তফসীরে নূরুল কোরআন

পঞ্চদশ পারা

১৫

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম

পঞ্চদশ খন্ড



তফসীরে নূরুল কোরআন

পঞ্চদশ পারা

১৫

পঞ্চদশ খণ্ড

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ,
সম্পাদক- মাসিক আল-বালাগ, তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ,
সাবেক সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অব গভর্ণস,
চেয়ারম্যান-তফসীরে তাবারী প্রকল্প সম্পাদনা বোর্ড,
বহু গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স

ঢাকা

তৃতীয় প্রকাশঃ সফর- ১৪২৭ হিঃ
ফেব্রুয়ারী- ২০০৬ ইং
চৈত্র- ১৪১৩ বাং

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

সর্বস্বত্ব ঃ গ্রন্থকারের

হাদীয়া ঃ ৩৫০.০০ টাকা

মুদ্রণেঃ নাদীয়াতুল কোরআন প্রিন্টিং প্রেস.
লালবাগ, ঢাকা

প্রাপ্তিস্থান

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭ স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১০৭১০/৯১১০৭৭৮

আন্ নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স
৬২-৬৩, চকবাজার, ঢাকা

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা

Tafseer-e Nurul Quran (v) 15; By Hazrat Moulana Mohammad Aminul Islam, Published by Al-Balag publications, 12/17, Sir Sayed Ahmed Road, Mohammedpur, Block-A, Dhaka-1207

Phone : 9110778, 9110710

Price : TK. 350.00

بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

ভূমিকা

পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের দরবারে অগণিত শোকর, তিনি তফসীরে নূরুল কোরআনের পঞ্চদশ খণ্ড পেশ করার তৌফিক দান করেছেন। কোন গ্রন্থের পঞ্চদশ খণ্ড পর্যন্ত রচিত এবং প্রকাশিত হওয়া নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাকের অসাধারণ নেয়ামত। এ নেয়ামতের জন্যে সারা জীবন শোকর আদায় করতে থাকলেও তাঁর হক্ব আদায় করা সম্ভব হবেনা। কেননা আমরা সর্বক্ষণ আল্লাহ্ পাকের করুণা-সমুদ্রে নিমজ্জিত রয়েছি। অহরহ তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করে চলেছি। তাই আমাদের সীমিত শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা তাঁর অসীম নেয়ামতের শোকরগুজারী সম্ভব নয়।

অগণিত দরুদ ও সালাম প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি রহমতুল্লিল আলামীন, যিনি সাইয়্যেদুল মুরসালীন, যিনি খাতেমুন নবিয়্যীন, যাঁর সৌজন্যে আমাদের প্রতি নাজিল হয় আল্লাহ পাকে রহমতের বারিধারা, যাঁর প্রতি বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে, যাঁর ওসীলায় তফসীরে নূরুল কোরআন রচনা ও প্রকাশনার তৌফিক পেয়েছি। হে আল্লাহ! দরুদ পেশ কর আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, এমন দরুদ যা হবে তোমার সন্তুষ্টির কারণ এবং সওয়াবের উপকরণ, আর যা হবে তাঁর হক্ব আদায়ের একটি পন্থা।

পবিত্র কোরআন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ। মানবতার উৎকর্ষ সাধন এবং বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যেই পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে। পবিত্র কোরআনে রয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্যে হেদায়েত। আর এ মহান গ্রন্থই আল্লাহ্ পাকের জীবন্ত রহমত, চিরন্তন, শ্বাশত, চির নির্ভুল, চির সত্য পাক কালাম। পবিত্র কোরআনের আবেদন বিশ্বজনীন, যার আহ্বান সমগ্র মানব জাতির জন্যে, যা অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্ব মানবের চির মুক্তির মহান সনদ রূপে। পবিত্র কোরআনে রয়েছে মানব জাতির অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের কথা। পবিত্র কোরআনে রয়েছে মানুষের ইহকালীন এবং পরকালীন জীবনের সাফল্য অর্জনের নির্ভুল দিক-নির্দেশনা। পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই মাটির মানুষ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য-ধন্য হতে পারে।

পবিত্র কোরআন সকল প্রকার জ্ঞানের মূল উৎস। এতে রয়েছে সর্বকালের মানুষের জন্যে সঠিক পথের সন্ধান, আর এতেই রয়েছে মানব-জীবনের সকল জটিল সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا (সূরা বণী ইসরাঈল)

"আর আমি প্রত্যেকটি বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

(সূরা যুমার)

"আর আমি এই কোরআনে মানব জাতির জন্যে প্রত্যেকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে"।

বস্তুতঃ যিনি বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানব জাতিকে, যিনি বিশ্ব প্রতিপালক, তিনিই মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে নাজিল করেছেন পবিত্র কোরআন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (সূরা ফোরকান)

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, পবিত্র কোরআন তিনিই নাজিল করেছেন, যিনি আসমান জমিনের সকল রহস্য সম্পর্কে অবগত"।

পবিত্র কোরআনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, সকল যুগের সর্ব প্রকার সমস্যার সমাধান রয়েছে পবিত্র কোরআনে, শুধু তাই নয়, বরং প্রত্যেকটি মানুষ দেখতে পাবে তার আলোচনাও রয়েছে এ মহান গ্রন্থে। তাই পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছেঃ

لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (সূরা আম্বিয়া)

"নিশ্চয় আমি এমন গ্রন্থ নাজিল করেছি যাতে রয়েছে তোমাদের আলোচনা, তবু কি তোমরা বুঝবেনা"?

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (সূরা নহল)

"আর (হে রসূল!) আমি আপনার প্রতি এমন গ্রন্থ নাজিল করেছি, যাতে রয়েছে প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা"।

অতএব, পবিত্র কোরআন হলো কালজয়ী, যুগোপযুগী বাস্তবের অগ্নি পরীক্ষায় বারে বারে পরীক্ষিত, চিরসত্য, চির সংরক্ষিত, চির প্রশংসিত।

আজকের বিশ্ব অশান্ত। এই অশান্ত পৃথিবীর মানুষ দিশেহারা। এ যুগের মানুষের কাছে সুখ-সামগ্রী রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে, কিন্তু শান্তি নেই এতটুকু। কেননা, শান্তির

মালিকের সাথে আড়াআড়ি করে, শান্তির বিধান নিয়ে বাড়াবাড়ি করে কোন দিন শান্তি পাওয়া যায়না। পবিত্র কোরআন এ সত্যটিকে এভাবে ঘোষণা করেছে–

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (সূরা না'দ)

"বিশ্ববাসী মনে রেখ, শুধু আল্লাহ পাকের স্মরণের মাধ্যমেই মানব-মন শান্তি লাভ করে"।

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনই মানব জাতিকে প্রকৃত শান্তির সন্ধান দেয়। আর শান্তিদূত হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে এবং বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই শান্তি পাওয়া যায়। যাঁরা সরাসরি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ করেছেন সেই পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরাম একদিন পবিত্র কোরআনের প্রচার-প্রসারে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সেদিন তাঁরা বিশ্ব শান্তি কায়েম করেছিলেন। আজকের বিশ্বে যে অশান্তি বিরাজমান, তা দূরীভূত করতে হলে প্রতিটি মুসলমানকে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বিশ্ব প্রতিপালকের মহান বাণী সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে। শুধু এভাবেই মানব-জীবনে সাধিত হবে সার্বিক কল্যাণ, লাভ হবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও রেজামন্দী। মূলতঃ এ উদ্দেশেই অব্যাহত রয়েছে তফসীরে নূরুল কোরআনের সাধনা। আলহামদুলিল্লাহ-সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাক আজ এই সাধনার একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছার তৌফিক দিয়েছেন। হে আল্লাহ! শুধু তোমার দয়া ও মেহেরবানীতেই তফসীরে নূরুল কোরআনের পঞ্চদশ খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে। হে আল্লাহ! কবুল কর অধমের এ সাধনা এবং এ মহান গ্রন্থকে পরিপূর্ণ করার তৌফিক দান কর। এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ দান কর তোমার প্রত্যেক অনুগত বন্দাকে। যারা তফসীরে নূরুল কোরআনের এ সাধনায় আমাদের সাথে সহযোগিতা করেন তাঁদেরকে তোমার সন্তুষ্টি দান কর। হে আল্লাহ! তোমার পেয়ারা হাবীব হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে আমাদের অগণিত দরুদ ও সালাম পৌঁছে দাও। আমীন।

বিনীত

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

৪/১১/১২

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

সূচীপত্র
তফসীরে নূরুল কোরআন
পঞ্চদশ খন্ড

সূরা বণী ইসরাঈল প্রসঙ্গে	১
নামকরণ	২
ফজিলত	২
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	২
মে'রাজঃ মানব জাতির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা	৩
কয়েকটি প্রশ্নের জবাব	১১
মে'রাজ	১৩
ঘটনা (১)	১৩
ঘটনা (২)	১৪
ঘটনা (৩)	১৪
ঘটনা (৪)	১৬
ঘটনা (৫)	১৬
ঘটনা (৬)	২০
ঘটনা (৭)	২১
ঘটনা (৮)	২৪
ঘটনা (৯)	২৬
ঘটনা (১০)	২৭
ঘটনা (১১)	৩০
ঘটনা (১২)	৩০
ঘটনা (১৩)	৩১
ঘটনা (১৪)	৩২
ঘটনা (১৫)	৩২
ঘটনা (১৬)	৩৩
ঘটনা (১৭)	৩৪
ঘটনা (১৮)	৩৭
ঘটনা (১৯)	৩৭

ঘটনা (২০) আল্লাহ্ পাকের দীদার এবং তাঁর সঙ্গে কথা	৪০
ঘটনা (২১) আসমানের উচ্চতর মকাম থেকে আসমানের দিকে প্রত্যাবর্তন	৪৩
ঘটনা (২২) আসমান থেকে জমীনের দিকে প্রত্যাবর্তন	৪৫
ঘটনা (২৩) মে'রাজের ঘটনা শ্রবণকারীদের অবস্থা	৪৭
মে'রাজ সম্পর্কে আরো কয়েকটি কথা	৪৯
বণী ইসরাঈল জাতির উত্থান-পতনের ইতিকথা	৬১
বখতে নসরের স্বপ্ন ও তা'বীর	৭০
বখতে নসরের ধ্বংস	৭১
তৌরাত পাওয়া গেল	৭২
হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে শহীদ করা হয়	৭৩
আয়াতের মর্মকথা	৭৮
পবিত্র কোরআন বিশ্ব গ্রন্থ	৮২
শানে নজুল	৮৫
আয়াতের মর্মকথা	৮৬
প্রত্যেককে তার আমলনামা দেয়া হবে	৯২
মুশরেকদের মৃত শিশুদের পরকালীন অবস্থা	৯৩
মুশরেকদের সন্তানদের সম্পর্কে আরও কিছু হাদীস	৯৮
পাপাচারের পরিণতি ধ্বংস	১০০
আয়াতের মর্মকথা	১০২
শিক্ষণীয় বিষয়	১০৫
আমল কবুল হওয়ার শর্ত	১০৭
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	১১০
প্রথম হুকুমঃ তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস	১১৪
দ্বিতীয় হুকুমঃ পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন	১১৪
পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাঁদের প্রতি করণীয়	১১৮
বার্ধক্যের সময়ে পিতা-মাতার খেদমতের তাগিদ	১১৯
পিতা-মাতার সঙ্গে যে আচরণ কাম্য	১১৯
পিতা-মাতার জন্যে দোয়া	১২০
তৃতীয় হুকুমঃ আত্মীয়-স্বজনের হক্ব আদায়ের তাগিদ	১২৪
চতুর্থ হুকুমঃ অপব্যয় করোনা	১২৬
অপব্যয়ের তাৎপর্য	১২৬
পঞ্চম হুকুমঃ সাহায্য প্রার্থীদের সঙ্গে বিনম্রভাবে কথা বল	১২৮
ষষ্ঠ হুকুমঃ মধ্যপন্থা অবলম্বন কর	১২৯
শানে নজুল	১২৯

আয়াতের মর্মকথা	১৩১
সপ্তম হুকুমঃ অভাবের তাড়নায় সন্তান হত্যা করোনা	১৩৫
অষ্টম হুকুমঃ ব্যাভিচারের ধারে কাছেও যেয়োনা	১৩৫
নবম হুকুমঃ হত্যা করোনা	১৩৬
দশম হুকুমঃ এতীমের সম্পদের কাছেও যেয়োনা	১৪০
একাদশ হুকুমঃ অঙ্গীকার রক্ষা কর	১৪০
দ্বাদশ হুকুমঃ পরিমাপ পূর্ণ করে দিও	১৪২
এয়োদশ হুকুমঃ যা জান না তার পেছনে পড়োনা	১৪৩
চতুর্দশ হুকুমঃ দর্পভরে চলাফেরা করোনা	১৪৪
দ্বীন ইসলামের মূল কথা	১৪৭
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	১৫০
শানে নজুল	১৬৬
মুসলমানদের পরস্পরের কলহ-দ্বন্দ্ব	১৬৭
আয়াতের মর্মকথা	১৬৭
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা	১৬৮
শেরকের বাতুলতা ঘোষণা	১৭১
আয়াতের মর্মকথা	১৭৬
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	১৭৬
আয়াতের মর্মকথা	১৭৮
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা	১৭৯
মানব সৃষ্টির ইতিকথা	১৮৫
মানব জাতির উচ্চ মর্যাদা	১৯৫
মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা	১৯৬
আধ্যাত্মিক বা রূহানী মর্যাদা	১৯৬
বিশেষ রুহানী মর্যাদা	১৯৭
মানব জাতির উচ্চ মর্যাদা	১৯৭
আলোচ্য বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা	১৯৯
দুনিয়াতে যে পথভ্রষ্ট, সে আখেরাতে হবে অন্ধ	২০৬
শানে নজুল	২০৭
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	২০৯
আয়াতের মর্মকথা	২১০
আল্লাহ্ পাকের হেফাজত	২১০
প্রিয়নবী (সাঃ)-এর উচ্চতম মর্যাদার কথা ঘোষণা	২১২
শানে নজুল	২১৩

প্রিয়নবী (সাঃ)-এর তাহাজ্জুদ নামাজের বিবরণ	২২১
মাকামে মাহমুদ	২২৩
সর্বশ্রেষ্ঠ শাফাআত	২২৯
তিনবার শাফাআত	২৩১
মানব চরিত্রের বৈচিত্র	২৩৭
রুহের অস্তিত্ব	২৪২
রুহ এবং প্রবৃত্তি	২৪৩
রুহের তাৎপর্য ও মাহাত্ম	২৪৩
রুহ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের অভিমত	২৪৩
রুহের গন্তব্যস্থল	২৪৮
পবিত্র কোরআন তুলে নেয়া হবে	২৫০
আলেমগণের মৃত্যুর মাধ্যমে এলম উঠে যাবে	২৫১
শানে নজুল	২৫২
কেয়ামতের দিন পুনরুত্থানের পন্থা	২৬৪
এ আয়াতের আরও একটি তফসীর	২৭১
শুধু জানা নয় মানার নাম ঈমান	২৭৫
পবিত্র কোরআন সত্যের প্রতীক	২৭৬
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা	২৮২
আয়াতের মর্মকথা	২৮৪
নামাজে প্রিয়নবী (দঃ)-এর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের অবস্থা	২৮৬
সূরা কাহফ	২৯০
সূরা কাহফ প্রসঙ্গে	২৯১
সূরা কাহফের ফজিলত	২৯১
সূরা কাহফের আমল	২৯২
শানে নজুল	২৯৩
পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত	২৯৫
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা	২৯৮
আসহাবে কাহফ ও রকীম	৩০২
আসহাবে কাহফের ঘটনা	৩০৪
আসহাবে কাহফের ঘটনা কেয়ামতের নমুনা	৩১১
সেনাপতির প্রতি হযরত ওমরের (রাঃ) নির্দেশ	৩১২
নীল নদের নামে খলীফাতুল মুসলেমীনের চিঠি	৩১২
ভূমিকম্প বন্ধ হলো	৩১৩
অগ্নির নামে চিঠি	৩১৩

হযরত আলী (রাঃ)-এর দোয়ায় হাত ঠিক হলো	৩১৪
আসহাবে কাহফের কুকুর	৩২৫
সংসর্গের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি	৩২৫
আসহাবে কাহফের স্থান	৩৩৩
আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ	৩৩৫
আসহাবে কাহফের সংখ্যা	৩৩৬
শানে নুযূল	৩৩৮
আল্লাহ পাকের দরবারে সর্বাধিক প্রিয় গুণ	৩৪৮
আয়াতের মর্মকথা	৩৬২
আয়াতের মর্মকথা	৩৬৪
কেয়ামতের পূর্বের অবস্থা	৩৭১
কেয়ামতের দিন যেভাবে হিসাব হবে	৩৭৬
সকল অন্যায়ের উৎস হলো অহংকার	৩৭৮
ইবলিসের ইতিকথা	৩৭৮
পাপীষ্ঠদের পরিণাম অত্যন্ত মন্দ	৩৮০
কাফেরদের উদ্দেশে কঠোর সতর্কবাণী	৩৮৭
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা	৩৮৭
আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর প্রিয় বন্দা কে?	৩৯৫
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	৩৯৬
হযরত খিজির (আঃ) প্রসঙ্গে	৪০০
এলম হাসিল করার আদব	৪০৩

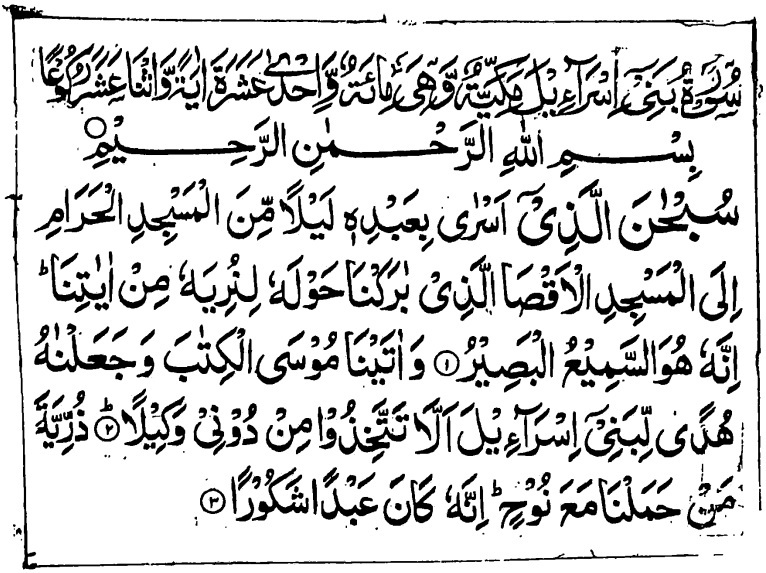
بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

তফসীরে নূরুল কোরআন

পঞ্চদশ খন্ড

পঞ্চদশ পারা


سُوْرَةُ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةٌ وَّاِحْدٰى عَشْرَةَ اٰيَةً وَّاثْنَا عَشَرَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ
اِنَّهٗ هُوَالسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝١ وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ
هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝٢ ذُرِّيَّةَ
مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝٣

তরজমা

(১) পবিত্র তিনি, যিনি তাঁর বন্দাকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকছা পর্যন্ত রাত্রিকালে ভ্রমণ করিয়েছিলেন, যার চতুর্দিক আমি বরকতময় করেছিলাম, যাতে করে তাঁকে আমি আমার কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখাই। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

(২) আমি মুসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম। আর তাঁকে করেছিলাম বণী ইসরাঈলের জন্যে পথ-প্রদর্শক। আমি আদেশ দিয়েছিলাম যে আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকেও কার্য নির্বাহক রূপে গ্রহণ করোনা।

(৩) তোমরা তো তাদেরই বংশধর, যাদেরকে আমি নূহের সঙ্গে আরোহণ করিয়েছিলাম। নিশ্চয় তিনি একজন কৃতজ্ঞ বন্দা ছিলেন।

সূরা বণী ইসরাঈল প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ, ১২ রুকু বিশিষ্ট এ সূরায় ১১১ আয়াত রয়েছে।

নামকরণ

সূরা বণী ইসরাঈলকে 'সূরাতুল এসরা'ও বলা হয়। এ সূরায় যেহেতু বণী ইসরাঈলের অনেক কথা রয়েছে, এজন্যে এর নামকরণ করা হয়েছে 'বণী ইসরাঈল'।

আর যেহেতু এ সূরায় প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মে'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, এজন্যে এ সূরাকে 'সূরাতুল এসরা' বলা হয়। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, এ সূরাটি মক্কী। কিন্তু কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেন, এ সূরার وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ থেকে আটখানি আয়াত মদনী, এতদ্ব্যতীর্ণ পূণ সূরাটি মক্কী।

ফজিলত

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক রাতে সূরা বণী ইসরাঈল এবং সূরা যুমার তেলাওয়াত করতেন।[১]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরায় তওহীদের দলিল-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। আর এ সূরায় নবুওয়্যতের দলিল-প্রমাণ এবং শরীয়তের বিধান স্থান পেয়েছে। এতদ্ব্যতীত, পূর্ববর্তী সূরার শেষে যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লংঘন করেছিল তাদের উল্লেখ ছিল। আর এ সূরার শুরুতেই বণী ইসরাঈলের জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অনাচার এবং তাদের শোচনীয় পরিণামের কথা বর্ণিত হয়েছে যাতে করে মক্কাবাসী নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করে ও সতর্ক হয়। কেননা মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে মক্কা থেকে বের করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। যেমন ফেরআউন হযরত মূসা (আঃ) এবং তাঁর সাথীদেরকে মিশর থেকে বের করার ইচ্ছা করেছিল। পরিণামে ফেরআউন তার সৈন্য-সামন্ত সহ লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়। আর বণী ইসরাঈলরা তাদের বাড়ী-ঘরের উত্তরাধিকারী হয়। এভাবে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে মক্কা শহর তথা সমগ্র আরবের উত্তরাধিকারী করবেন, এমন সময় এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী সূরার শেষে সবরের তা'লীম দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَئِن صَبَرتُم لَهُوَ خَيرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ

(যদি তোমরা সবর কর তবে তা হবে সবর অবলম্বনকারীদের জন্যে উত্তম।)

এমনকি, সূরা নাহলের সর্বশেষ আয়াতে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে, যারা সবর করবে এবং তাকওয়া-পরহেযগারী অবলম্বন করবে ও পরোপকারী হবে তারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হবে। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ

১। তফসীরে ফতহুল কাদীর খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০৫

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা তাকওয়া-পরহেযগারী অবলম্বন করে এবং যারা পরোপকারী হয়"।

এজন্যে এ সূরা শুরু করা হয়েছে মে'রাজের ঘটনা দ্বারা, যা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় সুদীর্ঘ দশটি বছরের অকথ্য নির্যাতন-উৎপীড়নের পর ঘটেছে অর্থাৎ দশ বছর সবর অবলম্বনের পর আল্লাহ্ পাক এ ইজ্জত এবং সম্মান দান করেছেন যা বিপদকে আনন্দ-উল্লাসে এবং অপমানকে সম্মানে রূপান্তরিত করেছে। আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মে'রাজের মাধ্যমে বিশেষ মর্যাদা এবং সম্মান দান করেছেন।[১]

মে'রাজঃ মানব জাতির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা

মে'রাজের এ অতি বিস্ময়কর ঘটনাকে মানব জাতির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা বললে অত্যুক্তি হবেনা। কেননা মে'রাজের মাধ্যমে প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়েছে তা আর কোন নবীকে দান করা হয়নি। এ সফরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথমতঃ মক্কা শরীফ থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত গমন করেন। বায়তুল মোকাদ্দাসে হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে অপেক্ষমান ছিলেন। তিনি সেখানে পৌঁছার পর দু' রাকাআত নামাজের ইমামতি করলেন। তাঁর পেছনে একতেদা করেছিলেন সমস্ত নবী রসূলগণ। দ্বিতীয়তঃ বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে মহাশূণ্য পরিভ্রমণ করে সাত আসমান পার হয়ে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত পৌঁছেন। এ সফর ছিল বোরাকে আরোহণ করে। এরপর রফ্‌রফে আরোহণ করে তিনি আরশে এলাহী পর্যন্ত সফর করেন। দরবারে এলাহীতে হাযিরী দেন। এরপর প্রত্যাবর্তন করেন ভূ-পৃষ্ঠে। এ বিস্ময়কর ঘটনার বিস্তাতির বিবরণ পেশ করার পূর্বে আলোচ্য আয়াতের তফসীরের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাক। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ

"পবিত্র তিনি, যিনি তাঁর বন্দাকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত রাত্রিকালে ভ্রমণ করিয়েছিলেন, যার চতুর্দিক আমি বরকতময় করেছিলাম, যাতে করে আমি তাঁকে আমার কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখাই, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ আল্লাহ্ পাক তাঁর কুদরতের মহিমার কথা বর্ণনা করে এরশাদ করেছেন যে তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি মহা পরাক্রমশালী। মানুষের বুদ্ধিতে যা অসম্ভব মনে হয়, যা মানুষের জন্যে

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত মওলানা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭৩

অকল্পনীয় এবং বিস্ময়কর, আল্লাহ পাকের কুদরত এবং ইচ্ছার কাছে তা কিছুই নয় অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দরবারে কোন কিছুই কঠিন নয়। যেমন সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একই রাত্রের কিছু অংশে মক্কা শরীফ থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস এবং এরপর আরশে এলাহী পর্যন্ত সফর করিয়েছেন।[১]

سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ

হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা থানবী (রঃ) তাঁর তফসীরে 'বয়ানুল কোরআনে' আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেনঃ

তিনি (আল্লাহ) সেই পবিত্র সত্তা যিনি স্বীয় বন্দাকে (হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে) রাতের বেলা মসজিদে হারাম থেকে (কা'বা শরীফ) মসজিদে আকসা (অর্থাৎ বায়তুল মোকাদ্দাস) পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, যার চতুর্দিকে (অর্থাৎ সিরিয়ায়) আমি (ধর্মীয় এবং পার্থিব) নানা প্রকার বরকত রেখে দিয়েছি (ধর্মীয় বরকত হচ্ছে এই যে, সেখানে অনেক আম্বিয়ায়ে কেরাম সমাধিস্থ রয়েছেন। আর পার্থিব বরকত হচ্ছে এই যে, সেখানে রয়েছে বৃক্ষরাজি, নহর সমূহ এবং শস্য-শ্যামলিমার বিপুল সমাবেশ)। এমন আশ্চর্য উপায়ে তাঁকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত এজন্যে নিয়ে গেলাম, যাতে করে আমি সে বন্দাকে আমার মহান কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ প্রত্যক্ষ করাই। এ নিদর্শন সমূহের মধ্যে কিছু তো সে স্থান সম্পর্কে, যেমন এত অল্প সময়ের মধ্যে এত দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করা এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের মোলাকাত ও তাঁদের বক্তব্য শ্রবণ করা। আর কিছু অংশ এর পরবর্তীকাল সম্পর্কীয়, যেমন আসমানের পরিভ্রমণ এবং সেখানকার বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ প্রত্যক্ষ করা, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব কিছু শ্রবণ করেন, সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন। তাই তিনি প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রত্যেকটি কথা শ্রবণ করতেন এবং তাঁর অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন, আর এভাবে তাঁকে সম্মানিত করলেন এবং স্বীয় নৈকট্য ও সান্নিধ্য প্রদান করলেন।

এখানে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা জরুরীঃ

১. যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এমন অভিনব উপায়ে পৃথিবী থেকে আসমানে নিয়ে যাওয়া একটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল, আর এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই سُبْحٰنَ শব্দ দ্বারা বিষয়টির বর্ণনা শুরু করা হয়েছে। কেননা সাধারণতঃ এ শব্দটি আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনার জন্যে এবং কোন বিষয়ে বিস্ময় সূচক ভাব প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর এ কারণেই আমি (হযরত থানবী (রঃ) আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে "বিস্ময়কর পন্থায়" শব্দটি যোগ করি। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-২১

আলাইহে ওয়াসাল্লাম বোরাকে আরোহণ করে মে'রাজ শরীফে গমন করেছিলেন। বোরাক শব্দটি আরবী ভাষায় "বরকুন" থেকে নিস্পন্ন হয়েছে। "বরকুন" অর্থ বিদ্যুৎ। বোরাক নামক যানটির গতিও বিদ্যুতের ন্যায় বিস্ময়কর রূপে দ্রুততর ছিল। অতএব, এ সফর অত্যন্ত বিস্ময়কর ভাবেই হয়েছিল।

২. হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মে'রাজের ঘটনাকে দু' ভাগে বিভক্ত করা হয়। কা'বা শরীফ থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত সফরকে 'এসরা' বা রাত্রিকালের সফর বলা হয়। বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে আসমানে আরোহণকে মে'রাজ বলা হয়। কিন্তু কখনো কখনো উভয় অংশের সমষ্টিকে তথা পূর্ণ সফরকে 'এসরা' বা 'মে'রাজ বলা হয়।

৩. بِعَبْدِهٖ শব্দ দ্বারা আল্লাহ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করেছেন। এতে দু'টি বিষয় প্রকাশিত হয়েছে–

প্রথমতঃ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহ পাকের অত্যন্ত প্রিয়তম এবং সর্বাধিক নৈকট্যের অধিকারী বন্দা তা প্রমাণ করা।

দ্বিতীয়তঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহাশূণ্য পরিভ্রমণের এমন বিস্ময়কর ঘটনা শ্রবণ করে কেউ তাঁকে উপাস্য বলে ভুল ধারণা করতে পারে- এ আশংকা ছিল, তাই بِعَبْدِهٖ (আল্লাহর বন্দা) বলে সে আশংকা দূর করা হয়েছে।

৪. যদিও আরবী ভাষায় রাত্রিকালের ভ্রমণকেই 'এসরা' বলা হয়, তবুও পুনরায় لَيْلًا (রাত্রিকালের) শব্দটি 'নাকেরাহ' রূপে সংযোজন করার তাৎপর্য এই যে, এর দ্বারা ভাষার প্রচলিত নিয়মানুসারে রাত্রির কিছু অংশ বোঝা যাবে। আর এভাবে মহান আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন সুদীর্ঘ কাজ সুসম্পন্ন করানো হয়েছে। অথচ لَيْلًا শব্দটি যোগ না করা হলে اَسْرٰى শব্দ দ্বারা সারা রাত্রির সফর বোঝা যেত। এজন্যেই অর্থাৎ সামান্যকাল বোঝাতে لَيْلًا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তফসীর গ্রন্থ রুহুল মাআ'নীতে বর্ণিত আছে, 'নাহার' এবং 'লাইল' শব্দদ্বয়কে যখন আলিফ লাম যুক্ত করে ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ হয় সারা দিন এবং সারা রাত।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাক এ আয়াতে لَيْلًا শব্দটিকে আলিফ লাম বিহীন 'নাকেরাহ' রূপে ব্যবহার করেছেন। এর তাৎপর্য হবে এই যে, মে'রাজের সফর সারা রাত ব্যাপী হয়নি; বরং রাতের কিছু অংশের মধ্যেই এ বিস্ময়কর সফর সুসম্পন্ন হয়েছিল।

৫. আলোচ্য আয়াতের তরজমা প্রসঙ্গে মসজিদে হারামের ব্যাখ্যা করা হয়েছে কা'বা শরীফ। কোন কোন সময় 'মসজিদে হারাম' শব্দটি হরম শরীফ অর্থেও (পবিত্র কা'বা শরীফের চারি পার্শ্বের সংরক্ষিত ও সম্মানিত স্থান) ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থই গ্রহণযোগ্য। কেননা সে সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাতীমে তথা-কা'বা শরীফের পার্শ্ববর্তী পরিবেষ্টিত রুকন, মকামে ইব্রাহীম, ও যমযম কূপের মধ্যস্থলে তশরীফ

রেখেছিলেন, হাদীস শরীফেই রয়েছে এ বিবরণ। আর এ স্থানটি কা'বা শরীফের অন্তর্ভুক্তও।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন হযরত উম্মে হানীর (রাঃ) গৃহে ছিলেন। এ বিবরণ উপরোল্লিখিত হাদীসের বিরোধী নয়, কেননা হতে পারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে হানীর (রাঃ) ঘর থেকে হাতীমে আগমন করেন এবং মে'রাজের সফর শুরু করেন।

৬. "আকছা" শব্দটি আরবী ভাষায় "বহু দূর" অর্থে ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ বায়তুল মোকাদ্দাস পবিত্র কা'বা শরীফ থেকে বহু দূরে রয়েছে বলেই তাকে মসজিদে আকছা বলা হয়।

৭. যদিও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে স্বগৃহে রেখে মে'রাজ শরীফের যাবতীয় বিস্ময়কর দৃশ্য দেখানো আল্লাহ পাকের পক্ষে সম্ভব এবং সহজ ছিল, কিন্তু তবুও তা করা হয়নি। কেননা এমন বিস্ময়কর পন্থায় বোরাকে আরোহণ করিয়ে আশ্চর্যজনক বিষয়গুলো দেখানোয় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদা অধিক রূপে প্রকাশ পায় এবং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় অনেক বেশী।

৮. বিশেষতঃ রাত্রিকালে মে'রাজ হওয়ার পশ্চাতে যে রহস্য রয়েছে তা এই, সাধারণতঃ রাত্রিকালই মিলনের উপযুক্ত সময়। অতএব, রাত্রিকালে আহ্বান করার মাধ্যমে এ সত্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং প্রতিভাত হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের অত্যন্ত প্রিয় এবং খাস দোস্ত।

৯. الَّذِيْ بٰرَكْنَا আলোচ্য আয়াতের এ অংশ দ্বারা যদিও বায়তুল মোকাদ্দাসের চারিপার্শ্বের মর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে, তবুও মূলতঃ এর দ্বারা মসজিদে আকসারই মর্যাদা ও পবিত্রতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা তার পারিপার্শ্বিক স্থানে বিভিন্ন প্রকার বরকত রয়েছে- একটি পার্থিব, অন্যটি ধর্মীয়। আর পার্থিব বরকত থেকে ধর্মীয় বরকতের শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রমাণিত। এর কারণ এই, মসজিদে আকসার চারিপার্শ্বে অনেক আম্বিয়ায়ে কেরাম সমাধিস্থ রয়েছেন। এর ফলে সেখানকার মাটির সাথে আম্বিয়ায়ে কেরামের (আঃ) দেহের সংস্পর্শ ঘটেছে।

অপরদিকে, মসজিদে আকসা অধিকাংশ আম্বিয়ায়ে কেরামেরই কেবলা ছিল, আর এ কারণে মসজিদে আকসার সাথে ছিল তাঁদের আত্মার সম্পর্ক। আর দেহের সংস্পর্শ থেকে আত্মার সংস্পর্শের বরকতই সমধিক। বিশেষ করে আম্বিয়ায়ে কেরামগণ (আঃ) তাঁদের নবুওয়্যতের যমানায় সে মসজিদেই এবাদত-বন্দেগী করতেন, যার ফলশ্রুতি স্বরূপ দেহ এবং আত্মার সংস্পর্শ একত্রিত হয়েছিল। কেননা মসজিদে আকসা কেবলা হিসেবে নির্দিষ্ট হবার পর তা বহু আম্বিয়ায়ে কেরামের (আঃ) এবাদতের স্থান ছিল।

অতএব, এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মসজিদে আকসা অত্যন্ত পবিত্র এবং বরকতময়।

১০. কোন কোন গ্রন্থে যে লিপিবদ্ধ রয়েছে, হযরত রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারকের স্পর্শ যে স্থানটি লাভ করেছে, তা মহান আরশ থেকেও উত্তম। এটি হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিশেষ ফজিলত এবং তাঁরই বৈশিষ্ট্য। والله اعلم যদিও আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশ দ্বারা একথা বোঝা যায় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মে'রাজ শুধু বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্তই ছিল।

কিন্তু لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا বাক্যটিতেই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বায়তুল মোকাদ্দাসের পর মহাশূণ্য পরিভ্রমণ করেছেন, আসমানে আরোহণ করেছেন। কেননা এ বাক্যে ব্যবহৃত اٰيٰتِنَا শব্দটি কোন বিশেষ গুণের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, তাই ভাষার ব্যবহারিক নিয়ম মোতাবেক এ শব্দ দ্বারা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বুঝতে হবে। আর পার্থিব নিদর্শন থেকে আসমানী নিদর্শন সমূহ যে অধিকতর শ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণ-একথা সন্দেহাতীত রূপে বলা চলে। বিশেষ করে যখন মে'রাজ সম্পর্কীয় হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, আসমানে আম্বিয়ায়ে কেরামও রয়েছেন। আর উপরোল্লিখিত আয়াতকে মে'রাজের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব অনুধাবন করতে হবে যে, আল্লাহ পাক তাঁর বন্দা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর অনন্ত অসীম আসমানী নিদর্শন সমূহ দেখাতে তাঁকে আসমানেও আরোহণ করিয়েছিলেন। এজন্যে বিখ্যাত তফসীর গ্রন্থ 'রুহুল মা'আনীতে' لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا বাক্যটির ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে—

ليرفعه الى السماء حتى يرى ما يرى من العجائب

অর্থাৎ আমার বন্দাকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত রাত্রিকালে ভ্রমণ করিয়েছিলাম, যাতে করে আসমানে আরোহণ করাই, যেন তিনি আমার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সমূহ থেকে যা কিছু দেখা যায় তা দেখতে পান।

বস্তুতঃ মক্কা শরীফ থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণের কথা যেভাবে আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে, এর পরবর্তী সফর তথা মহাশূণ্য পরিভ্রণের কথা তেমন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়নি। এর কারণ হয়ত এই হবে যে, আসমানে আরোহণ ও মহাশূণ্যে পরিভ্রমণ অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। সাধারণ লোকের পক্ষে তা বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে কাফের হতে হয়, তাই সুস্পষ্টভাবে এ ঘটনার উল্লেখ না করে দুর্বল ঈমানদারদের প্রতি দয়া করা হয়েছে।

(১১) مِنْ اٰيٰتِنَا শব্দের মধ্যে আংশিক বোধক مِنْ অক্ষরটি ব্যবহার করার কারণে একথা প্রতীয়মান হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মে'রাজের এ ঐতিহাসিক সফরে আল্লাহ পাকের সমস্ত নিদর্শন দেখতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে অবস্থাও তাই হয়েছে। কেননা হাদীস শরীফে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মে'রাজের সফরে কলম পরিচালনার শব্দ শ্রবণ করেছিলেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে তিনি কলম দেখেননি, এমনি আরো অনেক কিছু তিনি দেখেননি।

১২. এ আয়াতে اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ থেকে اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ পর্যন্ত শব্দ চয়নের

ব্যাপারে একটু ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, কেননা أَسْرٰى শব্দে নাম পুরুষের সর্বনাম সহ আরম্ভ করে, অনুরূপভাবে إِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ দ্বারা তথা-নাম পুরুষের সর্বনামের সাথে শেষ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো মধ্যখানে بٰرَكْنَا، لِنُرِيَهٗ، اٰيٰتِنَا এ তিনটি প্রথম পুরুষ বহু বচনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে, যা গুরুত্ব ও মহত্বের অর্থবহ। এ ব্যতিক্রমের কারণ হলো, একবার "সে", পুনরায় "আমি" বর্ণনা-শৈলীর মাধ্যমে শ্রোতাকে আনন্দ প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ أَسْرٰى শব্দে নাম পুরুষের সর্বনাম দ্বারা সাধারণ স্তরে রেখে এরপর প্রথম পুরুষ সর্বনাম ব্যবহার করার কারণে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, মে'রাজের এ ঐতিহাসিক ভ্রমণের কারণে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নৈকট্য এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নৈকট্য লাভের পরই প্রকৃতপক্ষে আলাপ-আলোচনার সময় সুযোগ হয়। তাই পরে প্রথম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করা সমীচিন মনে করা হয়েছে।

১৩. আলোচ্য আয়াতের শেষাংশ إِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ বাক্যটির সংযোজনের ফলে এর মাধ্যমে অবিশ্বাসী কাফেরদের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে এ মর্মে যে, 'আমি তোমাদের অবিশ্বাস, অবাধ্যতা এবং বিরোধিতা প্রত্যক্ষ করছি এবং শ্রবণ করছি'।

১৪. لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا এ বাক্যে এরশাদ হয়েছে, যাতে করে আমি তাঁকে আমার বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ প্রত্যক্ষ করাই। এরপর هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ (অর্থাৎ তিনি সর্বশ্রোতা-সর্বদ্রষ্টা) বাক্যটি সংযোজন করার মাধ্যমে একথার প্রতিও ঈঙ্গিত করা হয়েছে- যদিও তিনি (হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ দেখেছেন, অর্জন করেছেন জ্ঞান, কিন্তু জ্ঞানে আমার সমকক্ষ হতে পারেননি আদৌ, কেননা আমি তাঁকে দেখিয়েছি আর আমি স্বয়ং দর্শনকারী ও শ্রবণকারী। আর আমি না দেখিয়ে দিলে তিনি দেখতে পারেন না। অথচ আমার দর্শন ও শ্রবণে কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয়না।

দ্বিতীয়তঃ তিনি কয়েকটি নিদর্শন মাত্র দেখেছেন। আর আমি সব কিছুই প্রত্যক্ষ করি, সব কিছুই শ্রবণ করি।

এ পর্যায়ে আরো কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্যঃ

১. এ আয়াতে মসজিদে আকছা পর্যন্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গমনের কথা আছে। আরও বহু বিশুদ্ধ হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি মসজিদে আকছার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন এবং আম্বিয়ায়ে আলাইহিমুস সালামের সাথে তাঁর সাক্ষাত হলে তিনি এক জামাআতে নামাজ আদায় করেছিলেন, সে জামাআতের ইমাম ছিলেন স্বয়ং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

২. মসজিদে আকছার এ উপস্থিতির পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর মহাশূণ্য পরিভ্রমণ শুরু করেছেন, একের পর এক আসমানে আরোহণ করেছেন। কিন্তু একথা আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখিত হয়নি; বরং আরো অধিকতর সুস্পষ্টরূপে

বর্ণিত হয়েছে সূরা নজমে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى

অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে দ্বিতীয়বার দেখেছিলেন সিদরাতুল মুনতাহার নিকটবর্তী স্থানে। আর প্রথমবার দেখেছিলেন উফুকে আ'লায়। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইতিপূর্বে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গমন করেছিলেন। অতএব, যিনি দেখেছেন এবং যাঁকে দেখেছেন, উভয়ই সিদরাতুল মুনতাহার নিকট ছিলেন, একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং প্রতিভাত।

এতদ্ব্যতীত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আসমানে আরোহণের বিষয়টি হাদীস সমূহে এত সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে যে তা অস্বীকার বা অবিশ্বাস করার আদৌ কোন উপায় নেই।

৩. আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামায়াতের ওলামায়ে কেরামের অভিমত এই, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বশরীরে মে'রাজ শরীফে গমন করেছিলেন। একথার উপর উম্মতের এজমা (ঐক্যমত) হয়েছে। তাদের এ অভিমতের ভিত্তি হিসেবে যে কারণগুলো পেশ করা হয় তা হলো, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক যে গুরুত্বের সাথে মে'রাজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, এ ঘটনাটি অত্যন্ত বিস্ময়কর। অতএব, জাগ্রত অবস্থায় যে এ ঘটনাটি ঘটেছে, একথা সন্দেহাতীতরূপে বলা চলে। কেননা এমন একটি ঘটনা যদি স্বপ্নে বা আধ্যাত্মিকভাবে ঘটতো তবে তাতে বিস্ময়ের কোন কারণই থাকে না। কারণ স্বপ্নে বা আধ্যাত্মিক উপায়ে অতি সাধারণ লোক দ্বারাও অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ بِعَبْدِهٖ শব্দ ব্যবহার করার কারণেও একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মে'রাজ স্বশরীরে হয়েছিল। এর কারণ এই, যদি কেউ একথা বলে 'অমুক ব্যক্তির গোলাম আমার নিকট এসেছিল', তবে এর সহজ সরল অর্থ যা বোঝা যাবে তা হলো 'গোলাম জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে এসেছিল'।

কেননা 'গোলাম' বললে দেহ এবং প্রাণ উভয়ের সমন্বিত বস্তুটিকেই বোঝায়, আর আগমন শব্দের ব্যবহার হলে তার অর্থ হয় স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় আগমন।

তৃতীয়তঃ যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ মে'রাজ স্বপ্নে বা আধ্যাত্মিকভাবে হতো তবে বিশুদ্ধ হাদীস এবং বায়হাকী ও অন্যান্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনা অনুসারে কাফের মুশরেকরা যখন মে'রাজের কথা অবিশ্বাস করেছিল এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বায়তুল মোকাদ্দাসের বিবরণ এবং তাদের কাফেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন তিনি চিন্তিত হয়েছিলেন কেন? তিনি চিন্তিত না হয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে পারতেন যে আমার এ ঘটনা চোখের দেখা বলে তো আমি দাবি করিনি যে, তোমাদের এ সম্পর্কীয় প্রশ্নের জবাব আমি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেব; বরং

কাফেরদের প্রশ্ন শ্রবণ করে তিনি তখন বায়তুল মোকাদ্দাসের আকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন।

বহু হাদীসে এ কথাটি রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের প্রশ্নে চিন্তিত হলে আল্লাহ পাক তাঁর খাছ কুদরতে বায়তুল মোকাদ্দাসের চিত্র তাঁর চোখের সম্মুখে তুলে ধরলেন।

তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বায়তুল মোকাদ্দাস দেখে তার সুস্পষ্ট বিবরণ দান করলেন। (মুসলিম শরীফ)

(আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে টিভি চিত্রের মাধ্যমে এক স্থানের দৃশ্য অন্য স্থানে অহরহ দেখানো হচ্ছে। আর এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ ঘটনার সত্যতা এবং বাস্তবতা আধুনিক বিজ্ঞানের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয়।)

কেউ কেউ মে'রাজের ঘটনাকে স্বপ্নের ঘটনা মনে করেন অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সব কিছু স্বপ্নে দেখানো হয়েছে; স্বশরীরে তিনি মে'রাজ গমন করেননি এবং স্বচক্ষে তিনি আল্লাহ পাকের দীদারও লাভ করেননি। মে'রাজের ঘটনা সম্পর্কে তাদের এ সন্দেহের ভিত্তি হলো, কোরআনে করীমের একখানি আয়াতে رويا (রূয়া) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আর এ رويا শব্দের অর্থ হলো স্বপ্ন। তাদের এ সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। কেননা উল্লেখিত আয়াতে رويا শব্দটি বদরের যুদ্ধের সময়ের স্বপ্ন অথবা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় ওমরাহ পালনের সময় দেখা স্বপ্নের উদ্দেশেই ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন কোন কোন মোফাস্‌সেরীন এ মত পোষণ করেন, যার আলোচনা অন্য দু' আয়াতে সংক্ষিপ্ত ভাবে স্থান পেয়েছে, আয়াত দু'খানি হলোঃ

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ এবং لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا

অতএব, رويا শব্দের কারণে মে'রাজের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়।

আর যদি মে'রাজের ঘটনাকেই এ আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে বলে মনে করা হয় তবে "রূয়া" "রূয়াত" তথা দেখার অর্থে ব্যবহৃত হবে। কেননা রূয়া এবং রূয়াত উভয় শব্দ একই ধাতু থেকে নিঃস্পন্ন। যেমন আরবী ভাষায় এর আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে قربى (কুরবা) এবং قرابت (কারাবাত)।

অতএব, রূয়া অর্থ এ আয়াতে স্বপ্ন নয়; বরং দেখা আর সে দেখা জাগ্রত অবস্থায়। দৃষ্টান্তমূলক এ শব্দটি সংযোজিত হয়েছে। (রুহুল মাআনী)

কেউ কেউ শোরায়েক কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের শেষ শব্দ ثم استيقظت (তৎপর আমি জাগ্রত হলাম) দ্বারা সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। যেহেতু শোরাইক মোহাদ্দেসীনদের মতে হাদীসের হাফেজ নন, তাই তাঁর এ মত এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তিনি অন্যান্য হাফেজে হাদীসগণের বিরুদ্ধে মত পোষণ করেছেন। (রুহুল মাআনী)

অথবা এ আয়াত দ্বারা এবং হাদীসের এ শব্দ দ্বারা মে'রাজের ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে

বলে প্রমাণিত হয়। কেননা তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একাধিকবার আধ্যাত্মিক ভাবে মহাশূণ্য পরিভ্রমণ করেছেন। মে'রাজের এ ঐতিহাসিক অবিস্মরণীয় ঘটনার পূর্বে কোন কোন সময় স্বপ্নে আর কোন কোন সময় আধ্যাত্মিকভাবে তাঁর মে'রাজ হয়েছে– যাতে করে সেই মহান মে'রাজের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর মধ্যে শক্তি সৃষ্টি হয়।

আর কেউ কেউ হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং মাবিয়ার (রাঃ) কথায় সন্দিহান হয়েছেন। এর জবাব এই, মে'রাজের ঘটনার সময় পর্যন্ত হযরত আয়েশা (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি এবং হযরত মাবিয়া (রাঃ) তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি; হয়তো কারো নিকট শ্রবণ করে অথবা নিজে ইজতেহাদ করে বলেছেন অথবা অন্য কোন ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন।

৪. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত গমনের কথা যে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা তা হবে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণার বিরোধিতা। আর যে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণের কথা অস্বীকার না করলেও এ পর্যায়ে নানা প্রকার ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে তাকে খণ্ডনের চেষ্টা করে, তাকে বেদআতী বলা হবে। আর এর পরবর্তী সফরের কথা যে অস্বীকার করবে অথবা প্রকাশ্যে অস্বীকার না করলেও কোন রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আশ্রয় গ্রহণ করে তাকে খণ্ডনের চেষ্টা করবে, তাকেও বেদআতী বলা হবে।

যদিও পবিত্র কোরআনের সূরা নজমে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, তবু এ স্থানে ব্যবহৃত বাক্য সমূহে যে শব্দ চয়ন করা হয়েছে, আর আরবী ভাষার ব্যাকরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে তার এ অর্থও হতে পারে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের "সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা" পর্যন্ত গমন পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

৫. এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শবে মে'রাজে আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করেছেন কি-না। এ মতবিরোধ পূর্বে এবং পরে প্রায় সকল যুগেই রয়েছে। এ পর্যায়ে যে সমস্ত বিবরণ রয়েছে তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও রয়েছে। কেননা যে সমস্ত বর্ণনা দ্বারা আল্লাহ পাকের দীদার প্রমাণিত হয় তাতে এ সম্ভাবনা থাকে যে, এ দীদার অন্তর-চক্ষু দ্বারা হয়েছে আর দীদার না হওয়ার বিবরণকে বিশেষ কোন দীদার না হওয়ার অর্থেও গ্রহণ করা যায়। যেমন কেয়ামতের দিন জান্নাতে যে দীদার হবে তা থেকে এ দীদার অপেক্ষাকৃত কম সুস্পষ্ট হবে। যদিও দীদার হয়েছে, আর এতে আদৌ কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যেমন যারা চশমা দ্বারা দেখে অভ্যস্ত, তারা চশমা ব্যতীতও দেখেন কিন্তু চশমা হলে ভাল ভাবে দেখা যায়।

যাহোক, এসব বিষয়ে কোন প্রকার মন্তব্য না করাই শ্রেয়।

কয়েকটি প্রশ্নের জবাব

১. কেউ কেউ এ ভুল ধারণা করেছেন যে আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এতে হযরত ইব্রাহীম

(আঃ)-কে আসমান জমীনের কুদরত হেকমত প্রদর্শনের কথা রয়েছে অথচ সূরা বণী ইসরাঈলের প্রথম আয়াতে শবে মে'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে আর তাতে বলা হয়েছে لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا আর এই من শব্দটি কোন বস্তুর কিছু অংশ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহের কিছু অংশ দেখাতে মহাশূণ্য পরিভ্রমণ করানো হয়েছে।

এ প্রশ্নের জবাব এই যে, যদিও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনার বিবরণে من শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি তবুও مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ শব্দ দ্বারা আল্লাহ পাকের সমস্ত নিদর্শন বোঝা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ একথার সম্ভাবনা রয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাকের কুদরতের যে অংশটি দেখানো হয়েছে তা শ্রেষ্ঠতম অংশ।

২. কেউ কেউ এ ভুল ধারণা করে বসে আছে যে, আসমান বিদীর্ণ হওয়া সম্ভব নয় অতএব, মে'রাজের সফর কি করে সম্ভব? এর জবাব এই, এ যুক্তিই ভিত্তিহীন।

৩. কোন কোন লোক এ প্রশ্নও উত্থাপন করেছে যে, এত অল্প সময়ে এত সুদীর্ঘ সফর কি করে সম্ভব হলো? এর জবাব এই, কোন কোন নক্ষত্র এত বিরাটাকারের হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত দ্রুত গমনের কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই।

৪ কারো কারো বক্তব্য এই, আসমানের নিম্নদেশে বাতাস নেই এবং সেখানে তাপ অত্যন্ত বেশী, মানব দেহ সেখানে সুস্থ থাকতে পারেনা। এর জবাব এই, অসম্ভব বলে কিছু নেই অবশ্য কঠিন হতে পারে।

৫. কেউ কেউ বলেন, আসমানেরই কোন অস্তিত্ব নেই। জবাবে বলা যেতে পারে- তার প্রমাণ দাও।[১]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলুসী (রঃ) এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন (তফসীরে রূহুল মাআনী খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা ১-১৪ দ্রষ্টব্য)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) মে'রাজের ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। এ পর্যায়ে বর্ণিত হাদীস সমূহের উদ্ধৃতি দিয়েছেন (তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পৃষ্ঠা ২-২৫ দ্রষ্টব্য)।

এ আয়াতের তফসীর বর্ণনা করে মে'রাজের ঘটনার দলিল-প্রমাণ এবং বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) তাঁর রচিত তফসীরে মাআরেফুল কোরআনে (পৃষ্ঠা ২৭৩-২৮৬ দ্রষ্টব্য)।

এ আয়াতের তফসীরে মে'রাজের ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) (তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ৯-১৭ দ্রষ্টব্য)।

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) বিস্তারিত ভাবে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন (তফসীরে কবীর খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা ১৪৫-১৫৩ দ্রষ্টব্য)।

১। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা ৫৫৯-৫৬১

আল্লামা শওকানী (রঃ) এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন (তফসীরে ফতহুল কাদীর খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা ২০৫-২০৮ দ্রষ্টব্য)।

ইমাম তাবারী (রঃ) মে'রাজের এ ঘটনাকে তাঁর তফসীরে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন এবং বিশেষভাবে এ সম্পর্কীয় হাদীস সমূহের উদ্ধৃতি দিয়েছেন (তফসীরে তাবারী খণ্ড-১৫, পৃঃ ২-১৪ দ্রষ্টব্য)।

এ আয়াতের তফসীরে মে'রাজের ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু অত্যন্ত জোরালো ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন আল্লাম শিব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ) (ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৩৬৫ দ্রষ্টব্য)।

এমনিভাবে আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের তফসীরে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন (তফসীরে মাজেদী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা- ৫৭৭ দ্রষ্টব্য)।

এক কথায় সমস্ত তফসীরকারগণ এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেশ করেছেন। মে'রাজের একটি ঘটনায় রয়েছে অনেক ঘটনা। তফসীরকারগণ এ সম্পর্কে বহু তথ্য উপস্থাপন করেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানবী (রঃ) এ ঘটনাকে বিস্তারিতভাবে অত্যন্ত প্রামাণ্য এবং সুবিন্যস্ত আকারে পেশ করেছেন, আমরা এখানে তা উদ্ধৃত করছি।

মে'রাজ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের মহান গুণাবলীর অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন হলো মে'রাজের বিস্ময়কর ঘটনা। এ ঘটনাটি ইমাম জুহরীর বর্ণনা মোতাবেক নবুওয়্যতের পঞ্চম বর্ষে ঘটে (ইমাম নববীও এ অভিমতই পোষণ করেন)। এ বিস্ময়কর ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ যে সমস্ত মহান সাহাবায়ে কেরাম থেকে আমরা লাভ করি, তাঁরা হলেনঃ হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত এবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত এবনে ওমর (রাঃ), হযরত এবনে আমর (রাঃ), হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ), হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ), হযরত আনাস (রাঃ), হযরত আবু হোজায়ফা এবনুল ইয়ামান (রাঃ), হযরত সাদ্দাদ এবনে আউস (রাঃ), হযরত আবু আইউব (রাঃ), হযরত আবুজর (রাঃ), হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) এবং হযরত আবু সুফিয়ান এবনে হারব (রাঃ)। আর নারীদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ), হযরত উম্মে হানী (রাঃ) এবং হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকে এমন কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন।

ঘটনা (১)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আমি হাতীমে শায়িত ছিলাম। (বোখারী শরীফের বর্ণনা) অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি শোয়াবে আবি তালেবে ছিলেন (ওয়াকেদীর বর্ণনা)।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি হযরত উম্মে হানীর (রাঃ) ঘরে ছিলেন (তেবরানীর

বর্ণনা)।

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি স্বগৃহে ছিলেন এবং তাঁর ঘরের ছাদ খুলে ফেলা হয় (বোখারী শরীফের বর্ণনা)।

এ বিবরণ সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে এভাবে যে, উম্মে হানীর বাড়ী যা শোয়াবে আবি তালেবে ছিল, তাকে তিনি নিজের বাড়ী বলেছেন আর সেখান থেকে তাঁকে মসজিদে হারামের হাতীম নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং যেহেতু তাঁর চোখে তখনও ঘুম ছিল, তাই তিনি হাতীমে পৌঁছেও শায়িত হন। আর ছাদ খোলার মধ্যে এ হেকমত ছিল যে, প্রথম থেকেই যেন তিনি জানতে পারেন, কোন বিশেষ অসাধারণ ঘটনা তাঁর সাথে ঘটতে যাচ্ছে।

ঘটনা (২)

কিছু ঘুমও ছিল আর কিছুটা জাগ্রত অবস্থাও ছিল। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদুল হারামে নিদ্রিত ছিলেন। তাঁর নিকট হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আসলেন। অপর একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ তিন ব্যক্তি আসলেন। একজন বললেনঃ তিনি, অর্থাৎ উপস্থিত লোকদের মধ্যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে? দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেনঃ যিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি তিনিই। তৃতীয় ব্যক্তি বললেনঃ তবে যিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি, তাঁকেই নিয়ে চলো।

পরবর্তী রাতে উক্ত তিন ব্যক্তি পুনরায় আগমন করেন, আর কোন কথা বললেন না, তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। (বোখারী শরীফ)

নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যকার অবস্থা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে। আর তাকেই নিদ্রা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এরপর তিনি জাগ্রত ছিলেন আর সমস্ত ঘটনা তাঁর জাগ্রত অবস্থাতেই ঘটেছে। আর কোন কোন বিবরণে রয়েছে, যা মে'রাজের ঘটনার শেষে সন্নিবেশিত হয়েছে, "এরপর আমি জাগ্রত হয়েছি", এর অর্থ হলো- আমি মে'রাজের সেই অলৌকিক তথা অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছি। আর একথা যে বলা হয়েছে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে তিনি কে? এর কারণ হলো কোরায়েশ গোত্রের লোকেরা কা'বা শরীফ প্রাঙ্গনে শয়ন করতো। আর তেবরানীতেই রয়েছেঃ প্রথমে জিব্রাঈল (আঃ) ও মিকাঈল (আঃ) আগমন করেন, আর এসব কথা বলে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর তিনজন উপস্থিত হন।

আর মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছেঃ আমি একজনকে বলতে শুনেছি, এ তিনজনের মধ্যে একজন রয়েছেন, যিনি দু'জনের মধ্যে আছেন।

আর মাওয়াহেবে বর্ণিত আছে, দু' ব্যক্তি হলেন হযরত হামজা (রাঃ) এবং হযরত জাফর (রাঃ), আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের মাঝে শায়িত ছিলেন।

ঘটনা (৩)

সর্বপ্রথম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বক্ষ উপর থেকে নিচের দিকে

বিদীর্ণ করা হয় এবং তাঁর ক্বলব বের করে ফেলা হয়। একটি সোনালী পাত্রে ছিল আবে জমজম। এ আবে জমজম দ্বারাই তাঁর ক্বলবকে ধৌত করা হয়। এরপর অন্য একটি পাত্র আনা হলো, তাতে ছিল ঈমান এবং হেকমত, যা তাঁর ক্বলবে রাখা হলো। এরপর ক্বলবকে যথাস্থানে সঠিক ভাবে রাখা হয়। (মুসলিম শরীফ)

ফেরেশতাগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ক্বলবকে জমজম দ্বারা ধৌত করলেন, অথচ কাওসারের পানিও এক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভব হতো, কোন কোন আলেমের মতে, এটি প্রমাণ হলো একথার যে আবে জমজম আবে কাওসার থেকেও উত্তম (শায়খুল ইসলাম আল বলকেনী)। আর স্বর্ণের তশতরীর ব্যবহার অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে ব্যবহার হলো–এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে (১) স্বর্ণ ব্যবহার হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে মদীনা মুনাওয়্যারায়। মে'রাজের ঘটনার সময় এটি হারাম ছিল না। (ফতহুল বারী) (২) মে'রাজের ঘটনা হলো আখেরাতের ব্যাপার; আর আখেরাতে স্বর্ণের ব্যবহার বৈধ হবে। (৩) হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বর্ণ ব্যবহার করেননি, করেছেন ফেরেশতাগণ আর তাঁদের জন্যে এ হুকুম নয়। (এবনে আবি জমরাহ)

আর ঈমান ও হেকমত তশতরীতে থাকার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, এমন কোন গায়বী বস্তু ছিল, যদ্বারা ঈমান ও হেকমতের উন্নতি সাধিত হতো। তার দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন– দুনিয়াতে কোন কোন বস্তুর ব্যবহার অন্তর এবং মস্তিষ্কে এক প্রকার আনন্দের সঞ্চার করে। আর যেহেতু সে বস্তু হেকমত ও ঈমান বৃদ্ধির কারণ ছিল, এজন্যে এ নামকরণ করা হয় (ইমাম নববীও তাই বলেছেন)।

এরপর তাঁর নিকট শুভ্র বর্ণের একটি জন্তু উপস্থিত করা হলো যাকে বোরাক বলা হয়। যা লম্বা-কর্ণ বিশিষ্ট জন্তু থেকে সামান্য উঁচু এবং খচ্চর থেকে একটু নীচু ছিল, যা এত দ্রুতগামী ছিল যে যতদূর তার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হতো তত দূরেই সে তার পা ফেলত। (মুসলিম শরীফ) আর সে জন্তুটির পৃষ্ঠদেশে ছিল জিন, মুখে ছিল লাগাম।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সে জন্তুটির উপর আরোহণ করতে ইচ্ছা করলেন তখন সে একটু দুষ্টুমি করতে লাগলো। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তাকে সম্বোধন করে বললেন, তোমার কি হলো? আল্লাহ পাকের নিকট প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিকতর কোন সম্মানিত ব্যক্তি তোমার উপর আরোহণ করেননি।

এ কথাটি শ্রবণ করা মাত্র সে অত্যন্ত লজ্জিত হলো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বোরাকের উপর আরোহণ করলেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তাঁর বোরাকের রেকাব ধরলেন। আর মিকাঈল (আঃ) লাগাম হাতে নিলেন।

বোরাকের দুষ্টুমি ক্রোধবশতঃ ছিল না, ছিল আনন্দের আতিশয্যে; তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদার কথা শ্রবণ করে লজ্জিত এবং অনুগত হয়। যেমন একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাহাড়ের উপর তশরীফ রাখলেন, তখন পাহাড় নড়ে উঠল। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এরশাদ শ্রবণ করে সে স্থির হয়ে গেল। তিনি তখন পাহাড়কে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ

اثبت فانما عليك نبى وصديق وشهيدان

অর্থাৎ হে পাহাড়! স্থির হও, কেননা তোমার উপর রয়েছেন নবী ও সিদ্দীক এবং দু'জন শহীদ।

আর বিভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আমার হাত ধরে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে পৌঁছেন। (বোখারী শরীফ)

অন্য বিবরণে রয়েছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বোরাকের উপর নিজের পশ্চাতে আরোহণ করিয়েছেন। (এবনে হাব্বান)

উপরোল্লিখিত বিবরণের সঙ্গে এ বর্ণনার কোন বিরোধ নেই। কেননা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) প্রথম প্রথম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর সঙ্গে আরোহণ করিয়েছেন যাতে তিনি ভীত না হন। পরে বোরাক থেকে অবতরণ করে বোরাকের রেকাব হাতে নিয়েছেন, আর উভয় অবস্থায় মাঝে মধ্যে প্রয়োজন মোতাবেক তাঁর হাতও ধরেছেন।

ঘটনা (৪)

যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মঞ্জিলের দিকে রওয়ানা হলেন তখন এমন একটি এলাকায় উপস্থিত হলেন যেখানে ছিল অনেক খেজুর বৃক্ষ। এ সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তাঁকে বললেনঃ এখানে অবতরণ করে নফল নামাজ আদায় করুন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আরও বললেন, আপনি ইয়াস্রাব নামক স্থানে (মদীনা শরীফ) নামাজ আদায় করেছেন। এরপর এমন একটি এলাকায় আগমন করলেন, সেখানকার জমীন ছিল সাদা। জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ এখানে অবতরণ করে নামাজ আদায় করুন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায় করলে জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ আপনি মাদায়েনে নামাজ আদায় করেছেন। অতঃপর বায়তুল্লাহমে উপস্থিত হয়ে নামাজ আদায় করলেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ এটি হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মস্থান। (বাজ্জার, তেবরানী এবং বায়হাকীও এ বিবরণের সত্যতা বর্ণনা করেছেন)

আর একটি বিবরণে মাদায়েনের স্থলে 'তুরেছিনা' উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি তুরেছিনাতে নামাজ আদায় করেছেন, যেখানে আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন।

ঘটনা (৫)

এতে আলমে বরযখের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেন আর তা এই, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পথে জনৈকা বৃদ্ধাকে দন্ডায়মান অবস্থায় দেখলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে জিব্রাঈল! এটি কি? তিনি বললেন, চলুন, চলুন, আপনি চলতে থাকুন। এরপর একজন বৃদ্ধ লোককে দেখা গেল। সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এভাবে ডাকতে লাগল, 'হে মোহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এদিকে আসুন'। তখন জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, চলুন, চলুন। এরপর অন্য একটি দলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হলো। তারা তাঁকে এভাবে সালাম করলো,

আস্‌সালামু আ'লাইকা ইয়া আউয়াল, আস্‌সালামু আ'লাইকা ইয়া আখের, আস্‌সালামু আ'লাইকা ইয়া হাশের। তখন জিব্রাঈল (আঃ) তাঁকে বললেনঃ এঁদের জবাব দিন।

এই হাদীসের শেষে উল্লেখিত আছে, যে বৃদ্ধাকে আপনি পথে দেখেছিলেন তা ছিল দুনিয়া। অতএব, দুনিয়ার এতখানি বয়স হয়েছে যা সাধারণতঃ একজন বৃদ্ধার থাকে। আর যে আপনাকে আহ্বান করেছিল সে ছিল ইবলিস। যদি আপনি ইবলিস এবং দুনিয়ার আহ্বানে সাড়া দিতেন, তবে আপনার উম্মত দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিত। আর যাঁরা আপনাকে সালাম করেছিলেন, তাঁরা হলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)।

তেবরানী এবং বাজ্জারের বিবরণে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা হচ্ছে এই, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মে'রাজের এ সফরে এমন এক সম্প্রদায়ের সাক্ষাত লাভ করলেন যারা একই দিনে বীজ বপন করে এবং সেই একই দিনে ফল কাটে। আর ফল কর্তনের পর পুনরায় সে অবস্থা হয় যা ফল কর্তনের পূর্বে ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ এটি কি? তিনি জবাব দিলেন, এঁরা হলেন আল্লাহর পথের মুজাহেদ। তাঁদের নেকী সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, আর তাঁরা যা ব্যয় করে আল্লাহ পাক তার উত্তম বিনিময় দান করেন, আর তিনি উত্তম রিয্‌ক দাতা।

এরপর এমন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হলো, যাদের মাথা পাথর দ্বারা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলা হয়। পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে আর এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিব্রাঈল! এটি কি? তিনি বললেন, এরা সে সব লোক যারা ফরজ নামাজ আদায়ে প্রস্তুত হতো না।

এরপর এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাক্ষাত হলো যাদের লজ্জাস্থান অগ্রে এবং পশ্চাতে আবৃত ছিল আর লোকগুলো চতুঃষ্পদ জন্তুর ন্যায় বিচরণ করছিল, আর জাক্কুম এবং জাহান্নামের পাথর ভক্ষণ করছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ এ লোকগুলো কে? জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ এরা সে সব লোক, যারা স্বীয় অর্থ সম্পদের যাকাত আদায় করতো না। আল্লাহ পাক তাদের প্রতি জুলুম করেননি। আর আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।

এরপর অন্য একটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাক্ষাত হলো, যাদের সম্মুখে একটি পাত্রে পরিপক্ক গোশ্‌ত রাখা আছে; আর অন্য একটি পাত্রে কাঁচা-দুর্গন্ধময় গোশ্‌ত রাখা আছে। এ লোকগুলো পঁচা-কাঁচা গোশ্‌ত ভক্ষণ করছে, আর পরিপক্ক গোশ্‌ত স্পর্শ করছে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে, ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ এ লোকগুলো কে? হযরত জিব্রাঈল (আঃ) জবাব দিলেনঃ এরা আপনার উম্মতের সে সব লোক, যাদের নিকট ছিল বৈধ স্ত্রীগণ, তবুও তারা ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছে, এভাবে সে সব স্ত্রীলোকরা; যাদের বৈধ স্বামী থাকা সত্ত্বেও তারা ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছে।

এরপর এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত হলো, যে জ্বালানী সংগ্রহ করে এত বড় একটি

বোঝা তৈরী করেছিল যা সে বহন করতে সক্ষম নয়, এরপরও আরো জ্বালানী সে সংগ্রহ করে চলেছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কি? হযরত জিব্রাঈল (আঃ) জবাব দিলেন, এ হলো আপনার উম্মতের সে ব্যক্তি যার উপর মানুষের বহু আমানত ও অধিকার রয়েছে, যা আদায়ে সে সক্ষম নয় এরপরও সে আরো বোঝা নিতে উদ্যত।

এরপর তিনি অন্য একটি এমন সম্প্রদায়ের সাক্ষাত পেলেন যাদের রসনা এবং ওষ্ঠদ্বয় কাঁচি দ্বারা কর্তন করা হচ্ছে, আর কর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসছে। এ অবস্থা কখনো বন্ধ হয় না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ এটি কি? জিব্রাঈল (আঃ) জবাব দিলেন, এ হলো পথভ্রষ্টকারী ওয়ায়েজ বা উপদেশ দাতা।

এরপর তিনি একটি ছোট পাথর দেখলেন, ঐ পাথরটি থেকে একটি বড় গরু সৃষ্টি হয়; গরুটি পুনরায় উক্ত পাথরে প্রবেশ করতে চায় কিন্তু তা তার পক্ষে সম্ভব হয়না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কি? জিব্রাঈল (আঃ) জবাব দিলেন, এ হলো সে ব্যক্তির অবস্থা যে মুখে অনেক বড় কথা বলে পরে লজ্জিত হয়; কেননা তা ফেরত দিতে অক্ষম হয়।

এরপর তিনি এমন একটি ময়দানে তশরিফ নিলেন যেখানে পবিত্র আনন্দদায়ক বাতাস এবং কস্তরীর সুগন্ধ রয়েছে। এরপর একটি শব্দ শ্রবণ করলেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলে, জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, এটি জান্নাতের শব্দ। জান্নাত বলে, হে পরওয়ারদেগার! যা আমার সঙ্গে ওয়াদা করেছেন তা আমাকে দান করুন। কেননা আমার সুউচ্চ ইমারত সমূহ, তার মূল্যবান দ্রব্য-সম্ভার, মণি-মুক্তা, হীরা-জহরত, রেশমী পোশাক-পরিচ্ছদ, সোনালী রূপালী পাত্র সমূহ, মূল্যবান কুরসী-কেদারা, বাহন সমূহ, মধু, পানি এবং অন্যান্য সুস্বাদু পানীয় দ্রব্য অনেক বেশী একত্রিত হয়েছে। তাই প্রতিশ্রুত জান্নাতবাসীদেরকে আমার নিকট প্রেরণ করুন, যাতে করে তারা এ নেয়ামত সমূহ উপভোগ করতে সক্ষম হন।

আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ তোমার জন্যে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, প্রত্যেক মুসলিম নারী ও পুরুষ যে তোমার প্রতি ও আমার রসূলদের প্রতি বিশ্বাসী হবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করবে, আমাকে ভিন্ন অন্য কারো প্রতি বিশ্বাস না করবে, আর যে আমাকে ভয় করবে সে শান্তিতে বসবাস করবে; সে যা আমার নিকট চাইবে আমি তা তাকে দান করবো। আর যে আমাকে করজ দেবে (অর্থাৎ আল্লাহর রাহে ব্যয় করবে) আমি তাকে উত্তম বিনিময় দান করবো। আর যে আমার প্রতি ভরসা করবে আমি তার জন্যে যথেষ্ট হবো। আমি আল্লাহ। আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি না। আর মোমেনদের সাফল্য সুনিশ্চিত, আর আল্লাহ পাক সর্বোত্তম স্রষ্টা, তিনি বরকতময়।

জান্নাত বললোঃ আমি রাজী হয়েছি।

এরপর একটি ময়দানে গমন করতে হলো। সেখান থেকে অত্যন্ত ভয়ংকর শব্দ শ্রুত

হচ্ছিল, আর দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ এটি কি? জিব্রাঈল (আঃ) জবাব দিলেন, এটি জাহান্নামের আওয়াজ। জাহান্নাম বলে, হে পরওয়ারদেগার! আমার সঙ্গে যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে (অর্থাৎ দোযখীদের দ্বারা জাহান্নাম ভরপুর করে দেয়া) তা পূর্ণ করুন। কেননা আমার জিঞ্জির সমূহ, আমার বাগান সমূহ, আমার অগ্নি স্ফুলিঙ্গ, আমার গরম পানি এবং অন্যান্য আজাব সমূহ অনেক মাত্রায় একত্রিত হয়েছে, আমার গর্ত অত্যন্ত গভীর এবং তাপ অতীব সতেজ হয়েছে। আল্লাহ পাকের এরশাদ হলো, প্রত্যেক মুশরেক নারী ও পুরুষ, প্রত্যেক কাফের নারী ও পুরুষ এবং প্রত্যেক অহংকারী দ্বীন ইসলামের দুশমন যে কেয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস করেনা, তোমার জন্যে নির্দিষ্ট হবার প্রস্তাব গৃহীত হলো।

দোযখ বললোঃ আমি রাজী হয়েছি।

আর আবু সায়ীদের বিবরণ বায়হাকী থেকে এভাবে বর্ণিত আছে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমাকে ডান দিক থেকে জনৈক আহ্বায়ক আহ্বান করলো যে, আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবো। আমি তার কথার কোন জবাব দেইনি। অনুরূপভাবে আরেকজন আমাকে বাম দিক থেকে আহ্বান করলো; আমি তারও কোন জবাব দেইনি। আর এ বিবরণে একথাও রয়েছে যে, একজন স্ত্রীলোককে দেখা গেল যে তার হাতগুলো উন্মুক্ত করে রেখেছে আর সে সম্পূর্ণভাবে সুসজ্জিত রয়েছে, আর আল্লাহর দান স্বরূপ সে সৌন্দর্য লাভ করেছে। সেও আমাকে বললোঃ হে মোহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, আমি আপনার নিকট থেকে কিছু কথা জানব। আমি তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিনি।

আর এই হাদীসেই রয়েছে যে, জিব্রাঈল (আঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ প্রথম আহ্বায়ক ছিল ইহুদীদের আহ্বায়ক। যদি আপনি তার জবাব দিতেন তবে আপনার উম্মত ইহুদী হয়ে যেত। আর দ্বিতীয় আহ্বায়ক নাসারা বা খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে ছিল। যদি আপনি তার জবাব দিতেন তবে আপনার উম্মত খৃষ্টান হয়ে যেত। আর সে স্ত্রীলোকটি ছিল দুনিয়া। যদি আপনি তার আহ্বানে সাড়া দিতেন তবে আপনার উম্মত দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ হয়ে আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিত।

এসব ঘটনা আসমান সমূহের সফরের পূর্বেই ঘটেছিল। আর কোন কোন ঘটনা আসমানে অবতরণের পর ঘটেছে। যেমন এই হাদীসেই রয়েছে যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসমানে তশরিফ নিয়ে যাওয়ার পর হযরত আদম (আঃ)-কে দেখতে পেলেন। আর সেখানে অনেক দস্তরখান পাতা রয়েছে, তাতে রয়েছে পবিত্র গোশ্ত। কিন্তু এ দস্তরখানে কোন লোক নেই। এতদ্ব্যতীত আরো কয়েকটি দস্তরখান রয়েছে; তাতে রয়েছে পঁচা গোশ্ত এবং তাতেই রয়েছে মানুষের ভীড়। অনেক লোক সেই পঁচা গোশ্ত ভক্ষণ করেছে। জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ এরা সে সব লোক, যারা হালালকে বাদ দিয়ে হারাম খায়।

আর এ বিবরণে একথাও রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সফরে

এমন এক সম্প্রদায়কে দেখলেন যাদের উদর মনে হয় যেন একটি ঘর। যখন তাদের কেউ দন্ডায়মান হতে চায় তখন সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায়। জিব্রাঈল (আঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ এরা হলো সুদখোর লোক।

আর এমন এক সম্প্রদায়ের সাক্ষাত পেলেন যাদের ওষ্ঠদ্বয় উষ্ট্রের ন্যায়; তারা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ভক্ষণ করে আর সেগুলো তাদের নিম্নদেশের পথ দিয়ে বেরিয়ে আসে। জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ এরা সে সব লোক যারা অন্যায়ভাবে এতিমদের ধন-সম্পদ হজম করে। আর এ সফরে এমন একদল নারীকে দেখলেন যাদেরকে তাদের স্তনের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে দেয়া হয়েছে; এরা ছিল ব্যাভিচারিনীর দল।

আর এ সফরে এমন এক সম্প্রদায়কেও দেখলেন, যাদের পাঁজরের গোশ্ত কর্তন করে তাদেরকেই ভক্ষণ করানো হচ্ছিল; এরা ছিল চোগলখোর।

আলমে বরযখের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন তা প্রত্যক্ষ করতে প্রত্যক্ষদর্শীর সে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকা জরুরী নয়। আর এ সম্ভাবনাও আছে যে, এ সমস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। সে আকৃতি সমূহের যা হযরত আদম (আঃ)-এর বাম দিকে ছিল যার উল্লেখ হবে নবম ঘটনায়।

আর এ পর্যায়ে কতকগুলো এমন ঘটনা রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়নি যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মহাশূণ্য পরিভ্রমণের পূর্বে দেখেছিলেন না কি পরে। যেমন হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মে'রাজে গমন করেন তখন কোন কোন আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়, যাঁদের সাথে বিরাট জনগোষ্ঠী ছিল, আর কোন কোন নবীর সঙ্গে নিতান্ত সামান্য সংখ্যক লোক ছিল; আর কোন কোন নবীর সাথে কেউই ছিলনা।

অতঃপর তিনি দেখলেন এক বিরাট দল, তিনি জিজ্ঞাসা করলে বলা হয়, মুসা (আঃ) এবং তাঁর উম্মত। কিন্তু একটু উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, আর দেখুন। এরপর যা দেখলাম তা হলো এক অত্যন্ত বিরাট জনসমাবেশ, চারদিক লোকে লোকারণ্য। তখন আমাকে বলা হলো, এটি আপনার উম্মত। এতদ্ব্যতীত আপনার উম্মতের আরো ৭০ হাজার লোক রয়েছে, যারা কোন হিসাব ব্যতীতই বেহেশতে প্রবেশ করবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এরা সে সব লোক, যারা দেহে কোন প্রকার চিহ্ন অংকন করেনা, যারা মন্ত্র দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করেনা, যারা কোন বস্তু দ্বারা ভাল-মন্দ হবার, কল্যাণকর-অকল্যাণকর হবার আলামত নির্ণয় করেনা, আর যারা স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল হয়। (তিরমিজী শরীফ)

ঘটনা (৬)

যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বায়তুল মোকাদ্দাস পৌঁছলেন (মুসলিম শরীফের বর্ণনা) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি বোরাক ঠিক সে স্থানে বেঁধে দিলাম যেখানে অন্য নবীগণ তাঁদের

বাহন সমূহ বাধতেন।

আর বাজ্জার বর্ণনা করেছেন (বুরাইদা থেকে) যে, জিব্রাঈল (আঃ) বায়তুল মোকাদ্দাসের নিকটস্থ একটি পাথরে স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা ছিদ্র করেন এবং তাতে বোরাককে বেঁধে দেন।

উভয় বিবরণের মাঝে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে যে, সে ছিদ্রটি হয়তো প্রাচীনকাল থেকেই ছিল কিন্তু কোন কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জিব্রাঈল (আঃ) স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা খুলে দেন, আর বোরাক বাঁধার ব্যাপারে হয়তো দু'জনেই অংশ গ্রহণ করেন।

আর এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করার কোন ন্যায্য কারণ নেই যে, বোরাককে বেঁধে রাখার কি প্রয়োজন ছিল, তাকে তো অনুগত করেই প্রেরণ করা হয়েছে। কারণ এ বিশ্বে অবতরণের পর হয়তো তার মধ্যে জাগতিক চরিত্র প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা ছিল। যদি বোরাক ছুটে যাওয়ার আশংকা নাও থাকে তবুও তার কোন প্রকার দুষ্টুমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরকে সাময়িক ভাবে অস্থির করার সম্ভাবনা ছিল। এতদ্ব্যতীত আরো বহু হেকমত থাকতে পারে যা অনুধাবন করা মানুষের সাধ্যাতীত।

ঘটনা (৭)

তফসীরে এবনে হাতেমে রয়েছে, এ বিবরণ হযরত আনাসের (রাঃ) যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন বায়তুল মোকাদ্দাস পৌঁছলেন, আর সে স্থানে পৌঁছলেন যার নাম বাবে মোহাম্মাদ, তখন বোরাক বেঁধে দিলেন এবং উভয়ে মসজিদ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন। তখন জিব্রাঈল (আঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ আপনি কি আপনার প্রতিপালকের নিকট এ দরখাস্ত করেছিলেন যে, আপনাকে যেন হুর দেখানো হয়। তিনি 'হ্যাঁ' সূচক জবাব দিলেন। তখন জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ এ স্ত্রীলোকদের নিকট তশরিফ নিন এবং তাদেরকে সালাম দিন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আমি তাদেরকে সালাম দিলাম। অতঃপর তারা আমার প্রশ্নের জবাব দিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কার জন্যে? তারা বললোঃ আমরা নেক এবং আমরা সুন্দরী। আমরা এমন লোকদের স্ত্রী যারা পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, যারা অপরিচ্ছন্ন হবে না, যারা চিরদিন বেহেশতে বাস করবে, কোন দিন বেহেশত থেকে বিদায় নেবে না, যারা চিরঞ্জীব, যাদের কোন দিন মৃত্যু হবেনা। এরপর কিছু সময় অতিবাহিত হলো, অনেক লোক সমবেত হলো, এরপর একজন মুয়াজ্জেন আজান দিলেন, একামতও হলো; আমরা সকলে কাতারবন্দী অবস্থায় অপেক্ষমান রইলাম যে, কে ইমাম হবেন। এমন সময় জিব্রাঈল (আঃ) আমার হাত ধরে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন, আমি সকলের ইমামতি করলাম। যখন নামাজ সুসম্পন্ন হলো, জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি জানেন যে আপনার পেছনে কারা নামাজ পড়েছেন? আমি বললাম, "না"। তিনি বললেন, এ পৃথিবীতে যত নবী রসূল প্রেরিত হয়েছেন সকলেই আপনার পেছনে নামাজ আদায় করেছেন।

বায়হাকী হযরত আবু সায়ীদের বিবরণ পেশ করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি এবং জিব্রাঈল (আঃ) উভয়ই বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ করি এবং আমরা দু' রাকাআত নামাজ আদায় করি। আর এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বিবরণে এতটুকু অতিরিক্ত সংযোজিত রয়েছে যে, আমি মসজিদে প্রবেশ করে আম্বিয়া (আঃ)-কে দেখতে পাই। তাঁদের কেউ দণ্ডায়মান অবস্থায়, কেউ রুকু অবস্থায়, আর কেউ সেজদারত ছিলেন। এরপর মুয়াজ্জেন আজান দিল, আমরা কাতারবন্দী হয়ে এ অপেক্ষায় রইলাম যে, কে ইমাম হবেন? ঠিক এমন সময় জিব্রাঈল (আঃ) আমার হাত ধরে আমাকে সম্মুখের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি সকলের ইমাম হিসেবে নামাজ আদায় করলাম।

হযরত এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। তাতে রয়েছে, যখন নামাজের সময় হলো তখন আমি তাদের ইমাম হলাম।

আর হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে আকছায় পৌঁছলেন তখন দন্ডায়মান হয়ে নামাজ পড়তে লাগলেন, আর সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম তাঁর সাথে নামাজ পড়লেন।

আর বায়হাকীতে আবু সায়ীদের বর্ণিত যে হাদীস সংকলিত হয়েছে তা এই, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে ফেরেশতাদের সঙ্গে নামাজ আদায় করলেন (অর্থাৎ তিনি ফেরেশতাদের জামাআতের ইমাম হলেন)। যখন নামাজ সুসম্পন্ন হলো তখন ফেরেশতাগণ জিব্রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সঙ্গে ইনি কে? জিব্রাঈল (আঃ) জবাব দিলেন, ইনি মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খাতেমুন নবিয়্যীন। ফেরেশতাগণ বললেন? তাঁর নিকট নবুওয়্যতের জন্যে কোন পয়গাম এসেছে নাকি তাঁকে আসমানে নিয়ে যাওয়ার দাওয়াত এসেছে? জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, হ্যাঁ তাই। ফেরেশতাগণ বললেন, আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি স্বীয় সন্তুষ্টি নাজিল করুন। উত্তম ভাই, উত্তম খলীফা (অর্থাৎ আমাদের ভাই আল্লাহর খলীফা)। এরপর আম্বিয়ায়ে কেরামের রুহের সাথে মোলাকাত হলো। তাঁরা সকলেই আল্লাহর প্রশংসা করলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এভাবে ভাষণ দান করলেনঃ সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকের জন্যে, যিনি আমাকে বন্ধু বলে ঘোষণা করেছেন, যিনি আমাকে দান করেছেন বিরাট ক্ষমতা। যিনি আমাকে অনুসরণীয় করেছেন, যিনি আমাকে নমরুদের অগ্নি থেকে নাজাত দিয়েছেন। আর সে অগ্নিকে আমার জন্যে শান্তির উপকরণ হিসেবে তৈরী করেছেন।

এরপর হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর প্রশংসা করে এভাবে ভাষণ দান করলেনঃ সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকের জন্যে, যিনি আমার সাথে বিশেষভাবে কথা বলেছেন। আর আমাকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন, আর আমার প্রতি তৌরাত নাজিল করেছেন। আর ফেরাউনের ধ্বংস এবং বণী ইসরাঈলের নাজাত আমার হস্তে প্রকাশ করেছেন। আর আমার উম্মতকে এমনি এক সম্প্রদায়ে পরিণত করেছেন যারা সত্যের আলোক দিশারী এবং সত্য অনুসারে সুবিচার করে।

এরপর হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহর প্রশংসা করে এভাবে ভাষণ দান করেনঃ সমস্ত

প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্যে, যিনি আমাকে বিরাট ক্ষমতা দান করেছেন, যিনি আমাকে যবুরের এলম দান করেছেন, আর আমার জন্যে লৌহকে নরম করে দিয়েছেন। আর আমার জন্যে পাহাড়কে অনুগত করে দিয়েছেন, আর পক্ষীদেরকেও আমার অনুগত করে দিয়েছেন এবং আমাকে দান করেছেন হেকমত ও সুস্পষ্ট ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করার ক্ষমতা।

এরপর হযরত সুলাইমান (আঃ) আল্লাহর প্রশংসা করে এভাবে ভাষণ দান করেনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্যে, যিনি আমার জন্যে বাতাসকে অনুগত করে দিয়েছেন, যিনি শয়তানদেরকে অনুগত করে দিয়েছেন, আমি যখন যা চাই তারা আমার জন্যে তাই প্রস্তুত করে, যেমন বড় বড় অট্টালিকা সমূহ এবং মূর্তি সমূহ (তখন তা বৈধ ছিল) এবং যিনি আমাকে পাখিদের ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন এবং যিনি বিশেষ দানে আমাকে সব কিছু দান করেছেন এবং যিনি আমার জন্যে শয়তান, মানুষ, জ্বীন ও পাখিদের সৈন্যদেরকে অনুগত করে দিয়েছেন। আর যিনি আমাকে এমন বাদশাহাত দান করেছেন যা আমার পরে আর কারো পক্ষে সম্ভব হবে না এবং যিনি আমাকে এমন পবিত্র বাদশাহাত দান করেছেন যে সম্পর্কে আমার কোনও হিসাব হবে না।

এরপর হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ পাকের প্রশংসা করে এভাবে বক্তৃতা আরম্ভ করেনঃ সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকের, যিনি আমাকে তাঁর কালেমা বলে আখ্যা দিয়েছেন, যিনি আমাকে আদম (আঃ)-এর ন্যায় সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে মাটি দিয়ে তৈরী করে আদেশ দিয়েছেন, 'তুমি আত্মা বিশিষ্ট হও' আর তিনি আত্মা বিশিষ্ট (জীবিত মানুষ) হয়েছেন আর যিনি আমাকে লিখবার ক্ষমতা, হেকমত এবং তৌরাত ও ইঞ্জিলের এলম দান করেছেন। আর যিনি আমাকে এ শক্তি দান করেছিলেন যে আমি যখন মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করে তাতে ফুঁক দিতাম তখন আল্লাহ পাকের হুকুমে তা জীবন্ত পাখিতে পরিণত হতো। আর যিনি আমাকে এ শক্তি দান করেছিলেন যে আমি আল্লাহ পাকের হুকুমে জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে দিতাম, আর মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দিতাম এবং যিনি আমাকে পবিত্র করেছেন এবং যিনি আমাকে ও আমার মাতাকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাজত করেছেন; এজন্যেই আমাদের প্রতি শয়তান কোন সফলতা লাভ করেনি।

বর্ণনাকারী বলেনঃ এরপর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং বলেনঃ আপনারা সকলে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করেছেন, আমিও আমার পরওয়ারদেগারের প্রশংসা করছি। সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকের জন্যে, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন রহমতুল্লিল আলামীন রূপে এবং সমস্ত মানুষের নিকট সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপে, যিনি আমার প্রতি কোরআনে করীম নাজিল করেছেন, যাতে রয়েছে সব কিছুর বিবরণ এবং যিনি আমার উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত হিসেবে ঘোষণা করেছেন যাদের আবির্ভাব হয়েছে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণার্থে, যিনি আমার উম্মতকে সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী উম্মত হিসেবে তৈরী করেছেন, আর যিনি আমার উম্মতকে এমনভাবে তৈরী করেছেন যে, প্রথমেও তারা (অর্থাৎ মরতবা ও মর্যাদার দিক থেকে সর্বাগ্রে তারা) আর শেষেও তারা (অর্থাৎ সময়ের দিক থেকে তারা সর্বশেষে), আর যিনি আমার বক্ষকে

প্রশস্ত করেছেন, আমার বোঝাকে হালকা করেছেন এবং আমার আলোচনাকে সর্বোচ্চ মরতবায় স্থান দিয়েছেন, আর আমাকে নবুওয়্যতের উদ্বোধনকারী এবং পরিসমাপ্তিকারী নির্বাচন করেছেন (অর্থাৎ নূরের দিক থেকে সর্ব প্রথম এবং প্রকাশিত হওয়ার দিক থেকে সর্বশেষ)।

এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সকলকে সম্বোধন করে বললেনঃ অতএব এসব গুণাবলীর কারণেই হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আপনাদের সকলের উপরে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।

এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসমান সমূহের ভ্রমণের উল্লেখ করেন। অন্য একটি বিবরণে রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে তিনজন পয়গম্বরের যথা-হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভাষণ এবং তাঁদের আকৃতি বর্ণনা করেছেন। আর এ বিবরণে এ কথাও রয়েছে, যখন আমি নামাজ থেকে অবসর পেলাম তখন একজন আমাকে বললো- "হে মোহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ইনি হলেন মালেক, ইনি দোযখের দারোগা'। আমি তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে সে আমাকে সালাম পেশ করলো।

আর এবনে আব্বাস (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শবে মে'রাজে দাজ্জালকে এবং দোযখের খাজেনকেও দেখেছেন। (মুসলিম শরীফ)

এভাবে পাশাপাশি উল্লেখ করাতে একথা প্রমাণিত হয় যে, দাজ্জালকেও তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসে দেখেছেন অর্থাৎ তার আকৃতির কোন নমুনা তিনি দেখেছেন, কেননা সে মুহূর্তে দাজ্জাল যে সেখানে উপস্থিত ছিল না একথা সুস্পষ্ট।

ঘটনা (৮)

অন্য একটি বিবরণে রয়েছে, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাজ সুসম্পন্ন করার পর যখন মসজিদ থেকে বাইরে তশরিফ আনলেন, তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তাঁর সম্মুখে দু'টি পাত্র পেশ করলেন। একটিতে ছিল শরাব আর একটিতে ছিল দুধ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমি দুধকে বেছে নিলাম। জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ আপনি স্বভাব ধর্মকে পছন্দ করেছেন। এরপর আসমানের দিকে গমন করেন।

আর আহমদের বিবরণে রয়েছে, বর্ণনাকারী হলেন হযরত এবনে আব্বাস, দু'টি পাত্রের একটি দুধের আর অপরটি মধুর।

আর বাজ্জারের বিবরণে রয়েছে তিনটি পাত্রের কথা-দুধ, শরাব এবং পানি এবং সাদ্দাদ এবনে আউসের হাদীসে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ নামাজের পর আমি পিপাসাগ্রস্ত হলাম। তখন এ পাত্র সমূহ আমার সম্মুখে পেশ করা হয়। আমি যখন দুধ গ্রহণ করলাম তখন একজন বুজুর্গ যিনি আমার সম্মুখে ছিলেন তিনি জিব্রাঈল (আঃ)-কে বললেনঃ তোমার বন্ধু স্বভাব-ধর্মকে গ্রহণ করেছেন।

বোরাক বাঁধার পরে যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, সেগুলোর ধারাবাহিকতা এভাবে হবে–

১. মসজিদ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে হুরদের সঙ্গে সাক্ষাত ও আলোচনা।

২. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং জিব্রাঈল (আঃ)-এর দু' রাকাআত করে নামাজ আদায় করা। সম্ভবতঃ এটি ছিল তাহিয়্যাতুল মসজিদ। ঐ সময় হয়তো অন্যান্য নবীগণ পূর্বেই মসজিদে সমবেত ছিলেন; যাদেরকে তিনি বিভিন্ন অবস্থায় দেখেছেন; কেউ রুকু অবস্থায় ছিলেন, কেউ সেজদারত ছিলেন, হয়তো সকলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করছিলেন। আর তাঁদের মধ্যে কোন কোন নবী তাঁর পরিচিত ছিলেন। আর মনে হয় নবীগণ নিজেদের নামাজ শেষ করার পর এ তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মুক্তাদী হয়েছিলেন।

৩. এরপর অন্যান্য আম্বিয়া (আঃ)-এর একত্রিত হওয়া।

৪. এরপর আজান, একামত, নামাজ এবং জামাআত হওয়া, আর এ জামাআতেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইমাম ছিলেন এবং আম্বিয়ায়ে আলাইহিমুস সালাম এবং কিছু সংখ্যক ফেরেশতা তাঁর মুক্তাদী ছিলেন, তাদের কোন কোন ব্যক্তিকে তিনি চিনতেন না, এজন্যেই জিব্রাঈল (আঃ) বলেনঃ সমস্ত নবী রসূলগণ আপনার পেছনে নামাজ পড়েছেন।

এটি কোন্ নামাজ ছিল? এ প্রশ্নের জবাব পরে আলোচিত হবে। আর আজান এবং একামত হয়তো এভাবেই হয়েছে যেমন বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে, যদিও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মদীনা মুনাওয়্যারায় আগমনের পর এ বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে, অথবা অন্য কোন প্রকারের আজান একামত হয়েছে।

৫. এরপর ফেরেশতাগণের সঙ্গে পরিচয় পর্ব। এ পর্যায়ে দোযখের খাজেনের সঙ্গে মোলাকাত হলো। তখন ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর পরিচয়। জিব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম শ্রবণ করে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর নিকট কি কোন ওহী প্রেরিত হয়েছে? এসব একথারই প্রমাণ যে, ফেরেশতাগণ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অবহিত যে তাঁর সাথে এমন ঘটনা ঘটবে। এ সম্পর্কে অবশ্য দু'টি সম্ভাবনা আছে-প্রথমতঃ হয়তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত লাভের জ্ঞান তখন পর্যন্ত তাদের হয়নি, কেননা ফেরেশতাদের প্রতি অর্পিত থাকে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব। সর্বদা অন্যান্য ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়না।

দ্বিতীয়তঃ নবুওয়্যতের ব্যাপারে হয়তো তাদের জ্ঞান ছিল, আর প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো মে'রাজ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়া। এমনিভাবে আসমান সমূহের পরিভ্রমণের সময় যে সমস্ত প্রশ্ন করা হয়েছে সে সম্পর্কেও একই কথা।

৬. আম্বিয়া (আঃ)-এর সঙ্গে মোলাকাত।

৭. আম্বিয়া (আঃ)-এর ভাষণ।

৮. পাত্র সমূহ পেশ করা, এ বিবরণ সমূহ সম্পর্কে চিন্তা করলে জানা যায় যে, পাত্র ছিল চারটি- দুধ, মধু, শরাব এবং পানি। কোন কোন বর্ণনাকারী দু'টির উল্লেখ করা যথেষ্ট মনে করেছেন, আর কেউ তিনটির উল্লেখ করেছেন। অথবা পাত্র তিনটিই ছিল, একটি পাত্রে ছিল মিষ্টি যা মধুর ন্যায়, কখনও তাকে মধু বলা হয়েছে আর কখনও পানি, আর শরাব তখন পর্যন্ত হারাম ঘোষিত হয়নি, কেননা এ ঘোষণা হয় মদীনা মুনাওয়্যারায় হিজরতের পর। এটি আন্দদায়ক বস্তু, এজন্যে এটি দুনিয়ার রূপক। মধু অধিকাংশ সময় স্বাদ উপভোগ করার জন্যে পান করা হয়, খাদ্য হিসেবে নয়। তাই এটিও একটি অপ্রয়োজনীয় বস্তু, আর এর দ্বারা ইঙ্গিত হলো দুনিয়ার আনন্দ-উল্লাসের দিকে, আর পানি খাদ্য বস্তুর সহকারী, খাদ্য নয়। যেভাবে দুনিয়া দ্বীনের সাহায্যকারী, আসল উদ্দেশ্য নয়; পক্ষান্তরে দ্বীন আধ্যাত্মিক খাদ্য যা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যেমন দুধ যা দেহের মৌলিক খাদ্য। যদিও আরও অনেক প্রকার খাদ্য-দ্রব্য রয়েছে কিন্তু তবুও সেগুলোর উপর দুধের প্রাধান্য রয়েছে, এটি খাদ্য এবং পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর এভাবে সিদরাতুল মুনতাহার পরেও পাত্র সমূহের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে (হাফেজ এমাদুদ্দীন এবনে কাসীর)। হয়তো এতে সুদৃঢ় করা, তাগিদ করা এবং ভয় প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য হতে পারে।

৯. এরপর আসমানের সফর। আর উপরোক্ত বিবরণ দ্বারা যেভাবে ঘটনাবলীর বিন্যাস করা হয়েছে তাতে একদিকে ঘটনাবলীকে একত্রিত করা হয়েছে, অন্যদিকে উল্লেখিত বিবরণ সমূহের মধ্যকার গরমিলও দূরীভূত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্বর্ধনার জন্যেই হয়তো বায়তুল মোকাদ্দাসে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও ফেরেশতাদের একত্রিত করা হয়েছিল। মূলতঃ আল্লাহ পাকই সর্বজ্ঞাত।

ঘটনা (৯)

এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসমানের পরিভ্রমণ শুরু করেন। কোন কোন বিবরণে রয়েছে যে, তিনি বোরাকের উপর আরোহণ করে আসমানে পরিভ্রমণ সুসম্পন্ন করেন।

বোখারী শরীফে হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ অন্তরকে বিধৌত করে তাকে ঈমান এবং হেকমত দ্বারা পরিপূর্ণ করার পর আমাকে বোরাকে আরোহণ করানো হয়েছে। বোরাক তার দৃষ্টির শেষ সীমায় পদক্ষেপ গ্রহণ করতো। আর জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে এভাবে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে পৌঁছেন। এতে একথাই সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি বোরাকে আরোহণ করেই আসমানে তশরিফ নিয়ে যান; যদিও পথিমধ্যে তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসে তশরিফ নেন।

বায়হাকীতে আবু সায়ীদের বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এরপর (অর্থাৎ বায়তুল মোকাদ্দাসের পর) আমার সম্মুখে একটি সিঁড়ি আনা হয় যাতে মানব জাতির রুহ সমূহ (মৃত্যুর পর) আরোহণ করে, তাই ঐ সিঁড়ি থেকে সুন্দরতর আর কিছু দেখা যায়নি।

তোমরা কোন কোন মৃত ব্যক্তিকে উন্মীলিত নেত্রে আসমানের দিকে চেয়ে থাকতে

দেখেছ, এর কারণও এই যে, সে এই সিঁড়িকে দেখে আনন্দিত হয়।

আর 'শরফুল মোস্তাফা' গ্রন্থে রয়েছে যে, এ সিঁড়িটি জান্নাতুল ফেরদাউস থেকে আনা হয়েছে আর তার ডানে এবং বামে, উপরে এবং নীচে ফেরেশতাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

আর কা'বের বিবরণে রয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে একটি রৌপ্য নির্মিত এবং একটি স্বর্ণ নির্মিত সিঁড়ি আনা হয় এবং তিনি ও জিব্রাঈল (আঃ) তাতে আরোহণ করেন।

আর এবনে কাসীরের বিবরণ হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি যখন বায়তুল মোকাদ্দাসের ঘটনা থেকে অবসর পেলাম তখন এ সিঁড়ি আনা হয় এবং আমার ভ্রমণের সাথী জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে আরোহণ করায় এবং আসমানের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

বোরাক এবং সিঁড়ির বিভিন্ন বিবরণের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব যে, কিছু পথ বোরাকের উপর আরোহণ করে আর কিছু পথ সিঁড়ির উপর আরোহণ করে অতিক্রম করেছেন, যেভাবে সম্মানিত মেহমানের জন্যে বিভিন্ন প্রকার যানবাহন পেশ করা হয়। এতে করে তাঁর জন্যে এ সুযোগ ও অধিকার থাকে যে, তিনি সামান্য সামান্য পথ অতিক্রম করে সকল যানবাহনের সদ্ব্যবহার করেন। আর বোরাক যদিও অত্যন্ত দ্রুতবেগে ভ্রমণ করে কিন্তু তার দ্রুত গমন একজন আরোহীর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। কেননা বোরাকে আরোহণ করার পর বিভিন্ন স্থানে ও মকামে অবতরণ এবং বিভিন্ন মঞ্জিলে বিভিন্ন প্রকার দৃশ্য সমূহের বিস্তারিত বিবরণ একথারই প্রমাণ বহন করে যে, এ ভ্রমণ ছিল অত্যন্ত শান্ত অবস্থায়।

ঘটনা (১০)

হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর সঙ্গে তিনি সর্বপ্রথম দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে পৌঁছলেন। জিব্রাঈল (আঃ) আসমানের দ্বার খোলার ব্যবস্থা করলেন। দ্বাররক্ষী ফেরেশতাগণের তরফ থেকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ কে? তিনি বললেনঃ আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তোমার সাথে কে আছেন? তিনি জবাব দিলেনঃ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তাঁর নিকট আল্লাহর পয়গাম (নবুওয়্যতের জন্যে অথবা আসমানে উপস্থিতির জন্যে) প্রেরিত হয়েছে কি? জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ হ্যাঁ। (বোখারী শরীফ)

আর বায়হাকীর হাদীসে হযরত আবু সায়ীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আসমানের দ্বার সমূহের মধ্য থেকে একটি দ্বারে পৌঁছেন। এ দ্বারটির নাম বাবুল হাফাজ। এতে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন, তাঁর নাম ইসমাঈল। তাঁর অধীনে রয়েছেন বার হাজার ফেরেশতা।

শোরায়েকের বর্ণনা যা বোখারী শরীফে সংকলিত হয়েছে যে, জমীনে আল্লাহ পাকের

কি পরিকল্পনা রয়েছে সে সম্পর্কে আসমানের অধিবাসীরা তেমন একটা খবর রাখেন না, যে পর্যন্ত না তাঁদেরকে এ সম্পর্কে অবগত করানো হয়। যেমন এখানে জিব্রাঈল (আঃ)-এর ভাষায় জানা যায়, এতে ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসার কারণও সুস্পষ্ট (এর বিবরণ অষ্টম ঘটনার পাঁচ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেখানে ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করার যৌক্তিকতা লিপিবদ্ধ হয়েছে)।

বোখারী শরীফের বিবরণে রয়েছে, ফেরেশতাগণ একথা শ্রবণ করে বলেছেন 'মারহাবা', আপনার আগমন মোবারক। এরপর দ্বার খুলে দেয়া হয়। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আমি সেখানে পৌঁছে দেখি হযরত আদম (আঃ) উপস্থিত রয়েছেন। জিব্রাঈল (আঃ) তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি আপনার আদি পিতা হযরত আদম (আঃ), তাঁকে সালাম দিন, আমি তাঁকে সালাম পেশ করলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন আর বললেনঃ 'মারহাবা' সুসন্তানকে, 'মারহাবা' নবীয়ে ছালেহকে।

আর একটি বিবরণে রয়েছে যে, দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে এক ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখলাম যাঁর ডানে কিছু আকৃতি ছিল এবং বামেও, যখন তিনি ডান দিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন তাঁর মুখে হাসি ফুটে ওঠে, পক্ষান্তরে যখন তিনি বাম দিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন তিনি কাঁদতে থাকেন। আমি জিব্রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলামঃ ইনি কে? তিনি জবাব দিলেন, ইনি আদম (আঃ)। আর ডান দিকের এবং বাম দিকের এ আকৃতিগুলো হলো তাঁর সন্তানদের রুহ সমূহ।

ডানদিকে যারা রয়েছে তারা জান্নাতী, আর বাম দিকে যারা রয়েছে তারা দোযখী। এজন্যেই তিনি ডান দিকে দেখে খুশী হন এবং বাম দিকে দেখে কাঁদতে থাকেন (মেশকাত শরীফেও অনুরূপ বিবরণ সংকলিত হয়েছে)।

আর বাজ্জারের হাদীসে হযরত আবু হোরায়রার (রাঃ) বিবরণ এই, তাঁর ডান দিকে একটি দ্বার ছিল, সে দ্বার থেকে সুগন্ধ আসছিল আর বাম দিকেও একটি দ্বার ছিল তা থেকে আসছিল দুর্গন্ধ। যখন তিনি ডান দিকে দৃষ্টিপাত করতেন তখন খুশি হতেন, আর যখন বাম দিকে দৃষ্টিপাত করতেন তখন চিন্তিত হতেন। আর শোরায়েকের উপরোক্ত বিবরণে একথাও রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে নীল এবং ফোরাতকে দেখেছেন, আর এ বিবরণেই রয়েছে মুক্তা এবং জবরজদ পাথরের নির্মিত মহল, আর এটিই হলো কাওসার।

হযরত আদম (আঃ) ইতিপূর্বে সকল আম্বিয়ার সঙ্গে বায়তুল মোকাদ্দাসে একত্রিত হয়েছেন। আর এভাবে তিনি তাঁর কবরেও উপস্থিত রয়েছেন। এমনিভাবে আসমান সমূহেও যে আম্বিয়ায়ে কেরামের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে, তাঁদের সম্পর্কেও একই প্রশ্ন উত্থিত হয়। এর তাৎপর্য এই যে, কবরে তাঁর মূল দেহ থাকে। আর অন্যান্য স্থানে তাঁর রুহ আকৃতি ধারণ করে, যাকে সুফীগণ 'জেসমে মেছালি' বলে থাকেন, রুহের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে বিদ্যমান। আর সেই জেসম বা দেহের সংখ্যাও হয় একাধিক। একই সময়

সে দেহ সমূহের সাথে রুহের সম্পর্ক গড়ে ওঠাও সম্ভব। কিন্তু তাঁর নিজস্ব শক্তিতে নয়, বরং শুধু এক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের খাস কুদরত ও মর্জিতে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, এ 'জেসমে মেছালি' যা উভয় স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়েছে, প্রত্যেক স্থানে তা স্বতন্ত্র আকৃতির অধিকারী ছিল। এজন্যে বায়তুল মোকাদ্দাসে দেখা হওয়া সত্ত্বেও আসমানে হযরত আদমকে (আঃ) চিনতে পারেননি। অবশ্য হযরত ঈসা (আঃ) যেহেতু আসমানে পূর্ণ দেহ সহ আছেন সেজন্যে আসমানে তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখাটা সম্ভব। কিন্তু তাঁকে যে বায়তুল মোকাদ্দাসে দেখেছেন, যার উল্লেখ অষ্টম ঘটনায় রয়েছে ঐ দেখা দেহ সহ ছিলনা; বরং তা ছিল 'জেসমে মেছালি' আর আত্মার সঙ্গে মৃত্যুর পূর্বেও জেসমে মেছালির সম্পর্ক অলৌকিকভাবে সম্ভব। অবশ্য এও সম্ভব যে, তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসেও এসেছেন, এরপর আসমানে প্রত্যাবর্তন করেছেন। অবশ্য এটা অসাধারণ অবস্থা। আর আল্লাহ পাকই এসব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

আর আদম (আঃ)-এর ডানে এবং বামে যে আকৃতি সমূহ পরিলক্ষিত হয়, সেগুলোও দৃষ্টান্তমূলক আকৃতি।

আর বাজ্জারের সংকলিত বিবরণ চিন্তা করলে এ সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় যে, এ আত্মা সমূহ ঐ সময়ে আসমানে উপস্থিত এবং আসমানের অধিবাসী ছিলনা, বরং নিজ নিজ ঠিকানায় ছিল। আর সেই ঠিকানা ও আদম (আঃ)-এর অবস্থানের মধ্যে দ্বার ছিল। সে দ্বার দিয়ে এ আকৃতি সমূহের প্রতিবিম্ব সে স্থানে পড়েছিল। অথবা সেই বাতাস (সুগন্ধ) যা এসেছিল তাও দেহের রূপ ধারণ করে এবং তাতে ছিল প্রতিবিম্ব প্রকাশের বৈশিষ্ট্য। যেমন অগ্নি স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে যখন সম্মিলিত হয় তখন তা প্রত্যক্ষ করার ন্যায় যোগ্যতা অর্জন করে। কেননা এ বিবরণে দ্বারের অস্তিত্বের কথা উল্লেখিত রয়েছে, আর এটি সুস্পষ্ট এ দ্বারটি ছিল ঐ আকৃতি সমূহের প্রতিবিম্ব প্রকাশের মাধ্যম। আর আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী। আর এতে এ প্রশ্ন আর রইলনা যে কোরআনে করীমের যে আয়াতে রয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

(সূরা আ'রাফ)

(যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করে এবং অহংকার করে আল্লাহর বিধান অমান্য করে তাদের জন্য আসমানের দ্বারা খোলা হবেনা।)

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদের রুহ আসমানে যেতে পারবেনা। অতঃপর দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে হযরত আদম (আঃ)-এর বাম দিকে কাফেরদের আত্মা কিভাবে সমবেত হলো?

এতদ্ব্যতীত, নীল ও ফোরাত নদীকে সপ্তম আসমানের উপর সিদরাতুল মুনতাহার নিকট দেখার কথা রয়েছে, অথচ এ নদী সমূহ রয়েছে দুনিয়াতে। একথার তাৎপর্য কি? সিদরাতুল মুনতাহার নিকট নীল ও ফোরাতকে দেখার ব্যাখ্যা সিদরাতুল মুনতাহার বিবরণের স্থানে প্রদত্ত হবে। এখানে শুধু বিবরণ সমূহ একত্রিত করার ব্যাখ্যা উপলব্ধি করা

দরকার।

হয়তো সিদরাতুল মুনতাহার মূলেই রয়েছে নীল ও ফোরাতের কেন্দ্র আর সেখান থেকে পানি দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে আসে এবং সেখান থেকে জমীনে আসে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে হবে।

অন্যান্য হাদীসের বিবরণ হলো এই যে, হাউজে কাউসার জান্নাতে রয়েছে অর্থাৎ মূল হাউজ সেখানেই রয়েছে। আর একটি শাখা এখানে রয়েছে। যেমন একটি শাখা কেয়ামতের ময়দানেও হতে পারে।

ঘটনা (১১)

বোখারী শরীফে রয়েছে, আমাকে জিব্রাঈল (আঃ) সম্মুখের দিকে নিয়ে গেলেন এবং দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছলেন এবং দ্বার খোলা হলে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ কে? বললেনঃ আমি জিব্রাঈল। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তোমার সঙ্গে কে? জবাব দিলেনঃ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তাঁর নিকট কি আল্লাহর পয়গাম প্রেরণ করা হয়েছে? জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ হ্যাঁ। ফেরেশতাগণ একথা শ্রবণ করে বললেনঃ মারহাবা। আপনার আগমন মোবারক হোক। এরপর দ্বার খুলে দেয়া হলো। (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ) আমি সেখানে পৌঁছে দেখলাম সেখানে রয়েছেন হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ), তাঁরা উভয়ে আত্মীয় (খালাতো ভাই)।

জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ ইনি ইয়াহইয়া, ইনি ঈসা, তাঁদেরকে সালাম দিন। আমি সালাম দিলাম, তাঁরা উত্তর দিলেন। এরপর বললেনঃ মারহাবা নেক ভাইকে, মারহাবা নেক নবীকে।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতা হযরত মরিয়ম (আঃ)-এর খালা হলেন হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর মাতা। অতএব হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর মাতার খালার নাতি। আর নানী যেহেতু মায়ের পর্যায়ের হয়, এজন্যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর নানীকে তাঁর মাতার স্থানে রাখা হয়; যদি তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁর মাতা হতেন, তবে হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর খালাতো ভাই, অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর খালার সন্তান। যদিও ছেলে নয় তবে নাতি। আর যেহেতু তাঁরা আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (আঃ)-এর পূর্ব পুরুষদের মধ্যে নন, তাই তাঁকে ভাই বলে সম্বোধন করেছেন।

ঘটনা (১২)

বোখারী শরীফে রয়েছে, এরপর আমাকে জিব্রাঈল (আঃ) তৃতীয় আসমানে নিয়ে গেলেন। দ্বার খোলা হলো। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ কে? বললেনঃ আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তোমার সাথে কে রয়েছেন? তিনি বললেনঃ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তাঁর নিকট কি কোন পয়গাম প্রেরিত হয়েছে? জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ হ্যাঁ। ফেরেশতাগণ একথা শ্রবণ করে বললেনঃ মারহাবা। আপনার আগমন মোবারক হোক এবং দ্বার খুলে দেয়া হলো। যখন আমি তথায় পৌঁছলাম

তখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে সেখানে দেখতে পেলাম। জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ ইনি ইউসুফ। তাঁকে সালাম দিন। আমি সালাম দিলাম। তিনি জবাব দিলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ মারহাবা নেক ভাইকে। মারহাবা নেক নবীকে।

আর একটি বিবরণে রয়েছে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে সৌন্দর্যের একটা (বড়) অংশ দেয়া হয়েছে। (মেশকাত শরীফ)

আর বায়হাকী সংকলিত হাদীসে আবু সায়ীদের বিবরণে এবং তেবরানীর হাদীসে হযরত আবু হোরায়রার (রাঃ) বিবরণে রয়েছেঃ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে, এমন এক ব্যক্তিকে দেখলাম যিনি আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। আর যিনি সৌন্দর্যের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে এমন ফজিলতের অধিকারী যেমন সমস্ত তারকা-রাজির মাঝে চতুর্দশীর চাঁদ।

এতে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে প্রথমতঃ একথায় হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অন্তর্ভুক্ত নন, তার প্রমাণ একখানি হাদীস যা তিরমিজী শরীফে সংকলিত এবং হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ পাক এমন কোন নবীকে প্রেরণ করেননি যিনি সুন্দর এবং মধুর-কণ্ঠ নন। আর তোমাদের নবী তাঁদের সকলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে মধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা এই, এ বর্ণনায় ঐ সার্বিক পন্থা আপন অবস্থায় থাকতে পারে আর বিশেষ কোন ফজিলত সার্বিক ফজিলতের বিরোধী নয়। অথবা একথা বলা যেতে পারে যে, সৌন্দর্যের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। এক প্রকারে হযরত ইউসুফ (আঃ) সবচেয়ে বেশী সুন্দর হতে পারেন, আর অন্য প্রকারে আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক সুন্দর হবেন। আর উভয় প্রকারের মধ্যে এমনিভাবে পার্থক্য হবে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) প্রকাশ্য দৃষ্টিতে সর্বাধিক সুন্দর এবং এ সৌন্দর্যেরও একটি সীমা নির্দিষ্ট রয়েছে।

আর লাবণ্যের দিক থেকে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশী সুন্দর। আর এ সৌন্দর্যের কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। যেমন যতই দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে তাঁর সৌন্দর্য। আর সমস্ত বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে আল্লাহ পাকই ওয়াকেফহাল। আর এটি হলো নিতান্তই আদবের স্থান।

ঘটনা (১৩)

অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে চতুর্থ আসমানে নিয়ে গেলেন; দ্বার খোলা হলো। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তোমার সঙ্গে কে রয়েছেন? তিনি বললেনঃ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। জিজ্ঞাসা করা হলো, তাঁর নিকট কি আল্লাহ পাকের কোন পয়গাম প্রেরিত হয়েছে?

জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ হ্যাঁ। ফেরেশতাগণ একথা শ্রবণ করে বললেনঃ মারহাবা। আপনার আগমন মোবারক হোক। দ্বার খোলা হলো। আমি সেখানে পৌঁছে দেখলাম, সেখানে রয়েছেন হযরত ইদ্রিস (আঃ)। জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ ইনি ইদ্রিস (আঃ),

তাঁকে সালাম দিন। আমি সালাম দিলাম, তিনি জবাব দিলেন। এরপর বললেনঃ মারহাবা নেক ভাইকে এবং নেক নবীকে।

যদিও হযরত ইদ্রিস (আঃ) হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে ছিলেন তবুও নবুওয়্যতের সম্পর্কীয় ভ্রাতৃত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই তাঁকে ভাই বলে সম্বোধন করা হয়েছে, আর পৌত্রের সম্পর্কের উপর ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে প্রাধান্য দেয়ার কারণ হলো আদব। সাধারণতঃ সমসাময়িক সন্তানকে অথবা নিজের থেকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী সন্তানকে ভাই বলে ডাকা হয়। আর এবনুল মুনীর বলেছেন যে, একটি অপরিচিত সূত্রের বিবরণে রয়েছে, 'মারহাবা' নেক সন্তানকে। আর কারো কারো মতে, ইদ্রিস হলো হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর উপাধি আর তাঁরই সঙ্গে চতুর্থ আসমানে মোলাকাত হয়েছে আর তিনি নবীর পূর্ব পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত নন এবং আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী।

ঘটনা (১৪)

বোখারী শরীফে রয়েছে, অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানে গেলেন। দ্বার খোলা হলো। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ কে? তিনি বললেনঃ আমি জিব্রাঈল।

জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তোমার সঙ্গে কে আছেন?

তিনি বললেনঃ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তাঁর নিকট কি কোন পয়গাম প্রেরিত হয়েছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। পরে সেখান থেকে বলা হলোঃ মারহাবা। আপনার আগমন মোবারক হোক। আমি সেখানে পৌঁছে দেখলাম হারুন (আঃ)। জিব্রাইল (আঃ) বললেনঃ তাঁকে সালাম দিন। আমি সালাম দিলাম। তিনি জবাব দিলেন। অতঃপর বললেনঃ মারহাবা নেক ভাইকে এবং নেক নবীকে।

ঘটনা (১৫)

বোখারী শরীফে রয়েছেঃ এরপর জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে উপরের দিকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছলেন। দ্বার খোলা হলোঃ জিজ্ঞাসা করা হলোঃ কে?

তিনি বললেনঃ আমি জিব্রাঈল (আঃ)।

জিজ্ঞাসা করা হলোঃ আপনার সঙ্গে কে আছেন? তিনি বললেনঃ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তাঁর নিকট কি কোন পয়গাম প্রেরণ করা হয়েছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। তখন বলা হলোঃ মারহাবা। আপনার আগমন মোবারক হোক। আমি সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম হযরত মূসা (আঃ)-কে। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ ইনি মুসা (আঃ)। তাঁকে সালাম দিন। আমি সালাম দিলাম। তিনি জবাব দিলেন। অতঃপর বললেনঃ মারহাবা নেক ভাইকে এবং নেক নবীকে।

এরপর আমি যখন সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম তখন হযরত মুসা (আঃ) কাঁদলেন।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ক্রন্দনের কারণ কি? তিনি বললেন, আমি এজন্যে কাঁদি যে, আমার পরে একজন যুবক পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছেন যাঁর উম্মতের জান্নাতী লোকদের সংখ্যা আমার উম্মতের জান্নাতী লোকদের থেকে অনেক বেশী (এ কারণে আমার উম্মতের জন্যে আমার দুঃখ এবং আক্ষেপ হয় যে, যেভাবে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মত তাঁর অনুসরণ করেছে, ঠিক তেমনি আমার উম্মত আমার অনুসরণ করেনি, আর এভাবে আমার উম্মতের এমন লোকেরা বেহেশত থেকে বঞ্চিত হলো; তাই তাদের জন্যে আসে আমার কান্না)।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে যুবক শব্দটা ব্যবহার করা এদিক থেকে হয়েছে যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক লোক তাঁর অনুসারী হবে, যখন তিনি বৃদ্ধ কালেও পৌঁছবেন না। অথচ অন্য নবীগণ বয়সে বৃদ্ধ হওয়ার পরও তাঁদের এত অনুসারী হয়নি। এতদ্ব্যতীত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বয়স হয়েছে ৬৩ বছর, অথচ হযরত মুসা (আঃ)-এর বয়স হয়েছিল ১৫০ বছর (কাসাসুল আম্বিয়া)।

ঘটনা (১৬)

বোখারী শরীফে রয়েছে, এরপর আমাকে নিয়ে জিব্রাঈল (আঃ) সপ্তম আসমানের দিকে আরোহণ করলেন। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ কে? বললেনঃ আমি জিব্রাঈল (আঃ)।

জিজ্ঞাসা করা হলোঃ আর তোমার সঙ্গে কে আছেন? বললেনঃ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

জিজ্ঞাসা করা হলোঃ তাঁর নিকট কি কোন পয়গাম প্রেরিত হয়েছে? বললেনঃ হ্যাঁ। তখন বলা হলোঃ মারহাবা। আপনার আগমন মোবারক হোক। আমি সেখানে পৌঁছে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাক্ষাত পেলাম। জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ ইনি আপনার পিতামহ ইব্রাহীম (আঃ)। তাঁকে সালাম দিন। আমি সালাম দিলাম। তিনি জবাব দিলেন এবং বললেনঃ মারহাবা নেক সন্তানকে এবং নেক নবীকে।

অন্য একটি বিবরণে রয়েছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বীয় কোমর বায়তুল মা'মুরে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আর বায়তুল মা'মুরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করেন যাঁদের দ্বিতীয়বার আসার আর সুযোগ হয় না (অর্থাৎ আগামী দিন আরো নতুন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করবেন)। আর দালায়েলে বায়হাকীতে আবু সায়ীদের বিবরণে রয়েছে, যখন আমাকে সপ্তম আসমানে আরোহণ করানো হলো তখন আমি সেখানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেখতে পেলাম। তিনি অতি সুন্দর। আর তাঁর সাথে তাঁর সম্প্রদায়ের কিছু লোক রয়েছে। আর আমার উম্মতেরও দু' প্রকার লোক রয়েছে। প্রথমতঃ যাদের পরণে পরিচ্ছন্ন পোশাক ছিল, দ্বিতীয়তঃ যারা ময়লা পোশাক পরিহিত ছিল, আমি যখন বায়তুল মা'মুরে প্রবেশ করলাম তখন পরিচ্ছন্ন পোশাকধারী লোকেরাও আমার সঙ্গে প্রবেশ করলো। দ্বিতীয় প্রকারের লোকদেরকে বাধা দেয়া হলো। এরপর আমি আমার সঙ্গীদের নিয়ে নামাজ আদায় করলাম।

কোন কোন বিবরণে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মর্যাদার ধারাবাহিকতা অন্য ভাবে

এসেছে, কিন্তু উপরোল্লিখিত তরতীবই অধিকতর শুদ্ধ এবং আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী। বায়তুল মা'মুর সম্পর্কে সিদরাতুল মুনতাহার উল্লেখের পর আরো আলোচনা সন্নিবেশিত হবে।

ঘটনা (১৭)

বোখারী শরীফে রয়েছে, এরপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহার দিকে উঠানো হয়। তার কুল এত বড় বড় ছিল যেন হিজর নামক স্থানের মটকা, আর তার পাতাগুলো এত বড় ছিল যেন হাতীর কান। জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ এটি সিদরাতুল মুনতাহা। আর সেখানে চারটি নদী রয়েছে, দু'টি ভেতরের দিকে যায়, দুটি বাইরের দিকে আসে। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ হে জিব্রাঈল। এটি কি? তিনি বললেন, যে নদী দু'টি ভেতরে যাচ্ছে সেগুলো জান্নাতের আর যেগুলো বাইরে আছে সেগুলো নীল এবং ফোরাত। এরপর আমার নিকট একটি পাত্রে শরাব এবং অন্যটিতে দুধ, তৃতীয়টিতে মধু পেশ করা হয়। আমি দুধকে গ্রহণ করলাম। জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ এটি স্বভাব ধর্ম। যার উপর আপনি রয়েছেন এবং আপনার উম্মতও তারই উপর কায়েম থাকবে।

বোখারী শরীফের অন্য একটি বিবরণে রয়েছে যে, সিদরাতুল মুনতাহার বুনিয়াদে এই চারটি নদী রয়েছে। আর মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, সিদরাতুল মুনতাহার বুনিয়াদ থেকেই এ চারটি নহর প্রবাহিত হয়। আর এবনে আবি হাতেম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেখার পর আমাকে সপ্তম আসমানের উপরের ছাদে নিয়ে যাওয়া হয়। এমনকি তিনি একটি নদীর নিকট পৌঁছেন। যেখানে ইয়াকুত, মুক্তা ও জবরজদ পাথর দ্বারা নির্মিত পাত্র সমূহ ছিল এবং তার উপর সবুজ সূক্ষ্ম পর্দা ছিল। জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ এটি কাওসার, যা আপনাকে আপনার পরওয়ারদেগার দান করেছেন। এতে সোনালী এবং রূপালী পাত্র সমূহ ছিল, আর তা ইয়াকুত এবং জমরুদ নামক মূল্যবান প্রস্তর খন্ডের উপর প্রবাহিত হয়। তার পানি দুধের চেয়েও ধবধবে সাদা। আমি একটি পাত্র থেকে পান করে দেখলাম তা মধু থেকে অধিকতর মিষ্ট এবং কস্তুরী থেকে অধিকতর সুগন্ধিদায়ক ছিল।

আর বায়হাকী সংকলিত হাদীসে আবু সায়ীদের বিবরণে রয়েছে যে, সেখানে ছিল একটি ঝরণা। যার নাম "সালসাবীল" । আর সে ঝরণা থেকে দু'টি নহর প্রবাহিত, একটি কাওসার দ্বিতীয়টি রহমতের নহর।

আর মুসলিম শরীফের বিবরণে রয়েছে, আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, ষষ্ঠ আসমান এবং জমীন থেকে যে সব আমল উপরে উত্তোলন করা হয় তা সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছে। আর সেখান থেকে উপরে নেয়া হয়। আর যা হুকুম আহকাম উপর থেকে আসে সেগুলো সর্ব প্রথম সিদরাতুল মুনতাহার উপরেই অবতীর্ণ হয়। সেখান থেকে দুনিয়াতে আনা হয়। আর এজন্যেই তাকে সিদরাতুল মুনতাহা বলা হয়।

বোখারী শরীফে রয়েছে, সিদরাতুল মুনতাহায় এত রং-এর বিপুল সমাবেশ হয়েছে

যে, এখন এ সম্পর্কে যথার্থ ধারণা করাও মুশকিল হয়ে গেছে।

আর মুসলিম শরীফে রয়েছে, এগুলো হলো সোনালী পাখী।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে এগুলো হলো সোনালী টিড্যি পাখী। আর একখানি হাদীসে রয়েছে যে, সিদরাতুল মুনতাহাকে ফেরেশতাগণ পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

মুসলিম শরীফের একটি বিবরণে রয়েছে, যখন আল্লাহর হুকুমে একটি আশ্চর্য জিনিস সিদরাতুল মুনতাহাকে ঢেকে দিয়েছে তখন তার আকৃতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে, তাই কোন মখলুক সিদরাতুল মুনতাহার সত্যিকার অবস্থার বিবরণ পেশ করতে সক্ষম হয়না।

আর একটি বিবরণে রয়েছে যে, সিদরাতুল মুনতাহা দেখার এবং পানি পেশ করার মধ্যে এ বাক্য সংযোজিত হয়েছে, এরপর আমার সম্মুখে বায়তুল মা'মুর উত্তোলন করা হয়। (মেশকাত শরীফ, মুসলিম শরীফ)

আর একটি বিবরণে রয়েছে যে, সিদরাতুল মুনতাহা দেখার পর আমাকে বেহেশতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে আমি মুক্তা নির্মিত গুম্বেদ দেখেছি আর বেহেশতের মাটি হলো কস্তরী।

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে, যখন আল্লাহর নির্দেশে তাকে একটি আশ্চর্যজনক বস্তু ঘিরে ফেলল তখন তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গেল। অতএব, সৃষ্টি জগতে কেউ তার অবস্থা বর্ণনা করতে পারেনা। অপর এক বর্ণনায় সিদরাতুল মুনতাহা দেখা এবং পাত্রগুলো উপস্থিত করার মধ্যে একথাটি রয়েছে যে, পুনরায় বায়তুল মা'মুরকে আমার সম্মুখে উত্তোলন করা হয়েছে। (মুসলিম শরীফ)

অন্য আরো একটি বর্ণনায় রয়েছে, সিদরাতুল মুনতাহা দেখার পর আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়েছিল এবং সেখানে মুক্তা দ্বারা নির্মিত স্তম্ভ রয়েছে। আর তার মাটি হলো কস্তরী। (মেশকাত শরীফ)

এই হাদীস দ্বারা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে মনে হয় যে, সিদরাতুল মুনতাহা সপ্তম আসমানে রয়েছে আর ষষ্ঠ আসমানে হওয়ার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই, হয়তো তার ভিত্তি ষষ্ঠ আসমানেই রয়েছে। আর এতে একথা জরুরী নয় যে, চারটি নহরও ষষ্ঠ আসমানেই হবে; যেমন অন্যান্য বিবরণেও রয়েছে যে, এ নহরগুলো সিদরাতুল মুনতাহার ভিত্তি থেকেই প্রবাহিত হয়। প্রকৃত অবস্থা এই, যখন ষষ্ঠ আসমান পার হয়ে সপ্তম আসমানে নহর প্রবাহিত হয় তখন প্রবাহিত হওয়ার এ স্থানকে ভিত্তি বলে ধরা যায়, যা সপ্তম আসমানে রয়েছে। অতএব এ নহর সমূহ যা দ্বিতীয় ভিত্তি থেকে প্রবাহিত হয়ে ভেতরের দিকে যাচ্ছিল, এগুলো হলো কাওসার এবং রহমতের নহর। এ উভয়টি সালসাবিলের শাখা। সম্ভবতঃ এ সালসাবিল আর এ স্থান যেখান থেকে কাওসার এবং রহমতের নহর প্রবাহিত হচ্ছে এসব সিদরাতুল মুনতাহার দ্বিতীয় ভিত্তিতেই হবে।

আর এবনে আবি হাতেমের উপরোল্লিখিত বিবরণ দ্বারা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে মনে হয় কাওসার জান্নাতের বাইরে রয়েছে। এর ব্যাখ্যা হয়তো এই হবে যে, কাওসারের সে অংশটুকু বাইরে রয়েছে যা সিদরাতুল মুনতাহার ভিত্তিতেই রয়েছে, অবশিষ্ট অধিকাংশ

জান্নাতের ভেতরেই রয়েছে যেমন অন্যান্য হাদীসের বিবরণ দ্বারাও একথা জানা যায়।

আর নীল এবং ফোরাত নদী আসমানে হওয়া এভাবে সম্ভব হতে পারে যে, দুনিয়াতে যে নীল ও ফোরাত নদী রয়েছে তা বৃষ্টির পানি একত্রিত হয়ে প্রস্তর থেকে প্রবাহিত হয় আর বৃষ্টি আসমান থেকে। তাই বৃষ্টির যে অংশটি নীল এবং ফোরাতের মূল কেন্দ্রে রয়েছে তা হয়তো আসমান থেকে এসেছে, তাই নীল এবং ফোরাতের ভিত্তি আসমানে রয়েছে বলে প্রকাশ করা হয়েছে। আর সিদরাতুল মুনতাহার রং-এর ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তা রূপক হিসেবেই বলা হয়েছে, কেননা সে-তো ফেরেশতা ছিল। আর একথা বলা যে, "জানিনা কি ছিল"- এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, হয়তো প্রথমতঃ জানা যায়নি অথবা এই ভাষা স্বীয় বিস্ময় প্রকাশের উদ্দেশে ব্যবহার করা হয়েছে এ মর্মে যে, সিদরাতুল মুনতাহার অপরিসীম সৌন্দর্যের বিবরণ পেশ করার জন্যে ভাষা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

আর মুসলিম শরীফের বিবরণ যা বায়তুল মা'মুর সম্পর্কে রয়েছে তা দ্বারা মনে হয় বায়তুল মা'মুর সিদরাতুল মুনতাহারও উপরে; যেমন এ শব্দ দ্বারা "এরপর বায়তুল মা'মুর উত্তোলন করা হলো", আর এ উত্তোলন সিদরাতুল মুনতাহা দেখার পর হয়েছে। আর সিদরাতুল মুনতাহার স্থান হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মকামের উপরে বলে মনে হয়। যেমন এ শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয়— "আর আমাকে উত্তোলন করা হয়েছে সিদরাতুল মুনতাহার দিকে"। এ বাক্যটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পর। এমন অবস্থায় এ বাক্যের কি তাৎপর্য যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বায়তুল মা'মুরের সঙ্গে তাঁর কোমর ঠেকিয়ে রেখেছিলেন (যা সপ্তম ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে)। এর ব্যাখ্যা এই যে, সিদরাতুল মুনতাহা সপ্তম আসমানে রয়েছে আর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তার দেয়ালের নিম্নাংশের সঙ্গে কোমর ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। আর উত্তোলন উচ্চস্থান থেকে উচ্চস্থানে হতে পারে, সিদরাতুল মুনতাহা থেকে যা সপ্তম আসমান থেকেও উচ্চে, আরো উচ্চে হতে পারে।

আর সপ্তম ঘটনায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে নামাজ পড়ার যে কথা রয়েছে তাতেও কোন প্রশ্ন উত্থিত হতে পারেনা, কেননা নামাজ নিম্ন মঞ্জিলে হয়েছিল, যেমন সাধারণতঃ মসজিদ সমূহে হয়।

আর তেবরানী কাতাদার বিবরণ সংকলন করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমাকে বলা হয়েছে যে বায়তুল মা'মুর একটি মসজিদ যা আসমানে কা'বা শরীফের সোজাসুজি উপরে রয়েছে এভাবে যে, যদি তা নিক্ষিপ্ত হয় তবে নিক্ষিপ্ত হবে কা'বা শরীফের উপরেই। তাতে ৭০ হাজার ফেরেশতা প্রতিদিন প্রবেশ করে। আর যে একবার বেরিয়ে আসে সে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করার সুযোগ পায়না। আর উপরে জান্নাতে প্রবেশ করার যে কথা উল্লেখিত হয়েছে হয়তো তা বায়তুল মা'মুর দেখার পূর্বে হবে, আর হয়তোবা পরেও হবে। কিন্তু পবিত্র কোরআন থেকে এতটুকু জানা যায় যে, জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহার নিকটেই রয়েছে, কিন্তু তার উপরে। যেমন বায়হাকী আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় সিদরাতুল মুনতাহার সফরের পরের অবস্থা এভাবে

সংকলন করেছেন যে, এরপর আমাকে জান্নাতের দিকে তোলা হয়েছে এবং আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী। আর বায়হাকী সংকলিত হাদীসে একথা উল্লেখিত আছে যে, জান্নাত ভ্রমণের পর আমার সম্মুখে দোযখ উপস্থিত করা হয়, তাতে ছিল আল্লাহ্ পাকের গযব, আযাব এবং প্রতিশোধ। যদি তাতে লোহা এবং পাথরও নিক্ষেপ করা হয় তবে তাকে হজম করে ফেলে, এরপর তা বন্ধ করে দেয়া হয়।

এ বর্ণনার ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, দোযখ স্ব-স্থানে ছিল, আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও ছিলেন স্বীয় অবস্থানে। মাঝখান থেকে আবরণ সরিয়ে দিয়ে তাঁকে দেখানো হয়।

ঘটনা (১৮)

বোখারী শরীফে বায়তুল মা'মুর এবং দুধের পাত্রের উল্লেখের পর এ বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে যে, এরপর আমার প্রতি দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়। অন্য একটি বিবরণে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মোলাকাতের পর একথা রয়েছে যে, এরপর আমাকে উচ্চ মকামে তোলা হয়, এমনকি আমি এক সমতল ময়দানে পৌঁছি; আমি সেখানে কলমের শব্দ শ্রবণ করি (যা লেখার সময় হয়) তখন আমার প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়। (মেশকাত শরীফ)

প্রথম বিবরণে নামাজ ফরজ হওয়ার কথা বায়তুল মা'মুর ভ্রমণের অনেক পরে মনে হয় কেননা এই বিবরণের ثم শব্দটির ব্যাকরণগত তাৎপর্য এটিই। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় বিবরণে নামাজের ফরজ হওয়ার হুকুম বায়তুল মা'মুর ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অনতিবিলম্বে ঐ সমতল ময়দানে পৌঁছার সময়ে হয় বলে প্রমাণিত হয়। আর এ বিবরণে ব্যবহৃত অক্ষরটির তাৎপর্য এই হয়। এ দু'টি বিবরণের মধ্যে চিন্তা করলে যে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় তা হলো, বায়তুল মা'মুরের ভ্রমণের পর এবং উল্লেখিত ময়দানে পৌঁছার পর নামাজ ফরজ হয়। আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী।

এতদ্ব্যতীত, আরো একটি ইঙ্গিত থেকেও ঐ কলম ব্যবহারের স্থান সিদরাতুল মুনতাহা ও বায়তুল মা'মুরের উপরে হওয়া প্রমাণিত হয়। আর তা হলো, এ কলমগুলো হচ্ছে অদৃষ্টের, যা দৈনন্দিন যাবতীয় কর্মসূচীকে লওহে মাহফুজ থেকে নকল করে চলেছে। আর সিদরাতুল মুনতাহা সম্পর্কিত আলোচনা (ষোড়শ ঘটনায়) উল্লেখ করা হয়েছে যে, উপর থেকে যে সকল বিধান অবতীর্ণ হয় তা প্রথমে এখানে আসে। অতএব, সিদরাতুল মুনতাহা তার নীচে বলেই ধরা যায়। এমনিভাবে বায়তুল মা'মুরের ভিত্তি সপ্তম আসমানেই বিদ্যমান, যেখানে ফেরেশতাকূল আল্লাহ পাকের এবাদতে নিয়োজিত, আর আসমান সমূহ উক্ত সাধারণ বিষয়েরই অন্তর্ভুক্ত; আর এগুলোর মধ্যে বিধান সমূহ নাযিল হতে থাকে। অতএব, বায়তুল মা'মুরও সিদরাতুল মুনতাহার নিম্নদেশেই রয়েছে।

ঘটনা (১৯)

বাজ্জার মে'রাজ সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একখানি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। আর তাতে হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর বোরাকের উপরে আরোহণ করে চলার

কথা রয়েছে। তিনি ঐ অবস্থায় পর্দা পর্যন্ত পৌঁছেন। আর একথাও বলেন যে, একজন ফেরেশতা পর্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসলেন। তখন জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন, আমি যখন থেকে পয়দা হয়েছি কোন দিনও এ ফেরেশতাকে দেখিনি, অথচ বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে মর্যাদার দিক থেকে আমি আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য।

আর দ্বিতীয় হাদীসে রয়েছে যে, জীব্রাঈল (আঃ) আমার নিকট থেকে সরে গেলেন, সমস্ত শব্দগুলো বন্ধ হয়ে গেল।

আর আবুল হাসান এবনে গালেব আবু রবি এবনে ছাবা 'শেফাউছ ছুদুর' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার নিকট জিব্রাঈল (আঃ) এসেছিলেন; আমার পরওয়ারদেগারের মহান দরবারে সফরের সময় আমার সঙ্গী ছিলেন; এমনকি এক স্থানে গিয়ে তিনি থেমে গেলেন। আমি বললামঃ হে জিব্রাঈল! এমন স্থানে এসে কোন বন্ধু কি বন্ধুকে পরিত্যাগ করে? জিব্রাঈল (আঃ) বললেনঃ যদি আমি আর একটু অগ্রসর হই তবে আমার ডানাগুলো জ্বলে ছাই হয়ে যাবে। বিখ্যাত বুজুর্গ সাধক কবি সা'দী (রঃ) একথারই ব্যাখ্যা করেছেনঃ

اگر ایك سر موئے برتر پرم - فروغ تجلی بسوزد پرم

আর এই হাদীসে রয়েছে যে, আমাকে এরপর নূর দ্বারা শক্তিশালী করা হয় এবং সত্তর হাজার পর্দা আমাকে পার করানো হয়, যেগুলোর একটি পর্দা অপর পর্দাটির সাথে সামঞ্জস্যহীন ছিল এবং আমার সাথে মানব ও ফেরেশতাকূলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, ঐ সময় যখন আমার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়, তখন এক ঘোষণাকারী আবু বকর (রাঃ)-এর কণ্ঠস্বরে ঘোষণা করলেন- "থামুন, আপনার প্রভু সালাতে নিয়োজিত রয়েছেন, আর সেখানে একথাও ছিল, আমি আবেদন করলাম যে দু'টি বিষয় আমার নিকট অত্যন্ত আশ্চর্যজনক মনে হলো তার একটি হচ্ছে, তবে কি আবু বকর আমার চেয়েও অগ্রগামী রয়েছেন?

দ্বিতীয়তঃ আমার পরওয়ারদেগার সালাতের মুখাপেক্ষী নন।

তখন এরশাদ হয়েছেঃ হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! এ আয়াত পাঠ করুন-

هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا

(সূরা আহযাব)

অতএব, আমার সালাতের অর্থ হলো আপনার ও আপনার উম্মতের প্রতি রহমত। আর আবু বকর (রাঃ)-এর কণ্ঠস্বরের তাৎপর্য হলো, আমি একজন ফেরেশতা আবু বকরের আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি– যে আপনাকে ডাকবে আবু বকরের কণ্ঠস্বরে, যাতে করে আপনার

অস্বস্তি দূরীভূত হয় আর আপনি এতটা ভীত না হন, যা আসল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়।

"শেফাউস সুদুর" গ্রন্থের এক বিবরণে রয়েছে যে, পর্দা সমূহের উঠে যাবার পর একটি রফরফ তথা সবুজ রং-এর একটি মসনদ আমার জন্যে আনা হয় এবং আমাকে তাতে রাখা হয়, এরপর আমাকে উপরে তোলা হয়; এমনকি আমি আরশ পর্যন্ত পৌঁছি। সেখানে আমি এমন মহান বিষয় দেখেছি যার বিবরণ দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মাওয়াহেবে এবনে গালেবের সূত্র থেকে এ বিবরণ সমূহ শেফাউস সুদুর থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

বাজ্জারের বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, আকাশ সমূহের উত্তোলনও বোরাকের উপরেই হয়েছে (এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী) আর মহাপ্রভুর রহমতের দৃষ্টির জন্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি থেমে যাওয়ার যে আদেশ হয়েছিল তার অর্থ এই নয় যে তিনি সম্মুখে চলতে থাকলে আল্লাহর কাজে বিঘ্ন ঘটবে, যেভাবে সৃষ্টি জগতের একটির ব্যস্ততা অপরটির জন্যে বিঘ্নের সৃষ্টি করে। বরং এর তাৎপর্য এই, যেহেতু আল্লাহ পাক এই সময় বিশেষ রহমত প্রদানে নিয়োজিত, আপনি আপনার পরিভ্রমণ ক্ষান্ত করুন এবং এতে নিয়োজিত হোন, কেননা আপনার পরিভ্রমণের ব্যস্ততা এ বিশেষ রহমত লাভের মনোনিবেশে বিঘ্ন ঘটাবে (এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী)। আর শেফাউস সুদুরের উল্লেখিত বিবরণে এ-ও বর্ণিত ছিল, এরপর আমাকে পূর্বাপর সকলের এলম দান করলেন, আমাকে আরো বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান দান করেছেন এবং তার গোপনীয়তা রক্ষার নির্দেশ দেয়া হলো। এছাড়া আমি নিজেও অনুভব করছিলাম যে, এর মর্যাদা রক্ষা করা আমি ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হবেনা। আর আমাকে এলম দান করেছেন সে সব বিষয়ের, যে সব বিষয়ে আমাকে অধিকার দান করেছেন এবং আমাকে কোরআনের শিক্ষা দিয়েছেন।

এ বিবরণে একথাও রয়েছে, আর আমাকে শিক্ষা দিলেন আমার উম্মতের সর্ব সাধারণের নিকট এর প্রচারের।

অতএব, বিভিন্ন সুফীর একথার নির্ভুলতায় সন্দেহ হতে পারে, যেমন তাঁরা বলেছেন যে, মে'রাজে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এমন কিছু লিখিত জ্ঞান লাভ হয় যা বিশেষ সুফীদেরকেই প্রদান করা হয়েছে। অতএব বুঝে নিতে হবে যে, প্রথমতঃ ঐ বর্ণনাতেই প্রশ্ন আছে যেমন والعهدة عليه (এবং দায়িত্ব তার উপর) বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ যখন এর গোপনীয়তার অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে তখন সুফীদেরকেই বা কীভাবে জানানো হলো। তৃতীয়তঃ যদি এ বিষয়কেও সে সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার অধিকার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছে, তাহলে এতে এ সত্যকে মেনে নিতে হবে যে, হয়তো তিনি সুফীদেরকে ভিন্ন কোন এলম শিখিয়েছেন, আর এই যে তাঁদের বক্তব্যের কোন কোন বিষয় শরীয়তের খেলাফ হলেও হাকীকত এবং তরীকতে তা বৈধ। এই এলম সমূহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে মানুষের মাধ্যমে অলিখিতভাবে চলে আসছে। এ ধরনের বিশ্বাসকে অধর্ম ব্যতীত আর কি বলা যেতে পারে? কেননা এটি কোরআন ও হাদীসের

সুস্পষ্ট ঘোষণা বিরোধী কথা।

যদি একথা মেনে নেয়া যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এমন কোন কথা কারো নিকট বলেছেন, তবে তা নিশ্চয় শরীয়ত বিরোধী হবেনা, অবশ্য এ অবস্থা হতে পারে যে, শরীয়ত এসব বিষয়ে নির্বাক। তবে এ সমস্ত এলম এমন নয় যার উপরে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি নির্ভরশীল, কেননা এমন এলম শুধু এলমে দ্বীনই আর এলমে দ্বীনের পরিপূর্ণতা এবং তার প্রচার সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট দলিল-প্রমাণ দ্বারা হয়েছে। তবে এ পর্যায়ে একটি সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা যেতে পারে আর তা হলো শেষ জমানার ফেতনা-ফাসাদ সম্পর্কীয় এলম। এ বিষয়ে কোন কোন সাহাবীকে অবগত করানো হয়েছে আর কোন কোন সাহাবীকে এ বিষয়ে জানানো হয়নি, যা সাধারণতঃ এ ধরণের বিষয়ে স্বাভাবিক গ্রহণীয় নীতি হয়।

যা কিছুই হোক অন্তর থেকে অন্তরে সত্য পৌছবার যে দাবী তা মোটেই সত্য নয়। অন্তর থেকে অন্তরে পৌছবার যে কথা তার তাৎপর্য হলো আধ্যাত্মিক সম্পর্ক যা প্রকাশ্য এবং গোপনীয় সম্পর্কের ফলশ্রুতি। যেহেতু মানুষ এসব ব্যাপারে ভুল করে তাই এ বিষয়ে তাগিদ করা হলো।

ঘটনা (২০)

আল্লাহ্ পাকের দীদার এবং তাঁর সঙ্গে কথা

তিরমিজী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর পরওয়ারদেগারকে দেখেছেন। আবদুর রাজ্জাক মোআম্মারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি শপথ করে বলেছেনঃ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর পরওয়ারদেগারকে দেখেছেন। আর এবনে খোজায়মা ওরওয়া এবনে যোবায়েরের সূত্র থেকে এ বিবরণকে প্রমাণ করেছেন; আর এবনে আব্বাসের সঙ্গীগণও এ মত পোষণ করতেন। জুহরী এবং মোআম্মার এ মতের উপর আস্থাশীল ছিলেন।

আর ইমাম নেছায়ী বিশুদ্ধ সনদ সহ একরামার সূত্রে হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং হাকেম সে বর্ণনার সত্যতা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা কি আশ্চর্যবোধ কর যে, খেল্লাত তথা বন্ধুত্ব হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্যে হোক, আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে কথা বলেছেন, আর তাঁর দীদার লাভ করেছেন হযরত মোহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

আর তেবরানী বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলতেন, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় পরওয়ারদেগারকে দু'বার দেখেছেন, একবার স্বচক্ষে আর একবার অন্তরে। আর খেলাল কেতাবুচ্ছুন্নায় মরুজী থেকে এ উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমি ইমাম আহমদকে বলেছিলাম লোকে বলে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি একথা মনে করে যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম স্বীয় পরওয়ারদেগারকে দেখেছেন সে আল্লাহ্ পাকের প্রতি একটি অসত্য আরোপ করে, এমন অবস্থায় হযরত আয়েশার (রাঃ) একথার জবাব দেয়া যায় কোন্ দলিল দ্বারা?

ইমাম আহমদ (রঃ) তাঁর জবাবে বলেনঃ স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা দ্বারা তাঁর জবাব দেব। তিনি বলেছেন, "রাআইতু রাব্বী" অর্থাৎ আমি আমার পরওয়ারদেগারকে দেখেছি (অতএব, ইমাম আহমদ (রঃ)-এর রেওয়ায়েত মোতাবেক মরফু হাদীসটিও প্রমাণিত হলো)। আর কথা বলা? সহীহ হাদীস সমূহে এ সমস্ত বিষয় এসেছে যে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ফরজ করা হয়েছে এবং সূরা বাকারার শেষ আয়াত সমূহ দান করা হয়েছে এবং তাঁর উম্মতের যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক না করবে তার গুনাহ মাফ করা হবে। এভাবে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। আর এ প্রতিশ্রুতিও প্রদত্ত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন নেক কাজের ইচ্ছা করে আর সে কাজ সুসম্পন্ন করতে সক্ষম না হয় তবে তার আমলনামায় একটি নেকী লিপিবদ্ধ হবে। আর যদি সে কাজ করতে সক্ষম হয় তবে কমপক্ষে দশটি করে নেকী লিপিবদ্ধ হবে।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করে আর সে কাজ না করে তবে তা তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবেনা। আর যদি সে মন্দ কাজ করে তবে একটি বদ কাজের কথা লিপিবদ্ধ হবে। (মুসলিম শরীফ)

আর বায়হাকী আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে একখানি সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরজ করলেন যে, আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে বন্ধুত্ব এবং একটা বিরাট ক্ষমতা দান করেছেন, হযরত মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে কথা বলেছেন, হযরত দাউস (আঃ)-কে দান করেছেন বিরাট রাজত্ব এবং তাঁর জন্যে লৌহকে নরম হওয়ার এবং পাহাড় সমূহের অনুগত হওয়ার ব্যবস্থা। আর হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে দান করেছেন বিরাট রাজত্ব ও জ্বীন, মানুষ এবং শয়তানদের ও বাতাসের আনুগত্য এবং অদ্বিতীয় দেশ। আর ঈসা (আঃ)-কে দান করেছেন ইঞ্জিল এবং শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য করার মোজেযা এবং মৃতকে জীবিত করার অলৌকিক ক্ষমতা, তাঁকে এবং তাঁর মাতাকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করা।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ আরজীর জবাবে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ আমি আপনাকে আমার হাবীব মনোনীত করেছি এবং সমগ্র মানব জাতির নিকট আপনাকে প্রেরণ করেছি আর আপনার বক্ষ বিদীর্ণ করেছি। আর আপনার আলোচনাকে সর্বত্র পৌঁছিয়েছি, তাই যখন আমার আলোচনা হয় তখন আপনার আলোচনাও হয়, আর আপনার উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত ও উম্মতে আদেলা বলে ঘোষণা করেছি, আর শুরুতেও আপনাকে রেখেছি, শেষেও আপনাকে রেখেছি।

আর এজন্যে কোন নবীর কোন কথা সে পর্যন্ত গ্রহণীয় হয় না যে পর্যন্ত না সে

আপনাকে আল্লাহর বন্দা এবং রসূল বলে স্বাক্ষ্য দেয়। আর আপনার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করেছি যাদের অন্তরে আসমানী গ্রন্থ রেখে দিয়েছি, আর আপনাকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছি এবং সর্বশেষে প্রেরণ করেছি, আর কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আপনার উম্মতের হিসাব গ্রহণ করা হবে। আর আমি আপনাকে দান করছি সূরা 'ফাতেহা' এবং সূরা 'বাকারার' শেষ আয়াত সমূহ, আর এতে অন্য কোন নবীকে শরীক করিনি এবং দান করেছি আপনাকে কাওসার, ইসলাম, হিজরত, জেহাদ, নামাজ, ছদকা, রমযানের রোজা এবং সত্যের নির্দেশ দেয়ার এবং অসত্য থেকে বাধা দেওয়ার বিধান। আর আমি আপনাকে সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ (নবী) মনোনীত করেছি। এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে আবু জাফর নামে এক ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁর সম্পর্কে এবনে কাসীর মন্তব্য করেছেন যে, তাঁর স্মরণ শক্তি দুর্বল।

কোন কোন সাহাবী এ মত পোষণ করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাককে স্বচক্ষে দেখেননি, এটি তাঁদের নিজস্ব অভিমত যার ভিত্তি হলো কোরআন শরীফের সাধারণ ঘোষণা, যেমন لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ অর্থাৎ তাঁকে চোখে দেখতে পারেনা কিন্তু সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হবার পর এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করা হবে যে, কোন মানুষ আল্লাহ্ পাকের পরিপূর্ণ মারেফাত হাসিল করতে পারেনা। আর এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে মন্তব্য রয়েছে তার ব্যাখ্যা হলো, নূর বা জ্যোতি যে স্তরে পৌঁছলে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা সম্ভব হয় না, ঐ স্তর পর্যন্ত দেখা হয়নি।

আখেরাতে এ অবস্থার পরিবর্তন হবে, আর এত সুস্পষ্টভাবে দেখা সম্ভব হবে যার চেয়ে বেশী মানুষের পক্ষে অচিন্তনীয়, এ মন্তব্য দ্বারা আল্লাহ্ পাকের দীদারের অস্বীকৃতি প্রমাণিত হয় না।

এতদ্ব্যতীত, সূরা বাকারার শেষ আয়াত সমূহ সম্পর্কে উপরোল্লিখিত হাদীসে যে ঘোষণা রয়েছে তার ব্যাখ্যা এই, মে'রাজের সময় হয়তো এর প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে এবং পরে মদীনা শরীফে এ আয়াত সমূহ বিস্তারিতভাবে নাজিল হয়েছে। আর (এই রাতে) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাওয়ার তাৎপর্য হলো, অবশেষে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ রয়ে গেছে। প্রকাশ্যে এসব কথাবার্তা দীদারে এলাহীর স্থানেই হয়েছে। এটা সম্ভব হতে পারে যে নামাজ ফরজ হওয়া মসী চালনার স্থান পরিবর্তনের পূর্বের ঘটনা। আর যে সমস্ত বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছে সেগুলো একই সময়ের ঘটনা। আর যখন নামাজ ফরজ হওয়ার এটিই সময়, তখন কথাবার্তার সময়ও তাই হবে এবং আল্লাহ পাক সব বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

আর বিভিন্ন হাদীসে কা'বের যে কথা রয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর দীদার এবং কথা বলাকে ভাগ করে দিয়েছেন। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যে এবং হযরত মুসা (আঃ)-এর মধ্যে। এর দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা না হওয়া প্রমাণিত হয় না। উপরোক্ত হাদীসে রয়েছে, হযরত মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে আল্লাহ পাক দু'বার কথা বলেছেন। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাককে দু'বার দেখেছেন। এই দু'বার দেখার তাৎপর্য বর্ণনা করে হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ একবার অন্তর দ্বারা আর একবার চক্ষু দ্বারা।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর বন্ধুত্বের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, আর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর দীদার লাভের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। এর তাৎপর্য হলো হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাক স্বীয় বন্ধুত্বের কয়েকটি বিশেষ গুণ দান করেছেন। এর দ্বারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে বন্ধুত্ব না থাকা প্রমাণিত হয় না।

আর হাদীস শরীফে যে এরশাদ হয়েছেঃ সৎ কাজের ইচ্ছার কথাও লিপিবদ্ধ হয় কিন্তু অসৎ কাজের ইচ্ছার কথা লিপিবদ্ধ হয় না। এ ইচ্ছার অর্থ হলো যা সংকল্পের পর্যায়ে নয়। কেননা কোন বিষয়ের সংকল্প করা একটা স্বতন্ত্র কাজ বরং এ ইচ্ছা হলো আকাংক্ষা পর্যায়ের। কিন্তু সৎ কাজের আকাংক্ষা দূর করার ইচ্ছা যদি না হয়, আর অসৎ কাজের আকাংক্ষা দূর করার ইচ্ছা যদি হয়, তবে এমন অবস্থায় আমলনামায় নেকী লিপিবদ্ধ হবে। আর অসৎ কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ হবে না।

ঘটনা (২১)

আসমানের উচ্চতর মকাম থেকে আসমানের দিকে প্রত্যাবর্তন

বোখারী শরীফে বায়তুল মা'মুরের ভ্রমণ এবং দুধ, শরাব ও মধু পেশ করার ঘটনার পর (যার উল্লেখ ইতিপূর্বে হয়েছে) এরশাদ হয়েছেঃ এরপর আমার প্রতি দিন ও রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়। পরে আমি প্রত্যাবর্তন করি এবং মুসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেনঃ (আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে) আপনার প্রতি কি হুকুম হয়েছে?

আমি বললামঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে। তিনি বললেনঃ আপনার উম্মতের পক্ষে দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা সম্ভব হবে না। আমি ইতিপূর্বের লোকদের সম্পর্কে উক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। বণী ইসরাঈলের দ্বারা নিদারুণ কষ্ট ভোগ করেছি। স্বীয় প্রতিপালকের নিকট (অর্থাৎ যে মকামে এই আদেশ হয়েছে সে মকামে) গমন করুন। আর স্বীয় উম্মতের জন্যে এ আদেশকে সহজতর করার দরখাস্ত পেশ করুন। আমি প্রত্যাবর্তন করলাম। আল্লাহ্ পাক দশ ওয়াক্ত নামাজ কমিয়ে দিলেন। এরপর মুসা (আঃ)-এর নিকট পৌঁছলাম, তিনি পুনরায় ঐভাবে বললেন, আমি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন আরো দশ ওয়াক্ত নামাজ কম করা হলো। তিনি পুনরায় একই কথা বললেন। আমি প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন আরো দশ ওয়াক্ত নামাজ কম করা হলো। এরপর আবার মুসা (আঃ)-এর নিকট পৌঁছলাম, তিনি একই কথা বললেন, আমি পুনরায় ফিরে গেলাম। আমার প্রতি দৈনিক দশ ওয়াক্ত আদায়ের হুকুম হলো। এরপর মুসা (আঃ)-এর নিকট আসলে তিনি পুনরায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। এরপর আমি ফিরে গেলাম তখন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের হুকুম রয়ে গেল। মুসা (আঃ) বললেন,

আপনার উম্মত (অর্থাৎ সকল উম্মত) প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ আদায়ে সক্ষম হবেনা, আর আমি আপনার পূর্বের লোকদের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, আর বণী ইসরাঈলের দ্বারা কষ্ট পেয়েছি, পুনরায় আপনার পরওয়ারদেগারের নিকট গমন করুন আর নিজের জন্যে সহজতর হুকুমের আবেদন করুন। আমি বললাম, আমার পরওয়ারদেগারের নিকট অনেক দরখাস্ত করেছি, এখন আমি লজ্জাবোধ করছি। (যদিও আরো দরখাস্ত করা সম্ভব ছিল) কিন্তু আমি এতে রাজী এবং আমি এ আদেশ মেনে নিলাম।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আমি যখন সেখান থেকে অগ্রসর হই তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ ঘোষণা করা হয় যে, আমি আমার ফরজ জারি করে দিয়েছি এবং আমার বন্দাদের জন্যে হুকুমকে সহজ করে দিয়েছি। আর মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে যে পাঁচ ওয়াক্ত করে নামাজ কম করা হয়েছে আর সবশেষে এরশাদ হয়েছে, হে মোহাম্মদ! (সালাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দৈনিক এ পাঁচটি নামাজ, আর প্রত্যেকটি নামাজ দশটি নামাজের সমান, তাই পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজই হলো।

আর নেসায়ী শরীফে রয়েছে, আল্লাহ পাক আমার নিকট এরশাদ করেছেনঃ যেদিন আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছি সেদিন আপনার প্রতি এবং আপনার উম্মতের প্রতি পঞ্চাশ বার নামাজ ফরজ করেছি। অতএব আপনি এবং আপনার উম্মত যত্ন সহকারে এই আদেশ পালন করুন। এই হাদীসে হযরত মুসা (আঃ)-এর কথা হলো এই, বণী ইসরাঈলের প্রতি দু'টি নামাজ ফরজ ছিল কিন্তু তাদের দ্বারা তা আদায় করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আর এই হাদীসের শেষাংশে রয়েছে এ পাঁচটি পঞ্চাশটি নামাজের সমান। অতএব, আপনি এবং আপনার উম্মত নিয়মিত ভাবে এটি পালন করুন। আমি তখন উপলব্ধি করলাম যে এটি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। যখন মুসা আলাইহিস সালামের নিকট এলাম তখন তিনি বললেন, পুনরায় গমন করুন (এবং আরো সহজতর করার চেষ্টা করুন) কিন্তু পুনরায় গমন করলাম না।

আর বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে, যখন নামাজ কম করার পর পাঁচটি রয়ে গেল তখন এরশাদ হলো, এ পাঁচটি সওয়াবে পঞ্চাশটির সমান। আমার নিকট কথার এতটুকু ব্যতিক্রম হয়না (অর্থাৎ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব দেয়া সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত ছিল, তাতে কোন পরিবর্তন হয়নি)।

নামাজ ফরজ হওয়ার পর প্রত্যাবর্তন করেছেন, এতে একথা প্রমাণিত হয়না যে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেছেন, বরং এরই মধ্যে দীদারে এলাহী এবং অন্যান্য কথাবার্তা হওয়ার পর প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর নেসায়ীর বিবরণ থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের লজ্জিত হওয়া এবং নামাজের সংখ্যা কমাবার জন্যে দরখাস্ত না করার এ কারণ জানা যায় যে, আল্লাহ পাকের এরশাদ-'এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান আর আমার এখানে কোন কথার পরিবর্তন নেই'- একথা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাজের এ সংখ্যাই আল্লাহ পাকের পছন্দনীয়, (এ কারণেই) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সংখ্যা আরো কমাবার দরখাস্ত করেননি।

এতে একথা সুস্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে যে, বর্তমান পাঁচের সংখ্যা যা পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সমান, এর তাৎপর্য হচ্ছে, এ সংখ্যা এর চেয়ে কম ফজিলত রাখেনা।

ঘটনা (২২)

আসমান থেকে জমীনের দিকে প্রত্যাবর্তন

ঐতিহাসিক মোহাম্মদ এবনে এছহাক বর্ণনা করেন, উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব যাঁর নাম হেন্দ তাঁর সূত্র থেকে আমি এ বিবরণ লাভ করেছি। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মে'রাজ হয়েছে এ অবস্থায় যখন তিনি আমার কক্ষে নিদ্রিত ছিলেন। তিনি এশার নামাজ আদায় করার পর নিদ্রিত হলেন, আমরাও ঘুমিয়ে পড়েছি; ফজরের নামাজের পূর্বে আমাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জাগ্রত করেছেন, যখন তিনি নামাজ আদায় করে ফেলেছিলেন আর আমরাও তাঁর সাথে নামাজ পড়লাম। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ "হে উম্মে হানী! আমি তোমাদের সঙ্গে এশার নামাজ আদায় করেছি যেমন তোমরা দেখেছ, এরপর আমি বায়তুল মোকাদ্দাস গমন করেছি এবং সেখানে নামাজ আদায় করেছি। এখন আমি তোমাদের সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায় করেছি যেমন তোমরা দেখেছ"। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাইরে যেতে লাগলেন, আমি তখন তাঁর চাদর স্পর্শ করে আরজ করলামঃ "হে আল্লাহর নবী! মানুষের নিকট এ ঘটনা প্রকাশ করবেন না, কেননা তারা আপনার কথাকে মিথ্যা জ্ঞান করবে আর আপনাকে কষ্ট দেবে"। তিনি এরশাদ করলেনঃ "আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই এ ঘটনা প্রকাশ করবো"।

(হযরত উম্মে হানী বলেন) আমি অতঃপর আমার একটি হাবশী বাঁদীকে বললাম তুমি তাঁর অনুসরণ কর এবং যা তিনি মানুষকে বলেন এবং মানুষ যা তাঁকে বলে তা শ্রবণ কর। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাইরে তশরিফ নিয়ে গেলেন। তিনি মানুষকে সংবাদ দিলেন, মানুষ বিস্মিত হলো এবং বললো, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! এ (বিস্ময়কর) ঘটনার কোন নিদর্শন আছে কি? যদ্বারা আমাদের বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়, আমাদের একীন সুদৃঢ় হয়, কেননা এমন কথা আমরা কখনো শ্রবণ করিনি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এর নিদর্শন এই, অমুক ময়দানে অমুক গোত্রের কাফেলার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়, তাদের একটি উষ্ট্র হারিয়ে যায়, আমি তাদেরকে বলেছিলাম, সে সময় আমি সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করছিলাম (অর্থাৎ মে'রাজ সফরের প্রথম পর্যায় ছিল) এরপর আমি প্রত্যাবর্তন করি। এমনকি আমি যখন যাজনান নামক স্থানে অমুক গোত্রের কাফেলার নিকট পৌঁছি, তখন দেখি তারা সকলেই রয়েছে ঘুমন্ত অবস্থায়, তাদের একটি পাত্রে পানি ছিল, আমি সে পাত্র থেকে পানি পান করেছি এবং পাত্রের উপর যথারীতি ঢাকনাটি দিয়ে রেখেছি। আর আমার ভ্রমণের আর একটি নিদর্শন হলো ঐ কাফেলা এখন "বাইদা" নামক স্থান থেকে 'সানিয়াত্যুত ত্যানয়ীম' পর্যন্ত আসছে। এ কাফেলার সর্বপ্রথম উষ্ট্রটি ধুসর রং-এর, তার উপর রয়েছে দু'টি বোঝা-একটি সাদা রং-এর কাপড় দ্বারা, আর অপরটি ডোরাকাটা কাপড় দ্বারা।

একথা শ্রবণ করে অনেক লোক 'সানিয়াত্যুত তানয়ীম' নামক স্থানের দিকে দ্রুত গমন করলো এবং সেখানে ধুসর রং-এর সে উষ্ট্রটি তারা দেখতে পেলো, যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন। তাদেরকে পানির পাত্রের কথা জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো, আমরা পাত্রে পানি রেখেছিলাম, পাত্রের উপর ছিল ঢাকনি, কিন্তু পাত্রে পানি পাইনি, ঢাকনি যথাস্থানে রয়েছে।

আর যে সব লোকের উষ্ট্র হারিয়ে গিয়েছিল, তাদেরকেও জিজ্ঞাসা করা হলো, তারাও বললোঃ হ্যাঁ, তিনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের উষ্ট্র হারিয়ে গিয়েছিল। এরা ততক্ষণে মক্কা শরীফে পৌঁছে গিয়েছিল, তারা আরও বললোঃ আমরা এক ব্যক্তির কণ্ঠ শ্রবণ করি যিনি আমাদেরকে উষ্ট্রের দিকে ডাক দিচ্ছিলেন, অবশেষে আমরা উষ্ট্রটি পাকড়াও করি (সীরাতে এবনে হিশাম)।

আর বায়হাকীর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট মক্কাবাসী মে'রাজের নিদর্শন সম্পর্কে জানতে চাইলো। তিনি এরশাদ করলেনঃ কাফেলা (যাদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে সংবাদ দেয়া হয়েছে) বুধবার দিন মক্কায় পৌঁছবে। কিন্তু বুধবার দিন অতিবাহিত হতে চলল, আর কাফেলা পৌঁছলোনা, এমনকি সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ পাক সূর্যকে স্থির করে রেখে দিলেন, সে কাফেলা মক্কা শরীফ পৌঁছা পর্যন্ত সূর্যকে অস্তমিত হতে দিলেন না। এরপর তারা মক্কায় পৌঁছলো, যেমন তিনি এরশাদ করেছিলেন।

এ বর্ণনা সমূহ দ্বারা কয়েকটি কথা প্রমাণিত হচ্ছে। প্রথমতঃ এশা ও ফজরের নামাজের মধ্যেই মে'রাজ সফরে গমন ও প্রত্যাবর্তন সুসম্পন্ন হয়, যদিও এশার নামাজ তখনও ফরজ ছিলনা। কিন্তু তিনি এ নামাজ আদায় করতেন, আর হয়তো অন্যান্য মোমেনগণও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে এ নামাজ আদায় করতেন। আর ফজরের নামাজ যদিও মে'রাজের ঘটনার পর ছিল কিন্তু বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিব্রাঈল (আঃ) জোহরের সময় ইমামতি করেছিলেন, হয়তো এই ফরজ জোহরের সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। আর বায়তুল মোকাদ্দাসে যে নামাজ আদায় করেছেন, তাকে এশার নামাজ মনে করা অযৌক্তিক। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এশার নামাজ পূর্বেই আদায় করে ফেলেছিলেন তাই এটি হয়তো তাহাজ্জুদের নামাজ হবে। আর তাহাজ্জুদের নামাজ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অনেকদিন যাবত ফরজের ন্যায় অত্যাবশ্যক ছিল, আর আজানও তাহাজ্জুদের জন্যেই হয়েছিল, যেমন রমজানুল মুবারকে হযরত বেলাল (রাঃ) তাহাজ্জুদের আজান দিতেন। দ্বিতীয়তঃ এ বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মে'রাজ হয়েছিল স্বশরীরে। কেননা যদি তা না হতো তবে আরবের লোকেরা এ ব্যাপারে কেন প্রশ্ন তুললো? এ ঘটনাকে কেন মিথ্যা মনে করলো? আর তাদের জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথা কেন বললেন না, 'না, এটি স্বশরীরে ছিলনা'। এ সফর ছিল সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক যাতে যে কোন কঠিন ও অসম্ভব দাবীও গ্রহণযোগ্য হয়। তৃতীয়তঃ সীরাতে এবনে হেশামে যে সমস্ত কাফেলার উল্লেখ

রয়েছে, সেগুলো ছিল ভিন্ন ভিন্ন কাফেলা।

আর বায়হাকীর বিবরণে যে কাফেলা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে তা সন্ধ্যা পর্যন্ত মক্কায় পৌছায়নি, তা একটি ভিন্ন কাফেলা বলে মনে হয়। কেননা এ দু'টির মধ্যে পূর্বেই একটি মক্কায় পৌছেছিল আর দ্বিতীয়টি "তানয়ীম" নামক স্থানে পৌছেছিল, আর তৃতীয় কাফেলাটির সন্ধ্যা পর্যন্ত না আসা, সূর্যকে এজন্যে স্থির করে রাখা উল্লেখিত হয়েছে। এ কাফেলাটি যে একটি ভিন্ন কাফেলা তা সহজেই অনুমেয়। মাওয়াহেবে (গ্রন্থ) সনদ ব্যতীত দু'টি ঘটনারই উল্লেখ রয়েছে অর্থাৎ উষ্ট্রের পলায়ন সহ একটি ঘটনা। মনে হয় এ তিনটি কাফেলাই একটি কাফেলার অংশ বিশেষ। তন্মধ্যে দু'টি কাফেলার ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে; আর একটি যা নির্দিষ্ট সময়ে পৌছায়নি। এজন্যে সূর্যকে অচল ও স্থির করে রাখতে হয়েছে। যেহেতু এসব কিছু একই সমষ্টির বিভিন্ন অংশ মাত্র। তাই দু'টি ঘটনাকে একই কাফেলার সঙ্গে সংযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর সূর্যকে স্থবির করে রাখার ব্যাপারে অযৌক্তিক বা অসম্ভব কিছুই নেই। এজন্যে কোন আপত্তিও উত্থাপিত হয়নি। আর এ বিষয়টির প্রচার না হওয়ার কারণ এই, সূর্যকে স্থবির রাখা হয়েছিল অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্যে, কেউ সেদিকে লক্ষ্যও করতে সক্ষম হয়নি। অনেক অনুসন্ধানের পরও এ বিষয় আমি জানতে পারিনি যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কীভাবে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন-বোরাকে আরোহণ করে, না অন্য কোন পন্থায়? যদি কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন, তবে এ স্থানে টীকায় যেন লিপিবদ্ধ করেন।

অতঃপর এ স্থানে একটি টীকা সংযোজিত হয়েছে। এতে হযরত থানবী (রঃ) লিপিবদ্ধ করেছেন, আমার বন্ধু মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব বরদোয়ানী (মোদাররেস মাদ্রাসায়ে আলীয়া) আমাকে পত্র দ্বারা জানিয়েছেন যে, "হায়াতুল হায়াওয়ান" গ্রন্থের লেখক কামাল দমিরী বোরাকের কথাই উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসের ক্ষেত্রে দমিরীর অনুসন্ধান কার্য নির্ভরযোগ্য।

ঘটনা (২৩)

মে'রাজের ঘটনা শ্রবণকারীদের অবস্থা

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যখন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এক রাতের মধ্যেই মসজিদে আকসায় পৌছান হলো, (এতে পরবর্তী ভ্রমণের অস্বীকৃতি নেই) তখন সকালে তিনি মানুষের সাথে এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। কোন কোন লোক যারা ইতিপূর্বে মুসলমান হয়েছিলো, তারা ইসলাম পরিত্যাগ করলো। আর কতিপয় পৌত্তলিক হযরত আবুবকরের (রাঃ) নিকট দ্রুতবেগে হাযির হলো। তারা বললোঃ আপনার বন্ধুর খবর কি নিয়েছেন? তিনি বলেন, আমাকে রাত্রেই বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হযরত আবুবকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ তিনি কি এমন কথা বলেছেন? লোকেরা বললঃ হ্যাঁ। হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, যদি তিনি বলে থাকেন তাহলে ঠিকই বলেছেন। লোকেরা বললোঃ আপনি কি এ ব্যাপারে তাঁর

কথার সত্যতা স্বীকার করেন যে, তিনি একই রাত্রে বায়তুল মোকাদ্দাস গমন করে ভোর হওয়ার পূর্বেই প্রত্যাবর্তন করেছেন (অথচ বায়তুল মোকাদ্দাস কত দূরে)! তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আমি তো এর চেয়েও অনেক কঠিন ও জটিল বিষয়ে তাঁর সত্যতা স্বীকার করি। অর্থাৎ আসমানের খবরের ব্যাপারে যা তাঁর নিকট সকাল-বিকাল আসতে থাকে (যা এক রাতের চেয়েও কম সময়) তা-ও আমি বিশ্বাস করি। এজন্যেই তাঁর নামকরণ করা হয়েছে সিদ্দীক। এটি বর্ণনা করেছেন হাকেম মোসতাদরাকে।

এই হাদীস দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয় যে, মে'রাজ জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে হয়েছে।

ঘটনা (২৪)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি নিজেকে হাতীমে দেখলাম যে, কোরায়েশ আমাকে আমার মে'রাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল। তাই তারা আমাকে বায়তুল মোকাদ্দাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করলো যেগুলোকে আমি (প্রয়োজনীয় মনে না করার কারণে) সংরক্ষণ করিনি, তখন আমার জন্যে বিষয়টি এত জটিল এবং অসুবিধাজনক হয়েছিল, যা কখনও হয়নি। এরপর আল্লাহ পাক সে বিষয়টিকে আমার জন্যে এমনভাবে প্রকাশ করে দিলেন যেন আমি তা স্বচক্ষে দেখছিলাম। আর তারা যা যা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করছিল আমি তার জবাব প্রদান করছিলাম। এই হাদীস সংকলিত হয়েছে মুসলিম শরীফে এবং মেশকাত শরীফে।

আর আহমদ এবং বাজ্জার এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সেই মসজিদটি আমার নিকট আনা হলো, আমি তা দেখছিলাম এমনকি তা আকীলের বাড়ীর নিকট এনে রাখা হয় আর তিনি সব কিছু বর্ণনা করলেন আর আমি তা দেখছিলাম।

আর এবনে সা'দ উম্মে হানী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বায়তুল মোকাদ্দাসকে আমার নিকট পূর্ণ আকৃতিতে হাযির করা হয় আর আমি মানুষকে তার চিহ্নগুলো বলছিলাম।

আর উম্মে হানীর এই হাদীসেও রয়েছে যে, মানুষ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো যে বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদের দরজা কয়টি? তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি সেগুলোকে (নিঃস্প্রয়োজনীয় হওয়ার কারণে) গণনা করিনি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আমি তখন বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে দেখছিলাম আর একটি একটি দরজা গণনা করছিলাম। আবু ইয়ালার বিবরণে রয়েছে যে, প্রশ্নকারী ছিলেন মোবার এবনে মোতেমের পিতা মোতেম এবনে আ'দী।

এই হাদীস দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয় যে, শবে মে'রাজের এ ভ্রমণ হয়েছে স্বশরীরে-জাগ্রত অবস্থায়। যদি তা না হতো তবে এ প্রশ্ন উত্থিত হতো না। অন্য একটি বিবরণে রয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বায়তুল মোকাদ্দাস সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, তিনি তাঁর জবাব প্রদান করেন। এভাবে প্রত্যেকটি জবাবের পর হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর সত্যতা স্বীকার করতে থাকেন, তখন

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ হে আবুবকর! তুমি সিদ্দীক।[১]

হযরত আবুবকর (রঃ)-এর এ প্রশ্নে এমন কোন অসামঞ্জস্য কিছু নেই এজন্যে যে, তাঁর প্রশ্নগুলো সন্দেহভিত্তিক এবং পরীক্ষামূলক ছিল না, বরং তিনি এজন্যে প্রশ্ন করেছিলেন যাতে করে পৌত্তলিকরা এসব প্রশ্নের জবাব সমূহ শ্রবণ করে। আর হযরত আববুকর (রাঃ)-এর প্রতি এ বিষয়ে তাদের এ আস্থাও ছিল যে, তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস দেখেছিলেন, আর তাঁর সম্পর্কে তাদের এ আস্থা ছিল, যা সত্য নয় তার সত্যতা তিনি স্বীকার করবেন না। আর কাফেরদের প্রশ্ন করা সে মজলিসে হোক বা পরে হোক অথবা প্রশ্নকারী হযরত আবু বকর (রাঃ) হন এবং তাঁর প্রশ্নগুলো অন্যের প্রশ্নের সাহায্যকারী হোক, প্রত্যেকের উদ্দেশ্য বিভিন্ন হোক অথবা এ প্রশ্নগুলো দু' মজলিসে হোক এবং বায়তুল মোকাদ্দাসকে স্বস্থানে রেখে প্রকাশ করা, অথবা দ্বারে আকীলের নিকট এনে রাখা, অথবা তার অনুরূপ এসব বিবরণের মধ্যে সহজ সামঞ্জস্য এভাবে হতে পারে যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের একটি দৃষ্টান্ত তৈরী হয়েছে যা দ্বারে আকীলের নিকট প্রকাশিত হয়েছে, যেমন নেসায়ী শরীফে সংকলিত হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দোযখ এবং বেহেশত হাযির করার কথা উল্লেখিত হয়েছে। আর এখানে অত্যন্ত বেশী সামঞ্জস্য থাকার কারণে বায়তুল মোকাদ্দাসের আত্মপ্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে। এখন এ প্রশ্ন অবান্তর যে, যদি বায়তুল মোকাদ্দাস এখানে আসতো তবে স্বস্থান থেকে এতক্ষণ অনুপস্থিত থাকতো। আর এমন আশ্চর্য বিষয়টি ইতিহাসে উল্লেখিত থাকতো। এটি এ পর্যায়ের শেষ কথা, যা আমি উল্লেখ করতে চেয়েছি। এখন অজানার আধাঁর কেটে গেছে। জ্ঞানের সোবহে সাদেক দেখা দিয়েছে। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকিহি মোহাম্মাদিন ওয়ালা আলিহি ওয়া আছহাবেহি ওয়াবারাকা ওয়াসাল্লাম।

মে'রাজ সম্পর্কে আরো কয়েকটি কথা

যেহেতু মে'রাজের এ ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই এ সম্পর্কীয় আরো কয়েকটি জরুরী বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা সমীচিন মনে করছি। এ বিবরণ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগকে "বাবুল আনওয়ার" এবং দ্বিতীয় ভাগকে "বাবুল আসরার" বলে নামকরণ করা হয়েছে।

প্রথম ভাগ

(১) মে'রাজ সম্পর্কীয় হাদীস সমূহে উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বক্ষ মুবারক বিদীর্ণ করা হয়েছে, এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, পুরুষের জন্যে অন্য পুরুষের বক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা বৈধ। যদিও ফেরেশতাগণ নর-নারী হওয়া থেকে পবিত্র, তবুও তাদের সম্পর্কে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা পুংলিঙ্গ। তাই এমন চিন্তা করা অনুচিত নয়।

(২) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন বায়তুল মোকাদ্দাস পৌছলেন,

১। সীরাতে এবনে হিশাম খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০

তখন বোরাককে বেঁধে রাখা হয়। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, জীবনের বিভিন্ন স্তরে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজনীয়। আর আল্লাহ্ পাকের প্রতি তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা সত্ত্বেও উপায়-উপকরণ অবলম্বন অন্যায় অবৈধ বা অনুচিত নয়, যখন আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভরসা থাকে।

(৩) আসমানের দ্বারে যখন জিব্রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কে? জিব্রাঈল (আঃ) জবাবে তাঁর নাম বললেন। একথা বললেন না যে "আমি", এতে একথা জানা যায় যে, কোন জিজ্ঞাসাকারীর জবাবে নাম বলাই উচিত, এটিই আদব। কেননা শুধু 'আমি' বলা— পরিচিতি লাভের জন্যে অনেক সময় যথেষ্ট হয়না। একখানি হাদীসে 'আমি' বলতে নিষেধও করা হয়েছে।

(৪) আর এর দ্বারা কারো গৃহে প্রবেশের উদ্দেশে অনুমতি প্রার্থনার বিধানও প্রমাণিত হয়, যদিও সে গৃহে শুধু পুরুষই থাকে, তবুও অনুমতি প্রার্থনা ব্যতীত প্রবেশ করা অনুচিত।

(৫) আর এই হাদীসে একথাও রয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বায়তুল মা'মুরের সাথে হেলান দিয়ে বসেছিলেন, এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কেবলার দিকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন বা তৎপ্রতি হেলান প্রদানও বৈধ। যদিও আমাদের জন্যে আদব হলো নিঃপ্রয়োজনে এমন কাজ না করা।

(৬) মে'রাজের বিবরণে বিবরণ রয়েছে যে হযরত আদম (আঃ) ডান দিকে দৃষ্টিপাত করে হাসতেন। আর বাম দিকে দৃষ্টিপাত করে ক্রন্দন করতেন, এতে সন্তানের প্রতি পিতার মায়া প্রমাণিত হয়, কেননা পিতা তার সন্তানের ভাল অবস্থা বা সুখ-শান্তি দেখে খুশী হন। পক্ষান্তরে, সন্তানের দুঃখ-দুর্দশা দেখে দুঃখী হন। আর একটি বিবরণে রয়েছে, হযরত মুসা (আঃ) এই বলে ক্রন্দণ করছিলেন যে, আমার উম্মতের লোকদের চেয়ে অধিক সংখ্যক লোক তাঁর উম্মত (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মত) বেহেশতে স্থান পাবে। এ ক্রন্দণের কারণ ছিল তাঁর উম্মতের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা। আর আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী অধিক সংখ্যক হওয়ার কারণে তৎপ্রতি "গেবতার" দৃষ্টিতে দেখা। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ভাল কাজে লোভ করা অনুচিত নয়। মনের এ অবস্থাকে আরবী ভাষায় "গেবতা" বলা হয়। আর গেবতার তাৎপর্য হচ্ছে এই, অপরের নিকট কোন নেয়ামত দেখে এ আকাংক্ষা পোষণ করা যে এ নেয়ামত আমারও হোক, আর অপরের নেয়ামত বিনষ্ট হওয়ার আকাংক্ষা না করা। কেননা এমন আকাংক্ষা করলে তা হবে হিংসা আর তা হারাম।

এ সমস্ত বিষয় মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসের ব্যাখ্যা করে ইমাম নববী (রঃ) লিপিবদ্ধ করেছেন। এতদ্ব্যতীত, আরো কয়েকটি কথা এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

(৭) মে'রাজের বিবরণে রয়েছে যে, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বোরাকের রেকাব ধরেছেন, আর মিকাঈল (আঃ) লাগাম ধরেছেন। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আরোহী যদি কোন প্রয়োজনে বা কারণে স্বীয় খাদেমদের নিকট থেকে এমন খেদমত

নিতে ইচ্ছা করেন, অথবা কোন ভক্ত প্রেমিক ভক্তি-অনুরক্তি প্রকাশার্থে এমন কাজ করতে চায় তবে তা কবুল করা বৈধ হবে, অবশ্য যদি তাতে অহংকারের ভাব না থাকে।

(৮) মে'রাজের বিবরণে একথাও রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন কোন বরকতময় স্থানে নামাজ আদায় করেছেন। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, বরকতময় স্থানে নামাজ আদায় করা বরকত লাভের একটি উপায়। কিন্তু শর্ত হলো এতদ্বারা কোন মখলুকের প্রতি বিনয় প্রকাশ বা তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা যেন না হয়, এ সত্যকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হবে।

(৯) আর এতে একথাও রয়েছে যে, পথে আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে সালাম করেছেন। যেমন ষষ্ঠ ঘটনায় উল্লেখিত হয়েছে। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে, যদি আরোহী বা মুসাফির কোন উপবিষ্ট বা পথচারী ব্যক্তিকে দেখতে না পারার কারণে সালাম করতে সক্ষম না হয় তবে উত্তম হলো সেই আরোহী বা মুসাফিরকে সালাম করা।

(১০) আর এতে একথাও রয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন কোন আমলের জন্যে মানুষকে শাস্তি ভোগ করতে দেখেছেন। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ভাল আমলগুলো গ্রহণযোগ্য, আর মন্দ আমলগুলো বর্জনযোগ্য।

(১১) এ বিবরণে একথাও রয়েছে যে, বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায় করেছেন। এতদ্বারা তাহিয়াতুল মসজিদের নামাজ সুন্নত হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে।

(১২) আর এ বিবরণে একথাও রয়েছে যে, বায়তুল মোকাদ্দাসে তিনি ইমামতি করেছেন। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, দলের মধ্যে যিনি উত্তম ব্যক্তি থাকেন, তাঁরই ইমাম হওয়া উত্তম।

(১৩) এ বিবরণে একথাও রয়েছে যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম বায়তুল মোকাদ্দাসে তাঁদের ফজিলত এবং মাহাত্ম সম্পর্কে বক্তৃতা করেছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশে সেগুলোর উল্লেখ করা প্রশংসনীয় কাজ।

(১৪) আর উক্ত বিবরণে একথাও রয়েছে যে, মে'রাজের সফরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তৃষ্ণাবোধ করেন, তাঁর সম্মুখে বিভিন্ন প্রকার পানীয় দ্রব্য পেশ করা হয়। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, একাধিক প্রকার খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা করা এবং মেহমানের জন্যে বিশেষ কোন প্রকার বস্তু গ্রহণ করা অবৈধ নয়।

(১৫) যদি এ উপস্থিতির উদ্দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখা যায় যে, তা পরীক্ষা মূলক, তবে এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনের ব্যাপারে পরীক্ষা নেয়া অবৈধ নয়।

(১৬) আর তাতে একথাও রয়েছে যে, ফেরেশতাগণ তাঁকে দু'দিক থেকে পরিবেষ্টন

করে রেখেছিলেন, যেমন দশম ঘটনায় রয়েছে। এতে একথা প্রমাণিত হয়, যদি মেহমানের সম্মানের জন্যে খাদেমগণ তাঁকে দু'দিক থেকে পরিবেষ্টন করে তবে তা অন্যায় নয়।

(১৭) আর এতে একথাও রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন আসমানে পৌঁছেন তখন ফেরেশতাগণ এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম তাঁকে 'মারহাবা' বলে সম্বর্ধনা জানান। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, মেহমানের আগমনের মুহূর্তে আনন্দ প্রকাশ কাম্য।

(১৮) এ বিবরণে একথাও রয়েছে যে, বিভিন্ন আসমানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আম্বিয়ায়ে কেরামকে সালাম দিয়েছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আগমনকারী উপবেশনকারীকে সালাম দেবে, যদিও আগমনকারী উত্তম হয়।

(১৯) আর ঐ বিবরণে একথাও আছে যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের ফজিলত উল্লেখ করে নিজের জন্যে দোয়া করেন। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, নৈকট্যের মকামে পৌঁছার পরও দোয়ার ফজিলত বর্তমান থাকে।

(২০) এতে একথাও রয়েছে যে, হযরত মুসা (আঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন তিনি নামাজের সংখ্যা কম করার জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দরখাস্ত করেন। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সৎ পরামর্শ দান করা এবং কল্যাণ কামনা করা একটি কাম্য বস্তু। যদিও যাকে পরামর্শ দেয়া হয় তিনি উচ্চতর মর্যাদা সম্পন্ন হন।

(২১) আর এতে একথাও রয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাজের সংখ্যা কম করার জন্যে আল্লাহ পাকের নিকট দরখাস্ত করেছেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যথার্থ উপকারী পরামর্শ গ্রহণ করা একান্ত কাম্য বস্তু।

(২২) হযরত উম্মে হানী (রাঃ) হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলেনঃ মানুষের নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করবেন না (যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে)। এতে একথা প্রমাণিত হয়, যে কথা প্রকাশ পেলে কোন প্রকার অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে তা প্রকাশ করা উচিত নয়, কারণ হযরত উম্মে হানীর পরামর্শ দানের এটিই ছিল ভিত্তি।

(২৩) এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জবাব দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ নিয়মের মধ্যে কিছুটা বিস্তারিত কথা আছে, অর্থাৎ যে বিষয় দ্বীন ইসলামের জন্যে জরুরী নয়, তা প্রকাশ করা উচিত নয়। আর যে বিষয় জরুরী তা প্রকাশ করা এবং অশান্তির তোয়াক্কা না রাখা উচিত।

(২৪) আর এ বিবরণে একথাও রয়েছে যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বায়তুল মোকাদ্দাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বিশ্বাস স্থাপনের কারণে কাফেররা বিশ্বাস স্থাপন করবে। (যেমন পঁচিশতম ঘটনায় উল্লেখিত হয়েছে)। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, সত্য-সন্ধানী ও

অসত্যের পূজারীদের মধ্যে যখন কথা-বার্তা হয় তখন সত্যের সমর্থনের জন্যে আপাতঃদৃষ্টিতে বিরোধী পক্ষের তরফদার হওয়া অবৈধ নয়।[১]

যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মে'রাজকে বুঝতে পারেনা অথবা অস্বীকার করে তাদের উদ্দেশে ইমাম রাজী (রঃ) একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ একথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে আল্লাহর ফেরেশতাগণ সর্বদা আসমান থেকে জমীনে আসা-যাওয়া করেন। জিব্রাঈল (আঃ) মহান আল্লাহ পাকের দরবার থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পয়গাম নিয়ে আসেন। এ কাজকে কেউ অস্বীকার করেনা, অবিশ্বাসও করেনা। যে পথ দিয়ে জিব্রাঈল (আঃ) হাজারো বার সফর করেছেন সে পথ দিয়ে যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবারও সফর করেন, তবে তা অবিশ্বাস্য কেন হবে? অতএব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মে'রাজ স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় সচেতন ভাবে এবং সজ্ঞানে হয়েছিল। এ ধ্রুব সত্য বিশ্বাস করতে আর কোন অসুবিধা থাকেনা।[২]

এ পর্যায়ে আমাদের আরজী এই, মে'রাজের এ ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যতা উপলব্ধি করার জন্যে দু'টি বিষয়ের প্রয়োজন। একঃ একথা বিশ্বাস করা যে এই সফর তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহাশূণ্য অভিযানের এ ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ পাক করেছেন, আর আল্লাহ পাকের জন্যে কোন কিছুই অসম্ভব বা কঠিন নয়। অতএব, মে'রাজ স্বপ্নে হয়েছে বা আধ্যাত্মিক ভাবে হয়েছে এসব কথা বলার কোন প্রয়োজনই নেই। কেননা আল্লাহ পাক নিজেই এরশাদ করেছেনঃ

سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی

"পবিত্র তিনি, যিনি তাঁর বন্দাকে নৈশ অভিযানে নিয়ে গিয়েছেন"।

আর এ অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেছেনঃ

لِنُرِیَهٗ مِنْ اٰیٰتِنَا

"(অর্থাৎ) আমি দেখাতে চাই তাঁকে আমার নিদর্শন সমূহ"।

অতএব, স্বশরীরে সচেতন অবস্থায় মে'রাজ হয়েছে– এ সত্য উপলব্ধি করতে আর কোন অসুবিধা থাকেনা।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ পাকের মহান দরবারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুমহান মর্যাদা কত উচ্চে এবং তিনি আল্লাহ পাকের কত নৈকট লাভ করেছেন তার সঠিক ধারণা না থাকার কারণেও মে'রাজের সত্যতা উপলব্ধি করা ক্ষেত্র বিশেষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এ সত্য উপলব্ধি করা সহজ যে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হলেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বোত্তম সৃষ্টি হলেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

১। নশরুতীব ফি জিকরিন্নবিয়্যিল হাবীব, পৃঃ ৩৫-৭৫
২। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-১৪৯

আর আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাধিক প্রিয়নবী হলেন আমাদের নবী হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

অতএব, তাঁর জন্যে মে'রাজের ব্যবস্থা, দীদারের ব্যবস্থা, এক কথায় কোন কিছুই অসম্ভব নয়, অবিশ্বাস্যও নয়; বরং সবই বাস্তব এবং সবই সুন্দর।

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا

"আর আমি মুসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম, আর বণী ইসরাঈলের জন্যে তাকে পথ-নির্দেশক করেছিলাম, আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম তোমরা আমাকে ব্যতীত আর কাউকে কার্য নির্বাহক রূপে গ্রহণ করোনা"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদার কথা, তাঁর বিশেষ মোজেযা-মে'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

আর এ আয়াতে হযরত মুসা (আঃ)-এর উচ্চ মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাঁকে কোহে-তুরে হাযির করে বণী ইসরাঈল জাতির হেদায়েতের দায়িত্ব অর্পণ করেন আর তাঁকে এ হুকুম দেন যেন বণী ইসরাঈল জাতি তওহীদের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কাউকে কার্য নির্বাহক মনে না করে অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে শবে মে'রাজে হযরত মুসা (আঃ)-এর সঙ্গে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দেখা হয়েছিল। বোখারী শরীফেই রয়েছে এর বিবরণ।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ সাধারণতঃ কোরআনে করীমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আলোচনার পর হযরত মুসা (আঃ)-এর উল্লেখ করা হয়। এমনিভাবে পবিত্র কোরআন ও তৌরাতের কথাও পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়।

মূলতঃ প্রত্যেক নবীই তওহীদের ব্যাপারে তাগিদ করেছেন। তাই হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রতি এ আদেশ হয়েছে যেন তিনি বণী ইসরাঈল জাতিকে তওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানান এবং শেরকের ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করেন।[১]

ইমাম এবনে জরীর তবরী (রঃ) লিখেছেন যে, বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির وَكِيْلًا শব্দটির অর্থ হলো শরীক। এভাবে আয়াতের মর্ম হবে, আমি নির্দেশ দিয়েছি যেন বণী ইসরাঈলরা আমার সাথে অন্য কিছুকে শরীক না করে।

এবনে জরীর তবরী (রঃ) একথাও লিখেছেন, ইমাম কাতাদা (রঃ) এ আয়াতের

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৮৬-৮৭
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-২৬

ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, "আমি মুসাকে কিতাব (তৌরাত) দিয়েছি এবং তাকে বণী ইসরাঈলের জন্যে পথ-প্রদর্শক করেছি এবং তাকে এ দায়িত্ব দিয়েছি যেন তিনি বণী ইসরাঈলকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর বণী ইসরাঈলের জন্যে মুসাকে রহমত রূপে প্রেরণ করেছি"।[১]

যেহেতু শবে মে'রাজে হযরত মুসা (আঃ) আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন যে আপনার উম্মত দিবা-রাত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ে সম্মত হবেনা, এজন্যে আপনি দরবারে এলাহিতে হাযিরী দিয়ে এ আদেশকে আরও সহজ করার জন্যে আরজী পেশ করুন। বর্ণিত আছে যে হযরত মুসা (আঃ)-এর অনুরোধক্রমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বারে বারে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযিরী দিয়ে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের স্থলে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের নির্দেশ নিয়ে আসেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মে'রাজের ঘটনার পরই হযরত মুসা (আঃ)-এর উল্লেখ করেছেন।[২]

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ

তোমরা তো তাদেরই বংশধর, যাদেরকে আমি নূহের সঙ্গে উঠিয়ে নিয়েছিলাম। যাদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, নূহের সঙ্গে তরীতে আরোহন করিয়ে তাদেরকে রক্ষা করেছিলাম, তোমরা তাদেরই বংশধর। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আয়াতাংশে আল্লাহ পাক বণী ইসরাঈলকে তাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতি তাঁর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। হযরত নূহ (আঃ)-এর জমানায় যে প্রলয়ংকরী বন্যা এসেছিল তাতে সমগ্র মানব জাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যারা হযরত নূহ (আঃ)-এর সঙ্গে তরীতে আরোহণ করেছিল অর্থাৎ তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল, আল্লাহ পাক তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন।[৩]

ইমাম এবনে জরীর তবরী এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ আল্লাহ পাক এর দ্বারা সমগ্র মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করেছেন। আরব হোক কি আযম, বণী ইসরাঈল জাতি হোক কিংবা অন্য জাতি। কেননা পৃথিবীতে যারাই আছে বা আসবে সকলেই বংশধর হলো তাদের, যারা নূহ (আঃ)-এর তরীতে আরোহণ করেছিল।

এবনে জরীর তবরী এ পর্যায়ে ইমাম কাতাদা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে হযরত নূহ (আঃ) যে তরী নির্মাণ করেছিলেন তাতে তাঁর সাথে যারা আরোহণ করেছে তাদেরই বংশধর পরবর্তীকালে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। হযরত নূহ (আঃ) এবং তাঁর স্ত্রী ব্যতীত তাঁর তিন পুত্র সাম, হাম এবং ইয়াফেস

১। তফসীরে তবরী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৫
২। তফসীরের মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃঃ ৮৬-৮৭
৩। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৮

এবং তাদের স্ত্রীরা ছিল। সাম-এর বংশধর হলো আরব জাতি। আর হাম-এর বংশধর হলো আফ্রিকাবাসী। আর ইয়াফেস-এর বংশধর হলো রোমবাসী।[১]

إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

"নিঃসন্দেহে নূহ ছিলেন অত্যন্ত শোকর-গুজার বন্দা"।

এবনে মরদবিয়া আবু ফাতেমার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ নূহ (আঃ) ছোট বড় যে কাজই করতেন, বিসমিল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করে নিতেন। যখনই কোন খাবার গ্রহণ করতেন অথবা পানি পান করতেন, তিনি আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করতেন।

ইমাম রাজী (রঃ) আরও বিস্তারিত লিখেছেন। ইমাম এবনে জরীর তবরী (রঃ) লিখেছেন, হযরত নূহ (আঃ) যখন কোন খাবার গ্রহণ করতেন তখন বলতেন,

الحمد لله الذى أطعمنى ولو شاء أجاعنى

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের, যিনি আমাকে খাবার দান করেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে ক্ষুধার্তও রাখতে পারতেন। আর যখন তিনি পানি পান করতেন তখন বলতেন,

الحمد لله الذى أسقانى ولو شاء أظمأنى

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের, যিনি আমাকে পানি পান করিয়েছেন, তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে তৃষ্ণার্তও রাখতে পারতেন"।

আর যখন তিনি পোশাক পরিধান করতেন তখন বলতেন,

الحمد لله الذى كسانى ولو شاء أعرانى

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্যে, যিনি আমাকে পোশাক পরিধান করিয়েছেন, তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে নগ্নও রাখতে পারতেন"।

মূলতঃ এজন্যেই আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন,

إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

তিনি ছিলেন অত্যন্ত শোকর গুজার বন্দা।[২]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক সে বন্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যে একটি লোকমা গ্রহণের পর আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করে। এমনিভাবে একটু পানি পান করার পর আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করে।

১। তফসীরে তবরী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৫
২। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-১৫৪
তফসীরে তবরী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৬

বর্ণিত আছে, হযরত নূহ (আঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করতে থাকতেন।

বোখারী শরীফে সংকলিত শাফাআত সম্পর্কীয় সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে (কেয়ামতের দিন) লোকেরা যখন হযরত নূহ (আঃ)-এর কাছে শাফাআতের জন্যে হাযির হবে তখন তারা তাঁকে বলবে, আপনি প্রথম ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ্ পাক পৃথিবীতে রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং আল্লাহ্ পাক আপনাকে শোকর গুজার বন্দা বলে আখ্যায়িত করেছেন, আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন।[১]

وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ
بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ
عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤﴾ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ
أُو۟لِى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا۟ خِلَٰلَ ٱلدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾
ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَٰكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَ
جَعَلْنَٰكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ
وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْءَاخِرَةِ لِيَسُۥٓـُٔوا۟ وُجُوهَكُمْ
وَلِيَدْخُلُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا۟ مَا عَلَوْا۟
تَتْبِيرًا ﴿٧﴾

তরজমা

(৪) আর আমি কিতাবে বণী ইসরাঈলকে প্রত্যাদেশ দ্বারা জানিয়ে দিয়েছিলাম, নিশ্চয় তোমরা পৃথিবীতে দু'বার উৎপাত এবং অশান্তি দৃষ্টি করবে আর তোমরা অত্যন্ত অংহকারে স্ফীত হবে।

(৫) এরপর এ দু'য়ের প্রথমটির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার ভীষণ যুদ্ধবাজ বন্দাদেরকে প্রেরণ করি, তারা ছিল অতিশয় শক্তিশালী, তারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে সব কিছু ধ্বংস করে দেয়। আর প্রতিশ্রুতি যে কার্যকর হয়েই থাকে।

(৬) এরপর আমি তোমাদেরকে তাদের উপর পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা শক্তি প্রদান করলাম। আর তাদের থেকে তোমাদের সৈন্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করলাম।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দ), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-২৬

(৭) তোমরা যদি ভাল কাজ করে থাক তবে তা নিজেদের জন্যেই করেছ। আর যদি তোমরা মন্দ কাজ করে থাক তবে তার পরিণামও তোমাদের নিজেদেরকেই ভোগ করতে হবে। এরপর যখন পরবর্তী নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলো, তখন আমি আমার বন্দাদেরকে প্রেরণ করলাম তোমাদের মুখ বিবর্ণ করতে, প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিল ঠিক সেভাবেই পুনরায় তাতে প্রবেশ করার জন্যে এবং যেখানেই আধিপত্য লাভ করবে তা সম্পূর্ণভাবে তছনছ করে দিতে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

আল্লাহ্ পাক বণী ইসরাঈলের হেদায়েতের জন্যে আসমানী গ্রন্থ তৌরাত নাজিল করেছিলেন। কিন্তু এ অভিশপ্ত জাতি হেদায়েত গ্রহণের স্থলে অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়। অশান্তি-অকল্যাণ এবং উৎপাত করতে থাকে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ বণী ইসরাঈল জাতি বিভিন্ন বালা-মসিবতে গ্রেফতার হতে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাকের বিধান অমান্যকারীদের শোচনীয় পরিণাম বর্ণিত হয়েছে, যাতে করে বিশ্ববাসী বণী ইসরাঈলের এ অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য হয়, আল্লাহ্ পাকের বিধান অমান্য করে চলে, আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি বিধান করেন এবং তাদের দুশমনদেরকে তাদের উপর চড়াও হওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। আলোচ্য আয়াত সমূহে এমনি দু'টি ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে। বণী ইসরাঈল জাতি যখন আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য হয় তখন তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।[১]

আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا

"আর আমি বণী ইসরাঈলকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি যে তোমরা পৃথিবীতে দু'বার উৎপাত করবে, আর তোমরা অত্যন্ত অহংকারে স্ফীত হবে"।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে الكتب শব্দ দ্বারা তৌরাতকে বোঝানো হয়েছে। আর الارض শব্দ দ্বারা সিরিয়া ভূমিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ বাক্যে الى শব্দটি على অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর الكتب শব্দ দ্বারা লওহে মাহফুজ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এমন অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবেঃ আর আমি বণী ইসরাঈলের জন্যে লওহে মাহফুজে একথা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি যে, তোমরা

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৮৮

পৃথিবীতে দু'বার অশান্তি সৃষ্টি করবে।

বণী ইসরাঈল যখন প্রথম অশান্তি সৃষ্টি করে তখন তারা তৌরাতের বিধান অমান্য করে, তৌরাতে নিষিদ্ধ কাজগুলো তারা করতে থাকে এবং হযরত শাইআ এবনে আনাজিয়াকে শহীদ করে। আর তাদের অশান্তি সৃষ্টির দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে তখন, যখন তারা হযরত জাকারিয়া (আঃ)-কে এবং হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে শহীদ করে আর হযরত ঈসা (আঃ)-কেও হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তারা প্রথম অশান্তি সৃষ্টি করেছে তখন, যখন তারা হযরত জাকারিয়া (আঃ)-কে হত্যা করেছে আর দ্বিতীয় বার অশান্তি সৃষ্টি করেছিল তখন, যখন হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে হত্যা করেছিল এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল।

কোন কোন তফসীরকার لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ বাক্যটির ব্যাখায় বলেছেন, বণী ইসরাঈল পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে তথা আল্লাহ্ পাকের বিধান অমান্য করবে এবং মানুষের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করবে, তৌরাতে এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। বস্তুতঃ বণী ইসরাঈল জাতির ইতিহাস অন্যায়-অনাচার, জুলুম-অত্যাচার এবং ধ্বংসের ইতিহাস। এ পর্যায়ে দু'বার তাদের উপর যে ধ্বংস নেমে আসে তা চিরদিন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে। একবার ব্যাবিলন এবং নাইনুয়ার শাসনকর্তা বখতে নসর তাদের উপর চড়াও হয়েছিল। আর দ্বিতীয় বার ৭০ খৃষ্টাব্দে রোমের বাদশাহ তাইতাউসের যুগে।[১]

فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولٰهُمَا

যখন প্রথম বার তাদের শাস্তির নিদৃষ্ট সময় আসে-

بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا

তখন আমি এক দূর্দান্ত এবং অত্যন্ত শক্তিশালী জাতিকে তাদের উপর চড়াও করে দেই। যারা তাদের বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় এবং ঘরে ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে প্রহার করে এবং তাদের চেহারাকে বিকৃত ও বিবর্ণ করে দেয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে عِبَادًا لَّنَا শব্দটির দ্বারা ইরাকের নাইনুয়া শহরের রাজা সাখারিবকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

সায়ীদ এবনে জোবায়ের (রঃ) এ মতই পোষণ করেছেন। আর কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা জালুত এবং তার সৈন্যবাহিনীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এখানে একথা উল্লেখ্য, এই জালুতকে হযরত দাউদ (আঃ) হত্যা করেছিলেন। এবনে এসহাকের মতে, এর দ্বারা বখতে নসরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ মতই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

فَجَاسُوْا.....

অর্থাৎ ঐ শক্তিশালী দূর্দান্ত জাতি তোমাদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে তোমাদেরকে হত্যা

১। তফসীরে মাজেদী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৭৮

করে।

যুজায (রঃ) বলেছেন, جـوس অর্থ হলো কোন জিনিসকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে অনুসন্ধান করা।

আর ফররা (রঃ) বলেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হলো, তারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে তোমাদেরকে হত্যা করেছে।

وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا

আর তোমাদের শাস্তির প্রতিশ্রুতিতো পূর্ণ হওয়ার কথা ছিলই, যা হয়েছে।[১]

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

"এরপর আমি তোমাদেরকে তাদের উপর পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা শক্তি প্রদান করলাম, আর তাদের থেকে তোমাদের সৈন্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করলাম"।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এরপর যখন বণী ইসরাঈল জাতি তাদের কৃত অন্যায়ের জন্যে তওবা করে তখন আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি সদয় হন, তাদের ধনবল এবং জনশক্তি বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদের দুশমনদের উপর তাদেরকে বিজয় দান করেন।

আল্লামা বয়জাবী (রঃ) ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এভাবে লিখেছেন। বাহমান এবনে আসপানদীয়ার যখন তার পিতামহ গোশতাসেপ এবনে লইরাসেপের স্থলে ইরানের বাদশাহ হয়, তখন আল্লাহ্ পাক তার অন্তরে বণী ইসরাঈলের জন্যে দয়া সৃষ্টি করেন। এজন্যে সে বন্দী বণী ইসরাঈলকে রেহাই দিয়ে সিরিয়া পাঠিয়ে দেয়, হযরত দানিয়ালকে তাদের নেতা মনোনীত করে। তারা সিরিয়া গমন করে বখতে নসরের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করে। হযরত দাউদ (আঃ) জালুতকে হত্যা করেন। যখন সিরিয়া বণী ইসরাঈলের করতলগত হয় তখন তারা দেশের উন্নতি সাধন করে এবং তাদের জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

তোমরা যদি ভাল কাজ করে থাক তবে তা নিজেদের জন্যেই করেছ, আর যদি তোমরা মন্দ কাজ করে থাক তবে তার পরিণতি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে।

অর্থাৎ তোমাদের কর্ম যখন ভাল হবে ফলও তেমনি হবে। ভাল কাজ করলে তা তোমাদের জন্যেই ভাল হবে, আর মন্দ কাজ করলে তা তোমাদের জন্যেই মন্দ হবে।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৮-১৯

এরশাদ করেছেনঃ বণী ইসরাঈল যখন আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয় এবং পাপাচারে লিপ্ত হয় তখন আল্লাহ পাক তাদের উপর বখতে নসরকে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ দান করেন এবং দুশমনরা তাদেরকে হত্যা করে বন্দী করে। পরে যখন বণী ইসরাঈলরা তওবা করে তখন আল্লাহ পাক তাদের প্রতি সদয় হন এবং তাদের দেশ এবং তাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, যখন তারা আল্লাহ পাকের প্রতি অনুগত হয় তখন তারা নিজেদেরই উপকার করে, আর যখন তারা আল্লাহ পাকের নাফরমানী করে তখন তারা নিজেদেরই ক্ষতি করে। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ

অতএব, যদি তোমরা আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চল তবে তোমাদেরই জন্যে উপকারী হবে। তোমরা সওয়াব পাবে (তোমাদের আনুগত্যে আল্লাহ পাকের কোন ফায়দা নেই) আর যদি তোমরা মন্দ কাজ কর তবে তার শোচনীয় পরিণতি তোমরাই ভোগ করবে, তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করবে (আল্লাহ পাকের কোন ক্ষতি হবেনা)।[১]

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ

"এরপর যখন পরবর্তী নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলো তখন আমি আমার বন্দাদেরকে প্রেরণ করলাম তোমাদের মুখ বিবর্ণ করতে, প্রথম বার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিল, ঠিক সেভাবেই পুনরায় তাতে প্রবেশ করার জন্যে এবং যা কিছুর উপর আধিপত্য লাভ করবে তা সম্পূর্ণরূপে তছনছ করে দিতে"।

তৌরাতে বণী ইসরাঈল সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল সে অনুসারে যখন আল্লাহ পাকের দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের৬০ নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হয়, তখন বণী ইসরাঈলের উৎপাত এবং দুস্কৃতির কারণে আল্লাহ পাক তাদেরকে আযাব দেন। সে আযাব পূর্বাপেক্ষা কঠোরতর হয়। চরম নিষ্ঠুর এবং শক্তিশালী এক জাতি তাদের প্রতি আক্রমণ পরিচালনা করে, তাদের বাড়ী-ঘর ধ্বংস করে এবং প্রহারে প্রহারে তাদের চেহারা বিকৃত করে দেয়। শুধু তাই নয়, দুশমনরা বায়তুল মোকাদ্দাসে পর্যন্ত প্রবেশ করে এবং তা বিনষ্ট করার প্রয়াস পায়। এভাবে বণী ইসরাঈলের ধ্বংস নেমে আসে। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ আল্লাহ পাক ইরানী এবং রুমীদেরকে বণী ইসরাঈলের উপর চড়াও করে দিয়েছেন। যারা তাদেরকে হত্যা করেছে, বন্দী করেছে এমনকি, দেশত্যাগে বাধ্য করেছে। এভাবে বণী ইসরাঈল দ্বিতীয় বারের মত ধ্বংস হয়।

বণী ইসরাঈল জাতির উত্থান-পতনের ইতিকথা

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা বগভী (রঃ) মোহাম্মদ এবনে এছহাকের প্রদত্ত বিস্তারিত বিবরণের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বণী ইসরাঈল একাধারে আল্লাহ পাকের

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড - ২০, পৃষ্ঠা-১৫৮

নাফরমানীতে লিপ্ত ছিল, পাপাচারে মত্ত ছিল, আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করছিলেন, কিন্তু যখন তারা চরমভাবে সীমালংঘন করে, তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, আর ঐ শাস্তির কথা আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। বণী ইসরাঈলে একজন বাদশাহ হয়েছিল, তার নাম ছিল ছাদিকা। সে যুগে আল্লাহ পাকের এ বিধান ছিল যে আল্লাহ পাক বাদশাহর হেদায়েতের জন্যে তার সঙ্গে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করতেন, ঐ পয়গম্বরগণের উপর কোন নূতন কিতাব নাজিল হতো না; বরং তৌরাতে বর্ণিত বিধানের উপর আমল করার নির্দেশ দেয়াই হতো তাঁদের কাজ। ছাদিকা যখন বাদশাহ হয় তখন তার হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক শাইআ এবনে আনাজিয়াকে নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেন। হযরত জাকারিয়া (আঃ) এবং ইয়াহইয়া (আঃ)-এর পূর্বে শাইআ (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি হযরত ঈসা (আঃ) এবং সর্বশেষ ও সর্বশেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ "হে ইয়ারদাসালাম! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এখন তোমার নিকট একজন গর্ধভের উপর আরোহণকারী, আরেকজন উষ্ট্রের উপর আরোহণকারী আসবেন"।

যাহোক, ছাদিকা নামক বাদশাহ বায়তুল মোকাদ্দাস এবং বণী ইসরাঈলের উপর অনেক দিন বাদশাহী করে, যখন তার যুগ শেষ হওয়ার সময় আসে তখন আল্লাহ পাক ব্যাবিলনের বাদশাহ সাখারিবকে ইরাক থেকে প্রেরণ করেন। সাখারিবের সঙ্গে ৬ লক্ষ পতাকা ছিল। সাখারিব বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সে যুগে ছাদিকা বাদশাহর পায়ে এক প্রকার ফোঁড়া হয়েছিল। আল্লাহর নবী শাইআ (আঃ) বাদশাহকে বললেন, হে ইসরাঈলী বাদশাহ! ব্যাবিলন থেকে সাখারিব বাদশাহ ছয় লক্ষ পতাকা উড়িয়ে এসেছে, লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পলায়ন করছে। অতএব, তুমি সতর্ক হও। একথা শ্রবণ করে ছাদিকা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং বললো, হে আল্লাহর নবী! আপনার নিকট কি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ সম্পর্কে কোন ওহী এসেছে যে আমাদের এবং সাখারিবের মধ্যে কি সিদ্ধান্ত হবে? হযরত শাইআ (আঃ) বললেন, এ সম্পর্কে এখনো কোন ওহী আসেনি। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহী আসল এবং আদেশ হলো যে বণী ইসরাঈলী বাদশাহ ছাদিকাকে জানিয়ে দাও, তার সময় শেষ হয়ে এসেছে। অর্থাৎ তার মৃত্যুর সময় এসে গেছে, সে যাকে ইচ্ছা ওসিয়ত করতে পারে, হযরত শাইআ (আঃ) বাদশাহ ছাদিকাকে একথা জানিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার যা ইচ্ছা ওসিয়ত কর এবং তোমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে যকে ইচ্ছা তোমার স্থলাভিষিক্ত কর। ছাদিকা বাদশাহ একথা শ্রবণ করে সঙ্গে সঙ্গে নামাজে দন্ডায়মান হলো এবং ক্রন্দণ করতে লাগল ও বিনীত ভাবে এ আরজী পেশ করলঃ

"হে আল্লাহ! হে প্রতিপালক! হে পবিত্র সত্তা! যিনি সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র, হে রহমান! হে দয়াময়! যাঁর কোন নিদ্রা ও তন্দ্রা নেই, হে আল্লাহ! আমি যা করেছি আর যা কিছু আমার দ্বারা হয়েছে, বণী ইসরাঈলের উপর ন্যায় বিচারের সঙ্গে আমি ক্ষমতা পরিচালনা করেছি, সব কিছু তোমার তওফিকেই হয়েছে, তুমি এ সম্পর্কে আমার চেয়ে

অধিকতর অবগত। আমার গোপন ও প্রকাশ্য সবই তোমার সম্মুখে, আমার প্রতি দয়া কর"।

ছাদিকা আল্লাহর নেককার বন্দা ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং হযরত শাইআ (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে ছাদিকাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ পাক তোমার দোয়া কবুল করেছেন, তিনি তোমার প্রতি দয়া করেছেন, তোমার দুশমন সাখারিব থেকে তোমাকে রেহাই দিয়েছেন এবং আরো পনের বছর তোমার হায়াত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ সুসংবাদ শ্রবণ করায় ছাদিকার অন্তর থেকে দুশমনের ভয় দূরীভূত হলো। কোন দুশ্চিন্তা আর রইলনা, তখন তিনি এভাবে দোয়া করলেন, হে আমার এবং আমার পিতামহের মা'বুদ! আমি তোমাকেই সেজদা করি, আমি তোমার পবিত্রতার কথা স্বীকার করি, আমি তোমাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ জানি, তোমারই তা'যীম করি, তুমিই যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমতা দান কর, আর যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমতাচ্যুত কর। তুমি গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জান, তুমিই আউয়াল, তুমিই আখের। তুমিই জাহের, তুমিই বাতেন, তুমিই দয়া কর, তুমিই যারা ব্যাকুল, তাদের দোয়া কবুল কর। তুমিই আমার দোয়া কবুল করেছ এবং আমার প্রতি দয়া করেছ। এ দোয়া শেষ করে যখন তিনি সেজদা থেকে মাথা তুললেন, তখনই আল্লাহ পাক শাইআ (আঃ)-এর নিকট এ মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন যে, বাদশাহ ছাদিকাকে বলে দাও, সে যেন তার কোন খাদেমকে হুকুম দেয় যে জয়তুনের পানি তার ফোঁড়ায় ব্যবহার করে। আল্লাহ পাক সকাল পর্যন্ত তাকে আরোগ্য দান করবেন। ছাদিকা এ আদেশ পালন করলেন এবং আল্লাহ পাক তাকে সুস্থ করে দিলেন।

বাদশাহ হযরত শাইআ (আঃ)-এর নিকট আরজ করলেন, আপন প্রতিপালকের নিকট দোয়া করুন, আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে জানিয়ে দেন যে দুশমনের সঙ্গে তিনি কি ব্যবহার করবেন এবং তার কি হবে? আল্লাহ পাক শাইআ (আঃ)-কে বললেন, বাদশাহকে বলে দাও, আমি তোমার দুশমনকে তোমার নিকট আসতে বিরত করেছি এবং তার হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করেছি। সকাল পর্যন্ত তার সকল সৈন্য মারা যাবে। শুধু সাখারিব এবং তার পাঁচজন সঙ্গী বেঁচে যাবে। তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করে নিও। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের ফটকে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি চিৎকার করে বললো, হে বণী ইসরাঈলের বাদশাহ! আল্লাহ পাক তোমার কাজ করে দিয়েছেন, তোমার দুশমনকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, তুমি বাইরে এসে দেখ, আল্লাহ পাক সাখারিব এবং তার সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। বাদশাহ বাইরে বের হলেন এবং মৃতদের মধ্যে সাখারিবকে অনুসন্ধান করা হলো, কিন্তু তার লাশ পাওয়া গেলনা। তাই চতুর্দিকে সাখারিবকে খোঁজ করার জন্যে লোক প্রেরণ করা হলো। অবশেষে তারা পাহাড়ের এক গর্তের মধ্যে সাখারিব ও তার পাঁচজন সঙ্গীর সন্ধান পেল। তন্মধ্যে বখতে নসরও ছিল। তাদের সকলকে জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে বাদশাহর নিকট প্রেরণ করা হলো। বাদশাহ সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় পড়ে গেলেন। ভোর থেকে আছর পর্যন্ত তিনি সেজদায় পড়ে ছিলেন। এরপর সাখারিবকে বললেন, তুমি দেখেছ আমাদের প্রতিপালক কে? তোমার সাথে কি করেছেন? তুমি বেখবর ছিলে, আর তিনি তোমাকে ধ্বংস করেছেন। সাখারিব বললো, আমি পূর্বেই জানতে পেরেছিলাম তোমার প্রতিপালক তোমাকে সাহায্য করবেন এবং তোমার প্রতি রহমত

নাজিল করবেন, আমি আমার দেশ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই এ খবর পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি পথ-প্রদর্শকের কথা মানিনি, আমার নির্বুদ্ধিতার কারণেই আজ আমি বিপদগ্রস্ত, যদি আমি আমার পথ-প্রদর্শকের কথা মেনে নিতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হতাম তবে তোমার সাথে যুদ্ধ করতে আসতাম না।

ছাদীকা বললেন, মহান আল্লাহ পাকের শোকর, তিনি যার দ্বারা ইচ্ছা তোমাদেরকে ধ্বংস করেছেন। এখন তুমি এবং তোমার যে পাঁচজন সাথী বেঁচে গেলে, এ কারণে তোমরা এ ভুল ধারণা করোনা যে আল্লাহ পাকের দরবারে তোমাদের কোন সম্মান রয়েছে, এজন্যে আল্লাহ পাক তোমাকে এবং তোমাদের সাথীদেরকে রক্ষা করেছেন। তিনি তোমাকে এবং তোমাদের সাথীদেরকে এজন্যে রক্ষা করেছেন যেন দুনিয়াতে তোমাদের দুর্ভাগ্য এবং আখেরাতে তোমাদের আযাব বৃদ্ধি পায়। আর আমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাথে যা কিছু করেছেন তার সংবাদ তুমি তাদেরকে পৌঁছাও, যারা তোমাদের সাথে এখানে আসেনি। আর তাদেরকে আল্লাহ পাকের আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন কর। যদি একথা না হতো তবে আমি তোমাদের সকলকে হত্যা করে দিতাম, তোমার ও তোমার সাথীদের অবস্থা আল্লাহ পাকের নিকট একটি সামান্য পিপীলিকার রক্তের চেয়েও হীন, যদি আমি হত্যা করি তবে আমার প্রতিপালকের কোন পরোয়া নেই। এরপর বাদশাহ ছাদীকার আদেশক্রমে তাদের ঘাড়কে জিঞ্জির দ্বারা আবদ্ধ করা হলো এবং ৭০ দিন পর্যন্ত তাদেরকে বায়তুল মোকাদ্দাস এবং এলইয়া নামক স্থানে ঘোরানো হলো, তাদের সকলকে দৈনিক দু'টি যবের রুটি দেয়া হতো। সাখারিব ইসরাঈলী বাদশাহকে বললো, তুমি আমাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করছ তার চেয়ে হত্যা করাই উত্তম ছিল। ইসরাঈলী বাদশাহ তাদেরকে হত্যার স্থানে প্রেরণ করলেন। এরপর আল্লাহ পাক হযরত শাইআ (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, বাদশাহকে বল সাখারিব ও তার সাথীদেরকে রেহাই দিতে, যেন তারা সে সব লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করে যারা তাদের পেছনে রয়েছে এবং সাখারিব ও তার সাথীদেরকে যেন সসম্মানে যানবাহনে আরোহন করিয়ে তাদের দেশে প্রেরণ করে। হযরত শাইআ (আঃ) বাদশাহকে আল্লাহর হুকুম জানিয়ে দিলেন। বাদশাহ হুকুম পালন করলেন। সাখারিব সাথীদেরকে নিয়ে ব্যাবিলন পৌঁছে গেল এবং লোকদেরকে তাদের সৈন্যবাহিনীর অবস্থা জানিয়ে দিল। তাদের দেশের গণকরা বললো, আমরাতো পূর্বেই বণী ইসরাঈলের প্রতিপালকের খবর আপনাকে দিয়েছি, তাদের নবীর অবস্থাও আপনাকে জানিয়েছি এবং নবীর নিকট আল্লাহর তরফ থেকে যে ওহী আসে সে সংবাদও আপনাকে দিয়েছি, কিন্তু আপনি আমাদের কথা মানেননি। বণী ইসরাঈল এমনি এক উম্মত যাদের সঙ্গে তাদের প্রতিপালক রয়েছেন, এ অবস্থায় কেউ তাদের সাথে লড়াই করতে পারবেনা।

সাখারিবের ঘটনা তার সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শনের জন্যে ঘটেছিল। এ ঘটনা দ্বারা আল্লাহ পাক তাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। এরপর সাখারিব ৭ বছর জীবিত ছিল। পরে সে মারা যায়। মৃত্যুর পূর্বে সে তার পৌত্র বখতে নসরকে তার স্থলাভিষিক্ত করে আর বখতে নসর তার পিতামহের অনুসরণ করে। সে ঐ কাজই করে যা তার পিতামহ

করেছিল। বখতে নসর ১৭ বছর ক্ষমতা পরিচালনা করে।

বাদশাহ ছাদীকার মৃত্যুর পর বণী ইসরাঈলের মধ্যে পরস্পর কলহ-দ্বন্দ শুরু হয়। কেননা ক্ষমতা লাভের জন্যে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল, এমনকি পরস্পরে মধ্যে মারামারি, খুন-খারাবী পর্যন্ত হতে লাগলো। আল্লাহর নবী শাইআ (আঃ) উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তাঁর উপদেশ কেউ মানতো না। বণী ইসরাঈলীদের জাতীয় জীবনে এমনি দুর্দিনে আল্লাহ পাক হযরত শাইআ (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেনঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভাষণ দাও, আমি তোমার মুখে আমার ওহী জারি করবো (অর্থাৎ আমি যা চাইবো তাই তোমার মুখ থেকে বের হবে)। তাই শাইআ (আঃ) জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেয়ার জন্যে দণ্ডায়মান হলেন। আর আল্লাহ পাক তাঁর জবান দিয়ে এই ওহী জারি করলেনঃ হে আসমান! শ্রবণ কর, হে জমিন! তুমিও কর্ণপাত কর, আল্লাহ পাক বণী ইসরাঈলের অবস্থা বর্ণনা করতে চান। তাদেরকে আল্লাহ পাক স্বীয় নেয়ামত সমূহ দিয়ে লালন-পালন করেছেন, নিজের জন্যে তাদেরকে তিনি নির্বাচন করেছেন, আল্লাহ পাক তাদেরকে মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন, অন্য লোকদের উপর তাদেরকে বিশেষ সম্মান দান করেছেন, তাদের অবস্থা ছিল কয়েকটি বিক্ষিপ্ত বকরীর ন্যায় যাদের কোন পালক ছিলনা, আল্লাহ পাক তাদেরকে একত্রিত করে দিয়েছেন, পথহারা বকরীগুলোকে সমবেত করেছেন, যে দুর্বল ছিল তাকে মোটা-তাজা করেছেন, আর যে মোটা-তাজা ছিল তার জীবন হেফাজত করেছেন। আল্লাহ পাক তাদের সাথে এ ব্যবহার করেছেন, অথচ তারা এখন অহংকারী হয়ে গিয়েছে, পরস্পরের মধ্যে লড়াই করছে, একে অন্যের বিরুদ্ধে শিং দিয়ে আঘাত করছে, একে অন্যকে হত্যা করছে, এমনকি তাদের মধ্যে একজনও সুস্থ বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক রয়নি। এ পাপীষ্ঠ জাতির ধ্বংস অনিবার্য, যারা জানেনা তাদের মৃত্যু কোন্ দিক থেকে আসছে (অর্থাৎ তারা জানেনা, তাদের জাতির মৃত্যুর কি কি কারণ ও উপকরণ রয়েছে)। উষ্ট্র যখন তার গৃহের কথা মনে করে তখন স্বগৃহে ফিরে আসে। গর্ধভ যখন স্মরণ করে কোথায় সে পেট ভরে খেয়েছিল, সে তখন সেথায় যায়। গরু যখন সেই সবুজ ঘাষ বিশিষ্ট জমিনের কথা স্মরণ করে যেখানকার ঘাষ খেয়ে মোটা তাজা হয়েছিল, সে তখন সেখানে ফিরে যায়। কিন্তু এই বণী ইসরাঈল জাতি যাদের বিবেক-বুদ্ধি ছিল, যারা গরু নয় গাধা নয় কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা জানেনা তাদের ধ্বংস কীভাবে আসছে। আমি তাদের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছি। একটি জমিন বিরাণ ছিল, অনেকদিন থেকে বিরাণ অবস্থা ছিল, তাতে পানিও ছিলনা, ঘাষও ছিলনা, কোন ইমারতও ছিলনা, কিন্তু ঐ জমিনের মালিক ছিল একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তি, সে এই জমিনকে আবাদ করার প্রতি মনোনিবেশ করলো। সে পছন্দ করলো না যে লোকেরা বলবে, এই জমিনের মালিকের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জমিন বিরাণ করে রেখেছে। অথবা লোকেরা বলবে, এই জমিনের মালিকের বিবেক-বুদ্ধি আছে, এতদসত্ত্বেও সে জমিনকে বিরাণ করে রেখেছে। একথা স্মরণ করে সে জমিনের চারপাশে দেয়াল নির্মাণ করেছে, ভেতরে সুন্দর একটি মহলো নির্মাণ করেছে, নহর সমূহ প্রবাহিত করেছে। জাইতুন, আনার এবং খেজুর সহ অন্যান্য ফলের গাছ লাগিয়েছে। একজন সাহসী, শক্তিশালী প্রহরী নিযুক্ত করেছে যখন

বৃক্ষগুলোতে ফল-ফুল আসতে লাগলো আর তা আসলো অপূর্ণ, তখন লোকেরা বলত লাগলো এ জমিন অত্যন্ত মন্দ। উচিত হলো এর দেয়ালগুলো ভেঙ্গে দেয়া, মহলকে ধ্বংস করে দেয়া, নহরগুলো বন্ধ করে দেয়া, বৃক্ষগুলো জ্বালিয়ে দেয়া, জমিনকে ইতিপূর্বে যেমন বিরাণ ছিল তেমন বিরাণ করে দেয়া।

তুমি লোকদেরকে বল চতুর্দিকের দেয়াল হলো আমার দ্বীন, মহ'ল হলো আমার শরীয়ত, নহর হলো আমার কিতাব, জমিনের প্রহরী হলো আমার পয়গম্বর, আর বৃক্ষ হলে তোমরা। আর যে অপূর্ণ বা ব্যর্থ ফল আসল তা হলো তোমাদের মন্দ কার্যাবলী। তোমরা নিজেদের জন্যে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছ, আমি তোমাদের জন্যে সে সিদ্ধান্তই জারি করেছি। এটি একটি দৃষ্টান্ত যা আমি তাদের অবস্থা বোঝাতে বর্ণনা করেছি। তোমরা গরু বকরী জবেহ করে আমার নৈকট্য চাও, অথচ ঐ গোশ্ত আমার নিকট পৌঁছে না, আর তা আমি ভক্ষণও করিনা। তাদেরকে একথার জন্যে আহ্বান করা হয় যে, তারা যেন তাকওয়া-পরহেযগারী অবলম্বন করে, আর যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ বা হারাম করা হয়েছে তা থেকে যেন তারা বিরত থাকে আর এভাবে আমার নৈকট্য লাভ করে কিন্তু তারা অন্যায়ভাবে হত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আমার জন্যে ঘর তথা মসজিদ তৈরী করছে, মসজিদের অভ্যন্তরীণ জিনিস পবিত্র রাখছে কিন্তু নিজেদের অন্তর সমূহকে অপবিত্র এবং দেহ সমূহকে অপরিচ্ছন্ন রাখছে। মসজিদ সমূহে তারা পর্দা ব্যবহার করছে, আর তাকে সুসজ্জিত করছে। কিন্তু তাদের বিবেক-বুদ্ধিকে বিরাণ করছে এবং নৈতিক গুণাবলীকে ধ্বংস করছে। এ মসজিদগুলোকে পাকা করার আমার কি প্রয়োজন, আমিতো সেখানে থাকিনা। সেখানে পর্দা ব্যবহারের কি প্রয়োজন, আমি তো সেখানে আসিনা, মসজিদগুলোকে সুউচ্চ করার হুকুম আমি এজন্যে দিয়েছি যেন সেখানে আমাকে স্মরণ করা হয় এবং আমার পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়। তারা বলে, আমরা রোযা রাখি কিন্তু আমাদের রোযা উপরে হয়না, আমরা নামাজ আদায় করি কিন্তু নামাজের কারণে অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়না, আমরা দান-খয়রাত করি কিন্তু আমাদের সদকা আমাদেরকে পবিত্র করেনা, আমরা গর্ধভের আওয়াজের মত চিৎকার করে দোয়া করি এবং রোদন করতে থাকি, কিন্তু আমাদের কোন কিছুই কবুল হয়না।

তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, তাদের দোয়া কি কারণে কবুল হয়না, আমি কি সর্বশ্রোতা নই? আমি কি সর্বদ্রষ্টা নই? আমি কি নিকটতম জবাবদাতা নই? আমি কি দয়াময় নই?

আমি তাদের রোযা কীভাবে উপরে তুলবো, কেননা রোযা অবস্থায় তারা মিথ্যা কথা বলে, তারা হারাম খাদ্য গ্রহণ করে।

আমি তাদের নামাজে কীভাবে নূর সৃষ্টি করব যখন তাদের অন্তর আমার দুশমনদের দিকে এবং যারা আমার সীমালংঘন করে, তাদের দিকে আকৃষ্ট থাকে।

আমি তাদের সদকা কি করে কবুল করব যখন তারা পরের অর্থ-সম্পদ দান-খয়রাত করে। আমি তো দান খয়রাতের সওয়াব তাদেরকে দান করি, যারা নিঃস্পাপ এবং

কল্যাণকামী হয়। আমি তাদের দোয়া কীভাবে কবুল করব, তাদের দোয়া কথা হয়; কাজ নয়। তারা কথা বলে, কাজ করেনা, তাদের কাজ কথা থেকে অনেক দূরে থাকে। আমি তো তাদের দোয়া কবুল করি, যাদের অন্তর বিনম্র, যারা মানুষের কাছে চাওয়া থেকে বাঁচে অথচ তারা হয় মিসকীন, আমার সন্তুষ্টির নিদর্শন হলো মিসকীনদের সন্তুষ্টি।

যখন তারা আমার কথা শ্রবণ করে, আর যখন তুমি আমার বাণী তাদেরকে পৌঁছাও, তখন তারা বলে এগুলো হলো বানানো কথা আর পুরনো কথা যা আমাদের পিতা-পিতামহের কাছ থেকে শুনে এসেছি। আর যাদুকর এবং গণকদের কথার মত এগুলোও সাজানো গোছানো কথা। তারা দাবী করে যে ইচ্ছা করলে আমরাও এমন কালাম পেশ করতে পারি। শয়তান আমাদের নিকট ওহী নিয়ে আসে, আমরা ইচ্ছা করলে শয়তানের মাধ্যমে গায়বী খবর নিয়ে আসতে পারি। যেদিন আমি পৃথিবী সৃষ্টি করেছি, সেদিনই কেয়ামত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, আর সে সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন আমার নিজের উপর আমি চূড়ান্ত করে নিয়েছি। তার পূর্বে দুনিয়ার জীবনের একটা সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, আর সে নির্দিষ্ট সময় তা অবশ্যই হবে। যদি এই লোকেরা গায়ব জানার দাবী করে তবে তাদেরকে বল যে তারা বলুক, ঐ সিদ্ধান্ত কবে জারী হবে।

অর্থাৎ কেয়ামত কবে হবে? যদি তাদের মধ্যে এ শক্তি থাকে যে যা ইচ্ছা তা করতে পারে, তবে তারা সে শক্তি প্রদর্শন করুক।

যাহোক, আমার সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে, যদিও তা মুশরেকদের অপছন্দনীয় হয়।

আর আমি যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছি, সেদিনই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, নবুওয়্যতের ব্যবস্থা জারী করব। ক্ষমতা নিম্নশ্রেণীর জনগণকে দান করব। অপমানিতকে সম্মান, দুর্বলকে শক্তি, পরমুখাপেক্ষীকে সম্পদ, মূর্খদেরকে এলম এবং অশিক্ষিত লোকদেরকে হেকমত দান করব।

তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তারা জানে বলুক। এসব কিছু কবে হবে? আর কে এ কাজ করবে? আর কারা এর সাহায্যকারী হবে? একথা নিশ্চিত যে আমি এসব কাজের জন্যে একজন উম্মী নবী প্রেরণ করব, যিনি কঠোর মেজাজের লোক হবেন না, যিনি বাজারে চিৎকার দেবেন না, যাঁর মুখে কখনো অশ্লীল কথা আসবেনা, আমি তাঁকে সঠিক পথে চালাবো, সকল নৈতিক গুণাবলী তাঁকে দান করবো, আত্মমর্যাদাকে তাঁর ভূষণ বানাবো, নেকী এবং কল্যাণ হবে তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাকওয়া-পরহেযগারী হবে তাঁর অন্তরের বিষয়, হেকমত হবে তাঁর এলম, সত্যবাদিতা এবং অঙ্গীকার রক্ষা হবে তাঁর মৌলিক উপাদান, ক্ষমা ও ঔদার্য্য হবে তাঁর অভ্যাসে পরিণত, সুবিচার হবে তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্য, হক্ব হবে তাঁর শরীয়তের বুনিয়াদ, হেদায়েত হবে তাঁর ইমাম অর্থাৎ হেদায়েতই নেতৃত্ব লাভের মূল উপকরণ হবে, আর ইসলামকে তাঁর ধর্ম বানাবো, তাঁর নাম হবে আহমদ, আমি তাঁর মাধ্যমে পথহারা লোকদেরকে হেদায়েত করব, মূর্খ লোকদেরকে এলম এবং অখ্যাত লোকদেরকে খ্যাতি দান করব, তাঁর মাধ্যমে আমি কমকে বেশী এবং দারিদ্র্য-প্রপীড়িত লোকদেরকে সম্পদশালী বানাবো ও বিক্ষিপ্ত লোকদেরকে একত্রিত করব

তাদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং মমত্ববোধ সৃষ্টি করব, এ উম্মী নবীর উম্মতকে সমস্ত নবীর মধ্যে উত্তম উম্মত বানাবো, যাদেরকে মানুষের হেদায়েতের জন্যে সৃষ্টি করা হবে, যারা কল্যাণকর কাজের আদেশ দেবে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে, সে উম্মত আমাকে এক জানবে, আমার প্রতি ঈমান আনবে, আমার জন্যে এবং শুধু আমার জন্যে তাদের চিন্তা-চেতনা এবং আমল থাকবে, তারা নামাজ আদায় করবে, নামাজে তারা দন্ডায়মান হবে, রুকু সেজদা করবে, তারা আমার পথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জেহাদ করবে, তারা দুশমনদের উপর হামলা করবে এবং নিজের বাড়ী-ঘর, অর্থ-সম্পদ ফেলে আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে বের হয়ে পড়বে, আমি তাদের অন্তরে তকবীর, তওহীদ, তছবীহ, তাহমীদ এবং তামজীদের প্রেরণা দেব অর্থাৎ আমার শ্রেষ্ঠত্বের, একত্ববাদের, পবিত্রতার হামদ ও সানার স্বীকৃতি এবং প্রকাশ করার ব্যবস্থা করব, সফরে ও তাদের মজলিস সমূহে, তাদের শয়ন কক্ষে, আসা-যাওয়ার পথে ও তাদের বাড়ী-ঘরে তারা তকবীর বলবে। শুধু আমার মা'বুদ হওয়ার কথা প্রকাশ করবে এবং আমার পবিত্রতা বর্ণনা করবে। পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় আরোহণ করে চেহারা এবং হাত-পাকে আমার জন্যে পবিত্র করবে। আর কোমরে কাপড় বেঁধে নেবে। তাদের রক্ত তাদের কোরবাণী হবে, তাদের অন্তরে কোরআনে করীমের আয়াত থাকবে। রাত্রে তারা এবাদত করে কাটাবে। আর দিনে দুশমনের মোকাবেলায় ব্যঘ্র হয়ে দাঁড়াবে। আর এটি আমার দান। আমি যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে থাকি, আর আমি মহান দাতা।

হযরত শাইআ (আঃ) যখন এ ভাষণ শেষ করলেন, তখন তাঁকে হত্যা করার জন্যে বণী ইসরাঈলীরা তাঁর উপর হামলা করলো, তিনি পলায়ন করলেন। পথে একটি বৃক্ষ পেলেন, ঐ বৃক্ষ থেকে আওয়াজ আসল, হে আল্লাহর নবী! আমার ভেতর প্রবেশ করুন। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষটি ফেটে গেল, হযরত শাইআ (আঃ) তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন, কিন্তু শয়তান পেছন থেকে তাঁর জামার কোণ ধরে রাখল, তিনি বৃক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর খণ্ডিত বৃক্ষটি একত্রিত হয়ে গেল। কিন্তু কাপড়ের কোণ বাইরে রয়ে গেল। শয়তান মানুষকে ঐ কোণাটি দেখাতে লাগল এবং বললো, শাইআ এ বৃক্ষের ভেতরে আছেন, প্রমাণ হলো তাঁর পরিধেয় বস্ত্রের একটি কোণ বাইরে রয়ে গেছে। লোকেরা করাত দিয়ে বৃক্ষটিকে দ্বি-খণ্ডিত করলো এবং হযরত শাইআকেও (আঃ) চিরে ফেলল। এরপর আল্লাহ পাক নাসীয়া এবনে আমুস নামক এক ব্যক্তিকে বণী ইসরাঈলের বাদশাহ মনোনীত করলেন। আর তাঁর পথ-প্রদর্শনের জন্যে হযরত হারুন (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে আরমিয়া এবনে হালফিয়াকে নবী বানিয়ে প্রেরণ করলেন (সে যুগে বাদশাহকে সঠিক পথ-প্রদর্শনের জন্যে একজন নবী প্রেরিত হতেন)।

এবনে এছহাক বর্ণনা করেনঃ ইনিই হলেন খিজির, যার প্রকৃত নাম হলো আরমিয়া আর খিজির হলো তাঁর উপাধি। কেননা একবার তিনি শুষ্ক ঘাসের উপর বসেছিলেন, যখন উঠলেন তখন দেখলেন ঐ স্থানটি সবুজ এবং প্রাণবন্ত হয়েছে (তাই তাঁর উপাধি হয়েছে খিজির)। আল্লাহ পাক হযরত আরমিয়াকে (আঃ) বাদশাহর হেদায়েতের জন্যে নির্দেশ প্রদান করলেন।

কিছুদিন পর বণী ইসরাঈলে অনেক বেদআত শুরু হলো, অর্থাৎ ধর্মের নামে অনেক অধর্মীয় কাজ হতে লাগল। বণী ইসরাঈল জাতির মধ্যে পাপাচার বৃদ্ধি পেল, হারাম বা নিষিদ্ধ বস্তু সমূহকে তারা হালাল মনে করলো। আল্লাহ্ পাক হযরত আরমিয়াকে (আঃ) আদেশ দিলেন, তোমার জাতি বণী ইসরাঈলের নিকট যাও, আমি তোমাকে যে আদেশ দিচ্ছি তা তাদেরকে জানিয়ে দাও এবং তাদেরকে আমার নেয়ামত সমূহের কথা স্মরণ করাও। আর ধর্মের নামে যে সব অধর্মীয় কাজ শুরু হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক কর।

আরমিয়া (আঃ) আরজ করলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমি অত্যন্ত দুর্বল, যদি তোমার তরফ থেকে শক্তি লাভ না করি, তোমার সাহায্য-ধন্য না হই, তবে আমি অত্যন্ত অসহায় হয়ে যাব। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, তুমি কি লক্ষ্য করনা? সব কিছু আমার ইচ্ছাতেই হয়, সকল অন্তর এবং সকল রসনা আমার হাতেই রয়েছে, আমি যেমন ইচ্ছা তেমনই তাদেরকে ঘুরিয়ে দেই। আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি, এ অবস্থায় কেউ তোমাকে কোন দুঃখ দিতে পারবেনা।

যাহোক, আরমিয়া (আঃ) বণী ইসরাঈলের জন্যে ভাষণ দেয়ার উদ্দেশে দন্ডায়মান হলেন, কিন্তু তখনও তিনি জানতেন না তাঁকে কি বলতে হবে। তখন আল্লাহ্ পাক তাঁর অন্তরে একটি অতি উচ্চমানের ভাষণ এলহাম করলেন। তিনি মানুষকে আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যের সওয়াব এবং নাফরমানীর আযাব সম্পর্ক বললেন। উপসংহারে আল্লাহ্ পাকের ভাষায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বললেন, "আমি আমার ইজ্জতের শপথ করছি যে, বণী ইসরাঈলের উপর এক বিপদ আপতিত করব, যে কারণে বুদ্ধিমান লোকেরাও দিশেহারা হয়ে পড়বে (শান্তি ও মুক্তির কোন পথ খুঁজে পাবেনা)। একজন অত্যন্ত জঘন্য জালেমকে তাদের উপর বিজয়ী করব, যাকে আমি ভয়-ভীতির পোশাক পরিধান করাব, অর্থাৎ সে অত্যন্ত ভয়ংকর জালেম হবে, তার অন্তর থেকে দয়া বের করে দেব, তার সঙ্গে সৈন্যবাহিনী থাকবে রাতের অন্ধকারের ন্যায়। এরপর আল্লাহ্ পাক আরমিয়াকে (আঃ) ওহী প্রেরণ করলেন, আমি বণী ইসরাঈলকে ধ্বংস করব ইয়াফেছের মাধ্যমে, ইয়াফেছ ব্যাবিলনের অধিবাসী ছিল (হয়ত সে ইয়াফেছ এবনে নূহের বংশধর হতে পারে)।

এরপর আল্লাহ্ পাক ব্যাবিলনের রাজা বখতে নসরকে পাপীষ্ঠ বণী ইসরাঈলের শাস্তির জন্যে প্রেরণ করলেন। বখতে নসর ছয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে এসেছিল, সে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ করল। সিরিয়াকে ধ্বংস করলো, বণী ইসরাঈলের উপর এমন নির্যাতন ও হত্যা শুরু করলো যে, কারো নাম-নিশানা রইল না। তার জুলুম থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত রক্ষা পেলনা, সে তার সৈন্যদেরকে আদেশ দিল যে প্রত্যেকে তার ঢাল দিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসের উপর মাটি ফেল। বায়তুল মোকাদ্দাস মাটি চাপা পড়ল, এরপর বখতে নসর আদেশ দিল, এ এলাকার সমস্ত অধিবাসীকে একত্রিত কর, তখন বখতে নসর তার গোলামীর জন্যে ৭০ হাজার কিশোরকে নির্বাচন করলো, তার মালে গণীমত (যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ) সৈন্যবাহিনীর মাঝে বিতরণের নির্দেশ দিল। আর

অশ্বারোহী সৈন্যরা বললো, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ আপনার, তাই এর সবটুকুই রাজ কোষাগারে দেয়ার নির্দেশ দিন, তবে যে বণী ইসরাঈলীদেরকে নির্বাচন করেছেন, তাদেরকে সৈন্যদের মাঝে বিতরণ করুন। বখতে নসর এ প্রস্তাব মেনে নিল। কিশোরদেরকে গোলাম হিসেবে সৈন্যদের পদস্থ কর্মকর্তাদের মাঝে বিতরণ করা হলো। প্রত্যেকের অংশে চারটি করে গোলাম এসেছিল, আর অন্যান্যদেরকে তিনটি দলে বিভক্ত করা হলো। বণী ইসরাঈলের এক তৃতীয়াংশকে সিরিয়াতেই রেখে দেয়া হলো, আর এক তৃতীয়াংশকে বন্দী করা হলো। আর এক তৃতীয়াংশকে হত্যা করা হলো।

নাসীয়া সহ (রাজা) ৭০ হাজার শিশুকে বখতে নসর ব্যাবিলন নিয়ে গেল। বণী ইসরাঈলের এটি ছিল প্রথম ধ্বংস যার ঘোষণা রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ

"এরপর এ দু'য়ের প্রথমটির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার ভীষণ যুদ্ধবাজ বন্দাদেরকে প্রেরণ করি, তারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী"।

বণী ইসরাঈলের এ ধ্বংসের কথাই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে।

বখতে নসরের স্বপ্ন ও তা'বীর

কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর বখতে নসর এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখল। কিন্তু সে স্বপ্ন তার স্মরণ নেই। দানিয়াল, হানানিয়া, আযারিয়া এবং মিশাঈল বন্দীদের মধ্যে ছিলেন, তাঁরা সকলেই নবী রসূলগণের বংশধর। বখতে নসরের নির্দেশে তাদেরকে হাযির করা হলো। সে তাদেরকে তার স্বপ্নের কথা জিজ্ঞাসা করলো। তাঁরা বললেন, আপনি আপনার স্বপ্নের কথা বর্ণনা করুন, আমরা তা'বীর বলব। বখতে নসর বললো, স্বপ্নের কথা আমার স্মরণ নেই অতএব, তোমরা স্বপ্ন এবং তার তা'বীর বর্ণনা কর, যদি তোমরা তা না কর, তবে তোমাদের বাহু থেকে হাত পৃথক করে ফেলব। এ নির্যাতন মূলক আদেশ শ্রবণ করে তাঁরা বখতে নসরের নিকট থেকে বের হয়ে আসলেন এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অনেক কান্নাকাটি করলেন। তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে বখতে নসরের প্রশ্নের জবাব জানিয়ে দিলেন। এরপর তাঁরা বাদশাহর নিকট ফিরে এলেন এবং বললেন, আপনি একটি মূর্তি দেখেছিলেন যার দু'টি পা এবং টাখনু মাটির ছিল, আর হাঁটু এবং রান ছিল তামার, আর পেট ছিল রূপার এবং বক্ষ ছিল স্বর্ণের, মাথা ও ঘাড় ছিল লোহার। বখতে নসর বললো, তোমরা ঠিকই দেখেছ। তারা একথাও বলেছেন, আপনি এসব দেখছিলেন এবং বিস্মিত হচ্ছিলেন, ঠিক এমন সময় আল্লাহ পাক আসমান থেকে একটি পাথর নাজিল করলেন, সে পাথরটি মূর্তিটিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। এ দৃশ্যটি আপনি ভুলে গিয়েছেন। বখতে নসর বললো, তোমরা ঠিক বলেছ, এখন এর তা'বীর বর্ণনা কর। তারা বললেন, আপনাকে কয়েকজন রাজার রাজত্ব দেখানো হয়েছে, কারো ক্ষমতা অত্যন্ত দুর্বল, কারো তার চেয়ে একটু মজবুত, কারো অতি সুন্দর, কারো অতি সুদৃঢ়। মাটির যে

অংশটি দেখেছেন তা হলো দুর্বল ক্ষমতার নিদর্শন, এরপর তামার অংশ যেটুকু দেখেছেন, তা তার চেয়ে মজবুত, তবে রূপার যে অংশ দেখেছেন তা তামার চেয়ে সুন্দর, তবে সবচেয়ে সুন্দর স্বর্ণের অংশ, সবার উপরে দেখেছেন লোহা তা হলো আপনার ক্ষমতা যা অন্যান্য হুকুমতের চেয়ে মজুবত এবং সুদৃঢ়। এরপর যে পাথরটি আসমান থেকে অবতীর্ণ হতে দেখেছেন, তা হলো আল্লাহ পাকের গায়বী হুকুম যা আল্লাহর তরফ থেকে আসবে এবং ঐ মূর্তিটিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে এবং ক্ষমতা শুধু আল্লাহ পাকেরই থাকবে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

"ক্ষমতা তো শুধু আল্লাহ পাকেরই"।

বণী ইসরাঈলের লোকেরা বহুদিন ধরে ব্যাবিলনবাসীর গোলাম হিসেবে তাদের সেবায় নিয়োজিত ছিল। একদিন ব্যাবিলনবাসী বখতে নসরকে বলল, আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আপনি আমাদেরকে গোলাম দান করেছেন, এরা আমাদের সঙ্গে অনেক দিন ধরে আছে, এদের কারণে আমাদের পারিবারিক এবং সামাজিক শৃংখলা বিনষ্ট হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। কেননা আমাদের স্ত্রীরা এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এদেরকে এখান থেকে বের করে দিন অথবা হত্যা করুন।

বখতে নসর বলল, বিষয়টি তোমাদের ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা করলে তোমরা তাদেরকে হত্যাও করতে পার, ইচ্ছা করলে বের করে দিতে পার।

যখন লোকেরা তাদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা করলো তখন তারা আল্লাহ পাকের দরবারে ক্রন্দণ করতে থাকল। আর একথা বলে আরজী পেশ করলো, হে আল্লাহ! অন্যদের গুনাহর কারণে আমাদের উপর এ বিপদ, আমাদের প্রতি দয়া করুন। আল্লাহ পাক ওয়াদা করলেন, তোমাদেরকে জীবিত রাখব।

এরই মধ্যে কিছু লোককে মেরে ফেলা হলো। আর কিছু লোক জীবিত রইল, তাদেরই মধ্যে ছিলেন দানিয়াল, হানানিয়াহ, আযারিয়া এবং মিশাইল।

বখতে নসরের ধ্বংস

অবশেষে আল্লাহ পাক বখতে নসরকে ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন, সে নিজেই তার ধ্বংসের কারণ হলো। যে বণী ইসরাঈল তখনও তার নিকট ছিল, তাদেরকে বখতে নসর একদিন বললো, তোমরা বল আমি যে বাড়ীটি ধ্বংস করেছি তা কেমন ছিল আর যে লোকদেরকে হত্যা করেছি তারা কে ছিল? বণী ইসরাঈল জবাব দিল, সে বাড়ীটি ছিল আল্লাহর ঘর, আর যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, তারা ছিল আল্লাহর ঘরের আবাদকারী। তারা নবী রসূলগণের বংশধর ছিল, কিন্তু যখন তারা অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয় তখন আল্লাহ পাক তাদের অন্যায়ের শাস্তি স্বরূপ আপনাকে তাদের উপর বিজয়ী করেন, তাদের প্রতিপালক যিনি বিশ্ব প্রতিপালক, তিনি তাদেরকে সম্মানিত করেছিলেন, কিন্তু তারা এমন কাজ করেছে যা ছিল অত্যন্ত মন্দ, তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করেছেন, অন্যদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করেছেন। কিন্তু যে বিজয়ী শক্তি সে মনে করেছে আমি

বণী ইসরাঈলের সাথে যা করেছি তা আমার নিজের শক্তি বলেই করেছি। বখতে নসর বললো, আচ্ছা তাহলে আমাকে এমন কোন পন্থা নির্দেশ কর যে আমি আসমানে আরোহন করি এবং আসমানে যে-ই আছে তাকে হত্যা করি এবং আসমানে আমার ক্ষমতা ও রাজত্ব কায়েম করি। কেননা পৃথিবীর রাজত্ব থেকে আমি অবসর পেয়েছি। বণী ইসরাঈল বললো, কোন সৃষ্টি এ কাজ করতে পারেনা, কারো মধ্যে এ শক্তি নেই। বখতে নসর বললো, তোমাদেরকে এ কাজ করতেই হবে (আসমানে আরোহনের এবং আসমানে বিজয়ের তদ্বির বলতেই হবে) নতুবা আমি তোমাদের সকলকে হত্যা করবো, একথা শ্রবণ করে তারা সকলে আল্লাহ পাকের দরবারে কাঁদতে লাগলো এবং সকলে আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করতে লাগলো। ঐ সময় আল্লাহ পাক তাদেরকে সাহায্য করলেন। একটি মশা প্রেরণ করলেন, যা বখতে নসরের নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে তার মগজে পৌঁছে গেল এবং মগজে দংশন করতে লাগলো। বখতে নসর তখন চরম অস্থির হয়ে পড়লো, মাথায় আঘাত না দেয়া পর্যন্ত সে শান্তি পেতনা। এ অবস্থায় তার মৃত্যুর পর লোকেরা তার মাথা চিরে দেখলো যে মগজের মধ্যে একটি মশা দংশনরত রয়েছে। এভাবে আল্লাহ পাক বণী ইসরাঈলকে বখতে নসরের জুলুম থেকে নাজাত দিলেন। তারা সিরিয়া প্রত্যাবর্তন করলো, সেখানে নতুন করে ইমারত সমূহ নির্মাণ করলো। ইতিপূর্বে তাদের যে অবস্থা ছিল তার চেয়ে আরও ভাল হলো।

তৌরাত পাওয়া গেল

বণী ইসরাঈল যখন সিরিয়া প্রত্যাবর্তন করলো তখন তাদের নিকট আল্লাহর কিতাব তৌরাত ছিলনা। জালেম বখতে নসর জ্বালিয়ে দিয়েছিল তৌরাত। হযরত ওজায়ের (আঃ) ব্যাবিলনের কয়েদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনিও সিরিয়া ফিরে এসেছিলেন। তিনি সব মানুষ থেকে পৃথক হয়ে তৌরাতের জন্যে ক্রন্দন করতেন। একদিন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি এত কাঁদেন কেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাবের জন্যে কাঁদি, আল্লাহ পাকের যে বিধান আমাদের নিকট ছিল তা জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ঐ বিধান ব্যতীত আমাদের দুনিয়ার কাজও হয়না আর আখেরাতের কাজতো হতেই পারেনা। সে ব্যক্তি বললো, যদি আপনি তৌরাত পুনরায় ফিরে পেতে চান তবে রোযাব্রত পালন করুন, নিজের অন্তরকে পবিত্র করুন এবং পোশাকও পবিত্র রাখুন, আগামীকাল এখানেই আপনার সাথে আমার মোলাকাত হবে। হযরত ওজায়ের (আঃ) রোযাও রাখলেন, শরীর পবিত্র রাখলেন, পবিত্র পোশাক পরিধান করলেন এবং ঐ নিদৃষ্ট স্থানে অপেক্ষা করতে থাকলেন। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সে ব্যক্তি পানিতে পরিপূর্ণ একটি পাত্র নিয়ে আসলেন। ঐ ব্যক্তি ছিলেন একজন ফেরেশতা, আল্লাহ পাক তাকে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত ওজায়ের (আঃ)-কে তিনি পানি পান করালেন। পানি পান করার সঙ্গে সঙ্গে তৌরাত তাঁর অন্তরে স্থান নিল।

যখন তিনি বণী ইসরাঈলের নিকট ফিরে এসে তৌরাত পেশ করলেন তখন তাদের অন্তরে তাঁর জন্যে এমন মহব্বত হলো যা আর কারো জন্যে হয়নি। তিনি সকলের অতি

আপনজন এবং প্রিয়জনে পরিণত হলেন।

এর কিছুদিন পর আল্লাহ্ পাক তাঁকে ডাক দিয়ে নিয়ে যান (তাঁর এ জীবনের অবসান ঘটে)। এদিকে বণী ইসরাঈল নানা অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্ পাক তাদের শাস্তির ব্যবস্থাও করেন এবং তাদের হেদায়েতের জন্যে নবীগণকে প্রেরণ করেন। বণী ইসরাঈলরা কোন নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করতো, আর কোন কোন নবীকে তারা হত্যাও করেছে। সবশেষে আল্লাহ্ পাক তাদের নিকট প্রেরণ করেন হযরত জাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে। তারা সকলেই হযরত দাউদ (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, আর কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে তাঁকে শহীদ করা হয়।

হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে শহীদ করা হয়

বণী ইসরাঈলের দুবৃত্তরা যখন আল্লাহর নবী ইয়াহইয়া (আঃ)-কে শহীদ করলো এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে শহীদ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো, আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে আসমানে তুলে নিলেন, তখন ব্যাবিলনের খেরদাউস নামক রাজা বণী ইসরাঈলের উপর হামলা করে, সিরিয়ায় প্রবেশ করে বণী ইসরাঈলকে সম্পূর্ণ কাবু করে ফেলে। তখন সে তার ইয়াবুরজাযান নামক সেনাপতিকে বললো, আমি আমার মা'বুদের নামে শপথ করেছি, আমি যখন বায়তুল মোকাদ্দাসের উপর বিজয় লাভ করব, তখন আমি তাদেরকে এত বেশী হত্যা করব যে তাদের রক্ত প্রবাহিত হয়ে আমার সৈন্যবাহিনীর মধ্যস্থলে এসে পৌছবে। কিন্তু যদি হত্যা করার জন্যে কোন লোক না থাকে তবে তা মজবুরীর ব্যাপার, তুমি আমার এ শপথকে পূর্ণ কর। ইয়াবুরজাযান এ আদেশ পালনের জন্যে দন্ডায়মান হলো এবং বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ করে কোরবাণীর স্থলে পৌছে গেল, সেখানে গিয়ে সে দেখল যে মাটির ভিতর থেকে রক্ত বের হয়ে আসছে। লোকদেরকে সে জিজ্ঞাসা করলো, এই রক্ত কীভাবে আসছে? বণী ইসরাঈলীরা বললো, এখানে একটি কোরবাণীর জন্তু জবেহ করেছি। কিন্তু কোরবাণী কবুল হয়নি যে কারণে এভাবে রক্ত বের হয়ে আসছে। বিগত ৮শত বছর ধরে আমরা কোরবাণী করি, তার সবই কবুল হয়েছে, শুধু এটি কবুল হয়নি। ইয়াবুরজাযান বললো, তোমরা আমাকে সত্য কথা বলোনি। বণী ইসরাঈলীরা বললো, যদি পূর্বের ন্যায় সময় হতো তবে এ কোরবাণী কবুল হতো, তবে বর্তমানে তো আমাদের ক্ষমতা নেই এবং ওহী এবং নবুওয়্যতও আমাদের নিকট রয়নি, এজন্যে আমাদের কোরবাণীও কবুল হয়নি। এরপর ঐ স্থানেই ইয়াবুরজাযান বণী ইসরাঈলের সর্দারদের সাতশত সত্তর জোড়া লোককে জবাই করে, কিন্তু তবুও রক্ত বন্ধ হয়নি, ইয়াবুরজাযান এরপর বণী ইসরাঈলের আরো সাতশ' যুবককে জবাই করে, কিন্তু তবুও রক্ত বন্ধ হয়নি। তখন ইয়াবুরজাযান বণী ইসরাঈলকে বললো, হে বদ নসীব লোকেরা! তোমরা আমাকে এখনও সত্য কথা বল এবং স্বীয় প্রতিপালকের উপর সবর রাখ, সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তোমরা এ দেশের ক্ষমতা পরিচালনা করেছ, তোমরা যা ইচ্ছা তা-ই করতে, আমি তোমাদের কোন পুরুষ বা নারীকে ছাড়ব না, সকলকে হত্যা করব তবে

সেই কঠিন সময় আসার পূর্বে তোমরা আমাকে সত্য কথা জানিয়ে দাও। বণী ইসরাঈলীরা যখন দেখল হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে, তারা মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছে তখন তারা সত্য কথা বললো যে, প্রকৃত অবস্থা এই যে রক্ত প্রবাহ আপনি দেখছেন তা একজন পয়গম্বরের রক্ত, তিনি আমাদেরকে মন্দ কাজের ব্যাপারে নিষেধ করতেন আর আল্লাহ্ পাকের আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করতেন, যদি আমরা তাঁর কথা মেনে চলতাম তবে তা-ই হতো আমাদের জন্যে সরল-সঠিক পন্থা, তিনি আমাদেরকে তোমাদের সম্পর্কেও অবগত করেছেন, কিন্তু আমরা তাঁকে সত্যবাদী মনে করিনি, তাঁকে সত্যবাদী মনে করার স্থলে হত্যা করেছি, এ রক্ত তাঁরই। ইয়াবুরজাযান বললো, তাঁর নাম কি ছিল? তারা বললো ইয়াহইয়া এবনে জাকারিয়া। ইয়াবুরজাযান বললো, এবার তোমরা সত্য কথা বলেছ, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের থেকে এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিচ্ছেন। এরপর ইয়াবুরজাযান সেজদায় পড়ে গেল এবং যারা তার চারিপার্শ্বে ছিল তাদেরকে আদেশ দিল যে রাজা খেরদাউসের যে সব সৈন্য এখানে আছে, সকলকে বের করে দাও এবং শহরের ফটক বন্ধ করে দাও। যখন সে বণী ইসরাঈলের সঙ্গে একা রয়ে গেল তখন ইয়াবুরজাযান বললো, হে ইয়াহইয়া এবনে জাকারিয়া! আপনার হত্যাকান্ডে কারণেই আপনার জাতি এ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে এবং এ পর্যন্ত যত লোক মারা হয়েছে, তা আমার এবং আপনার প্রতিপালক জানেন, এখন আপনি আপনার প্রতিপালকের আদেশক্রমে থেমে যান, নতুবা আপনার জাতির কোন ব্যক্তিকে আমি জীবিত ছাড়ব না। তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের আদেশক্রমে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। এরপর ইয়াবুরজাযান বণী ইসরাঈলকে হত্যার আদেশ বাতিল করলো এবং বললো, বণী ইসরাঈল যার প্রতি ঈমান এনেছে, আমিও তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি, আমার একীন হয়েছে যে তিনি ব্যতীত কোন প্রতিপালক নেই, এরপর সে বণী ইসরাঈলকে বললো, রাজা খেরদাউস আমাকে আদেশ দিয়েছে যে আমি তোমাদেরকে এত হত্যা করি যেন তোমাদের রক্ত প্রবাহিত হয়ে তার সৈন্যবাহিনীর মধ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আমি রাজার আদশের বরখেলাফ করার শক্তি রাখিনা। বণী ইসরাঈল বললো, রাজা আপনাকে যে আদেশ দিয়েছেন তা পালন করুন। ইয়াবুরজাযান একটি বিরাট আকারের গর্ত তৈরী করার আদেশ দিল, যখন গর্ত তৈরী হয়ে গেল তখন সে আদেশ দিল, বণী ইসরাঈলের যত অশ্ব, গর্দভ, খচ্চর, উষ্ট্র, গাভী, মহিষ, বকরী ছিল সবগুলোকে জবেহ করে ঐ গর্তে ফেলে দেয়া হোক, এ আদেশ তামিল করা হলো। এমনকি, ঐ জন্তুগুলোর রক্ত সৈন্যবাহিনীর মধ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছে গেল। আর ঐ জন্তুগুলোর উপর নিহত লোকগুলোর লাশ ফেলে দিল যাদেরকে সে ইতিপূর্বে হত্যা করেছে। খেরদাউস বুঝলো যে গর্তের ভেতরে শুধু মানুষের লাশই লাশ, এজন্যে খেরদাউস হত্যাযজ্ঞ বন্ধের আদেশ দিল এবং ব্যাবিলন প্রত্যাবর্তন করলো। এ দুর্ঘটনায় বণী ইসরাঈল ধ্বংস হয়ে যায় বা সম্পূর্ণ ধ্বংস হবার উপক্রম হয়। মূলতঃ এটিই হলো দ্বিতীয় দুর্ঘটনা যার সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ

"তোমরা দু'বার পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে"।

প্রথম ঘটনা বখতে নসর এবং তার সৈন্যদের, আর দ্বিতীয় ঘটনা খেরদাউস এবং তার সৈন্যদের। দ্বিতীয় ঘটনা প্রথম ঘটনা থেকেও মারাত্মক ছিল। এরপর বণী ইসরাঈল জাতি আর কোন দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি, সিরিয়া এবং তার চতুর্দিকের ক্ষমতা রুমী বা গ্রীকদের হাতে চলে যায়, আর যে বণী ইসরাঈলীরা বেঁচে গিয়েছিল তারা বায়তুল মোকাদ্দাসের চারিপার্শ্বে আবার একটি ছোট্ট রাষ্ট্র কায়েম করে। যথানিয়মে প্রকৃত অর্থে কোন রাষ্ট্র তা হয়নি, তবুও আল্লাহ পাকের অনেক নেয়ামত তারা লাভ করেছে এবং আরাম-আয়েশে জীবন কেটেছে কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা নানা অপরাধে লিপ্ত হয়। যার পরিণামে আল্লাহ পাক তাদের উপর তায়তিশ এবনে আছিয়ানাশ রুমীকে বসিয়ে দিলেন। সে তাদের ঘর-বাড়ীগুলো ধ্বংস করে দিল এবং বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে তাদেরকে বহিস্কার করলো এবং ক্ষমতা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল। আর এমন অপমানজনক শাস্তি দেয়, যাতে ভবিষ্যতে যে সম্প্রদায়ের সঙ্গেই তারা থাকে, যেন অপমানিত অবস্থায় থাকে এবং জিযিয়া আদায় করতে বাধ্য হয়। বায়তুল মোকাদ্দাস এভাবে তখন থেকে বিরাণ পড়েছিল এমনকি, শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগ আসে, তাঁর আদেশে মুসলমানগণ বায়তুল মোকাদ্দাস আবাদ করলেন।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ পাক প্রথমবার বণী ইসরাঈলের উপর জালুতকে আধিপত্য দান করেন। জালুত তাদেরকে বন্দী করে এবং তাদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করে দেয়। আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ رددنا لكم الكرة عليهم ...

এরপর আমি তাদের উপর তোমাদের পালা পাল্টে দেই, অর্থাৎ হযরত দাউদ (আঃ)-এর জমানায় আল্লাহ পাক বণী ইসরাঈলের পালা পাল্টে দেন।

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ .....

এরপর যখন দ্বিতীয় বার ধ্বংসের নির্ধারিত সময় আসে তখন আল্লাহ পাক বণী ইসরাঈলের উপর বখতে নসরকে বিজয়ী করেন; বখতে নসর তাদেরকে বন্দী এবং তাদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করে।

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ .....

"আশা করা যায়, হয়তো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন"।

তাই আল্লাহ পাক দ্বিতীয় বার তাদের প্রতি দয়া করেছেন। কিন্তু বণী ইসরাঈল এরপরও বিভিন্ন যুগে চরম অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তাদের শাস্তি হতে থাকে। অবশেষে খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর জমানায় বায়তুল মোকাদ্দাস সহ সমগ্র এলাকা মুসলমানদের করতলগত হয়।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) উল্লেখ করেছেনঃ বণী ইসরাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি স্বপ্নে

দেখে যে, বায়তুল মোকাদ্দাস ধ্বংস হবে একটি এতীম ছেলের হাতে। ব্যাবিলনের অধিবাসী এ লোকটি একজন বিধবার পুত্র হবে। তার নাম হবে বখতে নসর, সে যুগে বণী ইসরাঈলীরা সত্য কথা বলতো, এজন্যে তাদের স্বপ্নও সত্য হতো। এ ব্যক্তি স্বপ্ন দেখার পর বখতে নসরের অনুসন্ধানে বের হয়ে পড়ল এবং তার মায়ের নিকট পৌঁছে গেল। বখতে নসর তখন জঙ্গল থেকে জ্বালানী সংগ্রহ করতো। কিছুক্ষণ পরই ঐ ব্যক্তি দেখল, জ্বালানীর বোঝা মাথায় নিয়ে বখতে নসর এসেছে। সে মাথার বোঝা রেখে বসে গেল। ঐ ব্যক্তি বখতে নসরের সঙ্গে কিছু কথা বললো এবং তিনটি দেরহাম তাকে দিয়ে বললো, কিছু খাবার নিয়ে আস, বখতে নসর বাজার থেকে এক দেরহামের গোশ্ত, এক দেরহামের রুটি এবং এক দেরহামের মদ ক্রয় করে নিয়ে আসল। এরপর সকলে মিলে ঐ খাবার গ্রহণ করলো এবং মদ্যপান করলো। পরপর এভাবে আরো দু'দিন সে বখতে নসরকে তিন দেরহাম করে দিল এবং এক সঙ্গে পানাহার করলো। এরপর ঐ ব্যক্তি বখতে নসরকে বললো, আমি একটি জিনিস তোমার কাছে চাই, তুমি যখন দেশের রাজা হবে তখন আমাকে জান-মালের নিরাপত্তা দেবে. আর তা এখনই লিখে দেবে যাতে তোমার রাজত্বের যুগে আমার কাজে লাগে। বখতে নসর বললো, তুমি কি আমার সঙ্গে বিদ্রুপ করছো? ঐ ব্যক্তি বললোঃ না, আমি তোমার সাথে আদৌ বিদ্রুপ করছিনা তবে তুমি যদি আমাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পত্র লিখে দাও, তাতে তোমার কোন ক্ষতি তো নেই। আর এভাবে তুমি আমার প্রতি এহসান করলে। অধিক বাক্য ব্যয় না করে বখতে নসর তাকে নিরাপত্তা নিশ্চয়তার একটি পত্র লিখে দিল।

ঐ ব্যক্তি বললো, যখন তোমার চারিপার্শ্বে অনেক লোক সমবেত থাকবে, তখন তোমার কাছে পৌঁছব কি করে? বখতে নসর বলল, কোন একটি বাঁশের মাথায় এ লেখাটি বেঁধে বাঁশটি উঁচু করে ধরবে, আমি চিনব।

ইমাম কাতাদা বলেছেনঃ বণী ইসরাঈলের বাদশাহ হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে অত্যন্ত সম্মান করতো। সে তাঁকে নিজের অতি নিকটস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে রেখেছিল। ঘটনাচক্রে বাদশাহ তার স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর কন্যার, আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, তার ভাগ্নীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ঐ কন্যার সঙ্গে বিবাহের ব্যাপারে সে হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর নিকট মাছআলা জিজ্ঞাসা করে। হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) এর অনুমতি দেননি (স্ত্রীর পূর্ব-স্বামীর কন্যা অথবা ভাগ্নীর সাথে ইহুদীদের শরীয়তে বিবাহ বৈধ ছিলনা)। হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর ফতোয়ার কারণে মেয়েটির মায়ের মনে তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতা সৃষ্টি হলো। একদিন বাদশাহর মদ্যপানের আসরে ঐ মেয়েটিকে লাল বর্ণের মূল্যবান পোষাক পরিয়ে সাজিয়ে বাদশাহর নিকট প্রেরণ করা হলো এবং মেয়েকে তার মাতা এ নির্দেশ দিল যে, তুমি বাদশাহকে মদ্যপান করাবে। যখন দেখবে যে বাদশাহ তোমার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে, তখন তুমি একটি শর্ত পেশ করবে এবং বলবে যে আমার একটি কথা আপনাকে অবশ্যই রাখতে হবে। যখন বাদশাহ তোমার কথা রক্ষার অঙ্গীকার করবে তখন তুমি বলবে, আমি ইয়াহইয়া এবনে জাকারিয়া (আঃ)-এর মাথা একটি তশতরীতে দেখতে চাই। এরপর বাদশাহ যা নির্দেশ দেয় তুমি তা পালন করবে। মেয়েটি

তার মায়ের নির্দেশ মোতাবেক সব কাজ করলো। কিন্তু যখন সে হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে হত্যা করার কথা বললো, তখন বাদশাহ জবাব দিল, হতভাগিনী অন্য কোন দাবী পেশ কর, এটি নয়। কিন্তু মেয়েটি তার ঐ জঘন্য দাবীর ব্যাপারে ছিল আপোষহীন। অবশেষে বাদশাহ হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে হত্যা করে তাঁর মস্তক মোবারক সম্মুখে এনে দেয়, কিন্তু তখনও ঐ মাথা থেকে একটি আওয়াজ আসছিলঃ "এ মেয়েটি তোমার জন্যে হালাল নয়"। যখন সকাল হলো তখন ঐ মস্তক মোবারক থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। বাদশাহ তার উপর মাটি ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেয়, কিন্তু রক্তের প্রবাহ বন্ধ হলোনা। এমনকি, শহরের বাইরের দেয়াল পর্যন্ত মাথা মোবারক নিয়ে মাটি চাপা দেয়া হলো কিন্তু রক্তের প্রবাহ কোনভাবেই বন্ধ হলোনা।

আর ঠিক ঐ সময়েই ব্যাবিলনের বাদশাহ সাহাবীন সেনাপতি বখতে নসরের নেতৃত্বে বণী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করল। বখতে নসরের সৈন্যরা বায়তুল মোকাদ্দাস আক্রমণ করলো, কিন্তু এর অধিবাসীরা দুর্গের ফটক বন্ধ করে দিল। বখতে নসর তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলল, এই ঘেরাও সুদীর্ঘ হলো। অবশেষে বখতে নসর ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করলো, ঠিক সে সময় বণী ইসরাঈলের একজন বৃদ্ধা বের হয়ে আসল এবং বখতে নসরকে বললো, আপনি শহর জয় না করেই প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছ করেছেন? বখতে নসর বললো, হ্যাঁ। কেননা এখানে আমার অবস্থান সুদীর্ঘ হয়েছে এবং আমার সৈন্যবাহিনীর রসদ ফুরিয়ে গেছে। তখন বৃদ্ধা বললো, আমি আপনার বিজয়ের জন্যে একটি কৌশল বলতে পারি, কিন্তু শর্ত হলো আমার একটি কথা আপনাকে মানতে হবে, তা হলো যাকে আমি হত্যা করতে বলি তাকে হত্যা করবেন, আর যাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকতে বলি তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবেন। বখতে নসর বললো, আচ্ছা তাই হবে। বৃদ্ধা বললো, আগামীকাল সকালে আপনি সৈন্যবাহিনীকে চার ভাগে ভাগ করবেন এবং দুর্গের চার কোণে চার ভাগকে নিযুক্ত করবেন। এরপর সকলে সমবেত ভাবে আসমানের দিকে হাত তুলে বলবেন, "হে পরওয়ারদেগার! ইয়াহইয়া এবনে জাকারিয়ার খুনের বদলে আমরা তোমার সমীপে বিজয় কামনা করি"। আমি আশা করি এ দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের দেয়ালগুলো ভেঙ্গে পড়বে। বখতে নসর ঐ বৃদ্ধার নির্দেশ মোতাবেক তাই করেছিল এবং আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করার পর সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের দেয়ালগুলো ভেঙ্গে পড়েছিল। সৈন্যবাহিনী চারদিক থেকে শহরে প্রবেশ করেছিল। বৃদ্ধা বখতে নসরকে বলেছিল, এখন হত্যা করা থেকে বিরত থাক। এরপর বখতে নসরকে নিয়ে হযরত ইয়াইয়া (আঃ)-এর হত্যার স্থলে তারা পৌঁছল (সেখানে তখনও হযরত ইয়াইয়া (আঃ)-এর মাথা মোবারক থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল)। তখন বৃদ্ধা বললো, এখন তুমি হত্যাকাণ্ড শুরু কর এবং হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর রক্ত প্রবাহ বন্ধ হওয়া পর্যন্ত হত্যা কর। বখতে নসর সেখানে সত্তর হাজার বণী ইসরাঈলীকে হত্যা করল। অবশেষে হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর মাথা মোবারকের রক্ত প্রবাহ বন্ধ হলো।

যখন কোন নবীকে হত্যা করা হয় তখন তাঁর হত্যাকারীদেরকে এবং যারা এ কু-কর্মে রাজী ছিল তাদেরকে যতক্ষণ হত্যা না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক রাজী হন না।

আর ঐ সময়েই সে ব্যক্তি হাযির হলো যাকে বখতে নসর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পত্র লিখে দিয়েছিল। বখতে নসর তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে নিরাপত্তা দিল, বায়তুল মোকাদ্দাস এবং তার চারিপার্শ্বের এলাকাকে ধ্বংস করলো। বায়তুল মোকাদ্দাসের ধ্বংসের ব্যাপারে রুমীরা বখতে নসরকে সাহায্য করেছে কেননা, বণী ইসরাঈলীরা হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে হত্যা করেছিল, আর ইয়াহইয়া (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

বখতে নসর তার সাথে বণী ইসরাঈলের কয়েকজন সর্দারকে বন্দী করে নিয়ে যায়, তন্মধ্যে দানিয়াল সহ অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের বংশধর ছিলেন। সে রাজা জালুতের মাথাও সঙ্গে নিয়ে যায়।

আর এভাবে আলোচ্য আয়াতের একথা বাস্তবায়তি হয়ঃ

وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا

"তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্যে"।[১]

এ বিস্তারিত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করেছেন ইমাম রাজী (রঃ) তফসীরে কবীরে, আল্লামা আলুসী (রঃ) তফসীরে রুহুল মাআনীতে এবং আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রাঃ) তাঁর রচিত তফসীর মাআরেফুল কোরআনে।[২]

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াত সমূহের মর্মকথা হলো, বণী ইসরাঈল যখন আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞ, অবাধ্য হয়েছে তখন আল্লাহ পাক তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ পাকের মর্জিতেই বণী ইসরাঈলের দুশমনরা তাদেরকে আক্রমণ করেছে, তাদেরকে পরাজিত করেছ, তাদের বাড়ী-ঘর ধ্বংস করেছে এবং তাদেরকে গোলাম-বাঁদীতে পরিণত করেছে। আর এসব কিছু হয়েছে আল্লাহ পাকের নাফরমানীর শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ। বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআনের এ আয়াত সমূহে সতর্কবাণী রয়েছে মুসলিম জাতি সহ পৃথিবীর অধিবাসী প্রত্যেকটি ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতির উদ্দেশে। যে বা যারাই এ পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে, ফেৎনা-ফ্যাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং তাদের পাপাচার দিয়ে এ সুন্দর বসুন্ধরাকে অসুন্দর করে তুলবে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে। যে যত বড় ক্ষমতাবান বা আধিপত্যের অধিকারীই হোক না কেন, কেউ পৃথিবীর মালিক হয়না, পৃথিবীর মালিক একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনই, আর কেউ নয়। যারাই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের নাফরমানী করবে, তারাই শাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। বণী ইসরাঈল জাতির উত্থান-পতনের যে ইতিহাস এখানে বর্ণিত হয়েছে তা একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পবিত্র কোরআন বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনের

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২০-৩৭
২। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-১৫৫-১৫৮
তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৭-২০
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৯৮-৩০০

লক্ষ্যে আলোচ্য আয়াতে এ সত্যই ঘোষণা করেছে। আর এ সত্যের প্রমাণ শুধু বণী ইসরাঈল জাতির জীবনেই নয়; বরং পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ইতিহাসেও এমন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়, স্বয়ং মুসলিম জাতির বিগত চোদ্দশ' বছরের ইতিহাসেও পবিত্র কোরআনে ঘোষিত এ সত্যের প্রমাণ মেলে। মদীনা তৈয়্যেবা থেকে মুসলিম জাতির যে অভ্যুত্থান শুরু হয়, তার নিদর্শন শুধু আরব জাহানই নয়; বরং সুদূর আলজেরিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত, অন্যদিকে হেজায থেকে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা বিস্মৃত হওয়ার কারণে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ থেকে বিরত থাকার কারণেই মুসলিম জাতির বর্তমান দুর্গতি। শুধু বণী ইসরাঈল বা মুসলিম জাতির কথাই বা কেন বলবো, এ যুগের পরাশক্তি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মাধ্যমেও পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণার বাস্তবায়নই হয়েছে। অতএব, পবিত্র কোরআনের আহ্বান হলো বিশ্ববাসী! সতর্ক হও, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তাঁর অবাধ্য ও নাফরমান হয়োনা। অবশেষে প্রত্যেককে প্রত্যাবর্তন করতে হবে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে, জবাবদেহী করতে হবে জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জন্যে।

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا
جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ۝٨ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ
هِىَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ
لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ۝٩ وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا
لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝١٠

তরজমা

(৮) হয়তো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর, তবে আমিও তাই করব। আমি দোযখকে কাফেরদের জন্যে কারাগার করেছি।

(৯) এই কোরআন সরল পথই প্রদর্শন করে এবং যারা নেক আমল করে– সে সব মোমেনদেরকে মহা পুরস্কারের সুসংবাদ দেয়।

(১০) (আর একথাও বলে যে) যারা আখেরাতে বিশ্বাস করেনা তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে বণী ইসরাঈলের দু' দু'বার অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হওয়ার এবং পৃথিবীতে উৎপাত ও অশান্তি সৃষ্টি করার যে ভবিষ্যদ্বাণী তৌরাতে রয়েছে তার উল্লেখ রয়েছে এবং সে ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে যে প্রতিফলিত হয়েছে তার বিবরণও স্থান পেয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ

হে বণী ইসরাঈল জাতি! তোমাদের প্রতিপালক হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া করবেন অর্থাৎ যদি তোমরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ কর এবং তাঁর মহান আদর্শের আলোকে আত্মসংশোধনে ব্রতী হও, তবে আশা করা যায় যে আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।

প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এ আয়াত সমূহে বণী ইসরাঈল জাতিকে তাদের অতীত ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে এবং একথা ঘোষণা করা হয়েছেঃ হে বণী ইসরাঈল জাতি! তোমাদের সকল অন্যায়-অনাচার, যাবতীয় পাপাচার, সকল দৌরাত্ম এবং ঔদ্ধত্ব এবং সর্ব প্রকার অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও তোমরা এখনও আল্লাহ পাকের দানে ধন্য হতে পার। তোমাদের জন্যে বর্তমানে একটি সুবর্ণ সুযোগের দ্বার উন্মোচিত। আল্লাহ পাকের রহমতের প্রতীক শান্তি দূত রহমতুল্লিল আলামীন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়েছে। আল্লাহর রহমতের বারিধারা বর্ষিত হয়েছে, তাঁর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর অনুসারী হয়ে নিজেদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করতে পার, লাভ করতে পার নব জীবন, সম্মান, সমৃদ্ধি, শান্তি এবং কল্যাণময় জীবন। এর জন্যে একটি মাত্র শর্ত, তাহলো সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি ঈমান এবং তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ।

وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا

পক্ষান্তরে, যদি তোমরা অতীতের ন্যায় বর্তমানেও সেই অন্যায়-অনাচার এবং দৌরাত্ম অব্যাহত রাখ, আল্লাহ পাকের নাফরমানী এবং অবাধ্যতা বর্জন না কর, উন্নত জীবন লাভের এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার না কর, তথা সর্বশেষ নবীর প্রতি ঈমান না আন, তবে আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি তাঁর শাস্তির পুনরাবৃত্তি করবেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আহলে কেতাবদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম, আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী এবং কা'বে আহবার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেন,

তখন তাঁদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। আল্লাহ্ পাকের বিশেষ রহমত লাভে তাঁরা ধন্য হন। কোরআনে পাকে আল্লাহ্ পাক তাঁদের প্রশংসা করেছেন।[১]

وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ (সূরা আ'রাফ)

(আর রসূলের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তারা যখন তা শ্রবণ করে, তখন তারা যে সত্যের সন্ধান পায় তার জন্যে তুমি তাদের চক্ষু অশ্রু বিগলিত দেখতে পাবে। তারা (মোনাজাত করে) বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদেরকেও সে সব লোকদের তালিকাভুক্ত করুন যারা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর কোরআনে করীম সত্য হওয়া স্বীকার করেন।)

আলোচ্য আয়াতে এ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, হে বণী ইসরাঈল! যদি তোমরা বিগত দু'বার যেভাবে দৌরাত্ম করেছিলে সেভাবে তৃতীয় বারও তাই কর তবে আল্লাহ্ পাক তোমাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। ইতিহাস স্বাক্ষী! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে, তৌরাতে তাঁর যে সব গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে তা গোপন রাখে এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তাঁকে শহীদ করার অপচেষ্টায় মেতে ওঠে। তাঁর উপর যাদু-টোনা করে, তাঁর খাবারে বিষ প্রয়োগ করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আল্লাহ্ পাক তাই তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। বণী কোরায়যা গোত্রের লোকদেরকে হত্যা করা হয়, বণী নযীরকে দেশ থেকে বহিস্কার করা হয় এবং অন্যদের প্রতি জিযিয়া (অমুসলিম কর) আরোপিত হয়। এভাবে আল্লাহ্ পাকের এ ঘোষণা

وَاِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا

(যদি তোমরা অন্যায়-অনাচারের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমিও শাস্তির পুনরাবৃত্তি করবো।) বাস্তবায়িত হয়েছে। আর দুনিয়ার এ শাস্তি-ই শেষ নয়; বরং আখেরাতে হবে অনেক কঠিনতর শাস্তি। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا

"আর আমি কাফেরদের জন্যে দোযখকে কারাগার করেছি"।

যেখান থেকে তারা কোন দিন রেহাই পাবেনা।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের حصيرا এর অর্থ বিছানা। অর্থাৎ কাফেরদের জন্যে আমি দোযখকে বিছানা রূপে তৈরী করেছি।[২]

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৯
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৯০

"নিশ্চয় কোরআন সর্বাপেক্ষা সরল পথ দেখায়"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মুসা (আঃ) ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ তৌরাত সম্পর্কে আলোচনা ছিল, আর তৌরাতের উপর আমল না করার কারণে বণী ইসরাঈল জাতির প্রতি যে সব আযাব এবং বিপদাপদ এসেছিল তার উল্লেখ ছিল।

আর এ আয়াতে বিশ্ব গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের আলোচনা করা হয়েছে যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের দলীল।

পবিত্র কোরআন বিশ্ব গ্রন্থ

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, তৌরাত নিঃসন্দেহে আসমানী গ্রন্থ যা হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রতি নাজিল হয়েছে। তৌরাতও সরল সঠিক পথের দিশারী ছিল। তবে তৌরাত শুধু বণী ইসরাঈল জাতির জন্যে, তৌরাতের আহ্বান শুধু বণী ইসরাঈলের উদ্দেশে। কিন্তু পবিত্র কোরআনের আহ্বান সমগ্র বিশ্ববাসীর উদ্দেশে। সমগ্র বিশ্ব মানবের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণের সর্বাপেক্ষা সহজ সরল এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করে পবিত্র কোরআন। সমগ্র বিশ্ব মানবের নামে বিশ্ব নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ এই গ্রন্থ হলো মানব জাতির উদ্দেশে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের সর্বশেষ বাণী ও সর্বশেষ পয়গাম। যেভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ঠিক তেমনি তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পবিত্র কোরআন। মানব জাতির সার্বিক কল্যাণের মূর্ত প্রতীক এ মহান গ্রন্থ। যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্যে রহমত রূপে আগমন করেছেন, তিনিই পবিত্র কোরআনের ধারক ও বাহক। পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার অনুশীলন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ব্যতীত নাজাতের বিকল্প কোন পন্থা নেই, তাই যারা পবিত্র কোরআনের বিধান মেনে চলে তাদের জন্যে রয়েছে এতে সুসংবাদ।

وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا

পবিত্র কোরআন মোমেনদেরকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মহান পুরস্কারের-তথা জান্নাতের সুসংবাদ দেয়, যারা ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে নেক আমলও করে। আর নেক আমলের মানদণ্ড হলো পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ।

وَاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

কিন্তু যারা পবিত্র কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ করেনা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেনা, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়ে মুগ্ধ-মত্ত হয়ে আখেরাত সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকে তারা তার পরিণাম স্বরূপ ভোগ করবে আখেরাতের

মর্মান্তিক শাস্তি, যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে দু'টি কথার ঘোষণা রয়েছেঃ

(১) পবিত্র কোরআন সর্বাপেক্ষা সহজ সরল এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করে। আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো পবিত্র কোরআন। পবিত্র কোরআন দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সার্বিক কল্যাণের পথ-নির্দেশ করে।

(২) পবিত্র কোরআন নেককার মোমেনদেরকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মহান পুরস্কার লাভের সুসংবাদ দেয় এবং যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয় তাদের উদ্দেশে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, পবিত্র কোরআনে কাফেরদের উদ্দেশে যেমন আযাবের ঘোষণা রয়েছে, তেমনি রয়েছে মোমেনদের জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ, যারা মোমেনদের সঙ্গে শত্রুতা করে, মোমেনদের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়ন করে, তাদের উদ্দেশে আযাবের ঘোষণা মোমেনদের জন্যে সুসংবাদ। বণী ইসরাঈলের মধ্যে যারা আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করেছে, দুনিয়াতেই যেমন তাদের শাস্তি হয়েছে এমনিভাবে মক্কার যে কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করেছে, তাদের শাস্তিও দুনিয়াতেই হয়েছে। তবে কথা এখানেই শেষ নয়; বরং আখেরাতেও হবে তাদের কঠিন শাস্তি। তাই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

"আমি তৈরী করে রেখেছি তাদের জন্যে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"।

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ؕ
وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ
فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا
مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ وَكُلَّ شَيْءٍ
فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ﴿١٢﴾ وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ؕ
وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿١٣﴾ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ
كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿١٤﴾ مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا
يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ وَلَا تَزِرُ
وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾
وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا
فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا ﴿١٦﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ
الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا
بَصِيْرًا ﴿١٧﴾

তরজমা

(১১) মানুষ তার কল্যাণ কামনার ন্যায় অকল্যাণও কামনা করে থাকে, মানুষ তো অত্যন্ত বেশী ত্বরাপ্রিয়।

(১২) আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টি নিদর্শন। রাতের নিদর্শনকে অপসারিত করেছি এবং দিনের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করেছি, যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দান সন্ধান করতে পার এবং যেন তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পার। আর আমি সব কিছুই বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছি।

(১৩) আর আমি প্রত্যেকটি মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং কেয়ামতের দিন তার জন্যে একটি কিতাব বের করবো যা সে উন্মুক্ত দেখতে পাবে।

(১৪) তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা) পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্যে যথেষ্ট।

(১৫) যে কেউ হেদায়েতের পথ অবলম্বন করবে সে তো তা নিজের মঙ্গলের জন্যেই করবে। পক্ষান্তরে যে কেউ পথভ্রষ্ট হয় সে তার নিজের ধ্বংসের জন্যেই হয় এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবেনা। আমি কোন রসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত কারো শাস্তির ব্যবস্থা করি না।

(১৬) আর আমি যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করতে চাই তখন তার সুখী সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎ কাজের আদেশ দিয়ে থাকি। কিন্তু তারা তাতে নাফরমানী করে। এরপর তাদের প্রতি আমার আযাবের কথা সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং আমি তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করি।

(১৭) নূহের পরেও আমি কত মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি। (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকই তাঁর বন্দাদের পাপাচারের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্যে যথেষ্ট।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, পবিত্র কোরআন মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। যে কাজে মানুষ আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে পুরস্কার লাভ করবে সে কাজের প্রতি পবিত্র কোরআন মানুষকে আকৃষ্ট করে। আর যে কাজের পরিণাম মানুষের জন্যে ভয়াবহ হবে সে কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়।

আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, পবিত্র কোরআনের এ আহ্বান সত্বেও মানুষ তার ভাল-মন্দ বুঝতে চায় না, তার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয় না। সে যেমন তার মঙ্গল কামনা করে ঠিক তেমনি তার অমঙ্গল এবং অকল্যাণের দিকেও ছুটে যায়। তার আচার-আচরণের মাধ্যমে সে নিজের অকল্যাণ ডেকে আনে এমনকি, পাপাচারে লিপ্ত হয়ে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

শানে নজুল

আলোচ্য আয়াতের শানে নজুল সম্পর্কে একাধিক বিবরণ রয়েছে। মক্কার কাফের নযর এবনে হারেস প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস করতো না, পবিত্র কোরআনকে সত্য মনে করতো না। তাই সে বিদ্রুপ করে এভাবে দোয়া করতো, "হে আল্লাহ! যদি ইসলাম এবং কোরআন সত্য হয় তবে আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ কর (নাউযুবিল্লাহ)"। বদরের যুদ্ধের দিন নযর এবনে হারেস নিহত হয়। এভাবে মানুষ নিজের অকল্যাণ কামনা করে। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ[১]

وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪১
তফসীরে কবীর, পারা-২০, পৃষ্ঠা-১৬২

এ পর্যায়ে আরও বিবরণ রয়েছে। ওয়াকেদী হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কোন আযাদ করা গোলামের সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন বন্দীকে এনে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, 'এর প্রতি লক্ষ্য রেখো (যেন পালিয়ে না যায়)'। হযরত আয়েশা (রাঃ) অন্য একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথায় মশগুল হওয়ার কারণে বন্দীর প্রতি নজর রাখতে পারেননি। এই সুযোগে সে পলায়ন করে। পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন এবং বন্দী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিলেন, 'আমি জানি না, আমি তার ব্যাপারে সামান্য গাফেল হয়েছিলাম, এই ফাঁকে সে পালিয়ে গেছে'। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হলেন। (রাগান্বিত হয়ে) বললেন, 'আল্লাহ তোমার হাত কেটে দিন'। একথা বলে তিনি বাইরে তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং অপরাধীকে ধরার জন্যে চারিদিকে লোক প্রেরণ করলেন। লোকেরা তাকে ধরে নিয়ে আসলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘরে তশরীফ আনলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তখন বিছানায় বসে তাঁর হাতকে ওলট-পালট করে দেখছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'কি হয়েছে'? হযরত আয়েশা (রাঃ) আরজ করলেন, 'আপনার বদ-দোয়ার প্রতিক্রিয়া দেখার অপেক্ষা করছি'। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের দরবারে হাত তুলে এভাবে মুনাজাত করলেন, 'হে আল্লাহ! আমি একজন মানুষ, অন্য মানুষের ন্যায় আমারও কষ্ট হয় এবং রাগ আসে। আমি যদি কোন মোমেন পুরুষ বা মোমেন নারীর জন্যে বদ-দোয়া করি তবে আমার বদ-দোয়াকে তাঁর জন্যে গুনাহ থেকে পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ বানিয়ে দাও'।[১]

আয়াতের মর্মকথা

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের মর্মকথা সম্পর্কে লিখেছেনঃ মানুষ কখনো কখনো নিরাশ হয়ে পড়ে এবং তখন সে মারাত্মক ভুল করে নিজের অমঙ্গলের জন্যে দোয়া করে বসে। কখনো বা মৃত্যুর জন্যে কখনো বা ধ্বংসের জন্যে এবং কখনো বা নিজের প্রতি লা'নত করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ পাক মানুষের প্রতি তার নিজের চেয়েও অধিকতর মেহেরবান। এরূপ দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গে যদি তিনি কবুল করে নেন তবে সে তখনই ধ্বংস হয়ে যায়। এজন্যে হাদীস শরীফে রয়েছে, নিজের জান এবং মালের ব্যাপারে কখনও বদ-দোয়া করোনা। কারণ তোমার মুখ থেকে অকল্যাণকর কোন শব্দ দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ কোন লগ্নে বের হয়ে পড়তে পারে।

নিজের প্রতি এরূপ বদ-দোয়ার কারণ শুধুমাত্র মানুষের পেরেশান হাল হওয়া, কোন বিষয়ে অস্থির ও ব্যাকুল হওয়া এবং তা থেকে দ্রুত উদ্ধার পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা। মানুষের প্রকৃতিই এরূপ যে সে পেরেশান হাল থেকে শীঘ্র উদ্ধার পেতে চায়। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এবং হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) এ প্রসঙ্গে হযরত আদম (আঃ)-এর একটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন। যখন হযরত আদম (আঃ) দন্ডায়মান হওয়ার ইচ্ছা

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-২৪
তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪০-৪১

করলেন, রুহ মাথার দিক থেকে নাক পর্যন্ত যখন পৌঁছল তখন তাঁর হাঁচি আসলো। তিনি 'আলহামদুলিল্লাহ' বললেন। আল্লাহ পাক তখন এরশাদ করলেনঃ

يَرْحَمُكَ رَبُّكَ يَا اٰدَمُ

"হে আদম! তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালক রহম করুন"।

যখন রুহ চক্ষু পর্যন্ত পৌঁছলো তখন তিনি চক্ষু খুলে দেখতে লাগলেন। যখন আরও নীচের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রুহ পৌঁছলো তখন তিনি নিজের দেহের প্রতি আনন্দের সঙ্গে দেখতে লাগলেন। এমনকি যখন পা পর্যন্ত রুহ পৌঁছেনি তখনই তিনি পদ সঞ্চালনের ইচ্ছা করলেন, কিন্তু তাতে সক্ষম হলেন না। তাই দোয়া করতে লাগলেন, "হে আল্লাহ! রাত্রি আসার পূর্বে রুহ আসুক"।[১]

হযরত আদম (আঃ)-এর এ ঘটনা সম্পর্কে ইমাম এবনে জরীর তাবারী (রঃ) লিখেছেনঃ যখন হযরত আদম (আঃ)-এর দেহে রুহ ফুঁকে দেয়া হয়েছিল, আছরের সময় পর্যন্ত পা ব্যতীত দেহের অবশিষ্টাংশে রুহ পৌঁছে যায়। তাই ঐ মুহূর্তে তিনি দোয়া করেছিলেনঃ

يا ربى عجل قبل الليل

"হে আল্লাহ! রাত্রি আসার পূর্বে সারা দেহে রুহ পৌঁছে দিন"।[২]

وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন যে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, الانسان শব্দ দ্বারা বিশেষ মানব গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ কাফের। যারা নিজেদের ধ্বংস কামনা করে দোয়া করে তাদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে। যারা ইসলামী শরীয়তের অনুসারী হয় তথা প্রকৃত মোমেন হয় তারা এমন দোয়া থেকে আত্মরক্ষা করে।[৩]

বস্তুতঃ মানুষ সব কিছুতে তাড়াহুড়ো করতে চায়। চিন্তা-ভাবনা করে কথা বলেনা, কাজ করেনা। পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হয়ে কাজ করেনা তথা দূরদর্শিতার পরিচয় দেয় না। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কেই বিশেষ তাগিদ করা হয়েছে।

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ

"আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টি নিদর্শন"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের আখেরাত সম্পর্কীয় নেয়ামতের

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-২৮
২। তফসীরে তাবারী খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৩৭
তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-২৪
৩। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-২৩
তফসীরে মাজেদী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৭৯

উল্লেখ ছিল। যেমন তিনি মানুষের হেদায়েতের জন্যে আসমানী কিতাব সমূহ নাজিল করেছেন, নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। এ আয়াতে মানুষের প্রতি আল্লাহ্ পাকের জাগতিক নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে। যেমন রাত ও দিনকে সৃষ্টি করা মানুষের প্রতি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ নেয়ামত এবং আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের উজ্বল নিদর্শন। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে মানুষ কখনও হেদায়েতের আলোর দিকে আর কখনও গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকারের দিকে যে আকৃষ্ট হয়— তার দৃষ্টান্ত হলো এমন, যেমন এই বিশ্ব কিছুক্ষণ আলোকিত থাকে আর কিছুক্ষণের জন্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর এর দ্বারা এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে, মানুষের কোন ব্যাপারেই তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। মানুষের উচিত দিন এবং রাত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। কেননা সময় এক অবস্থায় থাকেনা। কখনও আলো কখনও অন্ধকার, ঠিক এমনিভাবে কখনও আরাম কখনও কষ্ট।[১]

তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ

আমি রাত এবং দিনকে স্বীয় কুদরত, হেকমতের বিশেষ নিদর্শন করেছি। একটির পর একটি নিয়মিত চলে আসছে। কখনও রাতের অন্ধকার আবার কখনও দিনের আলো। এতদ্ব্যতীত, কখনও দেখা যায় রাত বড়, আর কখনও দেখা যায় দিন বড়। এমনিভাবে আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় সূর্যের প্রখর তেজ, চন্দ্রের মনোরম জ্যোৎস্না, চন্দ্র হোক কী সূর্য সব কিছুই আল্লাহ্ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কর্তৃত্বাধীন। আরও প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই, চন্দ্র এবং সূর্যের নির্ধারিত কক্ষপথে নিয়মিত যাতায়াত আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতির স্বার্থে এবং উপকারার্থেই হয়। মানব জীবনের অনেক কিছুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে চন্দ্র এবং সূর্যের সাথে। জীবন-সংগ্রামের জন্যে দিন, আর ক্লান্ত শ্রান্ত মানুষের বিশ্রামের জন্যে রাত। তাই আল্লাহ্ পাক রাতের অন্ধকারকে নিশ্চিহ্ন করে দেন যেন মানব জাতি জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এবং আল্লাহ্ পাকের যে অনন্ত অসীম নেয়ামত মানুষের জন্যে তিনি রেখে দিয়েছেন, তার অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু মানুষের শক্তি-সামর্থ সীমিত। সে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা সাধনার কারণে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ে, তার চাই একটু বিশ্রাম। এজন্যে বিশ্ব প্রতিপালক দান করেছেন রাতের অন্ধকার যেন তাঁর বন্দা কিছুক্ষণ ঘুমের ঘোরে অচেতন থেকে নতুন করে কর্মশক্তি অর্জন করতে পারে, নব জীবনের সন্ধান করতে পারে। এতদ্ব্যতীত, রাত ও দিনের গমনাগমনের মাধ্যমে মানুষ দিন, সপ্তাহ, মাস এবং বছরের গণনা করতে পারে। এ দু'টি উদ্দেশ্যকে আল্লাহ্ পাক দু'টি বাক্যে এরশাদ করেছেন,

لِتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ

অর্থাৎ তোমরা যেন (দিনের আলোতে) তোমাদের প্রতিপালকের দান সন্ধান করতে পার।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৯৪

وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ

"আর যেন তোমরা জানতে পার বছরের গণনা এবং হিসাব"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক সূর্যের আলোর ৭০টি ভাগ করেছেন। এমনিভাবে চন্দ্রের আলোরও ৭০ ভাগ করেছেন। কিন্তু চন্দ্রের আলো থেকে ৬৯ভাগ নিয়ে সূর্যের আলোর অন্তর্ভুক্ত করছেন। এমনকি জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক চন্দ্রের চেহারার উপর তিনবার তার ডানা দিয়ে আঘাত দিয়েছেন। ফলে চন্দ্রের আলো হয়েছে নিস্প্রভ, স্নিগ্ধ ও মনোরম, চন্দ্রের আলোর প্রখরতা এভাবে দূরীভূত হয়েছে। চন্দ্রের মাঝে যে চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় তার তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, চন্দ্রের আলোর তীব্রতা এবং প্রখরতা নিশ্চিহ্ন করার এটিই হলো চিহ্ন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) উল্লেখ করেছেন, বায়হাকী দালায়েলে সায়ীদ মাকবারীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট চন্দ্রের গায়ের কালো দাগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, দু'টিই (চন্দ্র-সূর্য) আলোকময় ছিল কিন্তু পরে (আলোচ্য আয়াতের) فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ অতঃপর আমি রাতের আলোর নিদর্শন (নিশ্চিহ্ন করে দেই) আলোর তীব্রতা এবং প্রখরতা নিশ্চিহ্ন করারই নিদর্শন স্বরূপ চন্দ্রের গায়ে এই কালো দাগ পরিলক্ষিত হয়।[১]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা কান্দলভী (রঃ) একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। আতা এবনে সায়েব থেকে বর্ণিত, খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ায় নিযুক্ত কাযী বা শাসনকর্তা হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আমি একটি ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছি, আমি দেখেছি সূর্য এবং চন্দ্র পরস্পর যুদ্ধরত রয়েছে, নক্ষত্রপুঞ্জের অর্ধেক সূর্যের সঙ্গে ছিল আর অর্ধেক চন্দ্রের সঙ্গে। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ যুদ্ধে তুমি কার সঙ্গে ছিলে'?

সে বললো, 'আমি চন্দ্রের সঙ্গে ছিলাম'। হযরত ওমর (রাঃ) তখন আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেনঃ

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً

এবং বললেনঃ আমি তোমাকে বরখাস্ত করছি। তুমি যেতে পার, তুমি এ উচ্চ পদের যোগ্য নও। কেননা যার আলো আল্লাহ পাক বৃদ্ধি করে দিয়েছেন তাকে বাদ দিয়ে যার আলো আল্লাহ পাক নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন তুমি তার সাথী হয়েছ। এই ব্যক্তির নাম ছিল আবেস্ এবনে সা'দ। সে খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর তরফ থেকে কাযী

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪১-৪২

অথবা শাসনকর্তা ছিল। সিফ্ফীনের যুদ্ধে তার মৃত্যু হয়।

وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا

"এবং আমি সব কিছু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি"।

অর্থাৎ তোমাদের দ্বীন-দুনিয়ার সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে আমি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি, যেন বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ না থাকে। তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ যেভাবে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে দিবা-রাত্রি, সকাল-সন্ধ্যা যথা নিয়মে যথা সময়ে চিরদিন হয়ে আসছে, এতে কখনো কোন ব্যতিক্রম হয়নি, ঠিক এমনিভাবে ভাল-মন্দের অবস্থাও অনুরূপ। যেভাবে রাতের পেছনে দিন আসে, তেমনি ভাল-মন্দও একে অন্যের পেছনে পরিচালিত হয়। মানুষের এ জীবন যেমন অন্ধকার রাত, রাতের অন্ধকারের কারণে মানুষ সব কিছু সুস্পষ্টভাবে দেখতে পারেনা, ঠিক তেমনি দুনিয়ার এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনেও মানুষ তার কল্যাণ-অকল্যাণ যথাযথভাবে অনুভব করতে পারেনা। মূলতঃ এজন্যেই আল্লাহ পাক মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে নবী-রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন যুগে যুগে। তাঁরা মানুষকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন, কেউ তাঁদের অনুসারী হয়েছে এবং সত্যকে গ্রহণ করেছে। আর কেউ তাঁদের বিরোধিতা করেছে এবং মন্দ পথ অবলম্বন করেছে। ভাল এবং মন্দের মীমাংসা অবশেষে কেয়ামতের দিন হবে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, রাত এবং দিন উভয়টি আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের নিদর্শন, তাঁর তওহীদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের দু'টি বিশেষ নেয়ামত।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ হেদায়েত এবং গোমরাহী, নেক হওয়া এবং বদ হওয়া- এটিও আল্লাহ পাকের কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। যেভাবে প্রকাশ্য নূর এবং অন্ধকার তাঁর কর্তৃত্বাধীন, ঠিক তেমনি বাতেনী নূর এবং অন্ধকারও আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন। অদৃষ্ট সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে যার পূর্ণ প্রকাশ ঘটবে কেয়ামতের দিন। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ

"আর আমি প্রত্যেকটি মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করেছি"।

অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষের আমল এবং অদৃষ্ট বা তকদীর তার সঙ্গেই থাকে। সে যেখানেই থাকুক না কেন তার তকদীর থেকে সে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনা।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), কালবী (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, ভাল হোক বা মন্দ হোক, কল্যাণ হোক কি অকল্যাণ সবই মানুষের সঙ্গে থাকে। অবশেষে ভাল বা মন্দ আমলের হিসাব তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে طٰئِرَهٗ শব্দটি দ্বারা 'বরকত' এবং 'বে-বরকতী' উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, طٰئِرَهٗ হলো সেই তকদীরী বিষয় যার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে মানুষ এ কাজটি অবশ্যই করবে এবং তার পরিণাম সে অবশ্যই ভোগ করবে, তা সৌভাগ্য হোক কি দুর্ভাগ্য অর্থাৎ মানুষের জীবনের কর্ম হবে তার কণ্ঠহার। ভাল এবং মন্দ কাজ তার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যে পরিণত হবে, কেয়ামতের দিন তা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাবে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, طٰئِرَهٗ শব্দটি মূলতঃ 'পাখী' অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর আরবরা এ শব্দটিকে 'ভাগ্য' অর্থে ব্যবহার করে। অতএব ভাগ্য বা কিসমত একটি পাখী, সৃষ্টির প্রথম দিন উড়ে এসে বসেছে এবং প্রত্যেকটি মানুষের গ্রীবায় মজবুতভাবে বেঁধে দেয়া হয়েছে। মানুষের অস্তিত্ব লাভের পূর্বে অদৃষ্ট তার অপেক্ষা করতে থাকে। যখন মানুষ অস্তিত্ব লাভ করে তথা শূণ্যের অন্ধকার থেকে বের হয়ে আত্মপ্রকাশ করে তখন তার তকদীর বা অদৃষ্ট তার গ্রীবার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। সমগ্র জীবন এমনকি যখন কবর থেকে সে উঠবে তখনও তার কণ্ঠহার হিসেবেই তা থাকবে, কখনও ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে তা বিচ্ছিন্ন হবে না।[১]

এক কথায় প্রতিটি মানুষের ভাল-মন্দ আমল তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে। মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সময় তার গলায় একটি কাগজ পড়ে থাকে, যাতে লিপিবদ্ধ থাকে সে নেক কি বদ।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, মানুষের আমল ভাল হোক কি মন্দ তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়ে যায়। ভাল কাজের বদলা সে ভালই পাবে, আর মন্দ কাজের পরিণতি অবশ্যই মন্দ হবে তার পরিমাণ যত কমই হোক না কেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

(সূরা যিলযাল)

"যে কণা পরিমাণ নেক আমল করবে সে তার শুভ পরিণতি অবশ্য দেখতে পাবে। আর যে কণা পরিমাণও মন্দ কাজ করবে সে তার শোচনীয় পরিণাম অবশ্যই দেখতে পাবে"।

ঠিক এমনিভাবে সূরা ক্বাফে এরশাদ হয়েছেঃ

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ

"স্মরণ রেখো, দু' গ্রহণকারী (ফেরেশতা) তার দক্ষিণে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে চলেছে"।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪২
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৯৬-২৯৭

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"মানুষ যে-কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্যে তার নিকটই প্রহরী তৎপর রয়েছে"।

যাহোক, মানুষের ছোট-বড়, গোপন ও প্রকাশ্য, ভাল-মন্দ যাবতীয় কথা ও কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। আর এ বিবরণের সমষ্টি আমলনামা আকারে কেয়ামতের দিন পেশ করা হবে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَلْقٰهُ مَنْشُورًا

"আর কেয়ামতের দিন তার জন্যে একটি কিতাব (আমলনামা) প্রকাশ করবো, যা সে উন্মুক্ত অবস্থায় দেখতে পাবে"।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ সাহাবায়ে কেরামের বাণীতে রয়েছে, যখন মানুষের বয়স শেষ হয়ে যায় তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেন যে এই লোকের আমলনামা কেয়ামতের পূর্বে আর খোলা হবেনা।

এ পর্যায়ে আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেনঃ আমলনামা ফেরেশতাদের নিকট কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে যা কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির সন্মুখে রাখা হবে এবং বলা হবেঃ

اِقْرَأْ كِتٰبَكَ

"তোমার আমলনামা তুমি নিজেই পাঠ কর"।

প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের যাবতীয় কর্মের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকবে আমলনামায়। তাই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

"সেদিন প্রত্যেকটি মানুষকে তার আগের পরের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত করা হবে"।

كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (সূরা কেয়ামাহ)

"আজ তোমার হিসাব নিকাশের জন্যে তুমি নিজেই যথেষ্ট"।

প্রত্যেককে তার আমলনামা দেয়া হবে

বায়হাকী (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ সমস্ত আমলনামা আরশের নীচে রক্ষিত আছে। কেয়ামতের দিন যখন সমস্ত মানুষকে হিসাব বুঝে নেয়ার জন্যে এক ময়দানে দাঁড় করানো হবে তখন আল্লাহ পাক একটি বাতাস প্রেরণ করবেন। সে বাতাস আমলনামা

গুলোকে উড়িয়ে নিয়ে মানুষের ডান হাতে অথবা বাম হাতে পৌঁছে দেবে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেনঃ যিনি তোমাকে তোমার নিজের হিসাব নেয়ার জন্যে নিযুক্ত করেছেন তিনি নিঃসন্দেহে তোমার উপর সুবিচার করেছেন।

এবনে জরীর হযরত কাতাদা (রঃ)-এর বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে লেখাপড়া জানতো না সে-ও সেদিন আমলনামা পড়তে সক্ষম হবে।

এবনে মোবারক (রঃ) হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেনঃ প্রত্যেকটি মানুষের গলায় একটি পত্র ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সে পত্রে তার সকল আমল লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তার গলাতেই তা রেখে দেয়া হয়। এরপর কেয়ামতের দিন যখন তার পুনরুত্থান হবে তখন সেই আমলনামাকে তার সামনে খুলে ধরা হবে এবং বলা হবেঃ

اِقْرَأْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا

ইসবাহানী হযরত আবু উমামা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানুষের সম্মুখে তার আমলনামা উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা হবে। সে তা পাঠ করে বলবে, আমি অমুক অমুক নেক আমল করেছিলাম কিন্তু তা এতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ তুমি মানুষের গীবত করতে, এজন্যে আমি তোমার ঐ নেক আমলগুলো বাতিল করেছি।[১]

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ

"যে ব্যক্তি সরল সঠিক পথ অবলম্বন করে সে তার উপকারার্থেই তা করে"।

وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا

"আর যে পথভ্রষ্ট হয় সে তার নিজের ক্ষতির জন্যেই তা হয়"।

অর্থাৎ যে পথভ্রষ্ট হবে তার শোচনীয় পরিণতি তাকেই ভোগ করতে হবে। আর তার পথভ্রষ্টতা অন্যের ধ্বংসের কারণ হবেনা।

মুশরেকদের মৃত শিশুদের পরকালীন অবস্থা

এবনে আবদুল বার একটি দুর্বল সূত্রে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। একবার হযরত খাদীজাতুল কোবরা (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে মুশরেকদের সেই শিশু সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, সাবালক হওয়ার পূর্বে যাদের মৃত্যু হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'তারা তাদের পিতাদের তরফ থেকে (জন্মগ্রহণ করেছে, অতএব তারা তাদের পিতাদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে'।)

কিছু দিন পর হযরত খাদীজাতুল কোবরা (রাঃ) পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন। তখন

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৩-৪৪

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'আল্লাহ পাকই ভাল জানেন তারা বড় হলে কি করতো'।

এরপর যখন ইসলাম সুদৃঢ় হলো তখন হযরত খাদীজা (রাঃ) পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন তখন নাজিল হলোঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

(কারো উপর অন্য কারো গুনাহর বোঝা দেয়া হবে না; বরং প্রত্যেকেই তার নিজের গুনাহর বোঝা বহন করবে।)

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

"আর কোন রসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি কাউকে আযাব দেই না"।

অর্থাৎ যে পর্যন্ত কোন সম্প্রদায়ের নিকট শরীয়তের বিধান পেশ না করা হয় এবং পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তাদের হেদায়েতের ব্যবস্থা না করা হয়, সে পর্যন্ত আমি তাদের উপর আযাব প্রেরণ করি না।

এ আয়াতের আলোকে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তির নিকট আল্লাহর নবীর খবর পৌঁছেনি, শুধু বিবেক-বুদ্ধির কারণে তার উপর কোন হুকুম কার্যতঃ ওয়াজিব হবেনা। এমনকি এ অবস্থায় যদি কেউ শেরক করে অথবা অন্য কোন পাপ কার্যে লিপ্ত হয় তবে তার প্রতি আযাব হবেনা। এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেছেন, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ পাক, কিন্তু একথা চির সত্য যে, আল্লাহ পাক মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, আর এ বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের সত্যতা উপলব্ধি করা, যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে তাঁর পবিত্রতা অনুধাবন করা এবং মোজেযা বা অলৌকিক শক্তি সমূহ দেখে নবীর নবুওয়্যতের কথা স্বীকার করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। অতএব, তওহীদ ও রেসালতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা মানুষের বিবেক-বুদ্ধির উপর বর্তায়। আল্লাহ পাকের হুকুম বা কোন রসূলের হেদায়েতের উপর নির্ভরশীল নয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন নবীর আবির্ভাবের খবর পায়নি অথবা কোন নবী প্রেরীতই হননি, তবুও আল্লাহ পাকের একত্ববাদের কথা স্বীকার করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য, এটি মানুষ মাত্রেরই বিবেক-বুদ্ধির স্বাভাবিক দাবী এবং দায়িত্ব। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো এই, শরীয়তের যাবতীয় বিধান, হুকুম-আহকাম তওহীদ এবং রেসালতের উপর বিশ্বাস স্থাপনের উপরই নির্ভর করে। এমন অবস্থায় যদি তওহীদ ও নবুওয়্যতকে স্বীকার করে নেয়াও শরীয়তের বিধানের উপর নির্ভরশীল হয়, তবে শরীয়তের বিধানের ভিত্তি কি থাকবে? অতএব, নবী রসূলগণের পেরিত হওয়ার খবর না পেলে অথবা প্রেরিত না হওয়ার কারণে যদি কেউ শেরক করে তবে সে শাস্তির যোগ্য অপরাধী সাব্যস্ত হবে। একথার সমর্থন পাওয়া যায় বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, 'হে আদম! হযরত আদম (আঃ) জবাব দেবেন, 'হাযির, যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে'।

আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, '(নিজের সন্তানদের থেকে) দোযখের অংশ বের কর'। আদম (আঃ) আরজ করবেন, 'দোযখের অংশ কি'? আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, 'হাজারে ৯৯৯ জন'। এ আদেশটি এমন ভয়াবহ হবে যে এর ভয়ে শিশুরাও বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভধারিনীর গর্ভপাত হয়ে যাবে, আর সমস্ত লোকদেরকে নেশাগ্রস্ত লোকদের ন্যায় অজ্ঞান মনে হবে, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত ছিলনা, কোন নেশাকর কিছু পান করেনি; বরং আল্লাহ পাকের আযাব হবে অত্যন্ত কঠিন কঠোর।

সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! 'আমাদের মধ্যে (নাজাত প্রাপ্ত) এক ব্যক্তি কে হবে'? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'তোমাদের জন্যে সুসংবাদ, তোমাদের মধ্যে একজন (দোযখী হবে), আর ইয়াজুয মাজুয থেকে হাজার'। (আল হাদীস)

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, জ্ঞান-বুদ্ধি লাভের পর প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের একত্ববাদের কথা স্বীকার করা। লক্ষণীয়, ইয়াজুয মাজুয একটি শীশা ঢালা দেয়ালের ওপারে হবে। তাদের মধ্যে কোন নবী প্রেরিত হবে না তবুও তাদের প্রতি আযাব হবে।

দু'জন পয়গম্বরের মধ্যবর্তী সময় যখন সাময়িক ভাবে নবুওয়্যতের সিলসিলা বন্ধ থাকে, তখন যারা জন্ম গ্রহণ করে তাদেরও কেয়ামতের দিন হিসাব–নিকাশ হবে। বাজ্জার হযরত সওবান (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন বর্বরতার যুগের (হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের পূর্বের) লোকেরা নিজ নিজ পৃষ্ঠে বোঝা বহন করে হাযির করবে। আল্লাহ পাক তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, তারা আরয করবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট কোন রসূল প্রেরণ করোনি, তোমার কোন আদেশও আমাদের নিকট পৌছেনি। যদি আমাদের নিকট কোন রসূল প্রেরিত হতো, তবে আমরা তোমার সর্বাধিক অনুগত বন্দা হতাম'। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, 'আচ্ছা, এখন যদি আমি তোমাদেরকে কোন আদেশ প্রদান করি তবে তোমরা মানবে কি'? তারা বলবে, 'অবশ্যই মানবো'। আল্লাহ পাক তাদের থেকে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করে হুকুম দেবেন, 'যাও এখন দোযখে প্রবেশ কর'। আদেশ মোতাবেক তারা দোযখের দিকে যাবে। দোযখের নিকটবর্তী হয়ে যখন দোযখকে দেখবে তখন ভীত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে এবং আরজ করবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দোযখকে বড় ভয় লাগে এজন্যে আমরা প্রবেশ করতে পারছিনা'। তখন আল্লাহ পাক নির্দেশ দেবেন, 'অপমানিত অবস্থায় দোযখে প্রবেশ করবে (অর্থাৎ তোমরা আমার নাফরমানী করেছ, তাই অপমানিত অবস্থায় তোমাদেরকে দোযখে যেতে হবে)'। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'যদি প্রথম বার তারা দোযখে প্রবেশ করতো তবে অগ্নি শীতল হয়ে যেত এবং নিরাপদ হতো'।

এবনে মুবারক (রঃ) বলেছেন, আমার নিকট মুসলিম এবনে ইয়াছার বর্ণনা করেছেন যে, কেয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে যে অন্ধ, মূক এবং বধির হবে।

যে ব্যক্তি কোন কিছু শ্রবণ করেনি, কোন কিছু দেখেনি এবং কখনো কোন কথাও বলেনি, তাকে আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, 'আমি তোমাকে যে আদেশ দিয়াছিলাম তা পালন করেছ'? সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক আল্লাহ্! তোমার শপথ! আমাকে তুমি চক্ষু দান করোনি যে আমি মানুষকে দেখতাম, আমাকে শ্রবণ শক্তি দান করোনি যদ্বারা আমি তোমার বিধি-নিষেধ শ্রবণ করতাম এবং আমাকে রসনা দান করোনি যে আমি ভাল কথা বলতাম, আমিতো একটি কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় ছিলাম'। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন, 'যদি আমি এখন তোমাকে কোন আদেশ প্রদান করি তবে কি তুমি তা পালন করবে'? সে বলবে, 'জ্বী হ্যাঁ'। আল্লাহ্ পাক তখন এরশাদ করবেনঃ 'তুমি দোযখে প্রবেশ কর'। এ আদেশ পালন করতে সে অস্বীকার করবে, তখন তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতবাদ হলো, যদি কোন মুশরেকের হুশ বহাল থাকে তবে তার নিকট পয়গম্বরের আহ্বান না পৌঁছলেও তাকে শেরকের জন্যে আযাব দেয়া হবে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ (সূরা নেছা)

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক শেরকের গুনাহ্ মাফ করবেন না"।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে জাহেলিয়াতের যুগে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তারাও এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত হবে। হয়তো তারা কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের দরবারে অজ্ঞতার ওজর পেশ করবে এবং আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন তাদেরকে পরীক্ষা করে অবশেষে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। কেয়ামতের দিন মুশরেকরা নিজেদের শেরকের কথা অস্বীকার করবে এবং তারা যে শেরক করেনি এ কথার উপরে স্বাক্ষ্য-প্রমাণ চাইবে, তখন তাদের নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দেবে এবং আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তাদের শেরক ও কুফরীর প্রমাণ পরিপূর্ণভাবে প্রদান করা হবে। আর আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা শেরকের জন্যে আযাব প্রদান করবেন, আর এটি ন্যায় বিচারের বরখেলাফও হবেনা। কেননা যে জ্ঞান-বুদ্ধি মানুষকে শেরক থেকে বিরত রাখে এবং তওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে অনুপ্রাণিত করে, তা আল্লাহ্ পাক তাদেরকে দান করেছিলেন (কিন্তু তারা সে জ্ঞান-বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করেনি)। এজন্যে তাদের নিকট তওহীদের আহ্বায়ক প্রেরণ করার কোন প্রয়োজন নেই, অবশ্য শরীয়তের বিধান যথাযথভাবে পালনের জন্যে মানুষের জ্ঞান যথেষ্ট নয়; বরং তার জন্যে রসূলের হেদায়েত পূর্বশর্ত।

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولًا

(আমি রসূল প্রেরণ করা ব্যতীত কোন সম্প্রদায়কে শাস্তি প্রদান করিনা।)

আলোচ্য আয়াতের 'রসূল' শব্দটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মত হলো এই, মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণ যেভাবে মানুষকে হেদায়েত করেন, ঠিক তেমনি মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও তাকে মন্দ কাজ

থেকে বিরত রাখে। অতএব, বিবেক-বুদ্ধিও আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত বা রসূল, যা মানুষকে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার সুযোগ এনে দেয়। আর এ কারণেই মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে যা অর্জন করা যায় তা বর্জন করার শাস্তি তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে তা শেরক হোক বা অন্য কিছু।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মুশরেকদের শিশু এবং পাগলের আযাব হবে না। কেননা তাদের নিকট কোন পয়গম্বরের দাওয়াত পৌঁছেনি এবং তাদের বিবেক-বুদ্ধিও ছিলনা এবং শিশুদের পিতা-মাতার শেরক তাদের শাস্তির কারণ হবেনা। আলোচ্য আয়াতে এ কথাটিই প্রমাণিত হয়।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"কেউ অন্য কারো ভার বহন করবেনা"।

কোন কোন হাদীসেও একথার সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম আহমদ (রঃ) খুনাছা এবনে মাবিয়ার পিতৃব্যের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! 'জান্নাতে কে যাবে'? তিনি এরশাদ করেন, 'নবীগণ জান্নাতী, শহীদগণ জান্নাতী এবং নবজাত শিশুও জান্নাতী এবং যে সব শিশুকে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হয়েছে তারাও জান্নাতী (অর্থাৎ তারা কোন হিসাব-কিতাব ব্যতীতই জান্নাতে যাবে)'।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত সামুরা এবনে যুন্দবের সূত্রে একখানি সুদীর্ঘ হাদীস সংকলন করেছেন, যার মধ্যে একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে একজন বৃদ্ধ লোক একটি বৃক্ষের ছায়ায় বসেছিলেন এবং তাঁর চারিপার্শ্বে ছিল অনেক শিশু। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে জিব্রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, ইনি ইব্রাহীম (আঃ) আর এরা হলো মুসলমান এবং কাফেরদের শিশু সন্তানেরা। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! মুশরেকদের শিশুরাও'? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'হ্যাঁ, মুশরেকদের শিশুরাও'।

মূলতঃ এজন্যেই কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, মুশরেকদের শিশুরা জান্নাতবাসীদের খাদেম হবে অর্থাৎ তারা জান্নাতে থাকবে তবে মোমেনদের খাদেম হিসেবে। কেননা আবু দাউদ তিয়ালিসী হযরত আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট মুশকেদের শিশুদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তিনি এরশাদ করেছেন, তাদের এমন কোন অপরাধ ছিলনা যার জন্যে তারা দোযখে যাবে। আর এমন কোন নেক আমলও ছিলনা যার কারণে তারা জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাদের নেক আমলের সওয়াব দেয়া যাবে। তাই তারা জান্নাতবাসীদের খাদেম হবে।

এবনে জরীর হযরত সামুরা (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে আমরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট মুশরেকদের শিশু সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তখন তিনি এরশাদ করেন, 'তারা জান্নাতীদের খাদেম হবে'। এই হাদীস হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।

ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে একজন

আনসারী শিশুর জানাযা পড়ার জন্যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আহবান করা হলো। আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! 'তার জন্যে তো শুধু আনন্দই আনন্দ। সে তো জান্নাতের পাখী ছিল, কখনও কোন গুনাহ করেনি, গুনাহ করার বয়সও পায়নি, তার বিরুদ্ধে কিছু করাও হবে না'। তিনি এরশাদ করলেন, '(শোন) আয়েশা, যখন জান্নাত পয়দা হয় তখন তার জন্যে কিছু ব্যক্তিকে তাদের পিতার পৃষ্ঠে পয়দা করা হয় এবং যখন দোযখ তৈরী করা হয় তখনও কিছু লোককে তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে পয়দা করা হয়'।

এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে মুসলমানদের শিশুদের ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না, এ ব্যাপারে নীরব থাকই সমীচিন। তবু তাদের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের ঐক্যমত রয়েছে। ইমাম আহমদ (রঃ), এবনে আবি যায়েদ (রঃ), আবু ইয়ালা (রঃ) প্রমুখ ফররা এবং অন্যান্যের সূত্রে এ ব্যাপারে ঐক্যমত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফের সুস্পষ্ট ভাষ্য দ্বারা এরূপ প্রমাণিত হয়। আল্লামা নববী (রঃ) এবং সয়ুতী (রঃ)-ও এরূপ মত প্রকাশ করেছেন (তবে বিষয়টি অমীমাংসিত ছিল সূরা ফাতাহ-এর আয়াত সমূহ নাজিল হওয়ার পূর্বে)।

মুশরেকদের সন্তানদের সম্পর্কে আরও কিছু হাদীস

আবু ইয়ালা (রঃ) হযরত বারা এবনে আজেব (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে মোমেনদের (মৃত) শিশুদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তখন তিনি এরশাদ করেন, 'তারা তাদের পিতাদের সঙ্গে থাকবে'। এরপর মুশরেকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি এরশাদ করেন, 'তারা তাদের পিতাদের সঙ্গে থাকবে'।

আবু দাউদ শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলিত হয়েছে। উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! মোমেনদের সন্তানদের কি হবে'? তিনি এরশাদ করেন, 'তারা তাদের পিতাদের সাথে থাকবে'। আমি আরও আরজ করলাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন আমল ব্যতীতই'? তখন তিনি এরশাদ কররেন, 'আল্লাহ পাক ভালভাবেই জানেন (যদি তারা জীবিত থাকত এবং যৌবন লাভ করতো) তারা কি করতো'। আমি আরজ করলাম, 'মুশরেকদের সন্তানদের কি হুকুম'? তিনি এরশাদ করলেন, 'তারা তাদের পিতাদের সঙ্গে (অর্থাৎ তারা দোযখী হবে)'। আমি আরজ করলাম, 'কোন আমল ব্যতীতই'? তিনি এরশাদ করলেন, 'আল্লাহ পাক ভালভাবেই জানেন যে তারা (বেঁচে থাকলে) কি করতো'।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ সম্পর্কে আরও কয়েকটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দেয়ার পর লিখেছেন, উত্তম কথা হলো মুশরেকদের সন্তানদের বিষয় আল্লাহ পাকের মর্জির উপর নির্ভরশীল। তারা জান্নাতে থাকবে না দোযখে থাকবে-এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত আল্লাহ পাকই করবেন। এ মত পোষণ করেছেন হাম্মাদ, এবনে মোবারক, এবনে ইয়াহইয়া এবং ইমাম শাফেয়ী (রঃ)। আর ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর একটি বর্ণনায় রয়েছে, কেয়ামতের দিন

যেভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বের লোকদের পরীক্ষা করা হবে, ঠিক তেমনি মুশরেকদের সন্তানদেরকেও পরীক্ষা করা হবে।

আবু ইয়ালা এবং বাজ্জার হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন চার প্রকার লোককে হাযির করা হবে।

১. যে শিশু জন্ম লাভের পর জীবনে পদার্পণের পূর্বেই মারা যায়,

২. পাগল,

৩. হযরত ঈসা (আঃ)-এর পরে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্বের সময়ের লোকজন,

৪. অত্যন্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি।

এদের প্রত্যেকে নিজ নিজ ওজর-আপত্তি পেশ করবে। আল্লাহ পাক দোযখের অগ্নির উপরের অংশকে হুকুম দেবেন 'বের হয়ে আস'। এরপর এরশাদ করবেন, 'দুনিয়াতে আমি আমার বন্দাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে পয়গম্বর মনোনীত করে প্রেরণ করেছি। আর আমি নিজেই তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছি, তোমরা এ দোযখের অগ্নিতে প্রবেশ কর'। তার জবাবে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে, তারা বলবে, 'আমরা কি অগ্নিতে প্রবেশ করবো? অথচ এ অগ্নি থেকেই তো আমরা পলায়নপর রয়েছি'। আর যারা ভাগ্যবান হবে, তারা আদেশের সঙ্গে সঙ্গে দোযখে প্রবেশ করবে। আল্লাহ পাক তখন নাফরমানদেরকে বলবেন, 'তোমরা যখন আজ আমার আদেশ অমান্য করলে, দুনিয়াতেও তোমরা আমার পয়গম্বরগণকে মিথ্যাজ্ঞান করতে'। অবশেষে যারা আল্লাহর হুকুমে দোযখে প্রবেশ করবে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর আল্লাহর আদেশ অমান্যকারীদেরকে দোযখে প্রেরণ করা হবে।

বাজ্জার এবং মোহাম্মদ এবনে ইয়াহইয়া হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তিন প্রকার লোক (কেয়ামতের দিন) নিজেদের ওজর পেশ করবে। একঃ যখন কোন নবী ছিলেন না তখন যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। দুইঃ পাগল। তিনঃ শিশু (শৈশবকালে যার মৃত্যু হয়েছে)। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ওজর পেশ করবে। কোন নবীর অনুপস্থিতিতে যার মৃত্যু হয়েছে সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার নিকট কোন কিতাব পৌঁছেনি'। পাগল বলবে, 'হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে বিবেক-বুদ্ধি দান করোনি, যার দ্বারা আমি কল্যাণকর পথ অবলম্বন করতে পারতাম'। শিশু বলবে, 'আমি বুদ্ধি-বিবেকের বয়স লাভ করতে পারিনি'।

তাদের ওজর পেশ করার পর দোযখের আগুনের একটি অংশ সামনে আসবে। তখন আল্লাহ পাক হুকুম করবেন, 'এ অগ্নিতে প্রবেশ কর'। যাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের জানা ছিল যে এরা দুনিয়াতে আমলের যমানা যদি পেত তবে নেককার হতো, তারা তখন সঙ্গে সঙ্গে সে আগুনে প্রবেশ করবে। আর যাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের জানা ছিল যে

এরা দুনিয়াতে আমলের যমানা যদি পেয়েও যেত তবু তারা নাফরমান থাকত, তারা তখন আগুনে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহ্ পাক তখন বলবেন, 'আজ যখন তোমরা আমার নাফরমানী করেছ তখন দুনিয়াতেও যদি আমার নবী তোমাদের কাছে পৌঁছতেন তবুও তোমরা তার নাফরমানী করতে'।

ইমাম আহমদ (রঃ), আবু দাউদ (রঃ) এবং হাকেম (রঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তিন প্রকার লোকের থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে (অর্থাৎ তারা শরীয়তের বিধানের আওতাধীন নয়) প্রথমঃ পাগল, যতক্ষণ সে সুস্থ না হয়। দ্বিতীয়ঃ ঘুমন্ত মানুষ, যতক্ষণ সে জাগ্রত না হয়। তৃতীয়ঃ শিশু, যতক্ষণ সে বালেগ না হয়। অন্য হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, যখন কোন ব্যক্তি গুনাহ্ করার ইচ্ছা করে তখন সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাকড়াও করা হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না সে উক্ত ইচ্ছাটি কার্যে পরিণত করে। ব্যাপারটি যদি তাই হয়, তাহলে যে ব্যক্তি গুনাহ করার কোন ইচ্ছা করেনি, বা যার মধ্যে গুনাহ করার কোন যোগ্যতাই নাই তাকে কীভাবে শাস্তি দেয়া হবে, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۭ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۭ

(সূরা বাকারা)

(আল্লাহ পাক কোন লোককে সাধ্যাতীত কষ্ট দেননা। কারণ সৎ কাজের ফল তারই জন্যে এবং তার অন্যায় কাজের পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে।)

এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একমত যে শরীয়তের সকল বিধি-নিষেধ শুধুমাত্র বালেগ এবং বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির উপর প্রয়োগের জন্যে দেয়া হয়েছে।

আল্লামা সয়ুতী (রঃ) লিখেছেন যে, মুশরেকদের শিশু সম্পর্কে একটি বর্ণনা এরূপ আছে যে, জান্নাত এবং দোযখের মাঝখানে বারযাখ্ নামক একটি স্থান রয়েছে, তাদেরকে সেখানে রাখা হবে। সুতরাং তারা দোযখীও হবেনা এবং জান্নাতীও হবেন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেন যে তাদেরকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু একথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মুসলমানদের শিশু সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম একমত যে তারা জান্নাতে যাবে, এ ব্যাপারে আর কোন মতভেদ নেই।

وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا

"আর আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে ইচ্ছা করি তখন তার সুখী সম্প্রদায়কে নির্দেশ প্রদান করি, কিন্তু তারা তাতে নাফরমানী করে, পরিণামে তাদের উপর আমার দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিহ্ন করে দেই"।

পাপাচারের পরিণতি ধ্বংস

একথা সর্বজনবিদিত যে পাপাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো ধ্বংস। কিন্তু কোন

এলাকাবাসীকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেই আল্লাহ পাক ধ্বংস করেন না; বরং তার জন্যে একটি প্রক্রিয়া কার্যকর হয়। আর তা হলো আল্লাহ পাক সমাজের সমৃদ্ধশালী লোকদেরকে আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু তারা আল্লাহ পাকের আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জানায় এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়। আর তখন তাদের উপর শাস্তি আপতিত হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের একটি সাধারণ নিয়ম ঘোষণা করা হয়েছে, যখন কোন জাতি বা সম্প্রদায় আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে সীমালংঘন করে এবং আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হয় যে তাদের শাস্তি বিধান করবেন, তখন তিনি কোন রসূলের মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু তারা সে আদেশ অমান্য করে, তখন তাদেরকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত হয়। এভাবে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংসের এবং শাস্তির পাত্র হিসেবে প্রমাণ করে।

فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

অর্থাৎ তাদের ধ্বংস হঠাৎ হয় না, বরং তারা নাফরমানীতে মশগুল হতে থাকে আর তাদের প্রতি নেয়ামতের বারিধারা বর্ষিত হতে থাকে। কিন্তু তাদের নাফরমানী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরপর তাদের সম্পর্কে আযাবের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এভাবে সে জনপদকে বা সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়। আর এ প্রথা নতুন কিছু নয়; বরং ইতিপূর্বেও বহু অপরাধী সম্প্রদায়কে আমি শাস্তি দিয়েছি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ পর্যায়ে বোখারী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)-এর সূত্রে হযরত জয়নব বিনতে জাহাশের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, একদিন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় আমার নিকট আগমন করলেন। তিনি তখন এরশাদ করছিলেনঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

মন্দ নিকটবর্তী হয়েছে আর তাতে আরবদের জন্যে রয়েছে ধ্বংস। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শাহাদাত ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা একটি বৃত্তের আকার করে এরশাদ করলেন, আজ ইয়াজুয মাজুয এতখানি (দেয়াল) ছিদ্র করে ফেলেছে। হযরত জয়নব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে আমি আরজ করলাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আরবে তো অনেক নেক লোক রয়েছে তারাও কি ধ্বংস হয়ে যাবে'? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ 'হ্যাঁ, যদি অন্যায়-অনাচার প্রসার লাভ করে তবে সকলে ধ্বংস হয়ে যাবে'।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ

আর নূহের পরেও আমি অনেক যুগের লোককে ধ্বংস করেছি। যেমন আদ জাতি, সামুদ জাতি প্রভৃতি।

এ আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে মক্কার কাফেরদের উদ্দেশে। কেননা যেভাবে আল্লাহর নবীগণের বিরোধিতার কারণে অন্যান্য জাতি ধ্বংস হয়েছে, ঠিক তেমনি এ কাফেরদের ধ্বংসও অনিবার্য।

আলোচ্য আয়াতের قرون শব্দটি তাৎপর্যবহ। যারা একই যুগে বাস করে তাদের জন্ম একই সময়ে হয়, তাদের সম্পর্কে বলা হয়। আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধাণ গ্রন্থ কামূসে রয়েছেঃ

هو على قرنى

অর্থাৎ সে আমার বয়সের লোক। আর 'ক্বরণ' শেষ হওয়ার অর্থ হলো সে যুগের কেউ বেঁচে নেই। সাহাবায়ে কেরামের ক্বরনের অর্থ হলো- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভকারী কোন ব্যক্তি এখনও বাকী আছে। কিন্তু যখন কেউ থাকবেনা তখন বলা হবে, সাহাবায়ে কেরামের যুগ শেষ হয়েছে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, একটি নির্দিষ্ট সময়কে 'ক্বরণ' বলা হয়। তবে ঐ নির্দিষ্ট সময় কত হবে এ বিষয় একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেছেন দশ বছর, কেউ বলেছেন বিশ বছর, কেউ বলেছেন পঞ্চাশ, কেউ বলেছেন ষাট, কেউ সত্তর, কেউ আশি এবং কেউ বলেছেন একশ' বছর। কামূসে এসব কথার উদ্ধৃতি রয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, সঠিক কথা হলো এক শতাব্দীকে 'ক্বরণ' বলা হয়। মুহাম্মদ বিন কাসেম আবদুল্লাহ এবনে তসতর মা'যানীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর দস্তে মুবারক আমার মাথায় স্থাপন করে বলেছেন, এই ছেলেটি এক ক্বরণ বাঁচবে। মুহাম্মদ বিন কাসেম বর্ণনা করেন, আমরা সর্বদা আবদুল্লাহর বয়সের হিসাব রাখতাম, অবশেষে যখন তাঁর একশ' বছর পূর্ণ হলো তখন তিনি এন্তেকাল করলেন।[১]

আয়াতের মর্মকথা

আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মানুষ যখন পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানী ও অবাধ্যতার মাধ্যমে এ সুন্দর বসুন্ধরাকে অসুন্দর করে ফেলে এবং সমগ্র পরিবেশকে দূষিত ও বিষাক্ত করে তোলে, তখন তাদের উপর আল্লাহ পাকের আযাব নেমে আসে। হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগ থেকেই আল্লাহ পাকের এ নীতি প্রচলিত হয়ে আসছে। কেননা হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে তিনি সুদীর্ঘ ৯৫০ বছর ধরে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু পাপাচারে অভ্যস্ত এ হতভাগা জাতি সরল-সঠিক পথে আসেনি। পরিণামে তারা নিপতিত হয়েছে আল্লাহ পাকের আযাবে। এভাবে আল্লাহর আযাবের সূচনা হয় হযরত নূহ (আঃ)-এর সময় থেকে তবে সে আযাব নাজিল হওয়ার পূর্বে আল্লাহ পাক নবী রসূলগণের মাধ্যমে মানুষকে বারে বারে সতর্ক করেন। যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫৬-৫৭

(আর আমি রসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত কোন সম্প্রদায়কে শাস্তি প্রদান করি না।)

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ (সূরা নেছা)

(তোমাদেরকে আযাব দিয়ে আল্লাহ পাক কী করবেন, যদি তোমরা শোকর-গুজার হও এবং ঈমান আনয়ন কর।)

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرٰى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ (সূরা কাসাস)

"আর আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করিনা কিন্তু যখন তার অধিবাসীরা জালেম হয় (তখন তাদের ধ্বংসের সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়)"।

এ সমস্ত আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, কোন জাতি যখন অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়ে সীমালংঘন করতে থাকে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বারে বারে সতর্ক করা সত্বেও তারা অন্যায়-অনাচার থেকে বিরত না হয় তখন তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। যেমন হযরত নূহ (আঃ)-এর অবাধ্য জাতিকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল, প্রলয়ংকরী বন্যায় তাদের সলিল সমাধি ঘটেছিল। এরপর আদ ও সামুদ জাতিরও একই পরিণতি হয়েছিল। ফেরআউন নমরূদকেও তাদের নাফরমানীর কারণে আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হতে হয়েছিল। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে মানুষের কীর্তিকলাপই তাদের শাস্তির কারণ হয়।[১]

وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا

"আর আপনার প্রতিপালকই তাঁর বন্দাদের গুনাহ জানা এবং দেখার জন্যে যথেষ্ট"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নিকট মানুষের কোন আমলই গোপন নেই। মানুষ তার অন্যায় যত গোপন রাখারই চেষ্টা করুক, আল্লাহ পাকের দরবারে কোন কিছুই গোপন থাকে না, বরং সবই তিনি দেখেন, সব কিছুই তাঁর নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত। কেউ অতি গোপনে ঘুষ গ্রহণ করে আর কেউ গোপনে বা বিভিন্ন নাম দিয়ে সুদ গ্রহণ করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। আর কেউ অন্য কোন অনাচারে লিপ্ত হয়। কিন্তু আল্লাহ পাক এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে তিনি মানুষের কীর্তিকলাপ এবং পাপাচার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। অতএব সতর্কতা অবলম্বনই শ্রেয় এবং আত্ম সংশোধনের মাধ্যমে পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করাই পরিণামদর্শী মানুষের কাজ।

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-১৭৪-১৭৫

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ
لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا
مَّدْحُوْرًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ﴿١٩﴾ كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ
وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ﴿٢٠﴾
اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ
وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ﴿٢١﴾ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا
مَّخْذُوْلًا ﴿٢٢﴾

তরজমা

(১৮) যে শুধু (দুনিয়ার) আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করে, আমি যাকে যা ইচ্ছা এখানেই সত্বর দিয়ে থাকি। পরে তার জন্যে দোযখই ঠিক রেখেছি, সে তাতে প্রবেশ করবে, নিন্দিত ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত অবস্থায়।

(১৯) আর যারা মোমেন অবস্থায় আখেরাতের সাফল্য কামনা করে, আর তার জন্যে যথাযোগ্য চেষ্টা করে, তাদের চেষ্টাই স্বীকৃত হয়ে থাকে।

(২০) (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক তাঁর দান দ্বারা এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করেন, আর আপনার প্রতিপালকের বদান্যতা অবারিত।

(২১) লক্ষ্য কর, আমি কীভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, আর আখেরাত-তো অবশ্যই মর্যাদায় মহত্তর ও গুণে শ্রেষ্ঠতর।

(২২) আল্লাহ পাকের সঙ্গে অন্য কোন মা'বুদ স্থির করোনা, নতুবা তোমাকে নিন্দিত ও অসহায় হয়ে বসে থাকতে হবে।

তফসীরুল কোরআন

যারা এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মায়া-মোহে মুগ্ধ মত্ত মাতোয়ারা হয়ে থাকে, এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনের আরাম-আয়েশ নিয়েই ব্যস্ত থাকে এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা ক্ষণিকের জন্যেও চিন্তা করেনা এবং এর জন্যে কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করেনা, আল্লাহ পাকের

প্রতি ঈমান এবং আনুগত্য প্রকাশ করেনা, প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে না, তাঁর অনুসরণ করেনা তাদের সম্পর্কে এ আয়াতে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ

এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার লাভ-লোভ এবং পার্থিব স্বার্থ অর্জন করাই যাদের উদ্দেশ্য হয়, তাদেরকে যা ইচ্ছা এবং যাকে যতখানি ইচ্ছা আমি দুনিয়ার নেয়ামত দিয়ে থাকি। এর দ্বারা কয়েকটি কথা প্রতীয়মান হয়।

১. যারা আখেরাতকে ভুলে থাকে ও দুনিয়ার লোভ-মোহ নিয়েই মুগ্ধ থাকে তাদেরকে তাৎক্ষণিক শাস্তি বিধান করা বা তাদেরকে ধ্বংস করা আল্লাহ পাকের নীতি বিরুদ্ধ কাজ; বরং তারা যেহেতু শুধু দুনিয়াই চায় আখেরাতের ব্যাপারে গাফেল থাকে, তাই তাদেরকে আল্লাহ পাকের বিচার-বিবেচনা মোতাবেক যাকে যতটুকু মর্জি হয় দুনিয়া দান করে থাকেন।

২. আর যারা দুনিয়ার স্বার্থ কামনা করে তাদের প্রত্যেক চাওয়াই যে পূর্ণ হবে তাও নয়; বরং আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা দান করে থাকেন।

কিন্তু যেহেতু তারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনা, তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করেনা এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসও করেনা, তার প্রস্তুতিও গ্রহণ করেনা, তাই আখেরাতে তারা হবে নিঃস্ব, রিক্তহস্ত এবং সর্বহারা।

পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا

"এরপর তাদের জন্যে আমি দোযখ নির্দিষ্ট করে রেখেছি, তারা নিন্দিত, লাঞ্ছিত এবং অপমানিত অবস্থায় দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে"।

এ কথাটি আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ أُولٰئِكَ مَأْوٰهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (সূরা ইউনুস)

"নিশ্চয় যারা আমার মোলাকাতের আকাংক্ষা করেনা এবং যারা এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া নিয়েই সন্তুষ্ট এবং নিশ্চিন্ত এবং যারা আমার আয়াত সমূহ সম্পর্কে গাফেল, তারাই সে সব লোক যাদের ঠিকানা হলো দোযখ, তাদের কৃতকর্মের পরিণতি স্বরূপ"।

শিক্ষণীয় বিষয়

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত বড় শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আজকের দুনিয়ায় বহু লোক বিভিন্ন প্রকার অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াদারিতে তথা অর্থ-সম্পদ সংগ্রহে, ক্ষমতা ও শক্তি অর্জনে সফলকাম হওয়ার কারণে

শুধু যে গর্ববোধ করে তাই নয়; বরং আখেরাতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ গাফলতের আবর্তে নিপতিত এবং নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে। কেউ ঘুষ গ্রহণ করে নিজের অর্থ লিপ্সা চরিতার্থ করছে, আর কেউ সুদখোরীর মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে এবং গৌরব বোধ করছে। অথচ চক্ষু বন্ধ হওয়ার পর তথা এ জীবনের অবসান ঘটার পর তার এসব কিছুই থাকবে না, এ সত্য সে উপলব্ধি করতে পারেনা। তাই হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন,

الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا

(দুনিয়ার সব মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে, যখন তাদের মৃত্যু হবে তখন তারা জাগ্রত হবে।)

আর তখন আক্ষেপ করে বলবে,

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ (সূরা ওয়ালফাজর)

"হায় আক্ষেপ! যদি এ জীবনের জন্যে কিছু করে পাঠাতাম তাহলে আজ মহা বিপদের সম্মুখীন হতাম না"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ যেহেতু দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট লোকেরা ক্ষণস্থায়ী বিষয়কে চিরস্থায়ী বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছে, তথা আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে তাই আখেরাতে তারা আল্লাহ পাকের রহমত থেকে হবে বঞ্চিত এবং অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় তারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।

মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছেঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, দুনিয়া সে ব্যক্তির গৃহ, আখেরাতে যার কোন গৃহ নেই। এটি সে ব্যক্তির সম্পদ, যার আখেরাতে কোন সম্পদ নেই। আর দুনিয়া সে ব্যক্তিই জমা করতে থাকে যার সুস্থ বিবেক নেই।[১]

العاجلة শব্দটির অর্থ হলো দুনিয়া আর দুনিয়ার ইচ্ছা করার তাৎপর্য হলো আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া। যারা এমন অযৌক্তিক, গর্হিত কাজ করবে তারা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেবে এবং তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। কেননা তাদের জীবনের সকল সাধনার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, এ ক্ষণস্থায়ী জগতের লাভ এবং লোভ। এতদ্ব্যতীত তারা আর কিছুই বুঝতে চায়নি। কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ এ আয়াতে মুনাফেকদের কথা বলা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। কেননা তারা মুসলমানদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে জেহাদে অংশ গ্রহণ করতো, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সওয়াব হাছিল করা বা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা হতো না; বরং তারা গণীমত বা যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ অর্জনের লক্ষ্যেই জেহাদে শরীক হতো।[২]

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৩৭
২। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৪৭

مَشْكُورًا

"আর যারা মোমেন অবস্থায় আখেরাতের সাফল্য কামনা করে এবং তার জন্যে যথাযোগ্য চেষ্টা করে তাদের সে-চেষ্টাই স্বীকৃত হয়ে থাকে"।

অর্থাৎ যারা আখেরাতের সাফল্য কামনা করে আর এ মহান উদ্দেশে সত্য-সাধনায় মগ্ন থাকে, যাদের অন্তর ঈমানের আলোকে উদ্ভাসিত থাকে, যারা আত্মশুদ্ধি লাভ করে, যারা খালেছ নিয়তে এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে জীবন-সাধনায় ব্রতী থাকে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসারী হয়ে অকৃত্রিম হৃদয়ে সত্য-সাধনায় তন্ময় থাকে, তাদের এ সাধনা কখনও ব্যর্থ হবে না; বরং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তা সাদরে গৃহীত এবং সমাদৃত হবে।

আমল কবুল হওয়ার শর্ত

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আমল কবুল হওয়ার জন্যে তিনটি শর্ত রয়েছে।

একঃ নিয়ত সঠিক হতে হবে।
وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়।

দুইঃ ঐ আমল হতে হবে সঠিক পন্থায়, তথা শরীয়তের বিধান মোতাবেক।
وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়।

অতএব, যারা শরীয়তের বরখেলাফ সাধনায় রত হয় তাদের সাধনা আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না।

তিনঃ সাধকের ঈমান আকীদা সঠিক হতে হবে। আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ এবং খাঁটি ঈমান থাকতে হবে।
وَهُوَ مُؤْمِنٌ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়।

এ আয়াতের আলোকে পৃথিবীর মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। যারা এ ক্ষণস্থায়ী জগৎ ও জীবনের লাভ অর্জনে এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত-মুগ্ধ রয়েছে, আখেরাতের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস করেনি। প্রথম আয়াতে এ লোকদেরই ভয়াবহ পরিণামের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরাই হবে দোযখের অধিবাসী।

আর দ্বিতীয় দল হলো তাদের, যারা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়না, বরং আখেরাতের সাফল্যের জন্যে সর্বক্ষণ সাধনায় রত থাকে। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ঐ সাধনা গৃহীত হয় এবং তারা আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (সূরা ইউনুস)

"সতর্ক হও, যারা আল্লাহর প্রিয় তাদের কোন ভয় নেই এবং তাদের কোন দুশ্চিন্তাও থাকবে না"।

প্রশ্ন হলো কারা আল্লাহর প্রিয়? পরবর্তী আয়াতাংশে এর জবাবে এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ

"যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং সর্বক্ষণ আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকে"।

তাদের সম্পর্কে আরও ঘোষণা করা হয়েছেঃ

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

"তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানে"।

لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

"আল্লাহ পাকের কথায় কোন পরিবর্তন হয় না। আর এ হলো মহান সাফল্য"।

আলোচ্য আয়াতে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে, যারা দুনিয়া চায় তাদেরকে আল্লাহ পাক তাঁর ইচ্ছা ও মর্জি মোতাবেক যাকে যা ইচ্ছা দুনিয়া দান করেন। পক্ষান্তরে যারা আখেরাতের সাফল্য কামনা করে, আল্লাহ পাক তাদেরকেও তাঁর বন্দেগীর তওফিক দান করেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী একথাও বলেছেন যে আল্লাহ পাক দুনিয়ার নেয়ামত মোমেন ও কাফের উভয়কেই দান করেন। কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত শুধু মোমেনদের জন্যেই সংরক্ষিত রয়েছে। আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে একথা বলেছেন যে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে রিয্ক সকলকেই দান করেন। ভাল, মন্দ, মোমেন, কাফের কারো জন্যে রিয্কের দ্বার বন্ধ করা হয় না। কেননা সকলেই আল্লাহর বন্দা, সকলেই আল্লাহর সৃষ্টি তাই সকলকে তিনি রিয্ক দিয়ে থাকেন। কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত শুধু মোমেন বন্দাগণই লাভ করবে।[১]

كُلًّا نُّمِدُّ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ

"(হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের দান থেকে আমি প্রত্যেককেই পরিবেশন করে থাকি, এদেরকেও, ওদেরকেও, আপনার প্রতিপালকের বদান্যতা কেউ বন্ধ করে রাখেনি"।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ পৃথিবীর মানুষ দু' দলে বিভক্ত। একদল দুনিয়া-প্রিয়, আরেকদল আখেরাতের কল্যাণকামী। আল্লাহ পাক তাঁর মর্জি মোতাবেক প্রত্যেককেই দান করে থাকেন। তাঁর দানের পথ কখনো রুদ্ধ হয় না। তিনি করুণাময়,

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৯৯-৩০০

সর্বদা তাঁর করুণা-বৃষ্টি হতেই থাকে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক এমন ক্ষমতাবান, যিনি কখনো কারো প্রতি জুলুম করেন না, প্রত্যেককে তার যথাযোগ্য বস্তু তিনি দান করে থাকেন। তাঁর ইচ্ছাকে কেউ বাধা দিতে পারেনা, তাঁর দানের পথও কেউ রুদ্ধ করতে পারেনা। আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত ব্যাপক, যা কখনো বন্ধ হয়না, কমেনা।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক উভয় দলকে দান করেন অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, সৌন্দর্য এবং মর্যাদা ও সম্মান। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর মর্জি মোতাবেক দিয়ে থাকেন। মোমেন হোক কি কাফের উভয় দলকে তিনি দান করে থাকেন। কাফের হওয়ার কারণে কারো প্রতি আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতের দ্বার রুদ্ধ হয়না। হিসাব হবে আখেরাতে, তাই দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতের দ্বার অবারিত।[২]

শায়খে আকবর মহিউদ্দিন এবনে আরাবী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, বন্দা দুনিয়া-প্রিয় হোক অথবা আখেরাত-প্রার্থী, আল্লাহ্ পাক প্রত্যেককে দান করে থাকেন। প্রত্যেকেই তাঁর দান লাভ করে। নেককার হোক কি বদকার, কেউ আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত থেকে মাহরুম হয়না।[৩]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে জরীর তাবারী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ যারা দুনিয়া-প্রিয়, আর যারা আখেরাতের কল্যাণকামী এবং প্রকৃত মোমেন, উভয় দলকেই আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে রিয্ক দান করেন। যার জন্যে যা লিপিবদ্ধ আছে প্রত্যেকে তা পেয়ে থাকে। কিন্তু মৃত্যুর পর তাদের মধ্যে পার্থক্য করা হবে। যারা দুনিয়া-প্রিয়, আখেরাতকে ভুলে থাকে তারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। আর যারা আখেরাতের সাফল্যের জন্যে সচেষ্ট থাকে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাক যাকে যা দেয়ার ইচ্ছা তা দান করবেন। কেউ তা বন্ধ করতে পারবে না। আর যাকে যা তিনি দেবেন না, কেউ তা দিতে পারবে না।

আল্লামা এবনে জরীর তাবারী (রঃ) এ পর্যায়ে ইমাম কাতাদা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন, আল্লাহ্ পাক দুনিয়াকে নেককার ও বদকারদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন, কিন্তু আখেরাতকে বিশেষভাবে রেখেছেন মুত্তাকী-পরহেযগারদের জন্যে।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা দুনিয়ার লাভ ও লোভে মুগ্ধ, দুনিয়ার সাফল্য অর্জনে ব্যস্ত এবং আখেরাত সম্পর্কে গাফেল, আল্লাহ্ পাক তাদেরকেও রিয্ক দান করেন। আর যারা আখেরাতের সাফল্যের জন্যে প্রয়াসী আল্লাহ্ পাক উভয়কেই রিয্ক দান করেন-নেককার হোক কি বদকার।[৪]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৩৭
২। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-১৮১
৩। তফসীরে মহিউদ্দিন এবনে আরাবী (রহঃ), খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭১৪
৪। তফসীরে তাবারী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৪৫

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة اكبر درجت واكبر تفضيلا

"লক্ষ্য করে দেখ, একের তুলনায় অন্যকে আমি কিভাবে প্রাধান্য দিয়েছি। আর মর্যাদার দিক থেকে আখেরাত অত্যন্ত মহান এবং শ্রেষ্ঠ"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ তোমরা লক্ষ্য করে দেখ দুনিয়াতে আমি একজনকে অন্যজনের উপর ফজিলত ও মর্যাদা দিয়েছি, তথা একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিয়েছি, কেউ আমীর কেউ ফকীর, কেউ মধ্যবিত্ত, কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র। মান-মর্যাদায়, ধন-সম্পদে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে, সুখ-সম্পদে, সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে দুনিয়াতে যেভাবে তারতম্য এবং পার্থক্য রয়েছে, ঠিক তেমনি আখেরাতেও পার্থক্য থাকবে। যারা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয়ে জীবন যাপন করে অথচ অহরহ আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করতে থাকে, তারা স্বাভাবিক ভাবেই দোযখে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী হবে, তারা জান্নাতের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করতে থাকবে। আর জান্নাতবাসীদের পরস্পরের মর্যাদাতেও আকাশ-পাতাল পরিমাণ পার্থক্য থাকবে। পৃথিবীতে থেকে যেমন আমরা আকাশে তারকা দেখতে পাই, নিম্নস্তরের জান্নাতবাসীরা উচ্চস্তরের জান্নাতবাসীদেরকে ঠিক তেমনি দেখতে পাবে। অবশ্য জান্নাত তারাই লাভ করবে, যাদের ঈমান হবে মজবুত, সুদৃঢ় এবং খাঁটি। যাদের জীবন-সাধনার উদ্দেশ্য হবে একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসারী, তারাই আখেরাতে উচ্চ মর্যাদা লাভে ধন্য হবে।

لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا

"আল্লাহ পাকের সঙ্গে অন্য কোন মা'বুদ স্থির করোনা, নতুবা তোমাকে নিন্দিত ও অসহায় হয়ে বসে থাকতে হবে"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। একদল দুনিয়া প্রিয়, যাদের পরিণাম হলো আখেরাতের আযাব। আরেক দল যারা আখেরাতের কল্যাণকামী, আল্লাহ পাকের অনুগত, তাদের শুভ পরিণতি হলো আখেরাতের সওয়াব, তবে এর জন্য তিনটি পূর্বশর্ত রয়েছে। একঃ আখেরাতের সাফল্যের জন্যে সচেষ্ট হতে হবে তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্যের আকাংক্ষা থাকতে হবে। দুইঃ এ আকাংক্ষা পূরণের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা এবং সাধনা অব্যাহত থাকতে হবে। তিনঃ ঐ ব্যক্তি প্রকৃত মোমেন হতে হবে।

আর আলোচ্য আয়াতে ঈমানের তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। ঈমান হলো তওহীদ

তথা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। কোন প্রকার শেরক না করা। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

"আল্লাহ পাকের সঙ্গে অন্য কোন মা'বুদ স্থির করোনা"।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অথচ এ আয়াতে শেরক না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, যদিও প্রকাশ্যে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে, কিন্তু উদ্দেশ্য করা হয়েছে তাঁর সমগ্র উম্মতকে। এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় অন্য আয়াতেঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ (সূরা তালাক)

এ আয়াতেও সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আর উদ্দেশ্য করা হয়েছে সমগ্র উম্মতকে। অথবা কথাটি এভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

ايها الانسان

অর্থাৎ হে মানব জাতি! আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক স্থির করোনা। যদি তা কর তবে তোমরা লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং অসহায় ও নিরুপায় হয়ে বসে থাকবে।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শায়খে আকবর মহিউদ্দিন এবনে আরাবী (রঃ) লিখেছেনঃ আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো কাছে দানের আশা করে আল্লাহ পাকের সঙ্গে অন্য কিছুকে মা'বুদ স্থির করোনা। আল্লাহ পাক কোন জিনিস যখন তোমার তকদীরে না রাখেন এমন অবস্থায় সে জিনিস অন্যের কাছে যদি আশা করা হয় তবে তা-ও হবে শেরক। এমন অবস্থায় তাকে অসহায় এবং অপমানিত হয়ে দোযখে প্রবেশ করতে হবে। এজন্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ (সূরা আলে-এমরান)

"আর যদি তিনি তোমাদেরকে অপমানিত করেন তবে তাঁর পরে কে তোমাদেরকে সাহায্য করবে"?

আর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি সারা পৃথিবীর মানুষ একত্রিত হয় তোমার উপকার করার জন্যে, আল্লাহ পাক যা তোমার জন্যে লিখে দিয়েছেন তা ব্যতীত অন্য কোন উপকার তারা করতে সক্ষম হবে না। পক্ষান্তরে, যদি সারা পৃথিবীর মানুষ একত্রিত হয় তোমার ক্ষতি সাধনের জন্যে, আল্লাহ পাক যা তোমার ব্যাপারে লিখে দিয়েছেন তা ব্যতীত অন্য কোন ক্ষতি সাধন করতে তারা সক্ষম হবে না। তকদীর লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, কলম তুলে ফেলা হয়েছে এবং কালি শুকিয়ে গেছে।[২]

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-১৮২
২। তফসীরে শায়খে আকবর এবনে আরাবী (রঃ), খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭১৬

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ
اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ
وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ
الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ؕ ﴿٢٤﴾
رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ
لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ﴿٢٥﴾ وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ
السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ
الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾ وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ
عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿٢٨﴾
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ﴿٢٩﴾ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ
يَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿٣٠﴾

তরজমা

(২৩) আর আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা তিনি ভিন্ন আর কারো বন্দেগী করোনা। পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার সম্মুখে বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে "উফ" কথাটি বলোনা, তাদেরকে ধমক দিওনা। আর তাদের সাথে সম্মানসূচক বিনম্র কথা বল।

(২৪) তাদের সম্মুখে বিনয়ের পাখা সবিনয়ে অবনত কর এবং বল, 'হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে তাঁরা আমার শৈশব কালে আমাকে লালন-পালন করেছেন'।

(২৫) তোমাদের অন্তরে যা-কিছু আছে তোমাদের প্রতিপালক সে-সম্পর্কে খুব ভালভাবেই অবগত। তোমরা যদি নেককার হও তবে নিশ্চয় আল্লাহ পাক তওবাকারীদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

(২৬) আর আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন এবং মুসাফিরকে তাদের হক্ব দিও। আর কোন অবস্থাতেই অপব্যয় করোনা।

(২৭) নিশ্চয় যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই, আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।

(২৮) আর (হে রসূল!) যদি কখনও আপনার প্রতিপালকের প্রত্যাশিত রহমতের অপেক্ষায় তাদের থেকে মুখ ফেরাতে হয়, তবে বিনম্রভাবে তাদের সাথে কথা বলুন।

(২৯) আর (হে রসূল!) আপনার হস্তকে স্বীয় গ্রীবায় আবদ্ধ করে রাখবেন না, আর তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করবেন না, তাহলে আপনাকে নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে বসে থাকতে হবে।

(৩০) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা স্বচ্ছল জীবিকা দান করে থাকেন এবং তিনি সংকীর্ণও করেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বন্দাদেরকে ভালভাবে জানেন এবং দেখেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আখেরাত তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সাধনার কথা ছিল। যারা আখেরাতের জন্যে সাধনায় রত হবে আল্লাহ পাক তাদেরকে আখেরাতের নেয়ামত দান করবেন।

আলোচ্য আয়াত সমূহে এমন আমলের বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে, যার মাধ্যমে মানুষ আখেরাতের নেয়ামত অর্জন করতে পারে। আর এ আয়াত সমূহে সে বিধান সমূহের বর্ণনা রয়েছে যার মাধ্যমে মানুষ হেদায়েত অর্জন করতে পারে। যে কর্মসূচীর বাস্তবায়নের মাধ্যমে আখেরাতের সাফল্য অর্জন করা যায় তার প্রথম কথাই হলো তওহীদে বিশ্বাস। তাই তওহীদের কথা দিয়েই বিষয়টি শুরু করা হয়েছে আর তওহীদের উপরই শেষ করা হয়েছে, যেন একথা জানা যায় যে শেরক হলো জঘন্যতম পাপ। এরপর ইসলামের অনেক বিধান এ স্থলে বর্ণিত হয়েছে, যা ইসলামী জীবন-ধারার বৈশিষ্ট্য। এ বর্ণনার মাধ্যমে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যদি তোমরা সত্যিই আখেরাতের সাফল্য কামনা কর, তবে এ আয়াত সমূহে বর্ণিত বিধি-নিষেধ পালন কর।[১]

পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে এরশাদ হয়েছে,

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ

অর্থাৎ যে হেদায়েত অবলম্বন করে সে তার নিজের উপকারার্থেই করে।

এ আয়াত থেকে সে হেদায়েতের বিধান সমূহ বর্ণিত হয়েছে যার উপর আমল করলে মানুষ হেদায়েত লাভ করতে পারে। আয়াত সমূহ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩০৬

আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ তৌরাতে যে নৈতিক শিক্ষা রয়েছে, তা পবিত্র কোরআনের এ পনেরটি আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রথম হুকুমঃ তওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ

"আর আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ভিন্ন আর কারো বন্দেগী করোনা"।

কেননা তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিয্কদাতা। মাতা-পিতা বা সন্তান-সন্ততি সকলেরই স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্ পাক। তাই এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, শুধু তাঁরই বন্দেগী করা, আর কারো নিকট মাথা নত না করা, আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং শুধু তাঁর প্রতিই ভরসা করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

দ্বিতীয় হুকুমঃ পিতা-মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন

এরশাদ হয়েছেঃ

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

"আর তোমাদের পিতা-মাতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর"।

اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

"তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার সম্মুখে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে "উফ" কথাটি বলোনা। তাদেরকে ধমক দিয়োনা, আর তাদের উভয়ের সাথে অত্যন্ত সম্মানসূচক বিনম্র ভাবে কথা বল"।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর তওহীদ বা একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পাশাপাশি পিতা-মাতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তফসীরকারগণ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের তওহীদের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে পিতা-মাতার প্রতি এহসান করার যে তাগিদ রয়েছে, তার তাৎপর্য কি?

ইমাম রাজী (রঃ) এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল্লাহ্ পাকই সকলের স্রষ্টা, আর পিতা-মাতাকে আল্লাহ্ পাক সন্তান-সন্ততির অস্তিত্ব প্রকাশের মাধ্যম বানিয়েছেন। তাই একই সঙ্গে নির্দেশ হয়েছে, স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী কর এবং পিতা-মাতার প্রতি এহসান কর। এজন্যে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ (সূরা লোকমান)

"তুমি আমার শোকর আদায় কর এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"।

এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

من لم يشكر الناس لم يشكر الله

"যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়না, সে আল্লাহ পাকের প্রতিও কৃতজ্ঞ হয়না"।

কোরআনে করীমের একাধিক আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর এবাদতের হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম রাজী (রঃ)-এর কারণ সম্পর্কে লিখেছেনঃ সন্তান মাত্রই তার পিতা-মাতার অংশ। যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

فاطمة بضعة منى

"ফাতেমা আমার অংশ বিশেষ"।

দ্বিতীয়তঃ সন্তান-সন্ততির প্রতি পিতা-মাতার স্নেহ-মমতা নজিরবিহীন। এটি আল্লাহ পাকের রহমতের একটি নমুনা মাত্র। সন্তানের সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং তাকে সর্ব প্রকার ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্যে পিতা-মাতা সর্বক্ষণ সচেষ্ট থাকেন। তাই কোন মানুষের কাছ থেকে অন্য মানুষ যা পায় তা বিচার করলে দেখা যায়, পিতা-মাতার নিকট সন্তান-সন্ততি সর্বাধিক মায়া-মমতা তথা উপকার পায়।

তৃতীয়তঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর যখন সে থাকে চরম অসহায়, নিরুপায় তখন পিতা-মাতাই তার সেবা-যত্নে, লালন-পালনে ব্যস্ত থাকে। আর এ অবস্থা প্রতিটি মানুষের জীবনেই আসে।

চতুর্থতঃ মানুষ যখন কারো উপকার করে তখন অপরপক্ষ থেকেও অনুরূপ প্রতিদান আশা করে। কিন্তু পিতা-মাতা সন্তানের জন্যে যা কিছু করে, তা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে করে। কোন প্রকার বিনিময়ের আশায় করেনা। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে সর্ব প্রথম তাঁর বন্দেগীর নির্দেশ দিয়েছেন এবং এরপর পিতা-মাতার প্রতি এহসান করার তাগিদ করেছেন।[১]

শায়খে আকবর মহিউদ্দীন এবনে আরাবী (রঃ) এ পর্যায়ে লিখেছেনঃ তওহীদ এবং পিতা-মাতার প্রতি এহসানের কথা আল্লাহ পাক একত্রিত করে বর্ণনা করেছেন। এর কারণ এই যে, আল্লাহ পাক মানুষের সৃষ্টির জন্যে পিতা-মাতাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যখন প্রতিটি মানুষ থাকে দুর্বল অসহায় তখন আল্লাহ পাক পিতা-মাতার মাধ্যমেই তাকে লালন-পালন করেন। তাই আল্লাহ পাকের রবুবিয়্যত বা লালন-পালন, রহমত এবং দয়া-মায়ার কিছু অংশ পিতা-মাতার স্নেহ মমতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করছেন কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-১৮৫
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩০৭

নন, মানুষের কাছে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তওহীদে বিশ্বাস করার পরই তোমরা পিতা-মাতার প্রতি এহসান কর এবং তাদের হক্ব আদায় কর।[১]

পিতা-মাতার প্রতি এহসান করার যে আদেশ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে, তার ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ সন্তানের কর্তব্য হলো পিতা-মাতার প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকা, তাঁদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করা, তাঁদের প্রতি মধুর ব্যবহার করা, তাঁদের সেবা-যত্নে আত্মনিয়োগ করা, পিতা-মাতার সাথে বিনম্র ভাষায় কথা বলা, তাঁদের সন্তুষ্টি কামনা করা, এমন কোন কথা বা কাজ না করা যা তাঁদের কষ্টের কারণ হতে পারে এবং তাঁদের সম্মুখে সর্বদা বিনীত থাকা।[২]

বিশেষতঃ পিতা-মাতা যখন বয়োবৃদ্ধ হয়ে যায় তখন তাঁদের সেবা-যত্নে আত্মনিয়োগ করা।

এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক এ নির্দেশও দিয়েছেন যে পিতা-মাতার জীবদ্দশায়ই সেবা-যত্ন করে ক্ষান্ত হবেনা; বরং তাঁদের এন্তেকালের পরও তাঁদের জন্যে সন্তানেরা দোয়া করবে, আর কোন্ ভাষায় দোয়া করবে তারও নির্দেশ রয়েছেঃ

وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا

"তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক! যেভাবে আমার পিতা-মাতা শৈশব কালে আমাকে লালন-পালন করেছেন, ঠিক তেমনি তুমি তাঁদের প্রতি দয়া কর"।

পিতা-মাতার হক্ব আদায়ের ব্যাপারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে তাগিদ করেছেন। তিনি (হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে) এরশাদ করেছেনঃ

رضا الرب فى رضا الوالدين

পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জনের মাঝেই নিহিত রয়েছে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি। আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির মধ্যে। (তিরমিজী, হাকেম) অর্থাৎ যে সন্তান তার পিতা-মাতাকে অসন্তুষ্ট করে, সে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেনা।

হযরত আবু দরদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পিতা জান্নাতের মধ্য দুয়ার, তোমার ইচ্ছা হলে তার হেফাজত কর, অথবা বিনষ্ট কর। (আহমদ, তিরমিজী, এবনে মাজা)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) এবং হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবেনা (১) যে কারো উপকার করার পর একথা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় (২) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান (৩) মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি। (নেসায়ী,

১। তফসীরে শায়খে আকবর ইবনে আরাবী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭১৭
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৩৮

দারমী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যার সম্মুখে আমার আলোচনা হয় অথচ সে আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করেনা, আর সে ব্যক্তিও ধ্বংস হোক যে রমজান মাস পাওয়া সত্ত্বেও তার মাগফেরাত লাভ করেনি (অর্থাৎ সে রোযা রাখেনি এবং কৃত অন্যায়ের জন্যে তওবা করেনি) আর সে ব্যক্তিও ধ্বংস হোক যার পিতা-মাতা উভয়কে বা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তাদের খেদমত করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেনি। (তিরমিজী)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! সন্তানের উপর পিতা-মাতার কি হক্ব? তিনি এরশাদ করলেনঃ তারা তোমার জান্নাত এবং দোযখ। (এবনে মাজা) অর্থাৎ যদি সন্তান পিতা-মাতার সেবা-যত্ন করে তবে জান্নাত লাভ করে, নতুবা দোযখ।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার ব্যাপারে সকালে আল্লাহ পাকের অনুগত হয় তার জন্যে জান্নাতের দু'টি দ্বার উন্মুক্ত হয়, আর যে ব্যক্তি পিতা-মাতার মধ্যে একজনের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের অনুগত হয়, তার জন্যে জান্নাতের একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়। আর যে সন্ধ্যাকালে তার পিতা-মাতার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের নাফরমান হয় তার জন্যে দোযখের দু'টি দ্বার উন্মুক্ত হয়। আর যে দু'জনের একজনের ব্যাপারে না-ফরমান হয় তার জন্যে দোযখের একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়। এক ব্যক্তি আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! 'যদি পিতা-মাতা সন্তানের হক্ব নষ্ট করে তবুও'? তিনি এরশাদ করলেন, 'যদি তারা সন্তানের প্রতি জুলুম করে এবং তাদের হক্ব নষ্ট করে তবুও'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এই হাদীস বর্ণিত, যে পিতা-মাতার অনুগত সন্তান পিতা-মাতার দিকে দয়া-মায়ার দৃষ্টিতে দেখে, আল্লাহ পাক প্রত্যেক নজরের বিনিময়ে একটি মকবুল হজ্জের সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন, সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, 'যদি প্রত্যহ শতবার এভাবে দেখে'? তিনি এরশাদ করলেন, 'হ্যাঁ তবুও, আল্লাহ পাক তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র'।

হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সমস্ত গুনাহর মধ্যে আল্লাহ পাক যা-ইচ্ছা মাফ করবেন পিতা-মাতার নাফরমানী ব্যতীত। কেননা আল্লাহ পাক পিতা-মাতার নাফরমানীর শাস্তি মৃত্যুর পূর্বে তথা এ জীবনেই দিয়ে দেন।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৬০-৬১
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৬০-৬১

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাঁদের প্রতি করণীয়

একজন আনসারী সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ আরজী পেশ করলেন, আমার পিতা-মাতার এন্তেকালের পর আমি কি তাঁদের সাথে কোন ভাল ব্যবহার করতে পারি? তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ-চারটি ভাল ব্যবহার করতে পার। একঃ তাদের জানাযার নামাযের ব্যবস্থা। দুইঃ তাদের জন্যে দোয়া ও এস্তেগফার করা। তিনঃ তাদের প্রতিশ্রুতি সমূহ পূর্ণ করা। চারঃ তাদের বন্ধু-বান্ধবের সম্মান করা আর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার যা তাদের জন্যে হয়। এসব কাজই পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তুমি করতে পার।[১] (আবু দাউদ, এবনে মাজা)

এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলো, 'আমি জেহাদের ইচ্ছায় আপনার খেদমতে সুসংবাদ নিয়ে হাযির হয়েছি'। তিনি এরশাদ করলেন, 'তোমার মাতা আছেন'? সে বললো, 'জ্বী হ্যাঁ!' তখন তিনি এরশাদ করলেন, 'যাও তার খেদমতে আত্মনিয়োগ কর, জান্নাত জননীর পদতলে'। দ্বিতীয় বার এবং তৃতীয় বারও বিভিন্ন সময়ে ঐ ব্যক্তি একই কথা বললেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একই উত্তরের পুনরাবৃত্তি করলেন। (নাসায়ী, এবনে মাজা)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তোমাদের পিতার সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে মাতাগণের সম্পর্কেও উপদেশ প্রদান করেন। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারেও উপদেশ প্রদান করেনঃ যে সর্বাধিক নিকটবর্তী অতঃপর তার পরের নিকটবর্তী। (এবনে মাজা, মসনদে আহমদ)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দাতার হস্ত উঁচু থাকে। তোমার মায়ের সাথে ভাল ব্যবহার কর এবং তোমার পিতার সাথেও এবং তোমার বোনের সাথেও এবং নিজের ভাইয়ের সাথে, এরপর যে নিকটতম হয় (মসনদে আহমদ)।

বাজ্জার তাঁর মসনদে দুর্বল সূত্রে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ এক ব্যক্তি তার মাকে কাঁধে তুলে তওয়াফ করছিলেন। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন তো আমি আমার মায়ের হক্ব আদায় করেছি'? তিনি এরশাদ করলেন, 'সামান্য পরিমাণও নয়'।[২]

আল্লামা আলুসী (রঃ) উপরোক্ত হাদীসের উদ্ধৃতি এভাবে দিয়েছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) দেখলেন, এক ব্যক্তি তার মাকে কাঁধে তুলে তওয়াফ করছিলেন। তখন সে ব্যক্তি বললেন, 'হে এবনে ওমর! আমি কি আমার মায়ের হক্ব আদায় করেছি'? তিনি বললেন, 'না, অবশ্যই নয়'। তবে হ্যাঁ ভাল কাজ করেছ। আল্লাহ পাক তোমার অল্প আমলের অধিক পরিমাণ সওয়াব দান করবেন'।[৩]

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৫৭
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৩৯
৩। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৫৮

বার্ধক্যের সময়ে পিতা-মাতার খেদমতের তাগিদ

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ

"তোমার সম্মুখেই যখন তাদের কোন একজন অথবা উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' শব্দটি বলোনা এবং ধমক দিওনা"।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতার বার্ধক্যের সময় তাদের বিশেষভাবে সেবা-যত্ন করা সন্তানের কর্তব্য। কেননা বার্ধক্যাবস্থাতেই পিতা-মাতা সন্তানের সেবা-যত্নের অধিকতর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায় বার্ধক্যের কারণে পিতা-মাতার হুশ-খেয়াল কমে যায়। একই কথা হয়তো বার বার বলেছেন। স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে ঐ সময় ক্রোধ বেড়ে যায়। সুযোগ্য ও ভাগ্যবান সন্তান-সন্ততির জন্যে তখনই আসে আখেরাতের সাফল্য লাভের এক অতি মূল্যবান ক্ষণ বা সুবর্ণ সুযোগ। এজন্যেই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ্ পাক কীভাবে পিতা-মাতার সাথে কথা বলতে হবে তার আদব শিক্ষা দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

অর্থাৎ আর তাদের সঙ্গে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিনীত হয়ে বিনম্র ভাষায় কথা-বার্তা বলবে।

এবনে জরীর ও এবনুল মুনজের আবুল হেদাজ নামক এক ব্যক্তির কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি সায়ীদ এবনে মুসাইয়্যেব (রঃ)-কে বলেছেন, 'কোরআনে করীমে আল্লাহ্ পাক পিতা-মাতার হক্ব সম্পর্কে যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা সম্যক উপলব্ধি করেছি, কিন্তু

وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারিনি। কীভাবে তাঁদের সাথে কথা বললে এ নির্দেশ পালন করা সম্ভব হবে'? তখন সায়ীদ এবনে মুসাইয়্যেব (রঃ) বললেন, 'কোন দূর্দান্ত মুনিবের সঙ্গে তার অপরাধী গোলামের যেভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কথা বলা উচিৎ'।[১]

অর্থাৎ অত্যধিক বিনয় এবং বিনম্রভাবে পিতা-মাতার সঙ্গে কথা বলতে হবে।

পিতা-মাতার সঙ্গে যে আচরণ কাম্য

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

"তাদের সম্মুখে বিনয়ের পাখা সবিনয়ে অবনত কর"।

অর্থাৎ মাতা-পিতার সম্মুখে নিজেকে অত্যন্ত বিনীত ভাবে হাযির করতে হবে এবং

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৫৭

তাদের সেবা-যত্নে, আদর-আপ্যায়নে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। কখনও এমন আচরণ করা যাবেনা যা দ্বারা পিতা-মাতার মনে কষ্ট হতে পারে।

পিতা-মাতার জন্যে দোয়া

পিত-মাতার সঙ্গে বিনীত হয়ে বিনম্র ভাষায় কথা-বার্তা বললে এবং মধুর ব্যবহার করলেই তাঁদের প্রতি দায়িত্ব পালন শেষ হবেনা, বরং তাদের এন্তেকালের পরও সর্বদা তাঁদের জন্যে দোয়া করতে হবে। আর দোয়ার ভাষা হবেঃ

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

(হে পরওয়ারদেগার! আমার শৈশবকালে আমি যখন ছিলাম অসহায়, অক্ষম তখন তারা যেভাবে আমাকে লালন-পালন করেছেন, যেভাবে তারা আমার সুখ-শান্তির জন্যে নিজেদের আরামকে বর্জন করেছেন এবং আমার প্রতি সর্বক্ষণ দয়া-মায়া করেছেন, ঠিক তেমনি তুমি তাদের প্রতি রহমত কর, দয়া কর, তোমার অনন্ত অসীম করুণার কোলে তাদেরকে আশ্রয় দাও, তাদেরকে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে সাফল্যমণ্ডিত কর।)

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, পিতা-মাতার জন্যে রহমতের দোয়া করার হুকুম তখন, যখন পিতা-মাতা মুসলমান হন।

আল্লামা বয়জাবী (রঃ) লিখেছেন, রহমতের দোয়া করা সর্বদাই সমীচিন। কেননা কাফের পিতা-মাতার জন্যে দোয়া করার তাৎপর্য হবে আল্লাহ পাক তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার তওফিক দান করুন। আর ইসলামের তওফিকই হলো রহমত।[১]

পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াতে সন্তান-সন্ততির প্রতি পিতা-মাতার এহসানের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের তাগিদ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ (সূরা আহক্বাফ)

"আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করে অত্যন্ত কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে অতি কষ্টের সাথে। তার গর্ভে ধারণ ও দুগ্ধ ছাড়ানোর সময় ত্রিশ মাস"।

এ সুদীর্ঘ সময় মাতা-পিতাকে তার সন্তানের জন্যে চরম কষ্ট ভোগ করতে হয়। সে কষ্টের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ পাক পিতা-মাতার প্রতি যথাযথ ভাবে দায়িত্ব

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৬০

পালনের তাগিদ করেছেন।

ইসলামী শরীয়ত পিতা-মাতার হক্ব আদায়ের প্রতি কতখানি গুরুত্বারোপ করেছে তা একটি কথা দ্বারা অনুধাবন করা যায়, যদি সন্তান নফল নামাজে থাকে আর পিতা-মাতা তাকে ডাকে, তবে ঐ মুহূর্তে নামাজ ছেড়ে দিয়ে পিতা-মাতার ডাকে সাড়া দিতে হয়। অবশ্য পরে ঐ নামাজ আদায় করতে হয়। এভাবে যদি সন্তান নফল হজ্জ বা নফল জেহাদের জন্যে গমন করতে চায় তবে পিতা-মাতার অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। পিতা-মাতার অবাধ্য হবার পরিণাম হয় অত্যন্ত শোচনীয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সময়কার একটি ঘটনা এ পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাহাবী হযরত আলকামা (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় তাঁর জবান বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর পক্ষে কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাঁর স্ত্রী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার স্বামী আলকামা অসুস্থ, তাঁর জবান বন্ধ হয়ে গেছে (তিনি কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করতে পারছেন না)। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাঃ) সহ কয়েকজন সাহাবীকে হযরত আলকামা (রাঃ)-এর গৃহে প্রেরণ করলেন এবং এ নির্দেশ প্রদান করলেন যে তোমরা তাকে কালেমা তালকীন কর, তাঁরা চেষ্টা করলেন কিন্তু ফল হলোনা। তাঁরা ফিরে এসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার পিতা-মাতা আছে কি'? তাঁরা বললেন, 'পিতা নেই, মাতা আছেন। কিন্তু অন্যত্র থাকেন'। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাঃ)-কে তাঁর মাতাকে আনার জন্যে প্রেরণ করলেন। তাঁর মাতা এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার পুত্র কেমন লোক'? বৃদ্ধা মাতা বললেন, 'সে নামাজী এবং দানশীল ব্যক্তি, তবে যেহেতু আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট সেজন্যে তার সঙ্গে থাকি না'। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হও'। হযরত আলকামা (রাঃ)-এর মাতা বললেন, 'আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনা'। এরপর আলকামা (রাঃ) তাঁকে যে প্রহার করেছেন তার চিহ্ন দেখালেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ দিলেন, 'তোমরা জ্বালানি কাঠ একত্রিত করে আগুন ধরিয়ে দাও এবং আলকামাকে নিয়ে অগ্নিতে ফেলে দাও'। যখন আলকামা (রাঃ)-কে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার মুহূর্ত আসলো তখন তাঁর মাতা বললেন, 'আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট'। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক তাঁর জবান জারী করে দিলেন, তিনি পাঠ করলেনঃ

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

আল্লামা এবনুল জওযী (রঃ) তাঁর রচিত كتاب المنتظم فى توا ريخ الامم গ্রন্থে হযরত মূসা (আঃ)-এর একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর জান্নাতের সাথীকে দেখার জন্যে আরজী পেশ করেন। তখন আল্লাহ পাক তাঁকে নির্দেশ দেন যে অমুক শহরে যাও। একজন কসাই ব্যক্তিকে পাবে, সে-ই

জান্নাতে তোমার সাথী হবে। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক গমন করে একজন যুবককে দেখতে পেলেন। ঐ যুবক হযরত মূসা (আঃ)-কে বললেন, 'আপনি কি আজ আমার মেহমান হবেন'? হযরত মূসা (আঃ) বললেন, 'হ্যাঁ'। ঐ ব্যক্তির নিকট একটি বড় আকারের থলে ছিল যা কাঁধে নিয়ে তিনি রওয়ানা হলেন। তাঁরা উভয়ে বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলেন এবং খাবার সম্মুখে রাখা হলো। হযরত মূসা (আঃ) লক্ষ্য করলেন, ঐ যুবক এক লোকমা মুখে দেয়ার পূর্বে দু' লোকমা থলেতে রেখে দেন। ঠিক এমন সময় কেউ তাঁর দরজার করাঘাত করলো। যুবক দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ঐ সময় হযরত মূসা (আঃ) ঐ থলের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করে আশ্চর্যান্বিত হলেন। তিনি দেখলেন, ঐ থলের ভেতর রয়েছে একজন বৃদ্ধ, আরেকজন বৃদ্ধা। তারা উভয়ে তাঁর দিকে দেখে মুচকি হাসলেন এবং কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। এরপর ঐ যুবক প্রত্যাবর্তন করে দেখলেন থলেটি হযরত মূসা (আঃ)-এর সম্মুখে পড়ে আছে। তখন তিনি বললেন, 'আপনি আল্লাহর রসূল মূসা (আঃ)'। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকে এ সম্পর্কে কে খবর দিল'? তিনি বললেন, 'এ থলেতে যে দু'জন ছিলেন তাঁরা হলেন আমার পিতা-মাতা। আমি এভাবে তাঁদেরকে থলেতে নিয়ে বহন করতাম এবং তাদেরকে পানাহার করানোর পূর্বে আমি পানাহার করতাম না। আর তাঁরা আল্লাহ পাকের দরবারে একটি দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ! তোমার নবী মূসা (আঃ)-এর জেয়ারতের পূর্বে আমাদেরকে মৃত্যু-মুখে পতিত করোনা'। এখন যেহেতু আমি এসে দেখলাম তাঁদের উভয়ের মৃত্যু হয়ে গেছে, তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে আপনিই আল্লাহর রসূল মূসা (আঃ)। তখন মূসা (আঃ) বললেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ কর, তুমি হবে জান্নাতে আমার সাথী'।

বস্তুতঃ পিতা-মাতার সেবা-যত্নের শুভ-পরিণতি স্বরূপই ঐ যুবক জান্নাতে হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথী হবার গৌরব অর্জন করেছেন।[১]

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ

"তোমাদের মনে কি আছে আল্লাহ পাক তা ভালভাবেই জানেন"।

অর্থাৎ পিতা-মাতার সেবা-যত্ন সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে করতে হবে। তাঁদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে অকৃত্রিমভাবে। কার মনে কি আছে আল্লাহ পাক সবই জানেন। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। অতএব, পিতা-মাতার খেদমত হতে হবে আন্তরিকতাপূর্ণ। পিতা-মাতাকে বোঝা মনে করে যদি কেউ সেবা-যত্ন করে, আল্লাহ পাক সে সম্পর্কেও অবগত থাকেন। আল্লাহ পাক তোমাদের নিয়ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। যদি তোমরা সওয়াবের নিয়তে পিতা-মাতার সেবা যত্ন কর এবং আল্লাহ পাকের হুকুম পালনার্থে তা কর তবে আল্লাহ পাক এর সওয়াব দান করবেন। পক্ষান্তরে, যদি দুনিয়ার কোন লোভে তথা জাগতিক কোন স্বার্থের বশীভূত হয়ে পিতা-মাতার খেদমত করা হয় তবে নিয়ত অনুসারেই ফল হবে।[২]

১। নুযহাতুল মাজালেস, কৃত আল্লামা আবদুর রহমান আস-সফুরী, পৃষ্ঠা-২৪২
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৬২

বস্তুতঃ সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক্কের গুরুত্ব বর্ণনাতীত। এ সত্য যে যত বেশী উপলব্ধি করবে সে তত বেশী উপকৃত হবে। হাদীস শরীফে রয়েছেঃ এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা বার্ধক্যের কারণে এমন অবস্থায় পৌঁছেছেন যে তাঁরা যেভাবে আমাকে আমার অতি শৈশবে দেখা-শোনা করতেন, ঠিক তেমনি আমি এখন তাঁদের খেদমত করি। তাহলে আমি কি তাঁদের হক্ব আদায় করতে পেরেছি'? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ 'না, কেননা যখন তারা তোমার লালন-পালন করতো তখন তাদের একমাত্র আকাংক্ষা হতো যেন তুমি জীবিত থাক, আর এখন যে তুমি তাদের সেবা-যত্ন কর তাতে তোমার আকাংক্ষা হলো যেন তারা মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই, মাতা সুদীর্ঘ নয়টি মাস যাবত সন্তানকে গর্ভে রেখেছে এবং দু' বছর যাবত দুগ্ধ পান করিয়েছে, আরও তিন-চার বছর যাবত পিতা-মাতা উভয়ে কোলে পিঠে রেখে লালন-পালন করেছে এবং সন্তানের জন্যে অনেক রাত জেগেছে, সন্তানের আরামের জন্যে অনেক কষ্ট করেছে এবং পিতা-মাতার চরম ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলশ্রুতিতে যখন সন্তান যৌবন-লাভ করে, তখন যদি সন্তান-সন্ততির আচার আচরণে পিতা-মাতার কষ্ট হয়, তবে তা ভদ্রতা নয়, সভ্যতা নয়, এমনকি মানবতাও নয়।

আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কোরআন পিতা-মাতার প্রতি সেবা-যত্ন করে মানবতার উৎকর্ষ সাধনের শিক্ষা দিয়েছে।

إِن تَكُونُوا صَٰلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّٰبِينَ غَفُورًا

"যদি তোমরা নেককার হও তবে আল্লাহ পাক তওবাকারীদের জন্যে অত্যন্ত ক্ষমাশীল"।

আল্লাম সানাউল্লাহ পনিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সায়ীদ এবনে যুবায়ের (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা সে সব মানুষকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যাদের অনিচ্ছা সত্বেও হঠাৎ পিতা-মাতার ব্যাপারে কোন অসদাচরণ হয়ে গেছে। অথচ তাদের নিয়ত ছিল সঠিক তাই এ অবস্থায় যদি আল্লাহ পাকের দরবারে তারা ক্ষমা-প্রার্থী হয়, তওবা করে তবে আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করবেন। অথবা আয়াতের অর্থ আরও ব্যাপক। যে কেউ পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করে কিন্তু পরে আন্তরিকভাবে তওবা করে তবে সেও আলোচ্য আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

সায়ীদ এবনে মুসাইয়্যেব (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের اواب শব্দটির অর্থ হলো সে ব্যক্তি যে গুনাহ করার পর তওবা করে। এরপর পুনরায় গুনাহ করে তওবা করে। এরপরও গুনাহ করে তওবা করে।

সায়ীদ এবনে যুবায়ের (রঃ) বলেছেন, কল্যাণকামী ব্যক্তিকেই اواب বলা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, اواب হলো সে ব্যক্তি যে সকল বিপদাপদে আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করে।

সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আরেকটি কথা এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ اوابين অর্থ হলো আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনাকারীগণ। কেননা আল্লাহ পাক পাহাড়কে সম্বোধন করে বলেছেনঃ

يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ

আর কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ এ শব্দ দ্বারা নামাজীগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আউফ আকেলীর মতে, এর দ্বারা চাশ্‌তের নামাজ আদায়কারীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত যায়েদ এবনে আরকামের (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে কুবা নামক স্থানের লোকেরা চাশ্‌তের নামাজ আদায় করছিলেন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ নামাজীদের দৃশ্য দেখে এরশাদ করেছেনঃ এটি اوابين অর্থাৎ আওয়াবীনের নামাজ।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যারা মাগরিব ও এশার মধ্যে নামাজ আদায় করে তাদেরকে রহমতের ফেরেশতাগণ পরিবেষ্টন করে রাখে। আর এটি আওয়াবীনের নামাজ।

তৃতীয় হুকুমঃ আত্মীয়-স্বজনের হক্ব আদায়ের তাগিদ

এরশাদ হয়েছেঃ

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ

"আর আত্মীয়-স্বজনকে তার হক্ব প্রদান কর"।

অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক এক কথায় সর্ব প্রকার হক্ব আদায় কর। তাদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হও, যার যা প্রয়োজন তা পূরণে সচেষ্ট হও, তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী আয়াতে পিতা-মাতার প্রতি এহসান করার আদেশ ছিল। আর এ আয়াতে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের হক্ব আদায়ের নির্দেশ রয়েছে। যেহেতু মানুষের মধ্যে সবার উপরে পিতা-মাতার হক্ব, তাই আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম পিতা-মাতার প্রতি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের তাগিদ করেছেন। এরপর এ আয়াতে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে দায়িত্ব পালনের হুকুম দেয়া হয়েছে। তাদের আর্থিক প্রয়োজন থাকলে তা পূরণ করা কর্তব্য। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মমত্ববোধের পরিচয় দেয়া, সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতর রাখার চেষ্টা করা একান্ত করণীয় কাজ।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন, সম্পদশালী ব্যক্তির কর্তব্য হলো আত্মীয়-স্বজন যদি দারিদ্র-প্রপীড়িত হয় তবে তাদের সাহায্য করা, যদি শারীরিক দিক থেকে অসহায় হয় তবে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য।

আল্লামা বগভী (রঃ) ইমাম জয়নুল আবেদীন (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে القربى শব্দ দ্বারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের

আত্মীয়-স্বজনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আত্মীয়-স্বজনের হক্ব আদায় কর। এবনে আবি হাতেম সুদ্দীর সূত্রেও একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

তেবরানী হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যখন আয়াত-

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ

নাযিল হয় তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমাকে (রাঃ) ডেকে আনলেন এবং ফোদক নামক বাগানটি তাঁকে দান করলেন।

এবনে মরদবিয়া লিখেছেন যে এ কথাটি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ)।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ হযরত ফাতেমা (রাঃ) নিজেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ফোদক নামক বাগানটি চেয়েছেন কিন্তু তিনি তা দান করেননি। হযরত ওমর এবনে আবদুল আযীযও একথা বলেছেন যে, যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমাকে ফোদক দান করতেন তবে খোলাফায়ে রাশেদীন বিশেষ করে হযরত আলী (রাঃ) অবশ্যই তাতে বাধা দিতেন না, আর এর বরখেলাফ করতেন না।[১]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) দু'খানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তুমি তোমার মায়ের প্রতি এহসান কর, তোমার পিতার প্রতিও ভাল ব্যবহার কর, এরপর যে নিকটতম আত্মীয় হবে তার প্রতিও এহসান কর।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি নিজের রিয্‌কের উন্নতি এবং আয়ু বৃদ্ধির আকাংক্ষা করে সে যেন ছেলায়ে রেহমী (যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক তাদের উপকার) করে।[২]

وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ

অর্থাৎ দারিদ্র-প্রপীড়িত, দীন-হীন এবং এতীম-মিসকীনকে, বিপদগ্রস্ত পথিক-মুসাফিরকে সাহায্য কর।[৩]

প্রথমে পিতা-মাতার হক্ব আদায় করার তাগিদ করা হয়েছে, এরপর নিকটাত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন প্রত্যেকটি মানুষ তার আত্মীয়-স্বজনের প্রয়োজনের আয়োজনে স্ব-স্ব ভূমিকা পালন করে। কেননা মানুষ শুধু নিজের তরে নয়; বরং একে অন্যের তরে। এটি ইসলামের মহান শিক্ষা, আর এটি পবিত্র কোরআনের আহ্বান। আর এ মহান আদর্শই পেশ করেছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তিনি প্রতিবেশীর হক্ব আদায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে এরশাদ করেছেনঃ

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৬৩
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৪০
৩। মিসকীন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩০৫-৬

ولجارك عليك حق

"তোমার প্রতিবেশীর প্রতি রয়েছে তোমার বিশেষ কর্তব্য"।

এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বাণীর উপর তথা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার উপর সাহাবায়ে কেরাম কীভাবে আমল করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর।

একবার একজন সাহাবীর বাড়ীতে আকীকার জন্যে একটি বকরী জবেহ করা হয়। পাশের বাড়ীতে বকরীর মাথাটা হাদীয়া হিসেবে প্রেরণ করা হয়। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন বকরীর মাথাটি নিজেরা না খেয়ে অন্য প্রতিবেশীকে হাদীয়া স্বরূপ পেশ করবেন। আর করলেনও তাই, যাঁদেরকে বকরীর মাথাটি দেয়া হলো তাঁরাও অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিয়ে বকরীর মাথাটি অন্যকে দিয়ে দিলেন। এভাবে বকরীর মাথাটি আটটি পরপর বাড়ীতে পৌঁছলো এবং সবশেষে হাদীয়া স্বরূপ ফিরে এল সেই বাড়ীতে যে বাড়ী থেকে এ বকরীর মাথা সর্ব প্রথম বের করা হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কোরআন যে মহান শিক্ষা দিয়েছে তার উপর আমল করার যে ফলশ্রুতি হয়েছিল তা হলো সামাজিক শান্তি-শৃংখলা, পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধ এবং ভ্রাতৃত্ব ভাব সৃষ্টি হওয়া।

আলোচ্য আয়াতে মিসকীন এবং বিপদগ্রস্ত পথিক-মুসাফিরকে সাহায্য করারও তাগিদ করা হয়েছে। বিশ্ব-মানবের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে মানবতার উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজনে এমনি কর্মসূচীর গুরুত্ব বর্ণনার অপেক্ষা রাখেনা।

চতুর্থ হুকুমঃ অপব্যয় করোনা

ولا تبذر تبذيرا

(আর কোন অবস্থাতেই অপব্যয় করোনা।)

অপব্যয়ের তাৎপর্য

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে এ বাক্যটির অর্থ হলো, অর্থ-সম্পদ গুনাহর কাজে বিনষ্ট করোনা।

বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তার সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহর রাহে ব্যয় করে দেয় তবে তাকে تبذير বা অপচয় বলা হবেনা।

পক্ষান্তরে, যদি কোন ব্যক্তি এক সের গমও গুনাহর পথে ব্যয় করে তবে তাকে অপচয় বলা হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, تبذير বা অপচয়ের অর্থ হলো, অন্যায় পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা।

শো'বা বর্ণনা করেন, আমি আবু এসহাকের সঙ্গে কুফার পথ অতিক্রম করছিলাম, পথে একটি দেয়াল দেখলাম, যা ইঁট দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে। তখন আবু ইসহাক

বললেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর ব্যাখ্যা মোতাবেক এটি অপচয়।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, অর্থ-সম্পদের অপচয় হলো অন্যায় পথে তা ব্যয় করা।

ওসমান এবনুল আসফাদ বর্ণনা করেন, আমি মুজাহেদ (রঃ)-এর সঙ্গে কা'বা শরীফের তওয়াফ করছিলাম। তিনি মক্কার আবু কোবায়েস পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন, যদি কোন ব্যক্তি পাহাড়ের সমান ধন-সম্পদও আল্লাহর রাহে ব্যয় করে তবুও তাকে অপচয়কারী বলা হবে না। কিন্তু যদি কেউ একটি দেরহামও আল্লাহর নাফরমানীর পথে ব্যয় করে তাকে অপচয়কারী বলা হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) অজু করছিলেন। এমন সময় ঐ স্থান অতিক্রম করছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তিনি হযরত সা'দ (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, 'হে সাদ! এ অপচয় কেন'? হযরত সা'দ (রাঃ) বললেন, 'অজুতেও কি অপচয় হয়'? তিনি এরশাদ করলেন, 'হ্যাঁ। যদিও তুমি নদীতে অজু কর (অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যয় করলে তা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে)'।[২]

আর অপব্যয়ীদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক পরবর্তী বাক্যে এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

নিশ্চয় অপব্যয়ীরা হলো শয়তানের ভাই। কেননা যারা অপচয় করে তারা সম্পদের কদর করেনা অর্থাৎ আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করে। শয়তানও আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করেছে। তাই যারা অপচয়ী তারা শয়তানের ভাই।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, কোন ব্যক্তি যদি কোন সম্প্রদায়ের অনুসারী হয় তবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

আর শয়তান তার প্রতিপালকের অকৃতজ্ঞ অর্থাৎ আল্লাহর নেয়ামতকে সে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে। এজন্যে তার অনুসরণ বৈধ নয়।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কারো প্রদত্ত কোন নেয়ামতকে তার পছন্দনীয় পথে ব্যয় করা কর্তব্য। যদি তার অপছন্দনীয় পথে ব্যয় করা হয় তবে তাই হবে অপচয়। বস্তুতঃ ধন-সম্পদ হলো আল্লাহ পাকের নেয়ামত। এ নেয়ামতের সদ্ব্যবহার করা মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

কিন্তু যারা অর্থ-সম্পদের অপচয় করে তথা অপব্যবহার করে তারা যেন আল্লাহ

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৬৪
২। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-১৯৩

পাকের নেয়ামতের অনাদর করে। আর এ অনাদরের মাধ্যমে অকৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ হয়। যেভাবে শয়তান আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞ, অবাধ্য ঠিক তেমনি যারা অর্থ-সম্পদের অপচয় করে তারাও যেন শয়তানের ন্যায় আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে অস্বীকার করে, তাই তারা শয়তানের ভাই।

এতদ্ব্যতীত, শয়তানের প্ররোচনায়ই মানুষ অর্থ-সম্পদের অপচয় করে, তাই শয়তানের সাথে থাকে তাদের নিবিড় বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব, পরিণামে তারা হয় আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বণী তমীমের এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি একজন সম্পদশালী ব্যক্তি। আমার পরিবারবর্গ আছে, আত্মীয়-স্বজন আছে, গোত্রীয় লোকদের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে, আমাকে বলুন, আমি কি পন্থা অবলম্বন করবো।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি তোমার অর্থ-সম্পদের যাকাত বের কর। এভাবে তুমি পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হবে, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দায়িত্ব পালন কর (তাদেরকে অর্থ-সম্পদ দ্বারা সাহায্য কর), সাহায্য প্রার্থীদের হক্ব আদায় কর এবং পাড়া-প্রতিবেশী ও মিসকীনদের হক্ব আদায় কর।

সে ব্যক্তি বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে সংক্ষিপ্ত ভাষায় কথাটি আরো বুঝিয়ে দিন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, তুমি আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন এবং পথিক-মুসাফিরের হক্ব আদায় কর, আর অপচয় করোনা। সে বললো, حسبى الله যখন আমি আপনার প্রতিনিধির নিকট যাকাত আদায় করে দেই, তখন কি আমি আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের দৃষ্টিতে দায়িত্বমুক্ত হলাম? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হ্যাঁ যখন তুমি আমার প্রতিনিধির নিকট যাকাতের অর্থ আদায় করলে তখন তুমি দায়মুক্ত হলে এবং তোমার সওয়াবও হলো।[১]

পঞ্চম হুকুমঃ সাহায্য প্রার্থীদের সঙ্গে বিনম্রভাবে কথা বল

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا

"(হে রসূল!) আর যদি কখনও আপনি আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রত্যাশিত রহমতের অপেক্ষায় থাকেন, এমন অবস্থায় সাহায্য প্রার্থীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হয়, তবে তাদের সাথে বিনম্রভাবে কথা বলুন"।

শানে নজুল

সায়ীদ এবনে মনসুর আতা খোরাসানীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কবীলায়ে মোজায়নার

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৪০

কিছু লোক প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয় এবং জেহাদে অংশগ্রহণের জন্যে যানবাহন চেয়ে আবেদন করে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'তোমাদেরকে দিতে পারি এমন কোন যানবাহন এ মুহূর্তে আমার নিকট নেই'। যখন তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে যানবাহনের অভাবে তারা জেহাদ থেকে মাহরুম হচ্ছে, তখন তারা অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে ক্রন্দণরত অবস্থায় ফিরে যায়। তারা ধারণা করে যে হয়তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন কারণে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট আছেন, যে কারণে তিনি আমাদেরকে কোন যানবাহন প্রদান করেননি, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।[১]

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, বিনম্র ভাবে কথা বলার তাৎপর্য হলো, সাহায্য প্রার্থীর সঙ্গে বিনম্রভাবে কথা বলে তাকে প্রতিশ্রুতি দাও। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো তাদের জন্যে দোয়া কর এভাবে যে, আল্লাহ পাক তোমাদের সমস্যার সমাধান করে দিন, আল্লাহ পাক আমাকে এবং তোমাকে রিয্ক দান করুন।[২]

বস্তুতঃ যারা মানুষকে সর্বদা দান করে থাকে, তাদের নিকটই সাধারণত মানুষ সাহায্য প্রার্থী হয়। কিন্তু দাতা হলেই যে সর্বদা অর্থ-সম্পদ থাকবে এমনও নয়। কখনো তারাও শূণ্য হস্ত হয়ে থাকে অথচ সাহায্য প্রার্থীরাও হাযির থাকে। এমন অবস্থায় কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ না করা এবং সাহায্য প্রার্থীদের প্রতি রুঢ় ব্যবহার না করা একান্ত কর্তব্য। 'এখন দিতে পারছিনা ইনশাআল্লাহ কোন স্থান থেকে আসলেই দেব'। এ ধরণের কথা বলে সাহায্য প্রার্থীকে বিদায় করবে।

ষষ্ঠ হুকুমঃ মধ্যপন্থা অবলম্বন কর

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

"আর (হে রসূল!) আপনার হাত নিজের গ্রীবায় আবদ্ধ করে রাখবেন না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করবেন না, তাহলে আপনাকে নিন্দিত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকতে হবে"।

শানে নজুল

সায়ীদ এবনে মনসুর হযরত সাইয়ার এবনে আবীল হাকাম এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে কিছু কাপড় পেশ করা হলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানবীর। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে এ কাপড় বিতরণ করে দিলেন। এরপর আরও কিছু লোক আসলো, কিন্তু তখন কাপড় বিতরণ সুসম্পন্ন হয়ে যায়, ফলে তারা কিছু পেলোনা। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৬৪
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৬৫

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে একটি ছেলে হাযির হয়ে আরজ করলোঃ আমার মা আপনার নিকট অমুক অমুক জিনিস (পানাহারের বস্তু, পোশাক, কিছু নগদ অর্থ প্রভৃতি) চেয়েছেন। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ আজকে আমার কাছে কিছুই নেই। ছেলেটি বললো, আমার মা বলেছেন আপনার কোর্তাটি আমাকে দান করুন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় কোর্তা দান করে দিলেন এবং নিজে ঘরেই বসে থাকলেন (কারণ তাঁর নিকট এই একটি মাত্র কোর্তাই ছিল)। এবনে আবি হাতেমও এ ঘটনাটি মিনহাল এবনে ওমরের সূত্রে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে এবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নির্দেশ প্রদান করেন যে আমার হাতে যা কিছু আসে তা খরচ করে দিও। হযরত আয়েশা (রাঃ) আরজ করেন, তাহলে তো এভাবে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

বগভী (রঃ) হযরত জাবের (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে একটি ছেলে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার মা পরিধানের জন্যে আপনার কাছে একটি কোর্তা চেয়েছেন'। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর পরিধানের কোর্তাটি ব্যতীত আর কোন কোর্তা ছিল না। তিনি এরশাদ করলেন, 'আশা করা যায় অমুক সময় থেকে অমুক সময়ের মধ্যে কিছু এসে যাবে, তুমি অন্য সময়ে এসো'। ছেলেটি তার মায়ের কাছে ফিরে গেল। এরপর আবার এসে আরজ করলো, 'আমার মা বলছেন আপনার পরিধানে যে কোর্তাটি আছে সেটিই দিয়ে দিতে'। এ আবেদন শ্রবণ করে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বগৃহে তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং কোর্তা খুলে ছেলেটিকে দিয়ে দিলেন এবং খালি গায়ে ঘরে বসে রইলেন। এরপর নামাজের জন্যে হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিলেন আর সাহাবায়ে কেরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হলেন না। তখন সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে অস্থিরতা বৃদ্ধি পেল। কয়েকজন সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে দেখলেন যে তাঁর দেহ মোবারকে কোন কোর্তা নেই, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।[১]

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাক মানুষকে তার জীবনে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। কৃপণ হয়োনা, আর অপচয়কারীও হয়োনা; বরং এ দু'য়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন কর।

এ পর্যায়ে বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আসমা বিনতে আবু বকর

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৬৫-৬৬

(রাঃ)-কে বলেছিলেন, আল্লাহ পাকের রাহে এদিক সেদিক ব্যয় করতে থাক, সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখোনা, নতুবা আল্লাহ পাকও বন্ধ করে রাখবেন। অর্থ-সম্পদের প্রবাহকে বন্ধ করে রেখোনা, অন্যথায় আল্লাহ পাকও সংকুচিত করে দেবেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, (ধন-সম্পদ) শুমার করে রেখে দিওনা, নতুবা আল্লাহ পাকও গণনা করে রেখে দেবেন।

মুসলিম শরীফে রয়েছেঃ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে বলেছেন, তুমি আল্লাহর রাহে ব্যয় করতে থাক, আল্লাহ পাক তোমাকে দিতে থাকবেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে রয়েছেঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক সকালে দু'জন ফেরেশতা আসমান থেকে অবতরণ করে। একজন এই দোয়া করে, 'হে আল্লাহ! যে দানশীল তাকে তার বদলা দিও', আর দ্বিতীয় ফেরেশতা দোয়া করে 'হে আল্লাহ! কৃপণের সম্পদ ধ্বংস কর'।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছেঃ ছদকা-খয়রাতের কারণে কারো অর্থ-সম্পদ কমে না। আর দানশীল ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক সম্মানিত করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের হুকুমের কারণে অন্যদের সাথে বিনয় সুলভ ব্যবহার করে, আল্লাহ পাক তার মর্যাদা বুলন্দ করেন।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছেঃ তোমরা লোভ থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা লোভই তোমাদের পূর্বকালের লোকদেরকে ধ্বংস করেছে। লোভের প্রথম আদেশ হলো তুমি কৃপণতা কর, সে কৃপণ হয়। এরপর লোভ তাকে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ছেলায়ে-রেহমী না করার নির্দেশ দেয়, সে তখন তাই করে, এরপর ফাসেকী এবং গুনাহ করার হুকুম দেয়, সে তখন তাই করতে থাকে।

বায়হাকী শরীফে আছেঃ মানুষ যখন খয়রাত করে তখন সত্তরটি শয়তানের চোয়াল ভেঙ্গে যায়।

মসনদে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি মধ্য-পন্থায় ব্যয় করে সে কখনও ফকীর হয়না।

হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমার কিছু এরূপ বন্দা আছে যারা ফকীর হওয়ারই যোগ্য। তাদেরকে যদি আমি ধনী বানিয়ে দেই তবে তাদের দ্বীন বরবাদ হয়ে যায়। আর আমার কিছু বন্দা এরূপ আছে যারা ধনী হওয়ার যোগ্য, যদি আমি তাদেরকে গরীব বানিয়ে দেই তবে তাদের দ্বীন নষ্ট হয়ে যায়। আর এটা সত্য যে কিছু কিছু লোককে বিত্তবান বানানো হয় পরীক্ষা করার জন্যে আর কিছু লোককে গরীব বানানো হয় শাস্তি প্রদানের উদ্দেশে।[১]

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতের মর্মকথা এই, হক্ব পথে ব্যয় করতে সে ব্যক্তির মত হস্ত সংকুচিত করে

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৪০

রেখোনা যে ব্যক্তির দু' হাত তার গলার সাথে এমনভাবে বাঁধা আছে যে সে হাত প্রসারিত করতে পারেনা। আবার হাত এমনভাবে প্রসারিত করে দিওনা যেন হাতে কিছুই না থাকে, ফলে নিজের ও পরিবারের এবং হক্বদারদের হক্ব আদায় করতে না পার। বয়জাবী (রঃ) লিখেছেন যে এ দু'টি বাক্য কৃপণতা এবং অপচয়কারীর ধ্বংসের চিত্র তুলে ধরেছে। আয়াতে এ দু'টি কাজকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং মধ্যপন্থা অর্থাৎ দানশীলতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا বাক্যাংশের অর্থ হলো সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও যদি কৃপণতা কর, অথবা যদি অর্থ-সম্পদের অপচয় কর, মিতব্যয়ী না হও, তবে আল্লাহ পাকের দরবারে এবং মানুষের দৃষ্টিতে অপমানিত হবে।

مَحْسُوْرًا শব্দটির অর্থ হলো লজ্জিত হওয়া, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়া।

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন যে, এ শব্দটির সম্পর্ক উভয়ের সাথে, অর্থাৎ কৃপণতা করলে এবং অপচয় করলে উভয় অবস্থায়ই অপমান এবং লাঞ্ছনা অনিবার্য। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, مَلُوْمًا শব্দটির সম্পর্ক কৃপণতার সঙ্গে। আর مَّحْسُوْرًا শব্দটির সম্পর্ক অপচয়ের সঙ্গে। অর্থাৎ যদি অর্থ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কার্পণ্য কর এবং সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য না কর তবে লোকেরা তোমার বদনাম করবে। আর যদি তুমি অর্থ-সম্পদের অপচয় কর তবে একদিন তুমি নিঃস্ব এবং সর্বহারা হয়ে পড়বে, তখন আক্ষেপ করা ব্যতীত আর কিছুই করণীয় থাকবেনা।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে ব্যয় করার পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন, অর্থাৎ কার্পণ্যও নয় এবং অপচয়ও নয়; বরং মধ্য পন্থা অবলম্বন কর। তিনি বলেছেন, এ আয়াতের মর্ম সূরা ফোরকানের একখানি আয়াতের অনুরূপ। এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

"(প্রকৃত মোমেনদের অন্যতম নিদর্শন হলো এই) তারা যখন ব্যয় করে তখন অপচয় করেনা এবং কার্পণ্যও করেনা, উভয়ের মধ্য পন্থা অবলম্বন করে"।[২]

ইমাম তাবারী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, সম্পদশালী তার প্রতি অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের ব্যাপারে অর্পিত দায়িত্ব যদি পালন না করে তবে তা হবে কৃপণতা যা নিন্দনীয় এবং বর্জনীয়। পক্ষান্তরে যা হাতে আছে সবই যদি কেউ ব্যয় করে ফেলে এবং নিজে পথের ভিখারী সাজে তবে তা-ও অকাম্য এবং পছন্দনীয় নয়। ইমাম তাবারী (রঃ) এ পর্যায়ে হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[৩]

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৬৬
২। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-১৯৫
৩। তফসীরে তাবারী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৫৬

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ

"নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা তাকে সচ্ছল জীবিকা দান করেন, আর তিনিই সংকীর্ণ করেন"।

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, ধন-সম্পদ, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য এবং অভাব-অনটন তথা জীবিকায় সচ্ছলতা এবং সংকট সবই এক আল্লাহ পাকের হাতে। তিনি আমীরকে করেন ফকির, আর ফকিরকে করেন আমীর। তোমরা ধন-সম্পদ দান না করে কৃপণ হলে যে সম্পদশালী হবে এমন নয়, আর মুক্ত হস্তে দান করলেই যে ফকির হয়ে যাবে এমনও নয়। মনে রেখো, জীবিকার সচ্ছলতা এবং তার সংকট একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে।

এ আয়াতের তফসীরে হযরত শাহ আবদুল কাদের (রঃ) লিখেছেন, কোন দরিদ্র সাহায্য প্রার্থীকে দেখে অস্থির ও ব্যাকুল হতে নেই। কেননা তাকে সচ্ছল সম্পদশালী করার ক্ষমতা ও এখতিয়ার তোমার নেই, এ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই।

যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল ব্যক্তি ছিলেন, তাই কোন সাহায্য প্রার্থীকে কোন কিছু না দিতে পারলে বা কারও প্রয়োজনের আয়োজন করতে না পারলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হতেন। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, কোন সাহায্য প্রার্থীকে যদি কোন কিছু দিতে না পারেন, তবে আপনি এজন্যে ব্যথিত ও অস্থির হবেন না। কেননা সচ্ছলতা ও দারিদ্র্য আল্লাহ পাকেরই হাতে, অর্থাৎ কাউকে ধনী বা দরিদ্র করা এটি আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন, যা কিছু হয় তা আল্লাহ পাকের হুকুমেই হয়।

إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا

আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের অবস্থা ভালভাবে জানেন এবং সব কিছু দেখেন। মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই আল্লাহ পাকের নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

তাই আল্লাহ পাক তাঁর জ্ঞান ও বিবেচনা মোতাবেক যাকে ইচ্ছা তাকে সম্পদশালী এবং যাকে ইচ্ছা তাকে দরিদ্র করেন। কোন কোন লোককে সম্পদশালী করা হয় পরীক্ষা স্বরূপ এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়। আর কোন কোন লোককে দারিদ্র্যের মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হয় (আল্লাহ পাক আমাদেরকে উভয় অবস্থা থেকে রক্ষা করুন)।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে, (১) ধনী বা দরিদ্র করা আল্লাহ পাকেরই কাজ তবে বন্দার কাজ হলো মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

(২) অথবা আল্লাহ পাক কারও রিয্ক বাড়িয়ে দেন আর কারও রিয্ক সংকুচিত করেন। অতএব তোমাদেরও কর্তব্য হলো, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত এ পন্থা অবলম্বন করা

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৪১-৪২

অর্থাৎ দান-খয়রাত বন্ধ করে একেবারে হাত গুটিয়ে রেখোনা। আর সব কিছু দান করে নিঃস্ব। হৃতসর্বস্ব হয়ে যেয়োনা।[১]

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ
خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۭ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً
كَبِيْرًا ۝ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۭ وَسَاۗءَ سَبِيْلًا ۝
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۭ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ
مَنْصُوْرًا ۝

তরজমা

(৩১) আর দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করোনা, তাদের আমি রিয্ক দান করি এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহা অপরাধ।

(৩২) আর ব্যাভিচারের কাছেও যেয়োনা, নিশ্চয় এটি অত্যন্ত অশ্লীল কাজ এবং জঘন্য নিন্দনীয় পথ।

(৩৩) আল্লাহ পাক যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন যথাযথ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করোনা। কেউ অন্যায় ভাবে নিহত হলে তার ওয়ারিশানদেরকে আমি তার প্রতিকারের ক্ষমতা দান করেছি। অতএব, হত্যার ব্যাপারে সে যেন সীমালংঘন না করে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি সাহায্য লাভ করবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيَقْدِرُ

"নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা রিয্ক বাড়িয়ে দেন, যাকে ইচ্ছা কমিয়ে দেন"।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৬৭

"আর তোমরা সন্তান-সন্ততিকে অভাবের ভয়ে হত্যা করোনা, আমি তাদেরকে রিয্ক দান করি এবং তোমাদেরকেও"।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ববর্তী আয়াতে পিতা-মাতার সঙ্গে এহসান করার পন্থা শিক্ষা দেয়া হয়েছে আর এ আয়াতে সন্তানের সঙ্গে ভাল ব্যবহারের আদেশ দেয়া হয়েছে।[১]

সপ্তম হুকুমঃ অভাবের তাড়নায় সন্তান হত্যা করোনা

আলোচ্য আয়াতে অভাবের ভয়ে সন্তান-সন্ততিকে হত্যা না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বর্বরতার যুগে কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হতো। যেমন বর্তমান যুগে জন্ম নিয়ন্ত্রণের সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান-কল্পে সেকালে পিতা নিজেই তার কন্যাকে হত্যা করতো। আর এ যুগে আধুনিক উপায়ে সন্তানের জন্ম রোধের চেষ্টা করা হচ্ছে। পবিত্র কোরআন এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে তাদের এবং তোমাদের রিয্কের দায়িত্ব আমার উপর। অতএব, তোমরা সন্তানদেরকে হত্যা করোনা। সন্তান হত্যা নিশ্চয় অত্যন্ত মহাপাপ।

হযরত এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সবচেয়ে বড় গুনাহ কোন্‌টি'? তিনি এরশাদ করলেন, '(সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো) আল্লাহ পাক তোমাকে সৃষ্টি করেছেন- এ সত্বেও অন্য কিছুকে তাঁর ন্যায় মনে করা'। আমি আরজ করলাম, 'নিঃসন্দেহে এটি বড় গুনাহ। তার পরের বড় গুনাহ কোন্‌টি'? তিনি এরশাদ করলেন, 'নিজ সন্তানকে নিজে এই আশংকায় হত্যা করা যে সে তোমার খাদ্যে অংশ গ্রহণ করবে'। আমি আরজ করলাম, 'তারপর কোন্‌টি'? তিনি এরশাদ করলেন, 'নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়া' (বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)।

যাহোক, আলোচ্য আয়াতে নিজের সন্তান-সন্ততিকে হত্যা না করার নির্দেশ দিয়ে এ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে (এ বিষয়ে সূরা আনআমে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে)।[২]

অষ্টম হুকুমঃ ব্যাভিচারের ধারে কাছেও যেয়োনা

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا

"আর ব্যাভিচারের ধারে-কাছেও যেয়োনা, এটি অত্যন্ত অশ্লীল কাজ ও জঘন্য ঘৃণ্য পথ"।

হযরত বোরায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সাত আসমান সাত জমিন বৃদ্ধ ব্যাভিচারীর উপর লা'নত করতে থাকে এবং (দোযখের ভেতর) ব্যাভিচারীদের গুপ্তাঙ্গের দুর্গন্ধের কারণে অন্য দোযখীরা কষ্ট

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-১৯৬
২। তফসীরে নুরুল কোরআন খণ্ড-৮ পৃষ্ঠা-৯৬-৯৯ দ্রষ্টব্য)

পাবে।

হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, ব্যাভিচারে লিপ্ত ব্যক্তি মূর্তি পূজকের ন্যায়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মানুষ যখন ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তখন ঈমান তার থেকে বের হয়ে যায় এবং চাদোয়ার ন্যায় তার উপর ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যখন সে এ (ঘৃণ্য কাজ থেকে) বিরত হয় তখন ঈমান ফিরে আসে। (আবু দাউদ, তিরমিজী, বায়হাকী এবং হাকেম)

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ব্যাভিচারী যখন ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তখন ঈমানদার অবস্থায় তা করেনা। চোর যখন চুরি করে তখন ঈমানদার অবস্থায় চুরি করেনা। মদ্যপায়ী যখন মদ্যপান করে তখন ঈমানদার অবস্থায় মদ্যপান করেনা (অর্থাৎ এসব মন্দ কাজে রত অবস্থায় মানুষের মধ্যে ঈমান থাকেনা)।

এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ব্যাভিচার হলো জঘন্য অপরাধ এবং নিতান্ত ঘৃণ্য, অশ্লীল কাজ। যার মাধ্যমে মানবতার মান হানি হয়, মানব বংশ দূষিত এবং কলংকিত হয়, মানুষের পরস্পরের মধ্যে কলহ-দ্বন্দ্ব, ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়, সমাজ-জীবনের শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হয়, মানবতার উৎকর্ষ সাধন ব্যাহত হয়, মানব সভ্যতা ভূলুণ্ঠিত হয়, এ কারণেই পবিত্র কোরআন এ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে- 'এমন অন্যায়ের ধারে কাছেও যেয়োনা'।

নবম হুকুমঃ হত্যা করোনা

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ

"আল্লাহ পাক যাকে সম্মানিত করেছেন এমন জীবনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করোনা"।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস সংকলিত হয়েছেঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের একত্ববাদে এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রসূল হওয়ার স্বাক্ষ্য দেয়, তাকে তিনটি কারণ ব্যতীত হত্যা করা বৈধ নয়।

(১) কোন লোক যদি অন্য লোককে হত্যা করে থাকে, তবে প্রাণের বদলে প্রাণ নেয়া বৈধ। যাকে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 'কেছাছ' বলা হয়।

'কেছাছ' হিসেবে হত্যাকারীকে হত্যার অনুমতি রয়েছে।

(২) কোন ব্যক্তি বিবাহিত অবস্থায় যদি ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়।

(৩) মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী।

হাদীস শরীফে একথাও রয়েছে, আল্লাহ পাকের নিকট কোন মোমেনকে হত্যা করার চেয়ে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া সহজ।

কোন ব্যক্তি যদি অন্যায় ভাবে নিহত হয় তবে তার উত্তরাধিকারীদেরকে আল্লাহ পাক হত্যাকারীর উপর প্রভাবশালী করে দেন। সে তিনটি পন্থার যে কোন একটি অবলম্বন করতে পারে। (১) কেছাছ নেয়া অর্থাৎ প্রাণের বদলে প্রাণ সংহার করা (২) মুক্তিপণ গ্রহণ করা (৩) সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করা।

কোন ব্যক্তি যদি কারো দ্বারা অন্যায় ভাবে নিহত হয় তবে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা সরকারী নির্দেশ মোতাবেক কেছাছ গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু এ পর্যায়ে সীমালংঘন করার অনুমতি নেই। হত্যাকারীর বদলে অন্যকে হত্যা করার, অথবা তার সঙ্গে তার আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করার, কিংবা হত্যাকারীকে হত্যা করে তার নাক, কান কেটে তার দেহকে বিকৃত করার অধিকার ইসলাম দেয়না।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যে নিহত হয় তার সর্বপ্রধান সহায়ক হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন। তিনিই তাকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দান করেছেন এবং এ অধিকার আদায়ে সহযোগিতা করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে রাষ্ট্রের উপর।

সায়ীদ এবনে জুবায়ের (রঃ) বলেছেন, যদি হত্যাকারী একজন হয় তবে কেছাছ হিসেবে হত্যাকারীকে হত্যা করা যেতে পারে। কিন্তু হত্যাকাণ্ডে যারা শরীক হয়নি, এমন লোকদেরকে হত্যা করার অনুমতি নেই।

বর্বরতার যুগে এ প্রথা প্রচলিত ছিল, যদি নিহত ব্যক্তি প্রভাবশালী হতো, তবে তার কেছাছে শুধু আততায়ীকে হত্যা করা হতোনা, বরং তার আত্মীয়-স্বজন সহ এক দলকে হত্যা করা হতো।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ এর অর্থ হলো হত্যাকারী থেকে কেছাছ গ্রহণ করা হোক, তবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে দেহকে বিকৃত না করা হোক (যেমন বর্বরতার যুগে করা হতো)।

إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

অর্থাৎ যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাকে সাহায্য করা হয়।

হত্যাকারীকে কেছাছের সূত্রে হত্যা করা জরুরী হয়, আখেরাতেও আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নিহতকে সাহায্য করা হবে। আল্লাহ পাক তার গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তার হত্যাকারীর জন্যে দোযখের শাস্তি নিশ্চিত করবেন। এ ব্যাখ্যা করেছেন তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ)।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হলো হত্যাকারীর বিরুদ্ধে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে সাহায্য করা হয় এবং হত্যাকারী থেকে কেছাছ নেয়ার হক্ব তাকে দেয়া হয় এবং যাদের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকে, তাদের কর্তব্য হলো নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে সাহায্য করা।

তফসীরকারগণ একথা বলেছেন যে, নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি এ নির্দেশ

রয়েছে যে, তারা যেন একজনের পরিবর্তে দু'জনকে হত্যা না করে। এমনিভাবে ঘাতক যদি ধরা না পড়ে, তবে তার কোন আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করার অনুমতি দেয়া হয়নি। একেই পবিত্র কোরআনে বাড়াবাড়ি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে (বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)।

হযরত বরা এবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে কোন মোমেনের অন্যায়ভাবে হত্যা করার মোকাবেলায় সারা পৃথিবী ধ্বংস হওয়া সামান্য ব্যাপার। বায়হাকী এ বর্ণনায় আরও একটি কথা সংযোজন করেছেনঃ যদি আসমান জমীনের সকল অধিবাসী একজন মোমেনের হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে তবে আল্লাহ পাক সকলকেই দোযখে প্রবেশ করাবেন।

এবনে মাজা শরীফে সংকলিত, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি কোন লোক অর্ধবাক্য উচ্চারণ করার মাধ্যমেও একজন মোমেনের হত্যাকাণ্ডে সাহায্য করে তবে যখন সে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হবে তখন তার দু' চক্ষুর মধ্যখানে লিখিত থাকবে, 'আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ'।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক গুনাহর ব্যাপারে আশা করা যায় যে আল্লাহ পাক মাফ করবেন, সে ব্যক্তি ব্যতীত যে কাফের অবস্থায় মরা যায় অথবা সে কোন লোককে ইচ্ছা করে হত্যা করে।

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন সকাল হয় তখন ইবলিস তার সৈন্যদেরকে ছুড়িয়ে দেয় এবং বলে, 'আজ যে কোন মুসলমানকে পথভ্রষ্ট করবে আমি তাকে মুকুট পরিধান করাবো'। এরপর যখন ঐ শয়তান প্রত্যাবর্তন করে এবং বলে, 'আমি আজ অমুক মুসলমানের সঙ্গে ছিলাম, ফলে সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিয়েছে'। ইবলিস বলে হয়তো সে দ্বিতীয় বিয়ে করবে। দ্বিতীয় শয়তান বলে, আমি অমুক মুসলমানের সঙ্গে ছিলাম এমনকি সে তার পিতা-মাতার অবাধ্য হয়েছে'। ইবলিস বলে, 'পুনরায় অনুগত হয়ে যাবে'। তৃতীয় শয়তান বলে, 'আমি অমুক মুসলমানের সঙ্গে ছিলাম, সে মুশরেক হয়ে গেছে'। তখন ইবলিস বলে, 'তুমি তুমি-ই (অর্থাৎ তোমার কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয়)'। চতুর্থ শয়তান এসে বলে, 'আমি অমুক মুসলমানের সঙ্গে ছিলাম, সে একজন মুসলমানকে হত্যা করেছে'। ইবলিস বলে, 'তুমি এমন কাজ করেছ'? এরপর তাকে মুকুট পরিয়ে দেয়

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৫ পৃষ্ঠা-১৬
তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৭০-৭১

(এবনে হাব্বান)।[১]

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى
يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ﴿٣٤﴾ وَاَوْفُوا
الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ
اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٣٥﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ اِنَّ السَّمْعَ
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۗىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَمْشِ فِي
الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿٣٧﴾
كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ﴿٣٨﴾ ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى
اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۭ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِيْ
جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿٣٩﴾ اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ
الْمَلٰۗىِٕكَةِ اِنَاثًا ۭ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾

তরজমা

(৩৪) উত্তম পন্থা ব্যতীত এতীমের ধন-সম্পত্তির কাছেও যেয়োনা, যে পর্যন্ত না সে যৌবনে পদার্পণ করে এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর, অঙ্গীকার সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

(৩৫) পরিমাণ করার সময় তোমরা পরিমাপ পূর্ণ করে দিও এবং ওজন করার সময় সঠিক দাড়ি-পাল্লায় ওজন কর, এটি উত্তম, আর এর পরিণাম উৎকৃষ্ট।

(৩৬) আর যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পেছনে পড়োনা। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু, অন্তর প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(৩৭) আর পৃথিবীতে দম্ভভরে চলা-ফেরা করোনা। তুমি ধরণী বিদীর্ণ করতে পারবে না, আর উচ্চ হয়ে পর্বত পর্যন্ত পৌঁছতেও পারবে না।

(৩৮) এসব মন্দ বিষয়, আর এতে তোমার প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি রয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৭০

(৩৯) (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক ওহীর দ্বারা আপনাকে যে হেকমত দান করেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত। আপনি আল্লাহ্ পাকের সাথে কোন মা'বুদ স্থির করবেন না, নতুবা আপনি নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন।

(৪০) তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্যে পুত্র সন্তান বেছে দিয়েছেন? আর নিজের জন্যে ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয় তোমরা অত্যন্ত ভয়ানক কথা বলে থাক!

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রথমে ব্যাভিচার নিষিদ্ধ হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, এরপর ত্যাকাণ্ড না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ব্যাভিচারের মাধ্যমে মানব বংশ দূষিত এবং কলংকিত হয়, মানুষের সৃষ্টির ধারা ব্যাহত হয়, মানুষের অস্তিত্ব লাভকে প্রতিরোধ করা হয়। আর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষের অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। ব্যাভিচারের মাধ্যমে মানব অস্তিত্বের পথ রুদ্ধ করা হয়। উভয় বিষয়ই মানুষের জীবন সম্পর্কীয়।

আর আলোচ্য আয়াতে মানুষের অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। আর মানুষের মধ্যে যারা দুর্বল, অসহায়, নিরুপায় তারা হলো এতীম, তাদের সম্পদের হেফাজতের তাগিদ করা হয়েছে।[১]

দশম হুকুমঃ এতীমের সম্পদের কাছেও যেয়োনা

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ

এ আয়াতে এতীমের ধন-সম্পদ আত্মসাত না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে এতীমের ধন-সম্পদের হেফাজতের প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করায় কোন অপরাধ নেই। এতীম যখন সাবালক হবে এবং তার নিজের ভাল-মন্দ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, তখন এতীমের সম্পদ অবশ্যই তার নিকট হস্তান্তর করতে হবে।[২]

একাদশ হুকুমঃ অঙ্গীকার রক্ষা কর

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

আর তোমরা অঙ্গীকার রক্ষা কর, যাকে যে কথা দাও তা অবশ্যই রক্ষা কর। অঙ্গীকার আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে হোক অথবা বন্দার সঙ্গে তা অবশ্যই পালন করতে হবে, যদি তা শরীয়ত বিরুদ্ধ কিছু না হয়।

আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক তাঁর বিধি-নিষেধের উপর আমল করার যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, তা পালন কর এবং মানুষের সঙ্গে যে সব অঙ্গীকার কর তা-ও

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-২০৪
২। এতীমদের প্রতি কর্তব্য পালন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তফসীরে নুরুল কোরআন, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩১৯-২২ দ্রষ্টব্য

পালন কর।

পবিত্র কোরআনে অঙ্গীকার রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (সূরা মায়েদাহ)

"হে মোমেনগণ অঙ্গীকার সমূহ রক্ষা কর"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (সূরা মাআরিজ)

"(তারাই সফলকাম) যারা আমানত এবং অঙ্গীকারের হেফাজত করে"।

এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যার কথার ঠিক নেই, তার দ্বীন ধর্মও নেই।

অতএব, দ্বীন রক্ষা করতে হলে অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে, কথা ঠিক রাখতে হবে।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ দু'জন মানুষের মধ্যে যে কোন ব্যাপারে কোন কথা দেয়া হলে তা রক্ষা করা উভয়েরই অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, তা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হোক, বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে হোক বা জীবনের অন্য কোন অঙ্গনে হোক।[১]

পরবর্তী আয়াতে অঙ্গীকার রক্ষা করার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে"।

অর্থাৎ অঙ্গীকার করা হলে তা রক্ষা করা হয়েছে কি-না, কেয়ামতের দিন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

অথবা যারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে, অথবা যে অঙ্গীকার করেছে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কি অঙ্গীকার করেছিল এবং কেন তা পূর্ণ করেনি।[২]

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ আল্লাহ পাকের সঙ্গে প্রতিটি মানুষ সর্ব প্রথম যে অঙ্গীকার করেছে তা হলো আল্লাহ পাককে বিশ্ব প্রতিপালক রূপে মেনে চলা। হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে যে, আল্লাহ পাক সৃষ্টির প্রথম দিন যখন হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মধ্যে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন, তখন কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত নারী-পুরুষের পদচারণা হবে সকলের রুহকে সেখানে হাযির করেন এবং সকলকে সম্বোধন করে একটি প্রশ্ন করেন, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (আমি কি তোমাদের প্রতিপালক

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-২০৫
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৭১
তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৭১

নই?) তারা বলেছে, بَلٰى অর্থাৎ হ্যাঁ।

যদিও সেদিন সর্বপ্রথম আল্লাহ্ পাকের এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, তাঁর অনুসরণ করে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম এ জবাব দেন। এরপর সমগ্র মানব জাতি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

এজন্যেই মরমী কবি বলেছেনঃ

وہاں قالوا بلی یہاں بت پرستی = ذرا سوچو کہا کیا تھا کیا کیا

"সেখানে অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের দরবারে কথা দিয়েছিলে হ্যাঁ বলে, আর এখানে এসে করছো মূর্তিপূজা, ক্ষণিকের জন্যে চিন্তা কর, তখন কি বলেছিলে, এখন কি করে চলেছ"।

যাহোক, সৃষ্টির প্রথম দিন বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের সাথে প্রতিটি মানুষ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের যে অঙ্গীকার করেছিল, তা রক্ষা করার তাগিদ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এর পাশাপাশি মানুষের সঙ্গে মানুষ যে কথা দেয় বা অঙ্গীকার করে, তা-ও রক্ষা করার তাগিদ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।[১]

আর পবিত্র কোরআনের এ শিক্ষা শুধু মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমাজ ও জাতীয় জীবনে, এমনিভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পবিত্র কোরআনের এ শিক্ষা গ্রহণ করা একান্ত জরুরী।

দ্বাদশ হুকুমঃ পরিমাপ পূর্ণ করে দিও

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ

"আর পরিমাপের সময় তোমরা পরিমাপ পূর্ণ করে দিও এবং ওজন করার সময় পাল্লাকে সোজা রেখো"।

অর্থাৎ মানুষকে যখন কোন জিনিস পরিমাপ করে দেয়া হয়, কেউ যেন তাতে পরিমাপে কম না দেয়। এমনিভাবে ওজন করার সময় ওজনে যেন ফাঁকি না দেয়া হয়। পরিমাপে কম দেয়া এবং ওজনে ফাঁকি দেয়া আল্লাহ্ পাকের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ এবং অমার্জনীয় অপরাধ। ইতিপূর্বে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় পরিমাপে কম দিত, ওজনে ফাঁকি দিত, এরপর আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে নেমে আসে তাদের প্রতি কঠিন শাস্তি। এভাবে ঐ পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছিল (এ সম্পর্কে তফসীরে নূরুল কোরআনের দ্বাদশ খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে)।[২]

হাদীস শরীফে আছে, ক্রেতা এবং বিক্রেতা যখন ঈমানদারী, আমানতদারী তথা সততা এবং সত্যবাদিতার পথ অবলম্বন করে, তখন তারা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে বরকত লাভে ধন্য হয়। কিন্তু তারা যদি মিথ্যাবাদিতার পথ গ্রহণ করে তবে বরকত বিনষ্ট

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩০৭
২। তফসীরে নূরুল কোরআন খণ্ড-১২ পৃষ্ঠা-১৪৭-৫৪

হয়ে যায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, ছলচাতুরী, প্রথম প্রথম কিছু দিন চলে কিন্তু সত্য একদিন না একদিন প্রকাশ পায়ই। তখন ধোঁকাবাজের মুখোশ খুলে যায়। প্রতারক তার প্রতারণার জন্যে সর্বত্র নিন্দিত হয়। অবশেষে তার ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়, সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে যারা সততা পরায়ণ ব্যবসায়ী, যারা মানুষকে ধোঁকা দেয়না, পরিমাপে কম দেয়না, ওজনে ফাঁকি দেয়না, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঈমানদারী, আমানতদারী, সততা এবং সত্যবাদিতার পরিচয় দেয়, তাদের ব্যবসায়ে উন্নতি দেখা দেয়, আর এ উন্নতিই হয় সততার শুভ-পরিণতি স্বরূপ যা এ দুনিয়াতে তারা লাভ করে। আর আখেরাতে রয়েছে তাদের জন্যে বিশেষ পুরস্কার। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين

সততা-পরায়ণ, বিশ্বস্ত আমানতদার ব্যবসায়ীর হাশর হবে নবী, সিদ্দীকগণের সঙ্গে। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে পরিমাপ পূর্ণ করে দেয়ার এবং সঠিক ওজন দেয়ার বিশেষ তাগিদ রয়েছে।

এয়োদশ হুকুমঃ যা জান না তার পেছনে পড়োনা

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ

"আর যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পেছনে পড়োনা। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু, অন্তর-এর প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে"।

যে বিষয়ে সঠিকভাবে জানা না থাকে, সে বিষয়ে কোন মন্তব্য করা উচিত নয়। আর অন্ধভাবে এমন বিষয়ের অনুসরণ করা আরো অন্যায়। আল্লাহ্ পাক মানুষকে চক্ষু, কর্ণ এবং অন্তর দিয়েছেন যেন মানুষ সত্য সন্ধান করতে পারে এবং সত্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, মোহাম্মদ এবনে হানাফিয়া (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো কখনো মিথ্যা স্বাক্ষ্য দিয়োনো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ এমন বিষয়ে স্বাক্ষ্য দিয়োনা যা তুমি চোখে দেখনি এবং যা তোমার কর্ণ শ্রবণ করেনি। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ এর অর্থ হলো কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ না দেয়া। বর্বরতার যুগে কবিরা মানুষের সমালোচনা করতো এবং মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কবিতা রচনা করতো।

আলোচ্য আয়াতে এসব অন্যায় আচরণকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ এ আয়াতে মিথ্যাবাদিতা পরিহারের নির্দেশ রয়েছে। আর কাতাদা (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ কোন কিছু শ্রবণ না করে, "শ্রবণ করেছি" বলোনা, আর কোন কিছু না দেখে "দেখেছি" বলোনা, আর কোন কিছু সঠিকভাবে না জেনে 'জানি' বলোনা।[১]

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-২০৭-৮

কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ আয়াতের অর্থ হল কোন বিষয়ে সঠিক ভাবে অনুসন্ধান না করে শ্রবণ মাত্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা উচিত নয়।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে কোন কথা বলোনা, কারো প্রতি অপবাদ দিয়োনা, মিথ্যা স্বাক্ষ্য দিয়োনা। না দেখে না শুনে এবং সঠিকভাবে না জেনে জানার দাবী করোনা এবং ভিত্তিহীন কথার উপর বিশ্বাস করে কারো প্রতি মন্দ ধারণা করোনা। এজন্যে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ..... (সূরা হুজুরাত)

"অনেক ধারণা থেকে তোমরা আত্মরক্ষা কর, কেননা কোন কোন ধারণা পাপকার্য"।

এমনিভাবে হাদীস শরীফে আছে, তোমরা ধারণা করা থেকে আত্মরক্ষা কর, কেননা (ভিত্তিহীন) ধারণা অত্যন্ত বড় মিথ্যা কথা।[১]

বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ যে বিষয়ে তোমার সঠিক জ্ঞান নেই, তার ভিত্তিতে কারো প্রতি অপবাদ দিয়োনা। কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ এ আয়াতে বিশেষতঃ সতী নারীদের উপর ব্যাভিচারের অপবাদ দেয়া এবং মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ.....

"নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু এবং অন্তর সম্পর্কে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে"।

অর্থাৎ এ অঙ্গ সমূহের ব্যবহার কীভাবে করা হয়েছে তা জিজ্ঞাসা করা হবে। যার এ অঙ্গ সমূহ ছিল সে কী করেছে তা জিজ্ঞাসা করা হবে। অথবা যে ব্যক্তি শ্রবণ করার, দেখার এবং জানার দাবী করে, তার এ দাবীকে সত্যায়িত করা হবে এবং অঙ্গ সমূহকে জিজ্ঞাসা করা হবে। যেমন চক্ষুকে জিজ্ঞাসা করা হবে সে কী দেখেছিল? এমনিভাবে কর্ণকে জিজ্ঞাসা করা হবে সে কী শুনেছিল? ইত্যাদি। আলোচ্য আয়াতে যে তিনটি অঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে, মূলতঃ এ অঙ্গ সমূহই মানুষের জ্ঞান অর্জনের সূত্র, আর এ কারণেই এ অঙ্গ সমূহকে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে। তাই শরীয়তে যে সব বিষয়ে দেখা নিষিদ্ধ, সে সব দেখা এবং শোনা থেকে আত্মরক্ষা করা কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য।[২]

চতুর্দশ হুকুমঃ দর্প ভরে চলাফেরা করোনা

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا

"আর তোমরা দর্পভরে পৃথিবীতে চলাফেরা করোনা"।

আলোচ্য আয়াতে অহংকারী হয়ে চলাফেরা করতে নিষেধ করা হয়েছে, কেননা আল্লাহ পাকের দরবারে অহংকার সবচেয়ে ঘৃণ্য চরিত্র।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৪৪
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৭২-৭৩

إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ

"নিশ্চয় তুমি ধরণীকে বিদীর্ণ করতে পারবে না"।

وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً

"আর তুমি উঁচু হয়ে কোন অবস্থাতেই পর্বত পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না"।

বস্তুতঃ দম্ভভরে চলে, জোরে জোরে পা ফেলে কেউ ধরণীকে বিদীর্ণ করতে পারেনা। এমনিভাবে অহংকারী হয়ে, বুক ফুলিয়ে, গলা বাড়িয়ে, উঁচু হয়ে কেউ পর্বতের সমানও হতে পারেনা। অতএব অহংকারী হয়ে চলাফেরা করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

হযরত এয়াজ এবনে হাম্মাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছেনঃ পরস্পর বিনয় অবলম্বন কর, কেউ কারো উপর অহংকার প্রকাশ করোনা এবং কারো প্রতি যেন কেউ জুলুমও না করে। (মুসলিম শরীফ)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তির অন্তরে কণা পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে যাবে না (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ অহংকার আমার চাঁদর, আর শ্রেষ্ঠত্ব আমার পোশাক, যে ব্যক্তি এ দু'য়ের কোনটি নিয়ে টানাটানি করবে আমি তাকে দোযখে প্রবেশ করাবো (মুসলিম শরীফ)।

হযরত সালমা এবনে আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানুষ বরাবর অহংকার করতে থাকে এমনকি, অবশেষে তাকে অত্যন্ত অহংকারী জালেমদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর তার উপর সে আযাব আসে যা জালেমদের উপরে এসেছিল (তিরমিজী শরীফ)।

আমর এবনে শোয়ায়েবের পিতামহ বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন অহংকারী লোকদেরকে পিপীলিকার ন্যায় অপমানিত, লাঞ্ছিত করে মানবাকৃতি দিয়ে তোলা হবে। সর্বদিক থেকে তাদের প্রতি অপমান এবং লাঞ্ছনা আপতিত হবে। 'বওলাস' নামক দোযখে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে। আর সর্বাধিক মারাত্মক অগ্নিতে তারা থাকবে। আর দোযখীদের দেহের পুঁজ তাদেরকে পান করানো হবে (তিরমিজী শরীফ)।

হযরত আসমা বিনতে ওমায়েস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেছেনঃ সে বন্দা অত্যন্ত মন্দ যে অহংকার করে এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনকে ভুলে যায় (তিরমিজী শরীফ)।

একদিন হযরত ওমর (রাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে বিনয় অবলম্বন করে আল্লাহ পাক তাকে উচ্চ মরতবা দান করেন, যদিও সে নিজের দৃষ্টিতে নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করে। আর যে নিজে বড় হয়, আল্লাহ পাক তাকে ক্ষুদ্র করে দেন, তখন মানুষের দৃষ্টিতেও ক্ষুদ্র হয়ে যায় এবং নিজের দৃষ্টিতে নিজে বড় হয়, এমনকি মানুষের দৃষ্টিতে কুকুর এবং শুকর থেকেও অপমানিত হয়।[১]

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا

"এ সমস্ত মন্দ বিষয় এবং এর মধ্যে রয়েছে আপনার প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি"।

অর্থাৎ উপরে বর্ণিত নিষিদ্ধ কাজগুলো করার মধ্যে এবং অবশ্য-করণীয় কাজগুলো না করার মধ্যে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি রয়েছে। যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, তাদের কর্তব্য হল নিষিদ্ধ কাজ সমূহ থেকে বিরত থাকা এবং যা করণীয় এবং নির্দেশিত তা সযত্নে পালন করা।

অতএব, আলোচ্য আয়াত সমূহের বিধি-নিষেধগুলো দু'ভাগে বিভক্তঃ অবশ্য করণীয় অথবা বর্জনীয়। এ পর্যায়ে বিধি-নিষেধগুলো সংক্ষিপ্তভাবে একত্রিত করে উপস্থাপন করা সমীচিন যাতে করে এগুলো স্মরণ করা সহজ হয়।

(১) আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করোনা,

(২) শুধু আল্লাহ পাকের এবাদত কর,

(৩) আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো এবাদত করোনা,

(৪) পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর,

(৫) পিতা-মাতার সম্মুখে 'উফ্' শব্দটি উচ্চারণ করোনা,

(৬) পিতা-মাতাকে ধমক দিও না। তাঁদের সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলোনা,

(৭) তাঁদের সঙ্গে আদবের সাথে কথা বল, যাতে করে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়,

(৮) পিতা-মাতার সাথে অত্যন্ত বিনীত ভাবে আচরণ কর,

(৯) পিতা-মাতার জন্যে রহমতের দোয়া কর,

(১০) আত্মীয়-স্বজনের হক্ব আদায় কর,

(১১) মিসকীনদের প্রতি দায়িত্ব পালন কর।

(১২) অপচয় পরিহার কর,

(১৩) দারিদ্র্য-প্রপীড়িত মানুষ যদি কিছু চায় তবে তাদের সাথে বিনম্র ভাষায় কথা

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৭৪-৭৫

বল,

(১৪) কৃপণ হয়োনা,

(১৫) আর যথা সর্বস্ব দিয়ে নিজে ভিক্ষুকে পরিণত হয়োনা,

(১৬) অভাবের ভয়ে সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করোনা,

(১৭) ব্যাভিচারের ধারে কাছেও যেয়োনা,

(১৮) যাকে শরীয়ত হত্যা করার অনুমতি দেয়নি তাকে হত্যা করোনা,

(১৯) কেসাস গ্রহণে সীমালংঘন করোনা,

(২০) প্রতিশ্রুতি পালন কর,

(২১) পরিমাপ ও ওজন পূর্ণ করে দিও,

(২২) যে-বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পেছনে পড়োনা,

(২৩) পৃথিবীতে দর্প ভরে চলা-ফেরা করোনা, অহংকার করোনা।

ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ

এসবই হলো (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে জ্ঞান-গর্ভ মূল্যবান নছিহত যা ওহীর মাধ্যমে আপনার নিকট প্রেরীত হয়েছে। এসবই হলো নৈতিক গুণাবলী, যা অর্জন করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। আর এসবই মানব সভ্যতার মূল উপকরণ, যা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাক বিশ্ব গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব মানবকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

"(হে মানব জাতি!) আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কিছুকে উপাস্য স্থির করোনা"।

দ্বীন ইসলামের মূল কথা

লক্ষ্যণীয়, আলোচ্য আয়াত সমূহে সর্ব প্রথম এই নসীহতই ছিলঃ আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করোনা। আর এ সারগর্ভ উপদেশ সমূহের পরও পুনরায় আল্লাহ পাকের সাথে শেরক না করার তাগিদ করা হয়েছে। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, তওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনই হল দ্বীন ইসলামের মূল কথা। তওহীদই হল এর মূল ভিত্তি এবং সকল নেক আমল কবুল হওয়ার পূর্বশত। সকল যুক্তি-বুদ্ধি, জ্ঞান-গবেষণা এবং বিচার-বিবেচনার বুনিয়াদী কথা হল তওহীদের প্রতি ঈমানকে সুদৃঢ় করা। সকলা সাধনা ও আরাধনার লক্ষ্যও তাই। যদি তওহীদের প্রতি ঈমান না থাকে তবে জীবন-সাধনার কোন সার্থকতা নেই, বরং সকল সাধনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا

(অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক কর) তবে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হয়ে তুমি দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ্ পাকের রহমত থেকে হবে তুমি বঞ্চিত।

যাহোক, উপরোল্লিখিত আয়াত সমূহে আল্লাহ্ পাক হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যমণ্ডিত এবং একান্ত প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ বর্ণনা করার পর তাগিদ করেছেন, যেন এ বিধি-নিষেধ পালনে অবহেলা না করা হয়। আর তওহীদের কথাকে শুরুতে এবং শেষে উল্লেখ করে এ বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন যে, তওহীদের প্রতি ঈমানই হল ইসলামের প্রথম কথা। আর এটিই শেষ কথা। তওহীদ ব্যতীত কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়। তওহীদের প্রতি ঈমানের মাধ্যমেই রহমতের দ্বার উন্মুক্ত হবে। আর তওহীদের প্রতি ঈমানের অভাব ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই নয়।

উপরোক্ত আয়াতে তওহীদের প্রতি ঈমানের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং শেরকের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে বর্বরতার যুগের সেই বাতিল ফেরকার ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা হয়েছে, যারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্ পাকের কন্যা সন্তান বলত।

কোরআনে করীমে আরো বহু আয়াতে কাফেরদের এ মূর্খতা-প্রসূত ভ্রান্ত ধারণা নিরসন-কল্পে এরশাদ হয়েছেঃ

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (সূরা তুর)

"তবে কি তাঁর জন্যে কন্যা সন্তান এবং তোমাদের জন্যে পুত্র সন্তান"?

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ (সূরা নজম)

"তবে কি পুত্র সন্তান তোমাদের জন্যে আর কন্যা সন্তান তাঁর"।

অর্থাৎ এমন অবাস্তব, অযৌক্তিক, অসুন্দর কথা হতেই পারেনা যা তারা বলছে। পরবর্তী আয়াতেও আল্লাহ্ পাক এ সম্পর্কেই এরশাদ করেছেনঃ

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا

"তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্যে পুত্র সন্তান রেখে দিয়েছেন এবং নিজের জন্যে ফেরেশতাদেরকে কন্যা রূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরা যে অত্যন্ত বড় ভয়ংকর কথা বলছো"।

তোমরা অত্যন্ত মন্দ কথা বলছো এবং আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীনের শানে বেআদবী করছো, কেননা আল্লাহ্ পাক সন্তান-সন্ততির সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। এসব সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী, অথচ আল্লাহ্ পাক চিরস্থায়ী।

দ্বিতীয়তঃ তোমরা সৃষ্টির মধ্যে যারা সবল তাদেরকে নিজেদের জন্যে পছন্দ করছো, আর যারা দুর্বল অর্থাৎ কন্যাদেরকে আল্লাহ্ পাকের জন্য নির্দিষ্ট করছো। এতদ্ব্যতীত

তোমরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ পাকের কন্যা সন্তান বলে বেআদবী করছো, এর চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই হতে পারেনা।

অথচ আসমান জমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর সৃষ্টি, সবাই তাঁর গোলাম, তিনিই স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তিনিই রিয্ক-দাতা, তিনিই সবার ভাগ্য-নিয়ন্তা এবং প্রত্যেককে কাল কেয়ামতের দিন হাযির হতে হবে তাঁর মহান দরবারে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে। যাদের আমলনামায় ঈমান এবং নেক আমল থাকবে, তারা চির শান্তির কেন্দ্র জান্নাতের অধিবাসী হবে। পক্ষান্তরে, যারা ঈমান এবং নেক আমলের সম্বল নিয়ে হাযির হবেনা, তারা চির শাস্তির কেন্দ্র দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا
الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ؕ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤١﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗۤ اٰلِهَةٌ
كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾ سُبْحٰنَهٗ وَ
تَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿٤٣﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ
وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ
تَسْبِيْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤٤﴾

তরজমা

(৪১) এই কোরআনে বহু বিষয় আমি বারবার বর্ণনা করেছি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে, কিন্তু তাতে তাদের বিমুখতাই বেড়ে চলেছে।

(৪২) (হে রসূল!) তারা যেমন বলে, যদি সত্যি সত্যিই আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কোন উপাস্য থাকত তবে তারা অবশ্যই মহান আরশের অধিপতির দিকে পথ করে নিত।

(৪৩) তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা থেকে তিনি অনেক অনেক উর্দ্ধে।

(৪৪) সাত আসমান এবং জমীন তন্মধ্যে সব কিছুই তাঁর পবিত্রতা এবং মহিমা ঘোষণা করে, এমন কিছুই নেই যা তাঁর হামদের তসবীহ পাঠ করেনা, কিন্তু তোমরা তাদের এই তসবীহ পাঠ অনুধাবন করতে পারনা। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত সহনশীল অতীব ক্ষমা-পরায়ণ।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তওহীদের প্রতি ঈমান। আর আলোচ্য আয়াত সমূহে তওহীদে বিশ্বাসের প্রতি তাগিদ এবং শেরকের বাতুলতার যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا

অর্থাৎ কাফের-মুশরেকরা যেন তওহীদের সত্যতা যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারে এবং তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হয়, তারা বাস্তববাদী এবং পরিণামদর্শী হয় এবং তারা উপদেশ গ্রহণ করে, এজন্যে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে বারে বারে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, কিছুতেই তাদের কিছু হয়না, তারা সঠিক পথে আসেনা, তাদের বিভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা, দৌরাত্ম এবং ধৃষ্টতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ এই কোরআনে আমি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ নসিহত এবং সারগর্ভ উপদেশ, বিধি-নিষেধ, দৃষ্টান্ত, যুক্তি-প্রমাণ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছি, যাতে করে লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে এবং সরল সঠিক পথ অবলম্বন করে। অথবা এর অর্থ হল এ আয়াত সমূহে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, তা আমি পবিত্র কোরআনে বারে বারে বিভিন্ন ভাবে এজন্যে বর্ণনা করেছি, যেন লোকেরা এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং জীবন-সাধনায় সঠিক পথ অবলম্বন করে। অথবা এর অর্থ হল ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের কন্যা না হওয়ার কথা আমি পবিত্র কোরআনে বারে বারে ঘোষণা করেছি, যেন তারা আল্লাহ পাকের শানে এমন আপত্তিকর, বেআদবী-পূর্ণ কথা না বলে এবং পবিত্র কোরআনে বর্ণিত বিধি-নিষেধ যথাযথ ভাবে পালন করে। কিন্তু তারা সঠিক পথে আসেনা, তাদের গোমরাহী এবং ধৃষ্টতা বেড়েই চলেছে।

قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ

"(হে রসূল) আপনি বলুন, তারা যেমন বলছে যদি সত্যিই আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কোন মা'বুদ থাকত তবে তো তারা আরশের অধিপতির দিকে অবশ্যই পথ করে নিত। তিনি পবিত্র, তারা যা বর্ণনা করে তার চেয়ে তিনি অনেক অনেক উর্ধ্বে"।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ হে আমার নবী! আপনি কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, তারা যে সব দেব-দেবীকে আল্লাহ পাকের শরীক মনে করে এবং নিজেদের উপাস্য বলে বরণ করে নেয়, যদি তাদের কথা সত্য হয় এবং আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন উপাস্য থাকে তবে তারা এত অসহায়, নিরূপায় হয়ে থাকত না। তারা আরশের অধিপতি আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে

অভিযান করতো, কিন্তু এমন কোন প্রয়াস তো পরিলক্ষিত হয়না। অতএব এ অক্ষম, অসহায় এবং অপদার্থদের উপাসনা করে কি লাভ?

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, কাফেররা বলতো, মহান আল্লাহ তো আছেন, আমরা যাদের উপাসনা করি তা শুধু আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের উদ্দেশেই করি। তাদের জবাব রয়েছে এ আয়াতে। যদি তোমাদের উপাস্যরা আল্লাহ পাকের দরবারে খোশামোদ ও তোয়াজ করে তবে তোমাদেরও কর্তব্য হলো শুধু সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকেরই এবাদত করা। অথচ আল্লাহ্ পাক যুগে যুগে নবী রসূলগণের মাধ্যমে শেরকের প্রতি তাঁর চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং তওহীদ বা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। মনে রেখ, আল্লাহ্ পাক মহান, পবিত্র, তিনি মহিমাময়, কাফের-মুশরেকদের ধারণার অনেক অনেক উর্ধ্বে তাঁর স্থান।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۭ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ

সপ্ত আসমান এবং সমগ্র জমিন এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে এক কথায় নিখিল বিশ্বের সব-কিছু আল্লাহ পাকের হামদের তসবীহ পাঠ করছে, তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছে, তাঁর প্রশংসা করছে। সমগ্র বিশ্বে এমন কিছু নেই, যা মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনায় এবং প্রশংসায় মশগুল নয়, নিখিল বিশ্বের প্রতিটি অণু পরমাণু পর্যন্ত আল্লাহ পাকের একত্ববাদের স্বাক্ষ্য দেয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোজেযা সমূহের বরকত দেখেছি। একবারের ঘটনাঃ আমরা তাঁর সঙ্গে সফরে ছিলাম, পানির অভাব হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন, তোমাদের নিকট যা পানি আছে নিয়ে আস, তখন একটি পাত্র পেশ করা হল যাতে সামান্য পানি ছিল, তিনি তাতে তাঁর হস্ত মোবারক স্থাপন করে এরশাদ করলেনঃ বরকতময় পবিত্র পানির দিকে আস, আর বরকত আল্লাহ পাকের তরফ থেকে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে দেখলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র অঙ্গুলি থেকে পানি বের হয়ে আসছিল। যখন খাবার গ্রহণ করা হতো তখন আমরা খাবার থেকে "সুবহানাল্লাহ" শ্রবণ করতাম (অর্থাৎ খাবার স্বয়ং "সুবহান্নাল্লাহ" বলতো (বুখারী শরীফ)।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, প্রতিটি বস্তু প্রাণহীন হোক বা প্রাণবন্ত আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠ করতে থাকে অর্থাৎ "সুবহানাল্লাহ ওয়াবি হামদিহী" বলতে থাকে।

ইব্রাহিম নখয়ী (রঃ) বলেছেন, প্রত্যেকটি বস্তুই আল্লাহ পাকের হামদ এবং তাঁর তসবীহ পাঠ করতে থাকে অর্থাৎ জ্বীন ও মানব জাতি, ফেরেশতা এবং সকল প্রাণী সুবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহী পাঠ করতে থাকে এবং সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল থাকে।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, সকল প্রাণী এমনকি, উদ্ভিদ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের হামদের তসবীহ পাঠ করতে থাকে।

একরামা (রঃ) বলেছেন, বৃক্ষগুলো আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠে রত রয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে খুতবা প্রদানের সময় যে খেজুর বৃক্ষটির উপর হেলান দিতেন, মিম্বর তৈরী হলে তিনি মিম্বরে আরোহন করে খুতবা দেয়া আরম্ভ করলেন। তখন ঐ খেজুর বৃক্ষটি শোকে মূহ্যমান হয়ে শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করেছিল। পবিত্র কোরআনে এ ঘোষণা রয়েছে যে, আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-এর সাথে পাহাড় এবং পাখীগুলোকেও তসবীহ পাঠের আদেশ দিয়েছেন।

তেবরানী হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসঊদ (রঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ একটি পাহাড় আরেকটি পাহাড়কে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, তোমার উপর কি কোন মানুষ আল্লাহ পাকের জিকর রত অবস্থায় অতিক্রম করেছে? যখন ঐ পাহাড় হ্যাঁ সূচক জবাব দেয় তখন জিজ্ঞাসাকারী পাহাড় আনন্দিত হয়। এতদ্ব্যতীত বস্তু মাত্রই প্রতিনিয়ত আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল থাকে।

وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ

"কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ বুঝতে পার না"।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, তোমরা জীব-জন্তুর মুখে আঘাত করোনা, কেননা প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠ করতে থাকে।

মায়মুন এবনে মাহরান বর্ণনা করেন, হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খেদমতে একটি কাক পেশ করা হয়েছিল, যার ডানা সংকুচিত ছিল। তিনি তার ডানাগুলোকে সম্প্রসারিত করে দিলেন এবং বললেন, কোন শিকারকে তখন পর্যন্ত শিকার করা হয়না এবং কোন বৃক্ষকে তখন পর্যন্ত কাটা হয়না যতক্ষন পর্যন্ত সে আল্লাহর জিকরে মশগুল থাকে, কিন্তু যখন সে আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের তসবীহ পাঠ ভুলে যায় তখন শিকার ধরা পড়ে এবং বৃক্ষটি কাটা হয়।[১]

اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত সহনশীল, অতীব ক্ষমা-প্রিয়"।

বস্তুতঃ নিখিল বিশ্বের সব কিছু যেখানে আল্লাহ পাকের হামদের তসবীহ পাঠরত, সেখানে কাফের-মুশরেকরা তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তাঁর সাথে শেরক করার ধৃষ্টতা দেখায়। এমন অবস্থায় তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করাই যুক্তিযুক্ত, কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাক অত্যন্ত সহনশীল, অতীব দয়াময়, একান্ত ক্ষমা-সুন্দর, তাই তিনি শাস্তি প্রদানে তাড়াহুড়া করেন না।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৭৭-৮৯

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا
بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾ وَّ
جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِذَا ذَكَرْتَ
رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا
يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ
الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ
الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾

তরজমা

(৪৫) (হে রসূল!) আপনি যখন পবিত্র কোরআন পাঠ করেন তখন আপনার ও আখেরাতে অবিশ্বাসীদের মধ্যে একটি গোপন পর্দা রেখে দেই।

(৪৬) আর আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যেন তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করে রেখেছি। আর (হে রসূল!) আপনি যখন কোরআনে করীমের মধ্যে আপনার প্রতিপালককে এককভাবে স্মরণ করেন, তখন তারা হতচকিত অবস্থায় পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে চলে যায়।

(৪৭) যখন তারা আপনার কথার প্রতি কর্ণপাত করে তখন তারা কেন কর্ণপাত করে তা আমি ভালভাবেই জানি, আর একথাও জানি যে গোপন পরামর্শের সময় পাপীষ্ঠরা বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছো।

(৪৮) (হে রসূল!) দেখুন তারা আপনার কি উপমা দেয়, তারা দিশেহারা হয়েছে এবং তারা সঠিক পথ পাবেনা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তওহীদের বিবরণ ছিল। আর এ আয়াত থেকে কাফেররা পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে যে আচরণ করতো তার বর্ণনা স্থান পেয়েছে।

শানে নজুল

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে,

যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে চরম কষ্ট দিত। বিশেষতঃ যখন তিনি তাদের নিকট পবিত্র কোরআন পেশ করতেন, তখন তারা তাঁর প্রতি হামলায় উদ্দত হতো।

আল্লামা বগভী (রঃ) সায়ীদ এবনে যোবায়েরের সূত্রে লিখেছেন, যখন সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়, তখন আবু লাহাবের স্ত্রী একটি পাথর নিয়ে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আক্রমণ করার জন্যে আসে। তিনি তখন হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে বসেছিলেন। কিন্তু সে তাঁকে দেখতে পেলনা। তাই সে হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলো, 'তোমার সঙ্গী কোথায়? আমি জানতে পারলাম সে আমার সম্পর্কে বিদ্রুপাত্মক কবিতা রচনা করেছে'। হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহর শপথ! তিনি কখনও কবিতা রচনা করেন না (তাহলে তিনি বিদ্রুপাত্মক কবিতা কীভাবে রচনা করলেন), তখন সে একথা বলতে বলতে ফিরে গেল, 'আমি এই পাথর দিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে এসেছিলাম (যদি দেখতে পেতাম তবে মাথা চুরমার করে দিতাম)'। হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! সে আপনাকে দেখতে পায়নি'। তিনি এরশাদ করলেন, 'একজন ফেরেশতা আমার ও তার মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল'।

মূলতঃ যারা তওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনা, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকেও মানে না এবং আখেরাতের প্রতিও যারা বিশ্বাস করেনা, নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কেও যারা চিন্তা করেনা, বর্তমানকে নিয়েই যারা মুগ্ধ-মত্ত ও মাতোয়ারা হয়ে থাকে, পরিণামদর্শী, কল্যাণকামী, মুত্তাকী-পরহেযগারদেরকে যারা বিদ্রুপ করে, তাদের অবস্থাই বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আখেরাত সম্পর্কে তাদের উদাসীনতাই হলো তাদের অন্তরের অদৃশ্য পর্দা যা সত্য-উপলব্ধির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিণামে আল্লাহর নবীর মহান শিক্ষা, তাঁর অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শ এবং পবিত্র কোরআনের সার-গর্ভ মূল্যবান উপদেশ তাদের মনে দাগ কাটে না, তারা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারেনা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যের এ সুবর্ণ সুযোগের তারা সদ্ব্যবহার করতে পারেনা।

আলোচ্য আয়াতের 'হিজাব' শব্দটির আরেকটি ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ পাক কাফেরদের চোখের উপর একটি পর্দা রেখে দিয়েছেন যার ফলে তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখতে সক্ষম হতো না, যার প্রমাণ ইতিপূর্বে আবু লাহাবের স্ত্রীর ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে।[১]

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا

"আর আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যেন তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করে রেখেছি"।

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-২২১

আল্লাহ পাক, তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাস কাফেরদের হেদায়েত লাভের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। প্রকাশ্যে দেখা যায় যে তারা পবিত্র কোরআন শ্রবণ করেছে এবং পবিত্র কোরআনের প্রতি তারা কর্ণপাত করেছে কিন্তু যেহেতু পবিত্র কোরআন দ্বারা উপকৃত হওয়া তাদের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হলো উপহাস, বিরোধিতা, তাই পবিত্র কোরআন তাদের কর্ণে পৌঁছলেও অন্তরকে স্পর্শ করেনা। আল্লামা শিব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ) এ পর্যায়ে কাফেরদের অবস্থার একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, সূর্য রশ্মি যত তীব্র এবং আলোকময়ই হোক না কেন, যদি কেউ তার গৃহের দরজা-জানালা বন্ধ করে বসে থাকে, আর সে গৃহ থাকে ভূ-গর্ভে, আর সে ব্যক্তি চোখ বন্ধ করে রাখে এমন অবস্থায় সূর্যের আলোক রশ্মি কি তার কোন কাজে আসতে পারে? ঠিক এমনিভাবে পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য ও মহিমা অদ্বিতীয়, এর মহান শিক্ষা সূর্যের আলোর ন্যায় সর্বজনবিদিত, কিন্তু কাফেররা এর দ্বারা উপকৃত হয় না।[১]

وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا

"আর (হে রসূল!) আপনি যখন কোরআন শরীফের মধ্যে আপনার প্রতিপালককে একক ভাবে স্মরণ করেন তখন তারা হতচকিত অবস্থায় পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে চলে যায়"।

এ আয়াতে কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক, অদ্বিতীয় লা-শরীক আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম উল্লেখ করতেন তখন কাফের-মুশরেকরা পলায়ন করতো।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ পবিত্র কোরআন শ্রবণের সময় মক্কার কাফেরদের দু' অবস্থা ছিল, যখন আল্লাহ পাকের নাম ব্যতীত অন্য কথা হতো তখন তারা শ্রবণ করতো, যদিও কিছুই বুঝতো না কিন্তু যে আয়াতে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের উল্লেখ থাকত এবং শেরক ও কুফরী পরিহার করার আহ্বান থাকত সে আয়াত শ্রবণ করা মাত্র তারা পালিয়ে যেত।[২]

ইমাম আবু জাফর তাবারী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় যেভাবে তওহীদ, তওবা-এস্তেগফার প্রভৃতি কথা শ্রবণ করতে রাজী হতো না; বরং হযরত নূহ (আঃ) যখন এসব কথা বলতেন তখন তারা কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখত, ঠিক এভাবে মক্কার কাফের-মুশরেকদের নিকট যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলতেন তখন তারা হতচকিত হয়ে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করতো, তারা সর্বদা শংকিত থাকত যেন কোনভাবেই তওহীদের কথা তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে।

ইমাম তাবারী (রঃ) হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে এ আয়াতের আরেকটি ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন। হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাকের পবিত্র

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৩১৭
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-২২৩

নাম শ্রবণ করলে যারা পলায়ন করতো, তারা হলো ইবলিস শয়তান ও তার দলবল। হাদীস শরীফে এ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, আজান শ্রবণ করলে ইবলিস শয়তান সে স্থান থেকে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, যখন এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমানের কথা বলা হতো তখন বেঈমানদের মন উদাসীন হয়ে যেত, মুসলমানগণ যখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতেন তখন ইবলিস শয়তান ও তার অনুসারী কাফের-মুশরেকরা বড় অসুবিধা অনুভব করতো এবং কালেমা তাইয়্যেবার ডাক বন্ধ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতো, কিন্তু তাদের এ অপচেষ্টা সর্বত্রই ব্যর্থ হয়েছে। আরবের মরুভূমি থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের একত্ববাদ বা তওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছিলেন, ইসলাম গ্রহণের ডাক দিয়েছিলেন, সে ডাক শুধু আরবের মরুভূমিতেই সীমিত রয়নি; বরং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এ আহবানে সাড়া দিয়ে জীবনকে ধন্য করেছে।[২]

ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-কে আদেশ দিয়েছিলেন যে খাবারের ব্যবস্থা কর এবং মক্কার কুরায়েশ সর্দারদেরকে আহ্বান কর। হযরত আলী (রাঃ) তাই করলেন, কোরায়েশ গোত্রের নেতৃস্থানীয়রা একত্রিত হলো, তাদের জন্যে খাবার পরিবেশন করা হলো। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করলেন এবং তাদেরকে তওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানালেন, তিনি বললেনঃ তোমরা বলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (এক আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই), যদি তোমরা এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আন তবে সারা আরব তোমাদের অনুসারী হবে এবং অনারব বিশ্বও ঈমান আনবে।

কিন্তু কাফের-মুশরেকরা সেদিন এ আহ্বানে সাড়া দেয়নি; বরং একে একে সকলেই মজলিস থেকে বিদায় নিয়েছে।

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ

"যখন তারা আপনার কথার প্রতি কর্ণপাত করে তখন তারা কেন কর্ণপাত করে তা আমি ভালভাবেই জানি"।

অর্থাৎ কাফের-মুশরেকরা সত্যকে গ্রহণ করার উদ্দেশে পবিত্র কোরআন শ্রবণ করে না, তাদের উদ্দেশ্য একটিই, তা হলো বিদ্রুপ এবং উপহাস করা, পবিত্র কোরআনকে মিথ্যাজ্ঞান করা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আপত্তিকর মন্তব্য করা।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, কাফেররা পরস্পরের মধ্যে যে সব কথা-বার্তা বলতো, শলা-পরামর্শ করতো, আল্লাহ পাক এ আয়াত সমূহের

১। তফসীরে তাবারী, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৬৭
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৪৯

মাধ্যমে তা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, '(হে রসূল!) আপনি পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকেন আর এ কাফেররা গোপনে আপনার বিরুদ্ধে শলা-পরামর্শ করে। তারা একথাও বলে যে এই ব্যক্তিকে কেউ যাদু করেছে। যাদুর প্রভাবেই তিনি এসব কথা বলছেন। কাফেররা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অনেক আপত্তিকর মন্তব্য করতো। কেউ বলতো তিনি কবি, কেউ বলতো তিনি যাদুকর, কেউ বলতো তিনি গণক, কেউ বলতো তিনি পাগল (নাউযুবিল্লাহে মিন যালিক)।[১]

অথচ প্রতি মুহূর্তে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জবান মোবারক থেকে অমূল্য মহান বাণী নিঃসৃত হতো যা সমগ্র মানব জাতির জন্যে কল্যাণ বয়ে আনতো। বর্ণিত আছে, একজন সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন। তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আপনার হাদীস সমূহ লিপিবদ্ধ করি অথচ কখনও কখনও আপনি কারো প্রতি ক্রোধান্বিত হন। আমি কি আপনার সেই ক্রোধের সময়ের কথাগুলোও লিখবো'? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ 'শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যিনি আমাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, এ ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্য দিয়ে হক্ব ব্যতীত কিছুই বের হয় না'।

আর স্বয়ং আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى (সূরা নজম)

"আর তিনি কখনও নিজের ভাবাবেগে কোন কথা বলেন না, তাঁর কথা ওহী ব্যতীত আর কিছুই নয়"।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও দূরাত্মা কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে উপরোল্লিখিত আপত্তিকর মন্তব্য করার ধৃষ্টতা দেখাতো। এর কারণ সম্পর্কে শায়খে আকবর আল্লামা মহীউদ্দীন এবনে আরাবী (রঃ) লিখেছেন, যেহেতু দূরাত্মা কাফের-মুশরেকরা আল্লাহ পাকের পরিচয় পায়নি, তাঁর মা'রেফাত হাসিল করতে পারেনি তাই তারা আল্লাহর নবীর সত্যিকার পরিচয়ও পায়নি। যদি তারা আল্লাহ পাকের ছিফাত বা গুণাবলী সম্পর্কে অবগত হতো, তবে তাঁর পবিত্র কালাম কোরআনে করীমের সত্যতা উপলব্ধি করতো। কিন্তু যেহেতু তাদের অন্তরে তাদেরই অন্যায়-অনাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ আবরণ ছিল তাই তারা পবিত্র কোরআনের যথার্থ মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের মূর্খতা, পথভ্রষ্টতা, নীচতা এবং হীনতার কারণে তারা যেমন আল্লাহ পাকের পরিচয় পায়নি, তাঁর কালামের সত্যতা উপলব্ধি করেনি, ঠিক তেমনি তারা আল্লাহর নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মর্যাদাও উপলব্ধি করেনি। এটি তাদের বদ-নছীবী ব্যতীত আর কিছুই নয়।[২]

আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের জন্যে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী। কেননা এ আয়াতে

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৪৯
২। তফসীরে শায়খে আকবর মহিউদ্দিন এবনে আরাবী (রঃ), খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৭১

এরশাদ হয়েছেঃ

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ

অর্থাৎ (হে নবী!) আমি খুব ভালভাবেই জানি যে কি উদ্দেশ্যে তারা আপনার কথা শ্রবণ করে, আপনার প্রতি কর্ণপাত করে। তাদের নিয়ত এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবগত। অতএব তাদের শাস্তি অবধারিত।

وَاِذْهُمْ نَجْوٰٓى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا

আর (একথাও জানি যে) গোপন পরামর্শের সময় পাপীষ্ঠরা বলে, তোমরাতো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছো।

যখন এ পাপীষ্ঠরা পরস্পর পরামর্শ করে তখন তারা একথা বলে, তোমরা যার অনুসরণ করছো সে-তো একজন যাদুগ্রস্ত লোক।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যালেম বলা হয়েছে ওলীদ এবনে মগীরা এবং তার দুর্বত্ত সাথীদেরকে।

ইমাম রাযী (রঃ) এ আয়াত اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا (তোমরা যার অনুসরণ করছো সেতো একজন যাদুকর মাত্র) সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, একথাটি কীভাবে সঠিক হতে পারে? কেননা কাফেররা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেনি। এরপর তিনি এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এভাবে যে এর অর্থ হলো-

أنكم إن اتبعتموه فقد اتبعتم رجلا مسحورا

অর্থাৎ যদি তোমরা তাঁর অনুসরণ কর তবে তোমরা একজন যাদুগ্রস্ত লোকেরই অনুসরণ করবে। আর যাদুগ্রস্ত লোক সে ব্যক্তি যার উপর যাদু প্রভাব বিস্তার করে।[১]

যেহেতু কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অত্যন্ত অন্যায়, অযৌক্তিক, অসুন্দর, অবাস্তব ও আপত্তিকর মন্তব্য করতো তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا

"(হে রসূল!) দেখুন তারা আপনার কি উপমা দেয়, তারা দিশেহারা হয়েছে এবং তারা সঠিক পথ পাবে না"।

অর্থাৎ এ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে যে বেআদবীপূর্ণ কথা বলতো তারই জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে নবী! লক্ষ্য করুন যে তারা আপনার কি উপমা দেয় এবং তারা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। তারা সরল সঠিক পথ থেকে দূরে সরে পড়েছে। অতএব তাদের সকল

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-২২৩

প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেননা তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, অসত্যকে গ্রহণ করেছে।

এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) মোহাম্মদ এবনে এছহাকের সূত্রে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

সীরাতে মোহাম্মদ এবনে এছহাকে বর্ণিত আছে যে আবু সুফিয়ান এবনে হারব, আবু জেহেল এবনে হিশাম এবং আখনাস এবনে সুরাইক এক রাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জবান মোবারক থেকে কোরআনে পাক শ্রবণের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বাড়ীর পেছনে উপস্থিত হলো। তিনি তখন নিজ গৃহে নামাজে রত ছিলেন। এ লোকগুলো এসে চুপিসারে এদিক-ওদিক যে যেখানে পারল বসে গেল। একজন আরেকজনকে দেখতে পেলনা। সারা রাত পবিত্র কোরআন শ্রবণ করলো, যখন ভোর হলো তখন সবাই উঠে গেল।

ঘটনাক্রমে রাস্তায় সবার দেখা হয়ে গেল তখন একজন আরেকজনকে তিরস্কার করতে লাগল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো যে এভাবে কেউ আর কখনও কোরআনে পাক শুনতে যাবে না। তাহলে অন্য লোকেরাও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলবে। কিন্তু পরের রাত্রে আবার তারা সেখানে গিয়ে হাযির। কোরআনে পাক শুনে সারা রাত কাটিয়ে দিল। সকালে ফিরে যেতে যাওয়ার সময় আবার রাস্তায় সবার দেখা হয়ে গেল। পূর্বের কথাগুলোর আবার পুনরাবৃত্তি হলো এবং পাকাপাকি কথা হলো যে আর কিছুতেই তারা এভাবে কোরআন শরীফ শুনতে যাবে না। তৃতীয় রাত্রেও একই ঘটনা ঘটলো। অবশ্য এরপর তারা পরস্পর শপথ করলো যে আর কখনো এভাবে তারা একত্রিত হবে না। সকালে আখনাস তার লাঠিটি হাতে নিয়ে আবু সুফিয়ানের বাড়ী পৌঁছলো এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'হে আবু হানযালা! আমাকে বল (আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে তোমার মত কি'? আবু সুফিয়ান বললো, 'হে আবু সালাবা! আমরা কোরআনের যে আয়াত সমূহ শ্রবণ করেছি তন্মধ্যে কিছু আয়াতের অর্থ আমি বুঝতে পেরেছি আর কিছু আয়াতের অর্থ আমার বোধগম্য হয়নি'। আখনাস বললো, 'আল্লাহর শপথ, আমারও একই অবস্থা'। এরপর আখনাস আবু জেহেলের বাড়ীতে গিয়ে একই প্রশ্ন করলো। আবু জেহেল বললো, 'দেখুন নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্বের ব্যাপারে বনু আবদে মনাফ গোত্রের সঙ্গে আমাদের একটা বহু পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। তারা মানুষকে খাবার পরিবেশন করে, আমরাও তা শুরু করেছি। তারা মানুষকে যানবাহন দিয়ে থাকে, আমরাও তা করি। তারা মানুষের উপকার করে, আমরাও তা করি। এক কথায় আমরা তাদের পেছনে থাকতে চাই না। এমন অবস্থায় যখন সব ব্যাপারে আমরা তাদের সমান রয়েছি, কোন ব্যাপারেই তারা আমাদের থেকে এগিয়ে যেতে পারেনি এমন সময় হঠাৎ করে তারা দাবী করে বসলো যে আমাদের মধ্যে নবুওয়্যত রয়েছে। আমাদের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তি রয়েছেন যাঁর নিকট আসমান থেকে ওহী বা প্রত্যাদেশ আসে'।

'এখন তুমিই বল কীভাবে আমরা একথা মেনে নিতে পারি? আল্লাহর শপথ! আমরা

তাঁর প্রতি ঈমান আনবোনা, তাঁকে কখনও সত্যবাদী জানবো না'।

তখন আখনাস উঠে চলে গেল।[১]

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

অর্থাৎ তারা সঠিক পথ পাবেনা। তাদের নাফরমানীর কারণে তারা পথহারা হয়েছে, এমনকি দিশেহারা হয়েছে, তাই তারা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবেনা।

এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ পাক তাদের অন্যায়-অনাচারের কারণে তাদের অন্তরে আবরণ রেখে দিয়েছেন।

অথবা এর অর্থ হলো তারা বিভ্রান্ত-পথভ্রষ্ট, কখনও কোন বিষয়ে মন স্থির করতে পারেনা, এমনি ব্যাকুল এবং অস্থির যে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনা তাদের করণীয় কি, তাই তারা সঠিক পথ পায় না এবং পাবেও না।

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا
وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٤٩﴾ قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ
حَدِيْدًا ﴿٥٠﴾ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ
يُّعِيْدُنَا ۭ قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ
وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ۭ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ﴿٥١﴾ يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ
فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٥٢﴾

তরজমা

(৪৯) আর তারা বলে, আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার পরও কি নতুন সৃষ্টি হিসাবে পুনরুত্থিত হবো?

(৫০) (হে রসূল!) আপনি বলুন, 'তোমরা পাথর অথবা লৌহ হয়ে যাও'।

(৫১) 'অথবা এমন কিছুতে পরিণত হও যা তোমাদের ধারণায় অত্যন্ত কঠিন'। তারা বলবে, 'কে আমাদেরকে ফিরিয়ে আনবে'? (হে রসূল!) আপনি বলুন, 'যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন (তিনিই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবেন)'। এরপর তারা আপনার

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৪৯

সম্মুখে, মাথা নাড়বে এবং বলবে তা কবে হবে? (হে রসূল!) আপনি বলুন, 'সম্ভবতঃ অতি শীঘ্র।

(৫২) যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন আর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে এবং তোমরা ধারণা করবে যে তোমরা অতি অল্প সময় অবস্থান করেছিলে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের এবং নবুওয়্যতের সত্যতার দলিল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে কেয়ামত সম্পর্কে কাফেরদের যে সন্দেহ ছিল তা খণ্ডন করা হয়েছে।[১]

কাফেরদের কেয়ামতের সম্পর্কে সন্দেহ ছিল যে আমরা যখন মৃত্যুর পরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব তখন কীভাবে আমাদের পুনরুত্থান হবে? আল্লাহ্ পাক তাদের এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন যে, মৃত্যুর পর যখন তোমরা মাটির সঙ্গে মিশে যাবে তখন পুনরায় তোমাদেরকে তিনিই সৃষ্টি করবেন যিনি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর এ কাজ তাঁর জন্যে অত্যন্ত সহজ। আল্লামা ওসমানী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যে সব অপপ্রচার করতো তন্মধ্যে একটি কথা এই, মানুষের মৃত্যুর পর সে মাটির সঙ্গে মিশে যায় এবং ধীরে ধীরে সবই শেষ হয়ে যায়। এমনকি অস্থি পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। অথচ ইনি দাবী করেন যে তোমরা নতুন জীবন লাভ করবে এবং তোমাদের পুনরুত্থান হবে। এমন আজগুবী কথা যে বলে তাঁকে পয়গম্বর কি করে মেনে নেয়া যায়? কাফেরদের এসব কথার উত্তরই দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।[২]

এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا

(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা পাথর অথবা লৌহ হয়ে যাও অথবা তোমরা যা তার চেয়েও কঠিন মনে কর তা হয়ে যাও অর্থাৎ তোমরা যদি জীবনী শক্তি বঞ্চিত লৌহ বা পাথরে পরিণত হও তবুও আল্লাহ পাক তোমাদেরকে পুনর্জীবন দান করবেন এবং তাঁর মহান দরবারে হাযির করবেন। সূরা জুমআয় কিভাবে এ সত্যকে ঘোষণা করা হয়েছে তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ .....

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, নিশ্চয় যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর রয়েছ সে মৃত্যু তোমাদের সঙ্গে মোলাকাত করবে। এরপর তোমাদেরকে হাযির করা হবে সেই মহান সত্ত্বার দরবারে, যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানেন। এরপর তিনি

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-২২৪
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২২
ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৩১৭

তোমাদেরকে তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

(সূরা বাকারা) اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের সকলকে আল্লাহ পাক হাযির করবেন"।

আর সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ পাক কাফেরদের কেয়ামত সম্পর্কীয় সন্দেহের জবাব এভাবে দিয়েছেনঃ

قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ

"সে বলে, যখন অস্থি পঁচে গলে যাবে তখন কে তাতে প্রাণ সঞ্চার করবে"? (হে রসূল!) আপনি বলুন, তিনিই তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন যিনি তা প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন আর তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত"।

বস্তুতঃ মাটির মানুষ যদি মাটিতে মিশেও যায়, অণু-পরমাণুতে রূপান্তরিত হয় তাকে পুনরায় একত্রিত করা অর্থাৎ মৃত দেহের বিচ্ছিন্ন অণু কণাগুলোকে একত্রিত করা এবং তাতে প্রাণ সঞ্চার করা আল্লাহ পাকের কাছে অত্যন্ত সহজ কাজ। কেননা প্রথম বার তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, পুনরায় তোমাদের দেহে প্রাণ সঞ্চার করা তাঁর পক্ষে কঠিন হবে কোন্ যুক্তিতে? আর আলোচ্য আয়াতে একথাই এরশাদ হয়েছেঃ

قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, যিনি প্রথম বার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন (তিনিই পুনরায় জীবন দান করবেন)"।

মূলতঃ তোমরা প্রথম ছিলে মাটি এরপর শুক্র-কণায় পরিণত হও, মানব-দেহে রূপান্তরিত হও এবং ঐ প্রাণহীন দেহে যিনি প্রাণ সঞ্চার করে তোমাদেরকে জীবন্ত এবং প্রাণবন্ত করে তোলেন, তিনি পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন এবং হাশরের ময়দানে একত্রিত করবেন।

فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ

কাফেররা তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথার কোন জবাব দিতে অপারগ হয়ে মাথা দুলিয়ে বলে, আচ্ছা না হয় মেনে নিলাম মৃত অণু কণাতে প্রাণ সঞ্চারিত হবে এমনিভাবে মৃত মানুষ পুনর্জীবন লাভ করবে, আর একথাও মেনে নিলাম সব মানুষকে একত্রিত করা হবে কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তা কবে হবে?

তারই জবাবে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا

(হে রসূল!) আপনি তাদেরকে বলুন, কেয়ামতের সঠিক দিনক্ষণ একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন। তবে সে সময় খুব দূরে নয়, অদূর ভবিষ্যতেই কেয়ামত সংঘটিত হবে, পৃথিবীর অতীত বয়সের তুলনায় ভবিষ্যতের সময় যে কম, এতে কোন সন্দেহ নেই।

অথবা এর অর্থ হলো, সৃষ্টির প্রথম থেকে যতদিন অতিবাহিত হয়েছে তার নিরীখে বিচার করলে দেখা যায় যে বিশ্ব সৃষ্টির লয়ের সময় সমাগত, অতএব সেদিনকে দূরে মনে করোনা। এতদ্ব্যতীত তোমাদের জীবনও ক্ষণস্থায়ী, যখন মানুষের মৃত্যু আসে তখনই তার কেয়ামত এসে পড়ে, সে নিজেই তার কেয়ামত প্রত্যক্ষ করে আর সেদিন আদৌ দূরে নয়।

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ

"যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন এবং তোমরা তাঁর প্রশংসা রত অবস্থায় চলে আসবে এবং তোমরা ধারণা করবে যে অতি অল্প সময়ই তোমরা অবস্থান করেছ"।

আলোচ্য আয়াতে কেয়ামতের কঠিন দিনের কথা স্মরণ করানো হয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তোমাদের জন্যে ডাক আসবে তখন সকলেই আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা করতে করতে হাশরের ময়দানে ছুটে আসবে, সকলেই সমবেত হবে সেদিন, কেউ-ই এ আদেশের বরখেলাফ করতে পারবে না। মুসলিম-অমুসলিম, মোমেন-কাফের নির্বিশেষে সকলেই সেদিন আল্লাহ্ পাকের হামদ করতে থাকবে এবং অত্যন্ত বিনীত ও অনুগত হয়ে দরবারে এলাহীতে হাযির হবে, যদিও সেদিন কাফেরদের এ হামদ বা প্রশংসা কোন উপকারে আসবে না।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন আল্লাহ্ পাক তাঁর ফেরেশতা ইস্রাফীল (আঃ)-এর মাধ্যমে তোমাদেরকে ডাকবেন তখন তোমরা সকলেই সমবেত হবে, তোমরা কবর থেকে বের হয়ে কেয়ামতের ময়দানে একত্রিত হবে এবং তখন আল্লাহ্ পাকের হামদ করতে থাকবে।

অথবা এর অর্থ হলো, কবর থেকে ওঠার সময় তোমরা আল্লাহ্ পাকের হামদ করবে এবং তখন একথা স্বীকার করবে যে, আল্লাহ্ পাকই তোমাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তিনিই তোমাদের পুনরুত্থান করিয়েছেন।

অথবা এর অর্থ হলো, যেভাবে আল্লাহ্ পাকের হাম্দকারীগণ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, ঠিক তেমনি তোমরাও সেদিন আল্লাহ্ পাকের অনুগত হবে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে মোমেনদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কবর থেকে ওঠার সময় মোমেনগণ আল্লাহ্ পাকের হামদ করবে আর কাফেররা তখন শুধু আক্ষেপ করতে থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমাকে জিব্রাঈল (আঃ) জানিয়েছেন, মোমেনদের জন্যে কলেমায়ে তাইয়েবা তাদের মৃত্যুর সময়, কবরে অবস্থান কালে এবং কবর থেকে ওঠার সময় শান্তি এবং সান্ত্বনার কারণ হবে। হে আল্লাহর রসূল, আপনি দেখে আশ্চর্যন্বিত হবেন

যে মোমেনগণ কবর থেকে মাথা ঝাড়তে ঝাড়তে বের হয়ে আসবে। তাদের মুখে থাকবে কলেমায়ে তাইয়েবা এবং আলহামদুলিল্লাহ, যার কারণে তাদের চেহারা হবে অতি সুন্দর এবং উজ্জল আর কাফেররা আক্ষেপ করে বলবে, 'হায় আফসোস! আমরা আল্লাহ পাকের ব্যাপারে গাফলত করেছি', তাদের চেহারা হবে কালো।

তেবরানী, এবনে আবি হাতেম এবং এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তওহীদে বিশ্বাসীগণ মৃত্যুর সময় ভীত হবে না। কবরে অবস্থান কালে বা কবর থেকে বের হবার সময়ও তাদের কোন অশান্তি হবে না। মনে হয় সে দৃশ্য আমার সম্মুখে রয়েছে, যখন মোমেনগণ শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে বলবে,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ

"সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন"।

وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا

কেয়ামতের দিনের মহা বিপদ দেখে কাফেররা ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতংকিত হয়ে দুনিয়ার জীবনকে বা কবরের জীবনকে অত্যন্ত স্বল্পায়ু মনে করবে।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন যে তারা কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে অতি সামান্য মনে করবে।[১]

ইমাম তাবারী (রঃ) এ আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা পেশ করেছেনঃ

فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ এর অর্থ হলো আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক তাঁর ডাকে সাড়া দেবে।

এ ব্যাখ্যা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)। অন্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে بحمده অর্থ হলো عرفته وطاعته অর্থাৎ তারা আল্লাহ পাকের ডাকে সাড়া দেবে এমন অবস্থায় যখন তারা আল্লাহ পাকের সত্যিকার পরিচয় পাবে এবং তাঁর প্রতি তারা আনুগত্য প্রকাশ করবে। এ ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম কাতাদা (রঃ) আর ইমাম তাবারী (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের بحمده শব্দের অর্থ হলো بقدرته অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ পাকের ডাকে সাড়া দেবে তাঁর কুদরতে।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৮৩-৮৪
২। তফসীরে তাবারী, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৭০

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ
يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ
كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۝ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ۭ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ
اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ۭ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۝ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ
بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰي بَعْضٍ
وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ
كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ۝ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ
اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ۭ اِنَّ
عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ۝

তরজমা

(৫৩) (হে রসূল!) আমার বন্দাদেরকে বলুন, তারা সে কথাই যেন বলে যা ভাল। শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়, শয়তান যে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

(৫৪) তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে খুব ভালভাবেই জানেন, ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন আর ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন। (হে রসূল!) আমি আপনাকে তাদের অভিভাবক করে প্রেরণ করিনি।

(৫৫) যারা আকাশে এবং পৃথিবীতে আছে আপনার প্রতিপালক তাদেরকে খুব ভালভাবেই জানেন। আর নিশ্চয় আমি কোন কোন পয়গম্বরকে কোন কোন পয়গম্বরের উপর মর্যাদা দিয়েছি, আর দাউদকে আমি যবুর দান করেছি।

(৫৬) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে কর তাদেরকে ডাক, (তোমরা দেখবে) তোমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার অথবা তা পরিবর্তন করার কোন শক্তি তাদের নেই।

(৫৭) তারা যাদেরকে ডাকে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে থাকে। তারা জানতে চায় কোন্ ব্যক্তিটি তাঁর নিকটতম এবং তারা আল্লাহ পাকের রহমতের আশা রাখে, তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের আযাব অত্যন্ত ভয়াবহ।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তওহীদ এবং কেয়ামতের সত্যতার দলিল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যদি কাফের-মুশরেকদের সাথে বিতর্কের প্রয়োজন হয় তবে বিনম্র ভাষায় যেন তাদের সঙ্গে কথা বলা হয়।[১]

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে عباد শব্দ দ্বারা মোমেনদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা পবিত্র কোরআনে শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে মোমেনদের উদ্দেশেই ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ ..... (সূরা যুমার)

(অতএব, সুসংবাদ দিন আমার সে বন্দাদেরকে যারা আল্লাহ্ পাকের কথা শ্রবণ করতে চায়।)

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ (সূরা ওয়ালফাজর)

(অতএব, আমার বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও।)

যেহেতু ইতিপূর্বে শেরকের বাতুলতা এবং তওহীদের সত্যতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং কেয়ামতের দিনের বাস্তবতার কথাও দলিল-প্রমাণ সহ এরশাদ হয়েছে, তাই আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে কাফেরদের সঙ্গে যেন বিনম্র ভাষায় কথা বলা হয়, তাদেরকে যেন গালি না দেয়া হয় এবং সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে যেন তাদের সাথে কথা বলা হয়।২

শানে নজুল

কালবী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, মুশরেকরা যখন মুসলমানদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন শুরু করে তখন মুসলমানগণ হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ সম্পর্কে অভিযোগ করলে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, এ আয়াত নাজিল হয় হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে। জনৈক কাফের তাঁকে গালি দিয়েছিল তাই আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ক্ষমা করার আদেশ দিয়েছেন এ আয়াতের মাধ্যমে।[৩]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, আল্লাহ্ পাক হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেনঃ আপনি আমার মোমেন বন্দাদেরকে বলে দিন যেন তারা পরস্পর কথা বলার সময় বিনম্র ভাষা ব্যবহার করে, তা

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২৫
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-২২৮
৩। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৮৪-৮৫

না হলে শয়তান পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে দেবে এবং কলহ-দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যাবে, শয়তান সব সময় সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, এজন্যে হাদীস শরীফে কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উঠিয়ে ইঙ্গিত করাকেও হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শয়তান তাতে আঘাত করিয়ে দিতে পারে। পরিণামে সে জাহান্নামী হয়ে যেতে পারে। (মসনদে আহমদ)

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি সমাবেশে এরশাদ করেনঃ সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। কেউ যেন কারো উপর জুলুম না করে এবং একে অন্যকে বিরক্ত না করে আর কেউ যেন কাউকে অপমান না করে। এরপর তিনি তাঁর বক্ষ মোবারকের প্রতি ইঙ্গিত করে এরশাদ করেন, 'তাকওয়া এখানে'। যে দু' ব্যক্তির মধ্যে দ্বীনি মুহাব্বত গড়ে ওঠে এবং পরে তা ছিন্ন হয়ে যায়, সে বিচ্ছিন্নতার কথা যে-ব্যক্তি আলোচনা করে সে অত্যন্ত মন্দ এবং নেহায়েত বদ ও দুষ্ট। (মসনদ)[১]

মুসলমানদের পরস্পরের কলহ-দ্বন্দ্ব

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে মুসলমানদের পরস্পরের কলহ-দ্বন্দ্ব, বিবাদ-বিসম্বাদ শয়তানী কাজ। শয়তানই মুসলমানদেরকে একে অন্যের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়। এজন্যে মুসলমানদের কর্তব্য হল- এক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা এবং বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়া ও পরস্পরের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করা, যাতে করে শয়তান পরস্পরের মধ্যে কলহ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টির কোন সুযোগ না পায়।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ শুরুতে মুসলমানগণ কাফেরদেরকে তাদের কুফরী ও নাফরমানীর কারণে তিরস্কার করতেন, ফলে অশান্তি-অকল্যাণ তথা কলহ-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতো এবং শত্রুতার বীজ উপ্ত হতো। আর এ অবস্থা ইসলামের উন্নতির পথে একটি বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়, এজন্যে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। যেহেতু এ আয়াত সূরা বণী ইসরাঈলের যা মক্কায় নাজিল হয়েছে এজন্যে আলোচ্য আয়াতে عبادى শব্দটি দ্বারা প্রথম যুগের মোহাজেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা মক্কার কাফেরদের দ্বারা উৎপীড়িত-নির্যাতীত হয়েছিলেন। এজন্যে আল্লাহ পাক عبادى বা আমার বন্দা বলে তাঁদের বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[২]

আয়াতের মর্মকথা

কাফেররা দ্বীন ইসলামকে সর্বদা উপহাস করতো। তাই মুসলমানদেরকে এ সম্পর্কে পূর্বেই সতর্ক করা হয় যে কাফেররা যাই করুক তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর, অর্পিত দায়িত্ব যত্ন সহকারে পালন কর। কাফেরদেরকে উপদেশ দিতে থাক, তাদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করোনা, তাদের মর্মবেদনার কারণ হতে পারে এমন আচরণ করোনা। তাতে

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৫১
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২৬

ক্ষতির আশংকাই বেশী থাকে, কেননা শয়তান সর্বদা পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করেই আনন্দিত হয়, পরস্পরকে উত্তেজিত করার হীন প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে।

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ

"তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে ভালভাবেই জানেন। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে দয়া করবেন অথবা ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তিনি ইচ্ছা করলে ঈমানের তৌফিক দিয়ে তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, অথবা যদি ইচ্ছা করেন তবে কাফের অবস্থায় মৃত্যু দিয়ে তোমাদেরকে আযাবে নিক্ষেপ করবেন। এবনে জরীর বলেন যে এ আয়াতখানি الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ পরে এসেছে। মাঝখানে অন্য প্রসঙ্গের আয়াত রয়েছে। মোটকথা অর্থ হলো, তোমরা কাফেরদেরকে বলে দাও যে, আল্লাহ পাক তোমাদের অবস্থা ভালভাবেই অবগত আছেন। তোমরা তাদেরকে গালি দিওনা এবং মূর্খের মত তাদের কথার জবাব দিওনা এবং প্রকাশ্যে তাদেরকে দোযখী বলোনা। কেননা এর দ্বারা অশান্তিই বৃদ্ধি পাবে। আর একথাও জানা নেই যে বর্তমানে যে কাফের রয়েছে ভবিষ্যতে তার অবস্থা কি হবে। হতে পারে অবশেষে সে ঈমান আনবে, আর ঈমানদার অবস্থায় তার মৃত্যু হবে। কার জীবনের অবসান কি অবস্থায় হবে এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ পাকেরই রয়েছে, আর কারো নয়।

কালবী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মোমেনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ পাকের যদি মর্জি হয় তবে তিনি দয়া করে মক্কাবাসীর জুলুম থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। আর যদি তাঁর ইচ্ছা হয় তবে তাদের দ্বারা তোমাদেরকে কষ্ট দেবেন এবং তাদেরকে তোমাদের উপর প্রভাবশালী করবেন।[১]

মূলতঃ এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জি সর্বত্র কার্যকর হয়। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ঈমানের তৌফিক দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা তাকে কাফের অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত করেন। আর এভাবে সে আযাবের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا

"(হে রসূল!) আমি আপনাকে তাদের অভিভাবক করে প্রেরণ করিনি"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। কেননা তিনি কাফেরদের হেদায়েতের জন্যে থাকতেন উদগ্রীব। তিনি তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের দাওয়াত দিতেন এবং তাঁর নবুওয়্যতের পক্ষে সুস্পষ্ট জ্বলন্ত প্রমাণ সমূহ

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৮৫

উপস্থাপন করতেন। তারা তাঁর মোজেযা সমূহ প্রত্যক্ষ করতো কিন্তু এতদসত্বেও তারা ঈমান আনতো না। এমনি অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মন আহত হতো। তিনি ব্যথিত-মর্মাহত হতেন। তাই আল্লাহ পাক তাঁকে এ আয়াতে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেন, হে আমার নবী! যদি কাফেররা দ্বীন ইসলামের জ্বলন্ত সত্য গ্রহণ না করে তবে এজন্যে আপনি আহত বোধ করবেন না। কেননা পথ প্রদর্শনই আপনার কাজ। সঠিক পথ গ্রহণে বাধ্য করা আপনার দায়িত্ব নয়, আপনি তাদের অভিভাবক নন, তাদের নিকট সত্যের আহ্বায়ক মাত্র। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা মোতাবেকই হেদায়েতের ফয়সালা হয়, তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত থেকে মাহরূম করেন। আপনার কাজ হলো সুসংবাদ দেয়া, আর ভয় প্রদর্শন করা। অতএব আপনি এ কাজ করতে থাকুন, তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করুন। আপনার প্রতি এবং আপনার সাথীদের প্রতি কাফেররা যে জুলুম-অত্যাচার করে তাতে সবর অবলম্বন করুন।[১]

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

"(হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক খুব ভাল করেই জানেন তাদেরকে যারা আকাশে এবং পৃথিবীতে রয়েছে"।

মক্কার কাফেরা এ প্রশ্ন করতো যে রসূল মনোনীত করার জন্যে আল্লাহ পাক আবু তালেবের এতীম ভ্রাতস্পুত্রকেই পছন্দ করলেন? আর বেলাল (রাঃ) এবং সোহাঈল (রাঃ)-এর ন্যায় অসহায় লোকেরা হয়ে গেল জান্নাতী? আর মক্কার উচ্চ পর্যায়ের লোকেরা হয়ে যাবে দোযখী? এ কেমন কথা? তারই জবাবে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ আসমান ও জমীনে যে যেখানে আছে আল্লাহ পাক সকলকেই জানেন, কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে নয়। সকলের সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। সব কিছুই রয়েছে তাঁর নখ-দর্পণে। আল্লাহ পাক ভাল করেই জানেন কে নবুওয়্যতের যোগ্য, আর কে যোগ্য নয়। এজন্যে তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁকেই নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেন। শুধু নবী মনোনীত করাই নয়; বরং নবীদের মধ্যে কোন কোন নবীকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا

"নিশ্চয় আমি কোন কোন নবীকে কোন কোন নবীর উপরে ফজিলত দান করেছি এবং দাউদকে যবুর দান করেছি"।

আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে কোন কোন নবীকে আল্লাহ পাক বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে তাঁর বন্ধু বলে ঘোষণা করেছেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে আল্লাহ পাক কথা বলেছেন। আর হযরত ঈসা (আঃ)-কে পিতা ব্যতীত 'কুন' শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৮৬

অতি শৈশবকালে তাঁকে বাকশক্তি দান করেছেন। এমনিভাবে হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে এমন ক্ষমতা দান করেছেন যা পৃথিবীতে আর কাউকে দান করেননি। হযরত দাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাক যবুর দান করেছেন। এই সমস্ত ফজিলত ও উচ্চ মর্যাদার মানদণ্ড অর্থ-সম্পদ নয়, বরং আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা, মর্জি, জ্ঞান এবং বিবেচনা। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁকে অন্যের চেয়ে উচ্চতর মর্যাদা দান করেছেন। যেমন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী করে প্রেরণ করেছেন। তাঁর প্রতি পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন। অতএব, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হওয়ার ব্যাপারে বিস্মিত হওয়ার কোন ন্যায্য কারণ নেই। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ একথা সর্বজন বিদিত ও স্বীকৃত যে, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে রসূলগণ উত্তম। আর তাঁদের মধ্যে পাঁচজন বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন রসূল রয়েছেন এবং এই পাঁচ জনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ), এরপর হযরত মূসা (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়।[১]

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আম্বিয়ায়ে কেরামের ফজিলত বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ যবূরের আলোচনা করার কারণ হচ্ছে– এর দ্বারা উম্মতে মোহাম্মদীয়ার ফজিলতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা হযরত দাউদ (আঃ)-কে নবুওয়্যত ও রেসালতের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও দান করা হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ্ পাক আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নবুওয়্যত ও রেসালতের সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও দান করবেন বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে যে তিনি যখন জেহাদে যেতেন তখন কখনও পিছপা হতেন না। ঠিক এভাবে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নবুওয়্যত ও রেসালাতের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও একই কম্বলের ভেতর একত্রিত করে দেয়া হয়েছে, শুধু তাই নয়; বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরে খোলাফায়ে রাশেদীন সিরিয়া এবং পারশ্যের শাসনভার হাতে নেন। যেমন কোরআনে করীমে এ সম্পর্কে সুসংবাদ দেয়া হয়েছেঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

"আর আমি যবুরে নছীহতের পর একথা লিখে দিয়েছি যে নিশ্চয় নেককার লোকগণই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে"।

পরবর্তী কালে আল্লাহ্ পাকের এ ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীন হযরত দাউদ (আঃ)-এর ন্যায় দুনিয়াতে ইনসাফ-ভিত্তিক শাসন পরিচালনা করেছেন।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৮৬
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩২৬-২৭
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৫১
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রাঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৮৭

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, যেহেতু প্রিয়নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সার্বভৌম ক্ষমতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদার কথা যবুরে উল্লেখিত হয়েছে, তাই এ পর্যায়ে হযরত দাউদ (আঃ)-এর এবং যবুরের কথার উল্লেখ অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।[১]

এখানে একথাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আল্লাহ পাক আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সকল নবী রসূলগণের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদা দিয়েছেন, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মনোনীত করেছেন এবং তাঁর উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত ঘোষণা করেছেন, কেননা যবুর গ্রন্থে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ আমার জমিনের উত্তরাধিকারী তারাই হবে যারা যোগ্যতা সম্পন্ন। আর আল্লাহ পাক উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন, এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে উম্মতে মোহাম্মাদীয়া হলো সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পবিত্র কোরআন দান করেছেন এবং সর্বাধিক নৈকট্য লাভে ধন্য করেছেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যবুর আসমানী গ্রন্থ যা আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-কে দান করেছিলেন, তাতে ১৫০টি সূরা ছিল এবং সব সূরাতেই দোয়া এবং আল্লাহ পাকের হামদ ও ছানা ছিল, তাতে হালাল-হারামের কোন বিবরণ ছিলনা এবং কোন ফরজ ওয়াযিবের উল্লেখও ছিলনা।

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদের তোমরা উপাস্য মনে কর তাদেরকে ডাক, (তোমরা দেখবে) তোমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার বা তা পরিবর্তন করার কোন শক্তিই তাদের নেই"।

শেরকের বাতুলতা ঘোষণা

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেনঃ মুশরেকরা তওহীদের প্রমাণ শ্রবণ করে তাদের বাতিল উপাস্যদের ফজিলত বর্ণনা করত এবং বলত যে, তাদের উপাস্যরা এভাবে তাদের উপকার করে, তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন ঃ (হে রসূল!) আপনি মুশরেকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, তারা যাদেরকে উপাস্য মনে করে তাদের কি কোন ক্ষমতা আছে? তারা কি তাদের ভক্তদের কোন দুঃখ দূরীভূত করতে পারে? যদি না পারে তবে একথা প্রমাণিত হয় যে তাদের কোন ক্ষমতাই নাই। তফসীরকারগণ বলেছেন, সে সময় মক্কায় চরম দুর্ভিক্ষ ছিল। মক্কাবাসী অভাব-অনটনে কাতর হয়ে পড়েছিল তাই আলোচ্য আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে; হে মুশরেকের দল! তোমরা যাদেরকে উপাস্য মনে কর তারা কি তোমাদের অভাব-অনটন

১। ফাওয়াযেদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৩৭২

দূরীভূত করতে পারে? তোমাদের দুঃখ কষ্ট কিছু মাত্র লাঘব করতে পারে? এ প্রশ্নের একই জবাব- 'না'। এমন অবস্থায় তাদের উপাসনার সার্থকতা কি? মূলতঃ মানুষের সুখ-দুঃখের একচ্ছত্র মালিকানা আল্লাহ পাকেরই, এতে আর কেউ শরীক নেই, তিনি যাকে সুখী করেন সে-ই সুখী হয়, তিনি যাকে দুঃখী করেন কেউ তাকে সুখী করতে পারেনা। অতএব আল্লাহ পাকের বন্দেগী করাই বুদ্ধিমান পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ

"এই মুশরেকরা যাদেরকে ডাকে তারাই তো স্বীয় প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে থাকে"।

শানে নজুল

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত এ মর্মে একখানি হাদীস সংকলন করেছেন যে, কিছু লোক জ্বীনদের পূজা করতো, পরবর্তীকালে ঐ জ্বীনরা মুসলমান হয়ে যায় কিন্তু এতদসত্বেও ঐ মুশরেককরা জ্বীনদের পূজা করতে থাকে। এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক ঐ কাফেরদের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, যারা জ্বীনদের উপাসনা করতো এ মর্মে যে তোমরা যাদেরকে উপাস্য মনে করছো তারা নিজেরাই আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং নৈকট্য লাভের অনুসন্ধান করছে, এমনকি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের ব্যাপারে তারা প্রতিযোগিতা করে চলেছে যে কে কার আগে যেতে পারে এবং আল্লাহ পাকের অধিকতর নৈকট্য লাভে ধন্য হতে পারে। যখন তোমাদের পূজারীরাই এক আল্লাহর বন্দেগীতে মশগুল তখন তোমাদের কর্তব্য নির্ধারণে বিলম্ব করা নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, যারা জ্বীনদের উপাসনা করতো শুধু তারাই নয়; বরং যারা ফেরেশতা, হযরত ঈসা (আঃ), হযরত ওজায়ের (আঃ), হযরত মরিয়ম (আঃ) এমনকি, চন্দ্র সূর্যের উপাসনা করতো, তাদের উদ্দেশেও এ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে وسيلة শব্দের অর্থ হলো, আগ্রহ সহকারে কোন কিছুর নিকট পৌঁছা, আর আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের ওসীলার তাৎপর্য হলো আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনের মাধ্যমে তাঁর তরফ থেকে নিদৃষ্ট শরীয়ত মোতাবেক জীবন-যাপন করে আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার চেষ্টা করা।

ايهم اقرب

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের সর্বাধিক নৈকট্য-ধন্য তারা নিজেরা আরও অধিকতর নৈকট্য লাভের সাধনায় রত রয়েছে। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, যাদের তোমরা উপাসনা কর, তারা এমন ব্যক্তির অন্বেষণ করে যে আল্লাহ পাকের সর্বাধিক নৈকট্য-ধন্য,

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৫২

তারা তারই ওসীলা গ্রহণে সচেষ্ট থাকে।

অথবা এর অর্থ হলো, তারা অধিকতর এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সর্বাধিক নৈকট্য-ধন্য হতে সচেষ্ট থাকে।

وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ

অর্থাৎ তারা আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। মুশরেকদের উপাস্যরা যখন নিজেই আল্লাহর রহমতের আশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে, এমন অবস্থায় তাদের পূজারীদের কী পরিণাম হবে তা সহজেই অনুমেয়। আর কিসের ভিত্তিতে মুশরেকরা তাদের উপাস্য স্থির করে তাও জিজ্ঞাসা।

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا

"নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের আযাব ভয় করার মত"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের যে আযাব কাফেরদের জন্যে রয়েছে তা সতিই ভয় করার মত। আর সে আযাব এত ভয়ংকর যে ফেরেশতা এবং পয়গম্বরগণেরও ভয় করা উচিত।

আল্লামা বয়যাভী বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো, হে মুশরেকরা! তোমরা যাদের উপাস্য মনে কর ফেরেশতা হোক বা জ্বীন অথবা হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত ওজায়ের (আঃ), তারা তোমাদের কোন দুঃখ-কষ্ট দূর করতে পারেনা। তারা নিজেরাই আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য বন্দা হওয়ার জন্যে সচেষ্ট রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো হযরত ঈসা (আঃ), তাঁর মাতা হযরত মরিয়ম (আঃ) এবং ওজায়ের (আঃ), তাঁরা সকলেই আল্লাহর রহমতের আশা করছেন এবং তাঁর আযাবকে ভয় করছেন। এমনি অবস্থায় তাদেরকে তোমরা কীভাবে উপাস্য মনে কর!

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, একবার মুশরেকরা অত্যন্ত অভাবে পড়ে, তাদের অবস্থা এত করুণ হয়েছিল যে মৃত জীব-জন্তু পর্যন্ত তাদের খেতে হয়েছিল, তখন তারা বাধ্য হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয় এবং আরজী পেশ করে যে আমাদের বিপদ দূর করার জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করুন। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয় এবং এতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদের উপাসনা কর তাদের নিকট দোয়া কর, অথচ তারা তোমাদের কোন দুঃখ-কষ্ট লাঘব করতে পারবে না।

وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ
مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُّرْسِلَ بِالْآيٰتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۚ
وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيٰتِ إِلَّا
تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۗ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا
الَّتِي أَرَيْنٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْاٰنِ ۚ وَ
نُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

তরজমা

(৫৮) এমন কোন জনপদ নেই যা আমি কেয়ামতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করবেনা, অথবা যাকে কঠিন আযাব দেবনা, একথা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

(৫৯) আর পূর্ববর্তী লোকেরা নিদর্শনকে অস্বীকার করেছিল বলেই আমি নিদর্শন প্রেরণ মূলতবী রেখেছি, সামুদ জাতিকে আমি শিক্ষাপ্রদ নিদর্শন স্বরূপ উষ্ট্রী দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল, আর শুধু ভয় প্রদর্শনের লক্ষ্যেই আমি নিদর্শন প্রেরণ করে থাকি।

(৬০) আর (হে রসূল!) স্মরণ করুন সে সময়কে যখন আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। আমি আপনাকে যে দৃশ্য দেখিয়েছি তা এবং কোরআনে করীমে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও মানুষের পরীক্ষার জন্যেই। আমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি কিন্তু তবুও তাদের দৌরাত্ম বেড়েই চলেছে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

অর্থাৎ আল্লাহর আযাব এমন যাকে ভয় করা উচিত।

আর আলোচ্য আয়াতে সে আযাব আপতিত হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا

অর্থাৎ এমন কোন জনপদ নেই, যাকে কেয়ামতের পূর্বে আমি ধ্বংস করব না, অথবা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবনা।

তফসীরকারগণ এ আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন।

(এক) পৃথিবীর প্রতিটি শহর, গ্রাম তথা জনপদ মাত্রকে তার অধিবাসীদের পাপাচারের পরিণতি স্বরূপ কেয়ামতের পূর্বেই ধ্বংস করে দেয়া হবে, অর্থাৎ যে সব জনপদে কুফরী ও নাফরমানী অহরহ হতে থাকবে, সেগুলোকে কেয়ামতের পূর্বেই ধ্বংস করা হবে, অথবা কোন কঠিন শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে।

বস্তুতঃ যেখানে মহাপাপ সংঘটিত হয় সে জনপদকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া হয়। আর যদি চরম পর্যায়ের পাপ না হয় তবে অপেক্ষাকৃত লঘু শাস্তি দেয়া হয়। আর একথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে পাপমুক্ত কোন জনপদই পৃথিবীতে নেই, তাই হয় ধ্বংস না হয় আযাব অবশ্যই আসবে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, ধ্বংস করার অর্থ মৃত্যুমুখে পতিত করা। যদি জনপদবাসী মোমেন হয় তবে তাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করা হবে। আর যদি কাফের হয় তবে তাদেরকে বিভিন্ন আযাবে গ্রেফতার করা হবে।

এ পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, যখন কোন জনপদে ব্যাভিচার এবং সুদখোরী প্রসার লাভ করে অর্থাৎ প্রকাশ্যে মানুষ ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়, সর্বত্র সুদ ছড়িয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ পাক ঐ জনপদকে ধ্বংস করার আদেশ দেন।[১]

(দুই) এ আয়াতের আরো একটি অর্থ হলো কেয়ামতের পূর্বে সকল জনপদই স্বাভাবিকভাবে ধ্বংস হবে। অথবা সেখানে কোন বিপদাপদ অবশ্যই আসবে। এ ব্যাখ্যার কারণ এই, পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফে هلاك শব্দটি ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যু অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ

এমনিভাবে হাদীস শরীফে আছে,

كلما هلك نبى خلفه اخر

এক্ষেত্রেও هلك অর্থ মৃত্যু। তাই আলোচ্য শব্দের مُهْلِكُوهَا অর্থ হবে কেয়ামতের পূর্বে প্রত্যেক জনপদকেই আল্লাহ পাক ধ্বংস করে দেবেন।

(তিন) আলোচ্য আয়াতে قرية শব্দটির সঙ্গে একটি শব্দ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ কাফেরদের জনপদ মাত্রকে তাদের পাপাচারের পরিণতি স্বরূপ কেয়ামতের পূর্বে ধ্বংস করা হবে। অথবা কোন ভয়ংকর আযাব তাদের প্রতি আপতিত হবে। এ ব্যাখ্যায় জনপদ বলতে

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৮৯

কাফেরদের জনপদ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতে বিশেষভাবে শেরক কুফর সহ যাবতীয় পাপাচারের শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا

"এ বিষয়টি কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে"।

তফসীরকারগণ লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে আল-কেতাব শব্দ দ্বারা "লওহে মাহফুজকে" উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক যা সৃষ্টি করেছেন তা হলো কলম। এরপর কলমকে নির্দেশ মোতাবেক কলম সব কিছু লিখেছে, যা কিছু হয়েছে তা-ও এবং কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে তা-ও। (তিরমিযী)

তেবরাণী এবং হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে এবং তেবরানী ও এবনে মরদবিয়া হযরত এবনে জোবায়রের সূত্রে একখানি সুদীর্ঘ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। মক্কাবাসী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজী পেশ করেছে যে, আপনি সাফা নামক পাহাড়টিকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করুন। আর এ পাহাড়গুলোকে এখান থেকে সরিয়ে দিন যাতে করে আমরা এ স্থানে কৃষিকাজ করতে পারি। আল্লাহ পাক তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে আমি তাদের আরজী গ্রহণে বিলম্ব করব, আর যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে এখনই তাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করব। কিন্তু তাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করার পরও যদি তারা ঈমান না আনে, তবে আমি তাদেরকে এভাবে ধ্বংস করব, যেভাবে পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছি। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরজ করলেন, তাদেরকে অবকাশ দেয়া হোক, অর্থাৎ তাদের দরখাস্ত মঞ্জুর না করা হোক, তখন আল্লাহ পাক নিম্নলিখিত আয়াত নাজিল করলেন,

وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ

"আর পূর্ববর্তী লোকেরা নিদর্শনকে অস্বীকার করেছে বলেই আমি নিদর্শন প্রেরণ মূলবতী রেখেছি"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরেকদের কথার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে তাদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কেননা মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে মোজেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের দাবী করে,

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৩৭২

তারই জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বিষয়টিকে এভাবে লিখেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে মক্কার কাফেররা এসে বললো, ইতিপূর্বে যে আম্বিয়ায়ে কেরাম আগমন করেছেন তাঁদের কারো কারো অনুগত ছিল বাতাস। আর কোন কোন নবী মৃতকে জীবিত করতেন। যদি আপনার ইচ্ছা হয় যে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনি তবে আপনি সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করুন, আমরা আপনার সত্যতায় বিশ্বাস করবো।

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এই ওহী নাজিল হলো—"হে নবী! যদি আপনারও ইচ্ছা হয় যে সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেই, তাহলে আমি তা এখনই করে দেব। কিন্তু মনে রাখবেন যদি এরপরও তারা ঈমান না আনে তবে তাদেরকে আর অবকাশ দেয়া হবেনা, বরং সঙ্গে সঙ্গে আযাব আসবে এবং তাদেরকে ধ্বংস করা হবে। পক্ষান্তরে হে নবী! যদি আপনি তাদেরকে অবকাশ দিতে চান এবং তাদেরকে আরও চিন্তা করার সুযোগ প্রদানের ইচ্ছা করেন তবে আমিও তাতে রাজী আছি"। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরজী পেশ করলেন, যদি তারা বেঁচে থাকে তবে তাতে আমি খুশী হই। তখন এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

বর্ণিত আছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, জিব্রাঈল (আঃ) এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার পরওয়ারদেগার আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং এরশাদ করেছেন, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে সকালেই এ পাহাড়টি স্বর্ণে রূপান্তরিত হবে। কিন্তু যদি এতদসত্ত্বেও তারা ঈমান না আনে তবে তাদের এমন শাস্তি হবে যা ইতিপূর্বে কারো হয়নি। আর যদি আপনার ইচ্ছা হয় যে আমি তাদের জন্যে তওবার দ্বার উন্মুক্ত রাখি (তবে তাই করা হবে)। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় পন্থা পছন্দ করলেন।

মসনদে আবু ইয়ালায় রয়েছেঃ যখন এ আয়াত وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (হে রসূল!) আপনার নিকটাত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন করুন) নাজিল হলো তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু কুবাইস পাহাড়ের উপর আরোহন করলেন এবং এভাবে মক্কাবাসীকে আহ্বান করলেন, হে আবদে মনাফ! আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। কোরায়েশ গোত্রের লোকেরা এ ডাক শ্রবণ করে একত্রিত হলো এবং বললো, আমাদের কথা শ্রবণ করুন, আপনি নবুওয়্যতের দাবী করেছেন আর সোলায়মান (আঃ)-ও নবী ছিলেন, তাঁর অনুগত ছিল বাতাস, হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি অনুগত ছিল সমুদ্র, আর ঈসা (আঃ) মৃতদেরকে জীবিত করতেন। আপনিও আল্লাহর নবী, আল্লাহ পাকের নিকট আপনি আরজী পেশ করুন যে তিনি এখান থেকে পাহাড়গুলোকে সরিয়ে দিয়ে জমীনকে

কৃষিযোগ্য করে দেন, আমরা যেন কৃষিকাজ করতে পারি। তা যদি না হয় তবে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন আমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে জীবিত করে দেন যেন আমরা তাদের সাথে বসে আলাপ করতে পারি। তা-ও যদি না হয় তবে যেন এ পাহাড়টিকে স্বর্ণে পরিণত করে দেন যেন আমরা প্রচণ্ড শীত এবং গরমের মধ্যে (ব্যবসায়িক উদ্দেশে) সফর করা থেকে মুক্তি পাই। একথার পরই ওহী অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়ে গেল। ওহী অবতরণ শেষ হওয়ার পর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ সেই আল্লাহ শপথ! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, তোমরা আমার কাছে যা চেয়েছ তা হওয়ার ব্যাপারে এবং রহমতের দ্বার উন্মুক্ত রাখার ব্যাপারে আমাকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। আমি তো তোমাদের ব্যাপারে ভয় করেছি। তাই রহমতের দ্বারা উন্মুক্ত থাকাই পছন্দ করেছি। নতুবা তোমাদের ঈমান না আনার কারণে তোমাদের প্রতি এমন আযাব আপতিত হবে যা ইতিপূর্বে কারো প্রতি হয়নি। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।[১]

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, মক্কাবাসী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যে নিদর্শন চেয়েছে তা প্রদর্শন করতে কোন বাধা নেই, যা তারা চায় তা সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে দেয়া যায়। আর এ কাজ অত্যন্ত সহজ। কিন্তু ইতিপূর্বে বহু জাতি নিদর্শন চেয়েছে অথচ নিদর্শন দেখার পরও ঈমান আনেনি, বরং আল্লাহর নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তখন তারা কোপগ্রস্ত হয়েছে।

وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ

সামূদ জাতির ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য কর। তারা চেয়েছিল, পাথর থেকে যেন একটি উষ্ট্রী বের হয়ে আসে। হযরত সালেহ (আঃ) আল্লাহ পাকের নিকট আরজী পেশ করলেন এবং পাথর থেকে উষ্ট্রী বের হয়ে আসলো। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় ঈমান আনলো না, তাদেরকে তিন দিনের অবকাশ দেয়া হলো, এরপর তাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হলো। বস্তুতঃ এ উষ্ট্রীটি ছিল আল্লাহ পাকের একত্ববাদের জ্বলন্ত নিদর্শন এবং আল্লাহর রসূলের সত্যতার প্রমাণ, এ প্রমাণ দেখা সত্বেও সামূদ জাতি ঈমান আনেনি।

وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا

"আর এ নিদর্শন সমূহ শুধু ভয় প্রদর্শনের জন্যেই প্রেরণ করে থাকি, যাতে করে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর জমানায় একবার কূফা শহরে ভূমিকম্প হয়েছিল। তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, আল্লাহ পাকের মর্জি হলো তোমরা তাঁর প্রতি মনোনিবেশ কর। অতএব তোমাদের কর্তব্য হলো তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ কর, তাঁর বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন কর, আর এ ব্যাপারে আদৌ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৫৩

বিলম্ব করোনা।

বর্ণিত আছে যে হযরত ওমর (রাঃ)-এর জমানায় মদীনা শরীফে ভূমিকম্প দেখা দেয়। তখন হযরত ওমর (রাঃ) লোকদেরকে বলেছিলেন, মনে হয় নতুন কিছু হয়েছে। যদি এরপর আরও ভূমিকম্প হয় তবে আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেব।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ওমর (রাঃ) জমিনে পদাঘাত করে বলেছিলেনঃ

اسكنى يا ارض

'হে জমীন থাম'। সঙ্গে সঙ্গে জমীন থেমে যায়। যাঁরা আল্লাহর ওলী; যাঁরা তাঁর একান্ত প্রিয়, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে এ শান এবং এ অবস্থা দান করেন।

একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহ পাকের দু'টি নিদর্শন মাত্র। কারো মৃত্যু বা জীবনের কারণে সূর্য বা চন্দ্রের গ্রহণ হয় না; বরং আল্লাহ পাক এর দ্বারা তাঁর বন্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। যখন তোমরা এ অবস্থা দেখ তখন দোয়া এবং এস্তেগফারের দিকে মনোনিবেশ কর। হে উম্মতে মোহাম্মদিয়া! আল্লাহ পাকের শপথ, আল্লাহ পাকের চেয়ে অধিকতর সম্মানবোধ আর কারোরই নেই যে তাঁর গোলাম-বাঁদীরা ব্যাভিচারে লিপ্ত হবে (কেননা এটি অত্যন্ত ঘৃণ্য নিন্দনীয় কাজ)। হে উম্মতে মোহাম্মদিয়া! আল্লাহর শপথ, আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে কম হাসতে, বেশী কাঁদতে।[১]

وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ

আর (হে রসূল!) আপনি স্মরণ করুন (সে সময়কে) যখন আমি আপনাকে (ওহীর মাধ্যমে) বলেছিলাম যে, আপনার পরওয়ারদেগার লোক সকলকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের এলম ও কুদরত সব কিছুকে নিজের আয়ত্বের মধ্যে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। সুতরাং আপনি কারো পরোয়া করবেন না এবং যে বাণী সহ আপনাকে প্রেরণ করা হয়েছে তা পৌঁছে দিন।

অথবা الناس শব্দটি দ্বারা কোরায়েশ সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে তখন অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ পাক কোরায়েশ সম্প্রদায়কে ঘিরে রেখেছেন, অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। সে অর্থে এ আয়াতখানি বদর যুদ্ধের ঘটনার একটি সুসংবাদ হিসেবে গ্রহণ করা হবে। আর যেহেতু বদর যুদ্ধের ঘটনাটি হওয়া নিশ্চিত ছিল সেজন্যে احاط (ঘিরে রেখেছেন) অতীত কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে (যেন ঘটনাটি ঘটে গেছে)।[২]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তাদের ফরমায়েশ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫ পৃষ্ঠা-৫৩-৫৪
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৯০

মোতাবেক মোজেযা চেয়েছিল। কিন্তু তিনি তাদের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে মোজেযা প্রদর্শন করেননি। তাই কাফেররা এ মর্মে তাঁকে বিদ্রুপ করার দুঃসাহস পেয়েছে যে, যদি আপনি সত্য সত্যই নবী হতেন তবে আমাদের ফরমায়েশ মোতাবেক মোজেযা প্রদর্শন করতেন। মোজেযা প্রদর্শন না করার কারণে কাফেররা আপত্তিকর মন্তব্য করবে বলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চিন্তা করছিলেন। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

وَاِذْ قُلْنَا لَكَ

(হে রসূল!) আমি আপনাকে বলেছি যে, সকল মানুষই আল্লাহ পাকের কতৃত্বাধীন, নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই আপনি চিন্তিত হবেন না। সমগ্র মানব জাতির আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম জ্ঞান এবং কুদরত হেকমতের আওতার বাইরে কেউ নয়। অতএব, কাফেরদের বিদ্রুপে আপনি মনক্ষুণ্ন হবেন না। এভাবে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মনোবল বৃদ্ধি করেন এবং তাঁকে আল্লাহ পাক সাহায্য করবেন বলে নিশ্চয়তা বিধান করেন।[১]

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِىْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

"আর (হে রসূল!) আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি তাতো শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্যেই"।

অর্থাৎ মে'রাজের ঐতিহাসিক রজনীতে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের যে বিস্ময়কর দৃশ্য সমূহ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখানো হয়েছে তা মানুষকে পরীক্ষা করার উদ্দেশেই হয়েছে, যারা খাঁটি, প্রকৃত মোমেন তারা বিশ্বাস করেছে যে একই রাতের মধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত গমন করেছেন। এরপর তিনি মহাশূণ্য পরিভ্রমণ করে সাত আসমান সফর করে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হয়েছেন এবং এক রাতেই পুনরায় তিনি মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় প্রত্যাবর্তন করে পরদিন সকালে যখন লোকদের নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করেন, তখন যারা কাফের তারা বিদ্রুপ করলো, তারা বিশ্বাসই করতে পারলনা এ ঐতিহাসিক বিস্ময়কর ঘটনা, এমনকি তারা এ সম্পর্কে প্রমাণ স্বরূপ বায়তুল মোকাদ্দাসের বিবরণ জানতে চাইলো এবং তাদের কাফেলার অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিলেন। এ সময় ওলিদ এবনে মগিরা নামক দূরাত্মা কাফের বলেছিলো, এ ব্যক্তি যাদুকর। তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাজিল করেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে মে'রাজের ঘটনা ছিল একটি পরীক্ষা, কাফেররা তো এমন ঘটনার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে বসলো। হযরত আবদুল্লাহ

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-২৩৫

এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে رءيا অর্থ رويت অর্থাৎ চোখে দেখা। সাঈদ এবনে জুবায়ের, হাসান বসরী (রঃ), মসরুক (রঃ), মুজাহেদ (রঃ), প্রমুখ তফসীরকারগণ এ মতই পোষণ করেছেন।

رويت এবং رءيا একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, رأيت بعينى অর্থাৎ আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

কোন কোন ওলামায়ে কেরাম আলোচ্য الرءيا শব্দের অর্থ করেছেন সেই স্বপ্ন, যা ষষ্ঠ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হুদায়বিয়ার চুক্তির বছর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দেখেছিলেন যে তিনি এবং তাঁর সাথী মক্কা মোয়াজ্জমায় প্রবেশ করেছেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছুদিন পর মক্কার দিকে রওয়ানা হন, মুশরেকরা যখন হুদায়বিয়া নামক স্থানে তাঁকে বাধা দেয় তখন তিনি ফিরে আসেন। তিনি পূর্বে বলেছিলেন যে আমরা মক্কায় প্রবেশ করবো কিন্তু সে বছর হুদায়বিয়া নামক স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এ কারণে কিছু লোক সন্দিহান হয়ে পড়ে। পরবর্তী বছর যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চুক্তি মোতাবেক মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় প্রবেশ করেন তখন এ আয়াত নাজিল হয়ঃ

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ (সূরা ফাতহ)

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁর রসূলকে সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ন দেখিয়েছেন।

অবশ্য ইমাম বয়জাবী (রঃ) এ বর্ণনার ব্যাপারে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন আর তা হলো আলোচ্য আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ, আর হুদায়বিয়ার ঘটনা হিজরতের পরে ঘটেছে। তবে এ পর্যায়ে একটি সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে এভাবে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বপ্ন দেখেছেন মক্কায় অবস্থান কালে আর এ স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়্যারায়, এভাবে উপরোক্ত প্রশ্ন আর থাকে না।

আল্লামা বয়জাবী (রঃ) লিখেছেনঃ হয়তো এ স্বপ্নের সম্পর্ক বদরের যুদ্ধের সাথেও হতে পারে যেভাবে অন্য আয়াতে রয়েছেঃ

إِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنَامِكَ قَلِيْلاً (সূরা আনফাল)

বর্ণিত আছে যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বদর রণাঙ্গণে যেখানে পানি রয়েছে সেখানে আগমন করে বলেছিলেনঃ আমি মুশরেকদের নিহত হওয়ার স্থান স্বচক্ষে দেখছি। এ স্থানটিতে অমুক নিহত হবে আর এ স্থানটিতে অমুক। কোরায়েশ গোত্রের লোকেরা একথা শুনে বিদ্রুপ করে। বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের নিহত হওয়ার ব্যাপারে যে স্থানের কথা বলেছিলেন অবশেষে সে নির্দিষ্ট স্থানেই তাদের হত্যা করা হয়। এভাবে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৯২
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলবী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৩৪

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ

"কোরআনে করীমে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও মানুষের পরীক্ষার জন্যেই"।

এ বৃক্ষটিকে দোযখবাসীর আহার্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটিও পরীক্ষা স্বরূপ অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ পাককে বিশ্বাস করে, তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিশ্বাস করে এবং পবিত্র কোরআনকে বিশ্বাস করে, তারা এ অভিশপ্ত বৃক্ষ সম্পর্কীয় ঘোষণাকেও বিশ্বাস করে। কিন্তু যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস রাখেনা, তারা এ বৃক্ষ সম্পর্কীয় ঘোষণায়ও বিশ্বাস করেনা, তারা উপহাস করে বলে, শুনেছো! দোযখের মধ্যেও নাকি বৃক্ষ থাকবে, আর তা-ও আগুনে বৃক্ষ, তা কি কখনো সম্ভব?

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ যাক্কুম নামক এ অভিশপ্ত বৃক্ষটি দু' কারণে পরীক্ষা স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে।

(এক) আবু জেহেল বলেছিল, "মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে দোযখের অগ্নির ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করে, কিন্তু নিজেই বলে দোযখে একটি বৃক্ষ থাকবে যাকে অগ্নি জ্বালাতে পারবেনা, তোমরা জান অগ্নি বৃক্ষকে জ্বালিয়ে দেয়"। অথচ আবু জেহেল এ সত্য উপলব্ধি করলো না যে দোযখে এমন বৃক্ষ সৃষ্টি করা আল্লাহ্ পাকের পক্ষে আদৌ কঠিন নয়।

তফসীরে মাদারেকে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তুর্কীস্তানে সমন্দল নামক একটি ক্ষুদ্র জন্তু আছে যার চামড়া দিয়ে রুমাল তৈরী করা হয়। যখন তা ময়লা হয় তখন তা আগুনে নিক্ষেপ করা হয় এবং আগুনের কারণেই তার ময়লা দূরীভূত হয় ও তা পরিচ্ছন্ন হয়। আর ঐ চামড়াটির উপর আগুনের কোন প্রতিক্রিয়া থাকেনা। আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ কামূসে লিপিবদ্ধ আছে যে হিন্দুস্তানে সমন্দল নামে একটি পাখী আছে যা আগুনে পোড়ে না। সমন্দল নামক এই পাখীকে সমন্দরও বলা হয়। এ পাখীটি আগুনেই পয়দা হয় আর আগুনেই জীবিত থাকে। আগুনে থেকে বের করলে তার মৃত্যু হয়।

(২) এবনে যুবআরী বলেছে যে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে যাক্কুম সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করে। অথচ আমরা জানি, যাক্কুম হলো মাখন আর খেঁজুর। এছাড়া এর আর কোন অর্থ আমরা জানি না। একথা শ্রবণ করে আবু জেহেল তার বাঁদীকে ডাকলো يا جارية تعالى زقمينا 'হে বাঁদী! আমাদের জন্যে যাক্কুম এনে দে'।

তখন বাঁদী মাখন এবং খেজুর এনে দিল। আবু জেহেল বললো, 'তোমরা যাক্কুম খাও, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এই যাক্কুম সম্পর্কে ভয় দেখায়'। আল্লাহ পাক সূরায়ে ছাফফাতে যাক্কুমের উল্লেখ করেছেন।

এবনে আবি হাতেম এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আল্লাহ পাক যখন যাক্কুমের উল্লেখ করেছেন এবং কাফেরদেরকে যাক্কুমের ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করেছেন তখন আবু জেহেল কোরায়েশকে বললো, যে যাক্কুম সম্পর্কে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে,

তোমরা কি জান তা কী? তারা বললো, না আমরা জানি না। আবু জেহেল বললো, ইয়াসরাবে উত্তম প্রকারের খেজুর পাওয়া যায় যা মাখন দিয়ে খাওয়া হয়, আর এ খাবারকে যাক্কুম বলা হয়। যদি এই যাক্কুম পাওয়া যায় তবে আমরা খুব আনন্দ করে খাবো। তখন এ (আলোচ্য) আয়াত

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِى الْقُرْاٰنِ এবং اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ طَعَامُ الْاَثِيْمِ

নাজিল হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আরও লিখেছেন, মূলতঃ অভিশপ্ত হবে তারা যারা যাক্কুম খাবে, কিন্তু বিষয়টির অধিকতর ভয়াবহতা বোঝাতে ঐ বৃক্ষকেই অভিশপ্ত বলা হয়েছে। কেননা যাক্কুম নামক বৃক্ষটির গোড়া হবে দোযখের অভ্যন্তরে। আর তা এমন একটি স্থান যা আল্লাহর রহমত থেকে অনেক দূরে থাকবে। এজন্যে ঐ বৃক্ষটিকে অভিশপ্ত বলা হয়েছে।[১]

وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا

"আমি তাদেরকে ভয় দেখাই, কিন্তু এতদসত্বেও তাদের দৌরাত্ম বেড়েই চলেছে"।

বস্তুতঃ যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকেনা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হলেও তাদের দৌরাত্ম এবং ধৃষ্টতা কমে না, বরং বেড়েই থাকে।

ইমাম রাযী (রঃ) এ বাক্যটি সংযোজনের কারণ সম্পর্কে বলেছেন যে কাফেরদের ফরমায়েশী মোজেযা প্রদর্শন না করার এটিও একটি কারণ যে তাদেরকে যাক্কুম বৃক্ষের ভয় দেখানো হয়েছে; কিন্তু এতদসত্বেও তাদের অন্তর এত কঠিন এবং কঠোর যে তাদের পাপাচার, দৌরাত্ম এবং ধৃষ্ঠতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে। আর এ কারণেই কাফেরদের ফরমায়েশ মোতাবেক মোজেযা প্রদর্শন করা হয়নি।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৯৩
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রাঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৩৪
২। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-২৩৮

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا
لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ ۖ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ﴿٦١﴾ قَالَ
اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٢﴾ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ
جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ﴿٦٣﴾ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ
بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ
وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ إِلَّا غُرُوْرًا ﴿٦٤﴾ إِنَّ عِبَادِيْ
لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۚ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ﴿٦٥﴾ رَبُّكُمُ الَّذِيْ
يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ۚ إِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٦٦﴾

তরজমা

(৬১) আর স্মরণ কর সেই সময়কে যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সেজদায় পতিত হয়। ইবলিস বলেছিল, আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করবো যাকে আপনি মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন।

(৬২) সে বলেছিল, আপনি যাকে আমার উপর মর্যাদা দান করলেন যদি কেয়ামতের দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দান করেন তবে আমি তার বংশধরদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলকেই বশ করে ফেলবো।

(৬৩) আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ তুই যা, তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে দোযখই হবে তোদের সকলের শাস্তি-পূর্ণ শাস্তি।

(৬৪) তাদের মধ্যে যাকে পারিস, তোর আহ্বানে পদস্খলিত কর, তোর আরোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর; ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততিতে তাদেরকে শরীক করে নে এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

(৬৫) আমার বন্দাদের উপর তোর কোন প্রভাব খাটবে না। আর কর্ম বিধায়ক

হিসাবে আপনার প্রতিপালকই যথেষ্ট।

(৬৬) তোমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি তোমাদের জন্যে সাগরে সামুদ্রিক যান পরিচালনা করেন যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার; নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফেরদের দৌরাত্ম, নাফরমানী, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা ও শত্রুতার উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াত থেকে হযরত আদম (আঃ) এবং ইবলিস শয়তানের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো মানব জাতিকে শয়তান সম্পর্কে সতর্ক করা এ মর্মে যে ইবলিস শয়তান তোমাদের পুরাতন দুশমন, তাই তোমরা তার দ্বারা প্রতারিত হয়োনা এবং তোমাদের নিকট আমার প্রেরিত নবীর বিরোধিতা করোনা। শয়তানের কাজই হলো মানুষের মনে সন্দেহের উদ্রেক করা, মানুষকে পথভ্রষ্ট করা।[১]

এতদ্ব্যতীত আলোচ্য ঘটনা দ্বারা এ সত্য প্রকাশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অবনত মস্তকে মেনে নেয়া হলো ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য করা হলো শয়তানের কাজ। এ সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করার লক্ষ্যেই হযরত আদম (আঃ) ও ইবলিস শয়তানের ঘটনা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আদম (আঃ) ও ইবলিসের ঘটনা বিস্তারিত ভাবে সূরা বাকারায় পেশ করা হয়েছে।[২]

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا.....

আর সেই সময়কে স্মরণ কর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি আদমকে সেজদা কর, তখন সঙ্গে সঙ্গে ইবলিস ব্যতীত সকলে সেজদা করেছে। ইবলিস বললো, আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করবো, যাকে আপনি মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন। ইবলিস সেজদা করতে অস্বীকার করেছে এবং অহংকার করেছে।

মানব সৃষ্টির ইতিকথা

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, সায়ীদ এবনে যুবায়ের হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ পাক আদম (আঃ)-কে এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে জমিন থেকে এক মুঠো মাটি নিয়েছেন মিষ্ট এবং লবনাক্ত উভয় প্রকার, তা দ্বারা আদমের দেহ তৈরী করেছেন। যাকে মিষ্ট মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন সে ভাগ্যবান হয়েছে, এমনকি তার পিতা-মাতা কাফের

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৩৬
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৫৫
২। তফসীরে নূরুল কোরআন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৪-২৭০

হলেও। পক্ষান্তরে, যাকে লবনাক্ত মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে সে হয়েছে ভাগ্যাহত, এমনকি নবীর সন্তান হলেও।

আহমদ, তিরমিজী, আবু দাউদ, বায়হাকী এবং হাকেম হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক সমগ্র পৃথিবী থেকে এক মুঠো মাটি নিয়েছেন, তা থেকে আদমকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আদমের সন্তানগণ ঐ মাটি মোতাবেকই হয়েছে। বর্ণের দিক থেকে লাল, সাদা, কাল অথবা মাঝারী ধরনের। এমনিভাবে মেজাজের দিক থেকে বিনম্র, কঠোর, মন্দ এবং উত্তম।[১]

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ

"সে বলেছে এই তো সেই, যাকে আপনি আমার চেয়ে অধিক মর্যাদা দিয়েছেন"।

অভিশপ্ত শয়তান দরবারে এলাহীতে মানুষের সাথে তার শত্রুতার কথা প্রকাশ করেছে। আদম সন্তানের প্রতি তার যে বিদ্বেষ রয়েছে তা প্রকাশ করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেনি, শুধু তাই নয়; বরং মানব জাতির সর্বনাশ সাধনের সংকল্পের কথাও সে বলেছে। আর এ উদ্দেশে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কেয়ামত পর্যন্ত তাকে অবকাশ প্রদানের আবেদন পেশ করেছে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا

"যদি আমাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ প্রদান করেন তবে অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তার বংশধরদের সকলকেই আমি আমার তাবেদার করে ফেলবো"।

ইবলিস শয়তান আল্লাহ পাকের দরবারে আরজী পেশ করলো, হে পরওয়ারদেগার! যদি আমাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ প্রদান করেন, অর্থাৎ আমাকে জীবিত রাখেন তবে আমি আদম সন্তানদের সামান্য সংখ্যক লোক ব্যতীত তথা আম্বিয়ায়ে কেরাম, আউলিয়াগণ এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত সকলকেই প্রতারনা করবো এবং তাদেরকে আমি ধ্বংস করে ছাড়বো।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের قليلا শব্দ দ্বারা সে-সব মহান ব্যক্তিদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যাদেরকে আল্লাহ পাক নিজে হেফাজত করেন যেমন নবীগণ, ওলীগণ, সিদ্দীক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যাঁদেরকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন, আর তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ

"আমার বিশেষ বন্দাদের উপর তোর কোন প্রভাব খাটবে না"।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৯৪
তফসীরে তাবারী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৮০

এখানে প্রশ্ন হলো, ইবলিস শয়তান কীভাবে জানতে পারলো যে, সে আদম সন্তানদেরকে প্রতারিত করতে পারবে? ইমাম বয়যাবী (রঃ) এর জবাব দিয়েছেন, ফেরেশতাদের কথা দ্বারা সে এ ধারণা করেছে। কেননা যখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি প্রেরণ করবো"।

এর জবাবে ফেরেশতাগণ বলেছিলেন,

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا

"(হে পরওয়ারদেগার!) আপনি কি এমন জাতি সৃষ্টি করবেন? যারা পৃথিবীতে ফেতনা-ফ্যাসাদ করবে"।

ফেরেশতাদের একথা দ্বারা হয়তো ইবলিস এ ধারণা করেছিল। অথবা মানুষের সৃষ্টিগত অবস্থা, তার দৈহিক গঠন, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট যথা লোভ, ক্রোধ, মোহ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করে সে উপলব্ধি করেছিল যে মানব জাতিকে প্রতারণা করতে সে সক্ষম হবে।[১]

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا

"আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ যা, চলে যা, যে কেউ তোকে অনুসরণ করবে জাহান্নাম তোদের সকলের পরিপূর্ণ শাস্তি হবে"।

অর্থাৎ দূর হ এখান থেকে, তোর মন যা চায় তাই কর। এটি ছিল আল্লাহ পাকের তরফ থেকে একটা কঠিন ধমক এবং বহিষ্কার হয়ে যাওয়ার নির্দেশ।

এ আয়াত সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার লিখেছেনঃ যারা শয়তানের অনুগামী হয়, অথবা কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় চালিত হয়, তাদের এ কঠোর শাস্তির ঘোষণা স্মরণ করে নিজেদের ভবিষ্যত চিন্তা করা উচিৎ।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ ইবলিস আল্লাহ পাকের নিকট আদম সন্তানদেরকে প্রতারিত করার লক্ষ্যে অবকাশ প্রদানের আরজী পেশ করে। আল্লাহ পাক তার আরজী কবুল করেন এবং তার জন্যে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। আরও ঘোষণা করেনঃ তোর এবং যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের পুরোপুরি শাস্তির জন্যে আমি দোযখ তৈরী করে রেখেছি।

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ

আর যাদেরকে পারিস, তাদেরকে তুই তোর ডাকে পদস্খলিত করে দে আর তোর

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৯৫
তফসীরে মাজেদী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৯১

আরোহী এবং পদাতিক বাহিনী নিয়ে আক্রমণ কর। ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততীতে তাদেরকে শরীক কর, আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে, তবে ধোঁকা দেয়া এবং প্রতারণা করা ব্যতীত শয়তান কোন প্রতিশ্রুতি দেয়না অর্থাৎ যে ডাক শ্রবণে মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয়, আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, মানুষকে তুই সেই ডাক দে, এমনকি গান-বাজনা দ্বারাও মানুষকে প্রতারণা করে দেখ। আলোচ্য আয়াতের بصوتك শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো পাপাচারের প্রতি আহ্বান। এ পৃথিবীতে যে যখন পাপাচার তথা আল্লাহ পাকের নাফরমানীর দিকে মানুষকে ডাকবে সে তখন ইবলিস শয়তানের দলের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ এর অর্থ হলো মানুষকে ইবলিসের নিজের দিকে আহ্বান করা।

আর মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে صوت শব্দের অর্থ হলো গান-বাজনা।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ শব্দটির অর্থ গান-বাজনা, খেলা-ধূলা প্রভৃতি।[১]

وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ

"তোর আরোহী এবং পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ কর"।

অর্থাৎ তোর যত শক্তি রয়েছে সবই তুই মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কাজে ব্যয় কর। এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কাজে যত লোক পদব্রজে চলে অথবা কোন যানবাহনে আরোহন করে সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ জ্বীন ও মানব জাতির মধ্যে যারাই শয়তানের অনুগামী হয় সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতের এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কর্মসূচী নিয়ে যে কেউ এ পৃথিবীতে চলাফেরা করে বা যানবাহনে আরোহণ করে সে-ই ইবলিস শয়তানের অনুগামী হিসেবে পরিগণিত। আর মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ যে কেউ আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোথাও গমনাগমন করে সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত এবং ইবলিস ও তার অনুসারীদের জন্যে ঘোষিত শাস্তির যোগ্য।[২]

যুযাজ (রঃ) বলেছেনঃ "আরোহী এবং পদাতিক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ কর"-এ কথাটির তাৎপর্য হলোঃ তোর সর্বশক্তি নিয়োগ কর এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা কর।

আল্লামা কান্দলভী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এতে রয়েছে কঠোর সতর্কবাণী। যেমন কাউকে হুশিয়ার করার জন্যে বলা হয়-তোর যা ইচ্ছা কর। অদূর ভবিষ্যতে এর পরিণাম দেখতে পাবি।[৩]

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৯৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৫৫
তফসীরে ফতহুল কাদীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৪১
২। তফসীরে তাবারী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৮৩
৩। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা৩৩৭

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ পাপাচারী ব্যক্তি মাত্রই ইবলিসের সৈন্য। সে আরোহী হোক অথবা পদাতিক।

মুজাহেদ এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ জ্বীন ও মানব জাতির মধ্যে ইবলিসের কিছু নিজস্ব লোকও রয়েছে। তারা আরোহী এবং পদাতিক উভয়ই আছে।

বয়যাবী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এর অর্থ হলো, হে ইবলিস! তুই মানুষকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা কর, সে আরোহীই হোক বা পদাতিক।[১]

وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا

"ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে তাদেরকে শরীক কর, আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। আর শয়তান তো শুধু প্রতারণা করার জন্যেই প্রতিশ্রুতি দেয়"।

وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ

আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহেদ (রঃ), হাসান বসরী (রঃ) এবং সায়ীদ এবনে যুবায়ের (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো মানুষকে হারাম পন্থায় রোজগারের জন্যে অনুপ্রাণিত করা এবং হারাম ও অবৈধ পন্থায় অর্থ সম্পদ ব্যয় করা।

তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো সুদের ব্যবসা এবং মূর্তি ও দেব-দেবীর নামে যে-সব জীব-জন্তু ছেড়ে দেয়া হয় সেগুলোর গোশ্ত খাওয়া বা সেগুলোর উপর আরোহণ করা।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জীব-জন্তু উৎসর্গ করা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) شركت فى الاولاد সম্পর্কে বলেছেনঃ এর তাৎপর্য হলো সে সব কন্যা সন্তান, যাদেরকে জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ করা হয়েছে।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো ব্যাভিচারের মাধ্যমে যাদের জন্ম হয় সে সব সন্তান।

হাসান বসরী (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো সন্তানকে ইহুদী বা খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানানো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তরফ থেকে আরেকটি কথাও বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা সন্তান-সন্ততির অবৈধ নামকরণ উদ্দেশ্য, যেমন বর্তমান যুগেও অমুসলিম নাম রাখা হয়।[২]

وَعِدْهُمْ

"আর তাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দে"।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৯৬
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৯৬

অর্থাৎ আদম সন্তানদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দে। তাদের সঙ্গে মিথ্যা অঙ্গীকার কর। এখানে একথা, বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে ইবলিস শয়তান যখন মানুষকে পাপাচারের দিকে ডাকে তখন সে ব্যক্তির মনে এ কথাটা ঢেলে দেয় যে জান্নাত এবং দোযখ, হাশর-নশর এসব কথা ভিত্তিহীন (নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক)। যা কিছু পৃথিবীতে আছে তা ভোগ কর। এটিই জীবন। এবাদত-বন্দেগীতে কেন কষ্ট কর? শয়তান এভাবে মানুষকে প্রতারণা করে। বস্তুতঃ শয়তান সকল অবস্থায় মানুষকে ধোঁকা দেয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا

অর্থাৎ শয়তান তো শুধু ধোঁকা দেয়ার জন্যেই প্রতিশ্রুতি দেয়।

আল্লাহ পাক যখন ইবলিসকে বহিস্কারের আদেশ দিলেন, তখন সে আরজ করলো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আদমের কারণে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন, এখন আমাকে আদম সন্তানদের উপর ক্ষমতা দান করুন, যেন আমি তাদেরকে যেভাবে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করতে পারি। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ 'তোকে সে ক্ষমতা দেয়া হলো'। ইবলিস তখন আরয করলো, 'আপনার সাহায্য ব্যতীত আমি এতে সক্ষম নই'। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, 'তুই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার যত ইচ্ছা চেষ্টা কর'।

হযরত আদম (আঃ) আরজ করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমার প্রতি এবং আমার বংশধরদের প্রতি ইবলিসকে ক্ষমতা দিয়েছেন। আপনার সাহায্য ব্যতীত ইবলিসের ধোঁকা থেকে আমি আত্মরক্ষার শক্তি রাখিনা'। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ 'তোমার সন্তানদের রক্ষার জন্যে আমি প্রহরী নিযুক্ত করবো'। আদম (আঃ) আরজ করলেন, 'এ কথাটির বিস্তারিত বিবরণ জানতে চাই'।

তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ 'প্রত্যেক নেক কাজের সওয়াব দশগুণ দেয়া হবে'। আদম (আঃ) আরজ করলেন, 'আর কি হবে'? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ 'যতক্ষণ দেহে রূহ থাকবে ততক্ষণ তওবা কবুল হওয়ার সময় থাকবে' অর্থাৎ 'তওবার দ্বার বন্ধ হবেনা। আদম (আঃ) আরজ করলেন, 'হে আল্লাহ! আর কি হবে'? আল্লাহ পাক তখন এরশাদ করলেনঃ

يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا

"হে আমার বন্দাগণ! তোমরা যারা গুনাহর কারণে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সমস্ত গুণাহ মাফ করবেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান"।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, ইবলিস আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করলো, হে প্রতিপালকঃ তুমি নবীগণকে প্রেরণ করেছ এবং তাদের পাঠ করার জন্যে কিতাব নাযিল করেছ, আমার পাঠ করার জন্যে কি ঠিক করেছ? আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ কিতাব। ইবলিস আরজ করলো, আমার লেখা কি হবে? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, মানব দেহে যা লেখা হয়। ইবলিস বললো, আমার নবী কে? তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন,

গণক। ইবলিস আরজ করলো, আমার অবস্থান কোথায় হবে? আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, স্নানাগার (যেখানে লোকেরা নগ্ন অবস্থায় স্নান করে এবং একে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে)। ইবলিস আরজ করলো, আমার বসবাসের স্থান কোথায় হবে? আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, বাজার সমূহে। ইবলিস আরজ করলো, আমার আহার্য কি? আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, সে বস্তু সমূহ যাতে আল্লাহ্ পাকের নাম উচ্চারিত না হয়। ইবলিস আরজ করলো, আমার পানীয় দ্রব্য কি? আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, প্রত্যেক নেশাকর বস্তু। ইবলিস আরজ করলো, আমার প্রতাণার মাধ্যম কি? আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ স্ত্রীলোক। ইবলিস আরজ করলো, আমার আনন্দ-উল্লাসের উপকরণ কি? আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, বাজনার উপকরণ।[১]

إِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلاً

"নিশ্চয় আমার খাঁটি বন্দাদের উপর তোর কোন প্রভাব থাকবে না। আর কার্যসিদ্ধির জন্য আপনার প্রতিপালকই যথেষ্ট"।

অথাৎ যারা আল্লাহ্ পাকের প্রকৃত খাটি বন্দা, ইবলিস তাদেরকে প্রতারিত করতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় বন্দাদের হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা রাখবে, তাঁর নিকট আশ্রয়প্রার্থী হবে, আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে তাঁর হেফাযতে রাখবেন। ইবলিস তাদের প্রতি প্রভাব বিস্তার করতে পারবেনা।

رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ إِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"তোমাদের প্রতিপালক তিনিই, তোমরা যাতে তাঁর দান অনুসন্ধান করতে পার এজন্যে তিনি সাগরের বুকে নৌযান পরিচালনা করেন, নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আদম ও ইবলিস শয়তানের ঘটনা বর্ণনার পর পুনরায় আলোচ্য আয়াতে তওহীদের দলিল-প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে। আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের প্রতি কত নেয়ামত দান করেন, তা লক্ষ্য করার আহ্বান জানিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ তোমাদের প্রতিপালকের অনন্ত অসীম দয়া এবং অন্তহীন ক্ষমতা দেখ, তিনি তোমাদেরকে সমুদ্রের বুক চিরে নৌযান পরিচালনা করার তওফিক দিয়েছেন। তোমরা সামুদ্রিক সফরে মাধ্যমে তোমাদের জীবিকার অন্বেষণ কর, আল্লাহ্ পাকের দানের অনুসন্ধান কর, সমুদ্রের সফরে রয়েছে নির্ঘাত মৃত্যুর ভয়। এ মহা বিপদ থেকে আল্লাহ্ পাকই তোমাদেরকে রক্ষা করেন।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৯৮

নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান।

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ
فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنْتُمْ
أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ
وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ
قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ
تَبِيعًا ﴿٦٩﴾ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

তরজমা

(৬৭) আর যখন সাগর বক্ষে তোমাদেরকে কোন বিপদ স্পর্শ করে, তখন আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা ডাকতে, তাদেরকে তোমরা ভুলে যাও। এরপর যখন তিনি তোমাদেরকে উদ্ধার করে ডাঙ্গায় আনেন, তখন তোমরা ফিরে যাও। আর মানুষ অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।

(৬৮) তবে কি তোমরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছ যে তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে কোথাও ধ্বসিয়ে দেবেন না? অথবা প্রস্তর বর্ষণকারী ঝড়-ঝঞ্জা প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা তোমাদের কোন ত্রাণকর্তাই খুঁজে পাবেনা।

(৬৯) অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত হয়েছ যে তিনি তোমাদেরকে আরেকবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝড় পাঠাবেন না? এবং তোমাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন না? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবেনা।

(৭০) আর নিশ্চয় আমি তো আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি, স্থলে ও সামুদ্রিক ভাগে তাদেরকে বাহন দান করেছি এবং উত্তম রিয্ক দিয়েছি, আর আমার সৃষ্টির মধ্যে অনেকের উপর তাদেরকে মর্যাদা দান করেছি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদ বা তওহীদের কথা বলা হয়েছে এবং মানুষের প্রতি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ নেয়ামতের উল্লেখ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহ্বান জানানো হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে তওহীদের কথাই নতুন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে এবং মানব-চরিত্রের একটি দিক সম্পর্কে এরশাদ হযেছে যে মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। যখন সে সাগর বক্ষে ঝড়ের কারণে মহা বিপদের সম্মুখীন হয় তখন নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সে একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাককে অন্তর থেকে ডাকতে থাকে এবং অত্যন্ত কাতর হয়ে কাকুতি-মিনতি করতে থাকে। তার অবস্থা এমন হয় যে সে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে জানে না, আর কোন সাহায্যকারীকে ডাকে না। এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ

"আর যখন সমুদ্র বক্ষে তোমাদের বিপদ দেখা দেয়"।

সে বিপদ হলো নিমজ্জিত হয়ে শেষ হয়ে যাওয়া, তখন তোমরা এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে ডাক না।

ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ

অর্থাৎ ঐ কঠিন বিপদের মুহূর্তে তোমাদের সকল বাতিল উপাস্যদেরকে তোমরা ভুলে যাও, তোমাদের মন থেকে তারা গায়েব হয়ে যায়। অথবা এর অর্থ হলো সকল বাতিল উপাস্য তখন পলায়নপর হয়। কেউ তোমাদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে না। এক আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ তোমাদের ফরিয়াদ শ্রবণ করতে রাযী হয় না। কিন্তু যখন আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তখন তোমরা আল্লাহ্ পাকের তওহীদ বা একত্ববাদের বিশ্বাস থেকে মুখ ফিরিয়ে লও।

فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ

কিন্তু যখন আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে নাজাত দিলেন এবং স্থল ভাগে পৌঁছে দিলেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে। আল্লাহ্ পাকের মহান দানকে একেবারেই ভুলে গেলে। আর মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ।

وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ প্রসঙ্গে আবু জেহেলের পুত্র একরামার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় একরামা যখন আবিসিনিয়ায় পলায়নের উদ্দেশে যাত্রা করলো তখন সে একটি নৌকায় আরোহণ করলো। হঠাৎ নৌকাটি ঝড়ের মধ্যে পতিত হলো। বিপরীতমুখী বাতাসের ঝাপটা নৌযানটিকে একটি ক্ষুদ্র পাতার মত দোলাতে লাগলো। তখন নৌযানটিতে যত কাফের ছিল সবাই একজন আরেকজনকে বলতে

লাগলো, 'এখন স্বয়ং আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ কোন কাজে আসবে না, সুতরাং শুধু তাঁকেই ডাক'।

একরামার মনে তখন খেয়াল হলো, যদি সমুদ্রের মধ্যে এক আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ কোন কাজে না আসে, তবে একথা সুস্পষ্ট যে, স্থলভাগেও তিনিই কাজে আসবেন। হে আল্লাহ! আমি মানত মানছি, যদি আপনি এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তবে আমি অবশ্যই মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে আত্মসমর্পণ করবো, নিশ্চয় তিনি আমার উপর দয়া করবেন। এরপর সমুদ্র অতিক্রম করে তিনি সরাসরি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলেন এবং ইসলাম কুবুল করলেন। পরবর্তী কালে তিনি ইসলামের একজন বিশিষ্ট সৈনিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন যে, তোমরা সমুদ্র বক্ষে বিপদের সময় তো আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু ভুলে যাও কিন্তু বিপদ দূর হওয়ার পর আল্লাহকে ভুলে যাও এবং অন্যের কাছে আবেদন-নিবেদন করতে শুরু কর।[১]

أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا

"তবে কি তোমরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে স্থল ভাগে তিনি তোমাদেরকে ধ্বসিয়ে দেবেন না? অথবা তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন না? এরপর তোমরা তোমাদের কোন ত্রাণকর্তাই খুঁজে পাবেনা"।

অর্থাৎ সাগর বক্ষের মহা বিপদ থেকে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন অথচ স্থল ভাগে পৌঁছেই তোমরা আল্লাহ পাকের নেয়ামতের কথা ভুলে গেছ। তোমরা কি এ সত্য উপলব্ধি করনা? যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক সাগর বক্ষের মহাবিপদ থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে স্থল ভাগেও তোমাদেরকে ধ্বসিয়ে দিতে পারেন। অথবা প্রস্তর বর্ষণকারী ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রেরণ করে তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। যেমন হযরত লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ধ্বংস এভাবেই হয়েছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান। তাঁর ইচ্ছা সর্বত্র কার্যকর হয়। তিনি ইচ্ছা করলে ধ্বংসও করতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে রক্ষাও করতে পারেন। অতএব, তাঁর প্রতি আনুগত্য এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই হলো পরিণামদর্শী মানুষের কাজ।

أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا

"তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে তিনি তোমাদেরকে পুনরায় সাগরে

১। তফসীরে এবনে কাসীর, পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৫৬

ফিরিয়ে নেবেন না? এবং তোমাদের উপর প্রচণ্ড ঝড় প্রেরণ করবেন না? এবং তোমাদের অকৃতজ্ঞতার পরিণামে তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন না? এমন অবস্থায় তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবে না"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, হতে পারে আল্লাহ পাক এমন পরিস্থিতির উদ্ভব করবেন যে তোমাদের পুনরায় সামুদ্রিক সফর করতে হয় এবং তিনি আবার প্রচণ্ড ঝড় প্রেরণ করবেন (তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে?) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতেরঃقاصف শব্দটির অর্থ عاصف অর্থাৎ প্রচণ্ড ঝড়-তুফান। আবু ওবায়দা (রঃ) বলেছেন যে এর অর্থ হলো কোন কিছু ভেঙে চুরমার করে দেয়া قاصف সে বাতাসকে বলা হয় যা তার শক্তিতে সব কিছুকে ভেঙে চুরমার করে দেয়।

فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ

অর্থাৎ তোমাদের শের্ক ও কুফরীর কারণে অথবা তোমাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারেন।

ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا

"এরপর তোমরা কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যখন কারো বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেউ কোন প্রকার সাহায্য করতে পারেনা, এটি সম্পূর্ণ অকল্পনীয়।

তোমাদের কুফরী ও নাফরমানীর কারণে অথবা তোমাদের অকৃতজ্ঞতা ও না-শোকরীর শাস্তি স্বরূপ যদি তিনি তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেন, এমন অবস্থায় কেউ তোমাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। তোমাদের ধ্বংস হবে অনিবার্য। অতএব বিশ্বাস কর এক আল্লাহ পাকের প্রতি এবং আনুগত্য প্রকাশ কর তাঁর প্রতি, আর শোকর-গোজার হও তাঁর অগণিত নেয়ামতের জন্যে।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

"আর নিশ্চয় আমি তো আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি, স্থলে ও সামুদ্রিক ভাগে তাদেরকে বাহন দান করেছি এবং তাদেরকে উত্তম রিয্ক দান করেছি"।

মানব জাতির উচ্চ মর্যাদা

এ আয়াতে আল্লাহ পাক সৃষ্টির সেরা মানব জাতির সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছেন। মানুষকে আল্লাহ পাক অগণিত নেয়ামত দান করেছেন। যেমন মানুষের আকার-আকৃতি, বাক-শক্তি, বিচার-বুদ্ধি, বোধ-শক্তি, লেখার শক্তি ইঙ্গিতে বোঝাবার

শক্তি, সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর কর্তৃত্ব, বিভিন্ন রকম শিল্প এবং পেশা-কৌশল প্রদান করেছেন। তিনি মানুষকে পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর সঙ্গে মহাকাশের কিছুর যোগসূত্র স্থাপনের তওফিক দান করেছেন যেন মানুষ বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হতে পারে এবং রিয্কের উপকরণ সমূহ অর্জিত হতে পারে। তিনি মানুষকে জীব-জন্তুদের থেকে পৃথক এক বিশেষ ব্যবস্থা দিয়েছেন যে মানুষ হাত দ্বারা ধরে স্বচ্ছন্দে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে এবং মানুষকে তিনি মায়া-মহব্বত, স্নেহ-মমতা, শ্রদ্ধা-ভক্তি, প্রীতি-ভালবাসা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত করেছেন যেন সে আল্লাহ পাকের মা'রেফাত লাভ করে, তাঁর নৈকট্য লাভ ধন্য হতে পারে। হাকেম এবং দায়লামী হযরত জাবের এবনে আবদুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আঙ্গুল দ্বারা খাবার গ্রহণ করার ব্যবস্থার মাধ্যমেও আল্লাহ পাক মানুষকে সম্মানিত করেছেন।

মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা

এখানে উল্লেখ্য, আল্লাহ পাক মানব জাতিকে যে সম্মান এবং মর্যাদা দান করেছেন তা দু' প্রকার, একটি দৈহিক আরেকটি আধ্যাত্মিক বা রূহানী। দৈহিক সম্মান এবং বৈশিষ্ট্য সকল মানুষই পেয়ে থাকে মোমেন হোক বা কাফের। দৈহিক মর্যাদা এই যে-

(১) আল্লাহ পাক স্বয়ং তার কুদরতী হস্তে তাকে বানিয়েছেন,

(২) আল্লাহ পাক মানুষকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন,

(৩) মানুষের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সঠিক ওজন মোতাবেক বানিয়েছেন,

(৪) ধরা এবং খাওয়ার জন্য আঙ্গুল দিয়েছেন,

(৫) চলার জন্যে পা দান করেছেন,

(৬) পুরুষদেরকে দাঁড়ি এবং মেয়েদেরকে চুল দিয়ে তাদের সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন.

(৭) বুদ্ধি-বিবেচনা দান করেছেন.

(৮) বাকশক্তি দান করেছেন.

(৯) কলম দ্বারা লিখতে শিখিয়েছেন.

(১০) জীবিকা উপার্জনের পথ-নির্দেশ করেছেন.

(১১) নব নব আবিস্কারের পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন।

আধ্যাত্মিক বা রূহানী মর্যাদা

মানুষের দ্বিতীয় প্রকার মর্যাদা হলো রূহানী। আর এ মর্যাদাও দু'ভাগে বিভক্ত। একটি হলো সাধারণ। আরেকটি হলো বিশেষ। সাধারণ মর্যাদা মোমেন এবং কাফের উভয়েই লাভ করে।

(১) রূহানী মর্যাদা হলো আল্লাহ পাক মৃত্তিকা দ্বারা তৈরী মানব দেহে একটি রুহ ফুঁকে দিয়েছেন, ফলে সে জীবন্ত হয়েছে।

(২) এরপর আদম সন্তানদেরকে আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠ-দেশ থেকে বের করেছেন এবং সমগ্র মানব জাতিকে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?) বাক্য দ্বারা সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ্ পাকের সম্বোধন লাভ করা নিঃসন্দেহে বিশেষ মর্যাদা। আল্লাহ্ পাকের একথার জবাবে মোমেন ও কাফের সকলে بَلٰى (হ্যাঁ) বলে জবাব দেয় অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক সকলের নিকট থেকে তাঁকে পালনকর্তা হিসেবে মেনে নেয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন।

(৩) সমগ্র মানব জাতিকে স্বভাব-ধর্মের উপর সৃষ্টি করা হয়।

(৪) এরপর কৃত অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে পৃথিবীতে রসূল প্রেরণ করেন যুগে যুগে এবং আসমানী গ্রন্থ সমূহ অবতীর্ণ করেন। এর দ্বারা একথা জানিয়ে দেয়া হয়, যদি তোমরা স্বভাব-ধর্ম ইসলামের উপর কায়েম থাক এবং আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা কর, তবে কেয়ামতের পর তোমাদের আদি পিতা আদম (আঃ)-এর সঙ্গে জান্নাতে চিরদিন বাস করবে। পক্ষান্তরে, যদি কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ কর এবং তোমাদের আদি পিতা আদম (আঃ)-এর শত্রু ইবলিসের অনুসারী হও, তবে ইবলিসের সঙ্গে তোমাদেরকে দোযখে থাকতে হবে।

বিশেষ রুহানী মর্যাদা

রুহানী মর্যাদার দ্বিতীয় প্রকার হলো বিশেষ মর্যাদা, যার দ্বারা আল্লাহ্ পাক তাঁর বিশেষ বন্দাদেরকে সম্মানিত করেছেন, যেমন আম্বিয়ায়ে কেরামকে নবুওয়্যত ও রেসালত দ্বারা মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন, আউলিয়ায়ে কেরামকে বেলায়েতের উচ্চ মরতবা দান করেছেন। এমনিভাবে নেককার মোমেনদেরকে বিশেষ মর্যাদায় সম্মানিত করেছেন। আর ঈমানদারদেরকে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন এবং সীরাতে মুস্তাকিম তথা সরল সঠিক পথের হেদায়েত প্রদানে ধন্য করেছেন, যাতে করে সীরাতে মুস্তাকিমের উপর কায়েম থেকে আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হতে পারে এবং তাঁর সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষার পুরস্কার লাভ করতে পারে।[১]

মানব জাতির উচ্চ মর্যাদা

মূলতঃ এজন্যেই আল্লাহ্ পাক মানব জাতির উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে ঘোষণা করেছেনঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ

"নিশ্চয় আমি আদম সন্তানদেরকে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন করেছি"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ মানুষ হলো সর্বোত্তম সৃষ্টি। যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ (সূরা ত্বীন)

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৪০-৩৪১

"আমি তো মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি"।

সে তার পদ যুগলের উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সঠিক ভঙ্গিতে চলা-ফেরা করে, তার হাত দু'টি উত্তম খাদ্য বেছে নেয়ার জন্যে ব্যবহার করে, অথচ জীব-জন্তুরা হাত-পা উভয়ের সাহায্যে চলাফেরা করে এবং মুখ দিয়ে খাবার গ্রহণ করে। মানুষকে তিনি বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, যার দ্বারা সে নিজের ভাল-মন্দ এবং লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে এবং দ্বীন ও দুনিয়ার ফায়দা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। স্থল ভাগের বাহন স্বরূপ তিনি চতুঃষ্পদ জন্তু যেমন ঘোড়া, খচ্চর, উট প্রভৃতি দান করেছেন এবং নৌপথে সফরের জন্যে তাকে নৌযান বানানো শিখিয়েছেন। উত্তম এবং সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় প্রদান করেছেন। কৃষিকাজের জন্যে জমি দিয়েছেন এবং ফল-ফসল উৎপন্ন করেছেন। গোশ্ত, দুধ এবং আরও অনেক উত্তম, সুস্বাদু ও মজাদার খাদ্য প্রদান করেছেন। মানুষের বসবাসের জন্যে তিনি উত্তম বাসস্থান দান করেছেন এবং পরিধানের জন্য রং বেরংয়ের পোশাক দান করেছেন। এক স্থানের জিনিস অন্য স্থানে নেয়া এবং আনার জন্যে তিনি বাহন দান করেছেন। সৃষ্টির সব কিছুর উপর মানুষকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে মানুষ ফেরেশতাগণের চেয়েও উত্তম। হযরত যায়েদ এবনে আসলাম বলেছেন যে ফেরেশতাগণ বলেনঃ হে আল্লাহ! আপনি আদম সন্তানদেরকে দুনিয়া দিয়েছেন। তারা পরিতৃপ্ত হয়ে পানাহার করে এবং ভোগ-বিলাস করে থাকে। অতএব আমাদেরকে দুনিয়ার বদলে আখেরাতেই না হয় এসব প্রদান করতেন, কারণ আমরা দুনিয়ার এসব নেয়ামত থেকে বঞ্চিত।

একথার জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ আমার ইজ্জতের কসম! আদমের নেককার সন্তান, যাদেরকে নিজের কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছি তাদের সম মর্যাদা আর কাউকে আমি দেব না, যাকে আমি 'কুন' শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এবনে আসাকের একথাটি অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে ফেরেশতাগণ বলেনঃ হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকেও আপনিই সৃষ্টি করেছেন এবং আদম সন্তানকেও। তাদেরকে পানাহারের বস্তু দিয়েছেন, তাদেরকে পোশাক-পরিচ্ছদও দিয়েছেন যা তারা পরিধান করে, তারা বিয়ে-শাদীও করে, তাদের জন্যে যানবাহনের ব্যবস্থাও রয়েছে, তারা আরাম-আয়েশও করে এবং কোন কিছুই আমাদের নেই। যাহোক, দুনিয়াতে তাদের জন্যে সব কিছু আছে; আমরা যেন আখেরাতে এসব কিছু পাই তার ব্যবস্থা করে দিন।

ফেরেশতাদের একথার জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ আমি যাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছি এবং নিজের রুহ যার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছি, কোন কিছুকে আমি তার মত করবো না, যার সম্পর্কে বলেছি 'হয়ে যাও' আর তা হয়ে গেছে।

তেবরানীতে রয়েছেঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে আদম সন্তানের চেয়ে সম্মানিত আর কেউ হবেনা। জিজ্ঞাসা করা হলো ফেরেশতাও নয়? এরশাদ হলোঃ না, ফেরেশতাও নয়। কেননা তার চন্দ্র সূর্যের ন্যায়ই মজবুর।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৫১

وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

"আমি অনেক সৃষ্টির উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি"।

প্রকাশ্য আয়াত দ্বারা একথা জানা যায় যে আল্লাহ পাক মানুষকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর নয়; বরং অধিকাংশ সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে। কিছু লোকের ধারণা, মানব জাতিকে ফেরেশতা ব্যতীত আর সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে।

কালবী (রঃ) বলেছেনঃ শুধু কয়েকজন ফেরেশতা ব্যতীত সমস্ত ফেরেশতাদের উপরও মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ জিব্রাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফিল এবং আজরাঈল ব্যতীত সকলের উপর মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, যদিও আয়াতে كثير (অনেক) শব্দ ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু মানব জাতিকে সমস্ত ফেরেশতাগণের উপরই শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। আর এরূপ ব্যবহার কোরআনে করীমের অন্যত্রও রয়েছে, যেমন এরশাদ হয়েছে।

وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ (সূরা শুআরা)

"তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী"।

এই اكثر। শব্দ দ্বারা সমস্ত লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ কথার সমর্থনে হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীস পেশ করা যেতে পারে। এতে রয়েছেঃ যখন আল্লাহ পাক আদম (আঃ) এবং তাঁর সন্তানদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তখন ফেরেশতাগণ আরজ করলেনঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছ এভাবে যে তারা পানাহার করবে এবং স্বামী-স্ত্রী মেলা-মেশা করবে এবং যানবাহনের উপর আরোহণ করবে, অতএব তাদের জন্যে দুনিয়ার নেয়ামত আর আমাদের জন্যে বিশেষভাবে আখেরাতের নেয়ামত দান করো। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ যাকে আমি স্বহস্তে তৈরী করেছি আর যার মধ্যে আমি নিজের রুহের কিছু অংশ ফুঁকে দিয়েছি, আমি তাকে আমার সেই সৃষ্টির মতো করবোনা (যাকে সৃষ্টি করার জন্যে আমি 'কুন' বলেছি, আর তা অস্তিত্ব লাভ করেছে (বায়হাকী)।

আলোচ্য বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা

নেককার মোমেন যিনি আল্লাহর ওলী তিনি সাধারণ ফেরেশতার চেয়ে উত্তম, আর যে গুনাহগার মোমেন আওলিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়, গুনাহ থেকে তওবা করে পবিত্রতা অর্জন করলে সে-ও সাধারণ ফেরেশতার চেয়ে উত্তম, কেননা তওবার মাধ্যমে গুনাহ থেকে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। অথবা গুনাহ পরিমাণ শাস্তি হওয়ার পরও গুনাহ থেকে পবিত্রতা অর্জন করা যায় এবং বেহেশতে প্রবেশ করার ব্যবস্থা হয়। এভাবে সাধারণ ফেরেশতার চেয়ে উত্তম হওয়া যায়। আর বিশেষ মোমেন যেমন আম্বিয়ায়ে কেরাম, তাঁরা সকল বিশেষ ফেরেশতাগণের চেয়েও উত্তম, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

(সূরা বাইয়্যেনাহ) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তারা উত্তম সৃষ্টি"।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মোমেন আল্লাহ পাকের নিকট ফেরেশতাদের চেয়েও সম্মানিত।

এবনে মাজা শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, মোমেন আল্লাহ পাকের নিকট কোন কোন ফেরেশতার চেয়েও উত্তম।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকায়েদ সম্পর্কীয় গ্রন্থ সমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ফেরেশতাদের চেয়েও বেশী মর্যাদাবান, এর কারণ এই, মানুষের মধ্যে আল্লাহর নাফরমানী করার উপকারণ বিদ্যমান কিন্তু ফেরেশতাদের মধ্যে আল্লাহর নাফরমানী করার উপকরণ নেই, বরং তাদের সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ পাকের আনুগত্যের উপর। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সাধনা করে, নিজেদেরকে নাফরমানীর কাজ থেকে রক্ষা করার জন্যে সংযম-চর্চা করে এবং আত্ম-সংশোধনের একটানা সাধনা করে যায়, তাদের সম্পর্কে সূরা আনকাবুতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

"আর যারা আল্লাহর রাহে সাধনা করে, আমি তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করি। আর নিশ্চয় আল্লাহ পাক নেককার লোকদের সঙ্গে রয়েছেন"।[১]

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

(সূরা ইউনুস) أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"সতর্ক হও! নিশ্চয় যারা আল্লাহর ওলী তাদের কোন ভয় নাই। আর তারা চিন্তিতও হবেনা"।

প্রশ্ন হলো আল্লাহর ওলী কারা? এর জবাব রয়েছে পরবর্তী আয়াতে—

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

"যারা ঈমান আনে এবং সর্বদা আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকে"।

এর পরবর্তী আয়াতে তাদের শুভ-পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

"তাদের জন্যে সুসংবাদ রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে"।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, নবী রসূলগণ সকল

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১০২-০৩

ফেরেশতার চেয়েও উত্তম। সাধারণ ফেরেশতা সাধারণ মানুষের চেয়ে উত্তম। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানতে হলে "কেতাবু উসুলেদ্দিন" কৃত ইমাম সদরুল ইসলাম বজদবী, পৃষ্ঠা-২০২ দ্রষ্টব্য।

এখানে উল্লেখ্য, আম্বিয়ায়ে কেরামের ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম হওয়া সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে খেলাফতের মুকুট দান করেছেন। তাঁকে সম্মানসূচক সেজদা প্রদানের জন্যে ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের চেয়ে তাঁকে অধিকতর এলম দান করেছেন। وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

ইমাম আবু মনসুর মাতুরীদি লিখেছেন, আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে নীরবতা পালন করা অধিকতর উত্তম। কেননা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আমরা অবগত নই। আর এর প্রয়োজনও নেই। উত্তম হলো বিষয়টির ফয়সালা আল্লাহ পাকের হাতে ছেড়ে দেয়া। তিনিই সর্বজ্ঞ, তিনি মহাজ্ঞানী, তিনিই জানেন তাঁর মহান দরবারে কে সর্বোত্তম।[১]

يَوْمَ
نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۢ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ
يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٧١﴾ وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ
فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٧٢﴾ وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيْٓ
اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْ
لَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ﴿٧٤﴾ اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ
ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾ وَاِنْ
كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ
خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٧٦﴾ سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ
لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ﴿٧٧﴾

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৪২-৪৪

তরজমা

(৭১) স্মরণ কর সেদিনকে, যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতা সহ ডাকবো, যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তারা তাদের আমলনামা পাঠ করবে আর তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবেনা।

(৭২) পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি এখানে অন্ধ হবে পরকালেও সে অন্ধ হবে এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট থাকবে।

(৭৩) (হে রসূল!) আমি আপনার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করেছি তারা তা থেকে পদস্খলন ঘটাবার চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছিল, যেন আপনি আমার সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করেন; আর এমন অবস্থায় তারা আপনাকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করতো।

(৭৪) (হে রসূল!) যদি আমি আপনাকে অবিচলিত না রাখতাম তবে আপনি কিছুটা তাদের দিকে ঝুঁকে পড়তেন।

(৭৫) এমন অবস্থায় আমি আপনাকে এ জীবনে দ্বিগুণ ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম। তখন আমার বিরুদ্ধে আপনি কোন সাহায্যকারী খুঁজেও পেতেন না।

(৭৬) আর তারা (হে রসূল!) আপনাকে দেশ থেকে উৎখাত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল, আপনাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করার লক্ষ্যে, যদি তা হতো তবে আপনার পরে তারাও সেখানে অল্পকালই টিকে থাকতো।

(৭৭) (হে রসূল!) আমার রসূলগণের মধ্যে আপনার পূর্বে যাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, তাদের ক্ষেত্রেও এমন নিয়মই ছিল আর আপনি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন পাবেন না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে দুনিয়াতে মানুষকে যে উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তার উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে আখেরাতে মানুষের উচ্চ মর্যাদার যে অবস্থা হবে তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। কেননা আখেরাতে নেককারদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে। আর বদকারদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেয়া হবে। মানুষের প্রকৃত মর্যাদা কেয়ামতের দিনই প্রকাশ পাবে। বিশেষতঃ এ পৃথিবীতে মানুষকে যে যোগ্যতা, ক্ষমতা, সম্মান এবং মর্যাদা দেয়া হয়েছে, সে তার কতখানি সদ্ব্যবহার করেছে, রক্ষা করেছে বা এর অনাদর ও অবহেলা করেছে, শেষ বিচারের দিন তথা কেয়ামতের দিন তারই বিচার হবে। দুনিয়ার এ জীবনে যার সঙ্গে যার ওঠা-বসা, ভালবাসা, কেয়ামতের দিন তার সঙ্গেই হবে তার হাশর। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

المرء مع من احب

অর্থাৎ দুনিয়াতে যার সঙ্গে যার ভালবাসা, কেয়ামতের দিন তার সঙ্গেই সে থাকবে।

নেককার মোমেনগণ নবী রসূল, ওলী, দরবেশগণের সাথে অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্দাদের সঙ্গে হাযির হবেন। কিন্তু কাফেররা উপস্থিত হবে তাদের পুরোহিত শয়তান এবং বাতিল উপাস্যদের সাথে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ

"সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতা সহ ডাকবো"।

আলোচ্য আয়াতের امام শব্দটির ব্যাখ্যায় মুজাহেদ (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ এর দ্বারা প্রত্যেক নবীর উম্মতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আবু সালেহ এবং যাহ্যাক বলেছেনঃ এ শব্দটির দ্বারা আসমানী কিতাব উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

এবনে মরদবিয়া হযরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক উম্মতকে তার ইমাম বা নেতা এবং আসমানী কিতাব সহ ডাকা হবে।

সায়ীদ এবনে যুবায়ের হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায়ের ইমাম তার সম্প্রদায়কে হয় পথভ্রষ্ট করে অথবা সঠিক পথ প্রদর্শন করে। আল্লাহ পাক উভয়ের সম্পর্কেই ائمة শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا (সূরা সজদা)

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ (সূরা কাছাছ)

প্রথম আয়াতে 'হেদায়েতের ইমাম' আর দ্বিতীয় আয়াতে 'পথভ্রষ্টতার ইমামের' উল্লেখ রয়েছে।

হাসান এবং আবুল আলীয়া বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের 'ইমাম' শব্দটির অর্থ হলো মানুষের আমল।

কাতাদা বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের 'ইমাম' শব্দ দ্বারা আমলনামাকে বোঝানো হয়েছে। কেননা আমলনামা-গ্রন্থকে কোরআনে করীমে 'ইমাম' বলা হয়েছে। সূরা ইয়াসীনে এরশাদ হয়েছেঃ

وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ

অর্থাৎ সবকিছু আমি সুস্পষ্ট গ্রন্থে সুরক্ষিত রেখেছি।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে 'ইমাম' শব্দের অর্থ হলো সে সব শক্তি যারা মানুষকে সত্য বা অসত্য পথে পরিচালনা করে।

মোহাম্মদ এবনে কা'ব (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের 'ইমাম' শব্দটি ام (মা) শব্দের বহু বচন। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন লোকদেরকে তাদের মায়ের নামে ডাকা হবে

এর দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে। এমনিভাবে ইমাম হাসান (আঃ) এবং ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর উচ্চ মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ হবে।

بِاِمَامِهِمْ

শব্দটির ব্যাখ্যা হলো, যে নবী বা যে গ্রন্থ বা যে নেতার অনুসরণকারী হবে কেয়ামতের দিন অনুসারী মাত্রই তার সাথে হবে। অথবা এর অর্থ হলো প্রত্যেকে তার আমলনামা হাতে নিয়ে হাযির হবে। অথবা এর অর্থ হলো প্রত্যেককে তার ইমামের নামে ডাকা হবে। যেমন হে অমুক নবীর উম্মত, অথবা বলা হবে হে অমুক ব্যক্তির অনুসারী, অথবা বলা হবে হে অমুক মাজহাবের অনুগামী, অথবা বলা হবে হে অমুক গ্রন্থের অনুসারী, অথবা বলা হবে হে মরিয়মের পুত্র, অথবা বলা হবে হে ফাতেমার পুত্র প্রভৃতি।[১]

আলোচ্য আয়াতের 'ইমাম' শব্দটির ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ ইমাম শব্দের আভিধাণিক অর্থ হলো, সে ব্যক্তি, যার অনুসরণ করা হয় 'তা' হেদায়েতের ব্যাপারে হোক বা পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে। অতএব প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতের ইমাম। প্রত্যেক রাষ্ট্রপতি তার দেশের জনগণের ইমাম। আর কোরআন হলো সমগ্র মুসলিম জাতির ইমাম। আর কোন জাতির ইমাম তাকে বলা হয় যাকে নামাজে অনুসরণ করা হয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন এভাবে ডাকা হবে, 'হে উম্মতে ইব্রাহীম, হে উম্মতে মূসা, হে উম্মতে ঈসা, হে উম্মতে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)। অতঃপর যারা আম্বিয়ায়ে কেরামকে অনুসরণ করেছিল সেই অনুসারীগণ দণ্ডায়মান হবে এবং তাদের আমলনামা ডান হাতে গ্রহণ করবে। এরপর এভাবে ডাকা হবেঃ হে ফেরআউনের অনুসারীরা, হে নমরূদের অনুসারীরা, হে অমুক পথভ্রষ্ট নেতার অনুসারী, হে অমুক কাফের নেতার অনুসারী ইত্যাদি।[২]

فَمَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

"অতএব, যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তারা তাদের আমলনামা পাঠ করবে আর তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবেনা"।

কেয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার আমলনামা হাতে দেয়া হবে। যারা নেককার হবে তাদেরকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে। পক্ষান্তরে যারা বদকার হবে তাদের পেছন থেকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে। আল্লাহ পাক আমাদের মালিক, আমরা সকলেই তাঁর গোলাম, কিন্তু কোন্ গোলাম তাঁর পছন্দনীয়? আর কে তার অপছন্দনীয়? তার প্রকাশ্য নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে কেয়ামতের কঠিন দিনে আমলনামা প্রদানের মাধ্যমে। এ পৃথিবীতে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করবে, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে এবং নবী রসূলগণের হেদায়েত মোতাবেক জীবন যাপন করবে, সর্বশেষ ও

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭,পৃষ্ঠা-১০২-৩
২। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৭

সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসারী হবে, হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করবে, তারাই আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় বন্দা হবে এবং তাদের ডান হাতেই দেয়া হবে আমলনামা। তখন তাদের আনন্দ-উল্লাসের সীমা থাকবে না, তারা বলবে, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتٰبِيَهْ (সূরা আল-হা-ক্বাহ)

"এসো হে, এসো, তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখো"।

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

"একটি সূক্ষ্ম সূতা পরিমাণও তথা সামান্যতম জুলুমও তাদের প্রতি করা হবে না"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি এরশাদ করেছেনঃএক ব্যক্তিকে ডেকে তার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তার দেহ তখন বড় হয়ে যাবে, চেহারা উজ্জ্বল ও চমকদার হবে এবং হীরার তৈরী মুকুট তার মাথায় শোভা পাবে। তাকে এ অবস্থায় তার লোকদের নিকট যেতে দেয়া হবে, তাকে দেখে সকলে আকাংক্ষা করবে-হে আল্লাহ! আমাদেরকেও এসব দান কর, আর তাতে বরকত দান কর।

সে এসেই বলবে, তোমরা খুশী হও, তোমাদের প্রত্যেককেই পুরস্কার দেয়া হবে।

পক্ষান্তরে, কাফেরের চেহারা কালো হয়ে যাবে, তার দেহের আকার বড় হয়ে যাবে, তার সাথীরা তাকে দেখে বলবে, আমরা এই লোকটি থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই, হে আল্লাহ! তাকে আমাদের নিকট আসতে দিওনা। কিন্তু সে তাদের নিকটই আসবে। তখন লোকেরা বলবে, হে আল্লাহ! তাকে অপমানিত কর। সে জবাবে বলবে, আল্লাহ তোমাদেরকে ধ্বংস করুন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে আল্লাহর এ গযব তৈরী।

মূলতঃ এ দুনিয়াতে যে কেউ আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে অস্বীকার করবে, তাঁর কিতাব থেকে চক্ষু বন্ধ রাখবে এবং তাঁর হেদায়েত গ্রহণে প্রস্তুত হবেনা সে সত্যি সত্যিই আখেরাতে অন্ধ হয়ে উঠবে। দুনিয়াতে যেভাবে পথভ্রষ্ট ছিল আখেরাতে তার চেয়েও বেশী পথভ্রষ্ট হবে (আল্লাহ পাক আমাদেরকে রক্ষা করুন)।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, কাফেরদেরকে যখন কেয়ামতের দিন আমলনামা দেয়া হবে, তখন তারা লজ্জায়, দুশ্চিন্তায় এত বেশী ব্যাকুল হবে যে তারা বাক শক্তি হারিয়ে ফেলবে। সঠিক জবাব দিতেও সক্ষম হবেনা। আক্ষেপ করে শুধু একথা বলতে থাকবে- 'যদি এই কিতাব আমাদেরকে দেয়া না হতো'!

যদিও কাফেরদের আলোচনা এ আয়াতে নেই, আর তাদেরকে আমলনামা দেয়ার কথাও আলোচ্য আয়াতে নেই, কিন্তু পরবর্তী আয়াতে তাদের করুণ অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯

وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى

"যে দুনিয়াতে অন্ধ হয়ে থাকবে, আখেরাতেও সে অন্ধ হয়ে উঠবে"।

দুনিয়াতে যে পথভ্রষ্ট, সে আখেরাতে হবে অন্ধ

অর্থাৎ দুনিয়ার এ জীবনে যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান থেকে তথা সরল সঠিক পথের হেদায়েত থেকে অন্ধ থাকবে, আখেরাতেও তারা তেমনি অন্ধ হয়ে উঠবে।

কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক বিষয়টিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى (সূরা তোয়াহা)

"আর যে কেউ আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, নিশ্চয় তার জীবন হবে দূর্বিষহ এবং কেয়ামতের দিন তাকে অন্ধ করে তুলবো। সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কেন অন্ধ করে উঠিয়েছ, আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম'। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন, "এভাবেই আমার আয়াত সমূহ তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে রয়েছিলে, ঠিক এভাবেই আজ তুমিও বিস্মৃত হবে"।

এ আয়াত দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয়, যারা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্ পাকের স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে, ঈমানের নেয়ামত থেকে মাহরূম হবে, পার্থিব জীবনের সম্পদ লাভ করাই একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের লোভ ও লাভে মুগ্ধ-মত্ত ও মাতোয়ারা থাকবে, তারা যদি বিশাল ঐশ্বর্য এবং বিত্ত-বৈভবের অধিকারীও হয় কিন্তু তবু তাদের জীবন হবে দূর্বিষহ, প্রকৃত সুখ-শান্তি থেকে তারা হবে বঞ্চিত, তারা আকাশচুম্বি ইমারতে থাকলেও অশান্তি, দুঃখ-যাতনার অনল তাদের অন্তরে জ্বলতেই থাকবে, আর আখেরাতে তাদেরকে অন্ধ করে উঠানো হবে।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছেঃ হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে 'এই সকল নেয়ামতের ব্যাপারে অন্ধ'- একথার দ্বারা ঐ সকল নেয়ামতকে বোঝানো হয়েছে যা পূর্ববর্তী আয়াতে (رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ) উল্লেখিত হয়েছে।

আর فِى الْاٰخِرَةِ (আখেরাতে) দ্বারা আখেরাতের বিষয় সমূহকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের এই সকল প্রকাশ্য নেয়ামত সমূহ দেখা সত্বেও যারা অন্ধ থাকছে তারা পরকালের বিষয়ে আরও অধিকতর অন্ধ থাকবে। কারণ পরকালকে তো তারা দেখেনি।

কোন কোন তফসীরকারের মতে, هٰذِهٖ শব্দটি দ্বারা দুনিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ দুনিয়াতে তওহীদ এবং সত্যের যুক্তি থাকা সত্বেও তার প্রতি অন্ধ রয়েছে, সে পরকালের নাজাতের পথ দেখার ব্যাপারেও অধিকতর অন্ধ থাকবে।

আলোচ্য আয়াতে 'অন্ধ' বলতে অন্তরের অন্ধত্বকে বোঝানো হয়েছে, চক্ষুর অন্ধত্ব নয়। যাহ্যাক (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তরফ থেকে আরেকটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যারা দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমত দেখা সত্বেও আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের ব্যাপারে গাফেল থাকে তথা অন্ধের ন্যায় চক্ষু বন্ধ করে রাখে এবং যাদের মনের কপাট সত্যকে গ্রহণের জন্যে উন্মুক্ত হয় না, তারা আখেরাতের এলম হাছিল করার ব্যাপারেও থাকবে অন্ধ।

আর হযরত হাসান বসরী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এর অর্থ হলো যারা দুনিয়াতে পথভ্রষ্ট এবং কাফের থাকে, আখেরাতেও তারা অন্ধ এবং পথভ্রষ্টই থাকবে। কেননা দুনিয়াতে তওবা কবুল হয়, আখেরাতে তা হবে না।

এর আরেকটি অর্থ হলো, যে দুনিয়াতে আল্লাহর মা'রেফাতের পথ পাবেনা তথা আল্লাহর মা'রেফাত সম্পর্কে অন্ধ থাকবে, সে আখেরাতে জান্নাতের পথও পাবে না এবং জান্নাতের পথ পাওয়ার ব্যাপারেও সে অন্ধ থাকবে।

এ আয়াতের আরেকটি অর্থ হলো, দুনিয়ার জীবনে যে মনের দিক থেকে অন্ধ থাকবে, অর্থাৎ দুনিয়ার লোভে মত্ত থাকার কারণে যে আখেরাতের ব্যাপারে গাফলতের আবর্তে নিপতিত থাকবে, আখেরাতে সে আরও বেশী অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে। কেননা তার নিকট আখেরাতে আল্লাহ পাকের মা'রেফাতের নূর থাকবেনা, তাই সে আখেরাতে অধিকতর অন্ধকারে থাকবে।[১]

وَاَضَلُّ سَبِيْلًا

অর্থাৎ যে দুনিয়াতে হেদায়েতের পথ থেকে দূরে থাকবে সে আখেরাতে নাজাতের পথ থেকে আরও দূরে থাকবে। কেননা সেখানে হেদায়েত লাভের কোন সুযোগ থাকবে না এবং কোন তওবাও কবুল হবে না।

অথবা এর অর্থ হলো, যে দুনিয়াতে আখেরাতের ব্যাপারে অন্ধ থাকবে সে আখেরাতে অন্ধের চেয়ে অধিকতর পথভ্রষ্ট হবে।

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ

"(হে রসূল!) আমি আপনার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করেছি তারা তা থেকে পদস্খলন ঘটাবার চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছিল, যেন আপনি আমার সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করেন, আর এমন অবস্থায় তারা আপনাকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করতো"।

শানে নজুল

এ আয়াতের শানে নজুল সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। এবনে মরদবিয়া এবং

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৯

এবনে আবি হাতেম মোহাম্মদ এবনে আবি মোহাম্মদ একরামার সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, উমাইয়া এবনে খালফ এবং আবু জেহেল এবনে হিশামসহ আরও কিছু লোক একত্রিত হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলোঃ হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি আমাদের উপাস্যগুলোকে যদি হাত দ্বারা একটু স্পর্শ করেন, তবে আমরা সকলে আপনার ধর্ম গ্রহণ করবো। যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তাদের মুসলমান হওয়া অত্যন্ত প্রিয় এবং কাম্য ছিল, তাই তাঁর অন্তরে তাদের ব্যাপারে কিছুটা নম্রতা সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

এবনে আবি হাতেম সায়ীদ এবনে জুবায়েরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করতেন। মুশরেকরা বললো, আমরা আপনাকে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে দেবনা যে পর্যন্ত না আপনি আমাদের উপাস্যদের প্রতি আকৃষ্ট না হন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ধারণা করলেন, যদি আমি তা করি তবে আমার ক্ষতি কি? যখন আল্লাহ পাক অবগত রয়েছেন যে আমি অন্তর দিয়ে এগুলো পছন্দ করি না।

এবনে আবি হাতেম জুবায়ের এবনে নাফীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে কোরায়েশ গোত্রের লোকেরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বলেছিল, যদি আপনাকে আমাদের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করা হয়ে থাকে তবে আপনার কাছে যে-সব নিম্ন পর্যায়ের লোক একত্রিত হয়েছে তাদেরকে বের করে দেন, তাহলে আমরা আপনার সাথী হবো। তখন এ আয়াত নাজিল হয়েছিল।

এবনে আবি হাতেম মোহাম্মদ এবনে কা'ব কারযীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন নামাজে সূরা আন্-নজ্ম তেলাওয়াত করেন, তাতে এ আয়াত পাঠ করেনঃ

أَفَرَءَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ (সূরা নজম)

এরপর শয়তান এ বাক্যগুলো সংযোজন করেঃ

تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى

তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। সে সময় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে কীভাবে একথাগুলো তাঁর জবান মোবারক থেকে উচ্চারিত হলো। অবশেষে যখন এ আয়াত-

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّىٰ (সূরা হজ্জ)

নাজিল হলো তখন তাঁর অন্তরে সান্ত্বনা আসলো।

এই হাদীস সমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, এ আয়াত মক্কী। কিন্তু কেউ কেউ এ আয়াতকে মদনী বলেন এবং নিম্নে বর্ণিত ঘটনাকে আলোচ্য আয়াতের শানে নজুল বলে

মনে করেন।

এবনে মরদবিয়া উফির সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে সকীফ গোত্রের লোকেরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলো যে আমাদেরকে এক বছরের অবকাশ দান করুন (আমাদের উপাস্যদের প্রতি মানত চড়ানো হয়) যখন সব হাদিয়া তোহফা আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে, তখন আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অবকাশ দেয়ার কথা চিন্তা করছিলেন, এমন সময় এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) সূত্র উল্লেখ করে আলোচ্য ঘটনা এভাবে লিখেছেন যে সকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলো এবং আরজ করলো, আমরা তিনটি শর্তে আপনার হাতে বয়আত করতে প্রস্তুত রয়েছি। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের শর্তগুলো কি? তারা বললো, প্রথম কথা হলো আমরা নামাজের মধ্যে ঝুঁকবনা। দ্বিতীয় কথা হলো, আমরা আমাদের মূর্তিগুলো স্বহস্তে ভেঙ্গে দেব না। তৃতীয় কথা হলো, আমরা 'লাত' মূর্তির উদ্দেশে যে সব নজরানা আসে সেগুলো এক বছর পর্যন্ত ভোগ করতে থাকব, অবশ্য এগুলোর পূজা করবো না। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর জবাবে বলেছেনঃ যে ধর্মে রুকু সেজদা নেই, তাতে কোন কল্যাণ নেই। আর তোমরা নিজ হাতে তোমাদের মূর্তি যদি ভাঙ্গতে না চাও তবে সেটা তোমাদের ইচ্ছা। আর এসব মূর্তির উদ্দেশে প্রদত্ত হাদীয়া-তোহফার দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিতে পারি না। তারা বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের আকাংক্ষা এই, আরবরা যেন একথা জানতে পারে যে আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বিশেষভাবে দান করেছেন যা অন্যদেরকে দান করেননি। যদি আপনার এ আশংকা হয় যে লোকেরা বলবে, সকীফ গোত্রকে আপনি বিশেষ কিছু দান করেছেন যা অন্যদেরকে দান করেননি তখন আপনি তাদের জবাবে বলুন যে আল্লাহ পাক এ আদেশই দিয়েছেন। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথা শুনে নীরব হয়ে গেলেন। তাঁর নীরবতাকে তারা অনুমতি মনে করলো এবং ধারণা করলো যে তিনি তাদের কথা মেনে নেবেন। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।[১]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি কাফেরদের এ অন্যায় আচরণের বিবরণ ছিল যে তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১০৬-১০৮
তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-২১
তফসীরে তবরী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৮৮
তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা ১২৭-২৮

মিথ্যাজ্ঞান করতো অর্থাৎ আল্লাহর রসূল হিসেবে বিশ্বাস করতো না। আর আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ের বিবরণ রয়েছে যে কাফেররা সর্বদা তাঁর সাথে শত্রুতা করতো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো, আর কখনও দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতো।

আয়াতের মর্মকথা

যারা ভাগ্যাহত, যারা বদনসীব, তাদের অবস্থা এই যে তারা নিজেরাতো সরল সঠিক পথ গ্রহণই করেনা, তদুপরি সর্বদা অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট এবং বিপদগ্রস্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। মক্কার কাফেরদের এ অবস্থাই ছিল। আল্লাহ পাকের মহান বাণী বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান আনা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু সে কর্তব্য পালন করা তো দূরের কথা, বরং তারা সর্বদা মানুষকে ঈমানের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। এমনকি তারা এ ষড়যন্ত্রও করতো যেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের মন রক্ষার্থে তাঁর নিকট আল্লাহ পাকের প্রেরিত ওহী সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে বাদ দেন, সে স্থলে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে তাদের পছন্দ মত কিছু রচনা করে আল্লাহ পাকের নাম প্রচার করেন। যেমন বণী সকীফ গোত্রের লোকেরা এসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেছিল যে, আপনি আমাদের খাতিরে অমুক অমুক বিধান সহজ করে দিন। এভাবে তারা বলেছিল, আমাদের মূর্তিগুলো একবার আপনি স্পর্শ করুন, তাহলে আমরা তখনই ইসলাম কবুল করবো। অথবা কেউ বলেছিল, পবিত্র কোরআনে শেরক ও পৌত্তলিকতার যে নিন্দাবাদ রয়েছে তা বাদ দিন, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবো।

কাফেররা এভাবে বহুবারই চেষ্টা করেছে কিন্তু তাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।

একবার তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালেবের মাধ্যমে এ প্রস্তাব দিয়েছিল, যদি তিনি শেরক এবং পৌত্তলিকতার নিন্দাবাদ বর্জন করেন, তবে তিনি চাইলে আমরা আরবের রাজত্ব তাঁর হাতে তুলে দিতে পারি, অথবা তিনি চাইলে তাঁকে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদশালী ব্যক্তি বানিয়ে দিতে পারি, অথবা সবচেয়ে সুন্দরী নারীর পাণি গ্রহণের ব্যবস্থা তাঁর জন্যে করতে পারি।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচাকে তখন বলেছিলেন, 'হে চাচা! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, আল্লাহর শপথ! যদি তারা আমার এক হাতে চাঁদ আর এক হাতে সূর্যও এনে দেয়, তবুও আল্লাহ পাক আমাকে যা করতে বলেছেন এবং আমার প্রতি যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা পালনে আমি কোন অবস্থাতেই বিরত হবোনা'।

আল্লাহ পাকের হেফাজত

মূলতঃ আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হেফাজত করেছেন, তিনি ছিলেন নিঃস্পাপ। তাঁর হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাক গ্রহণ করেছেন, তাই

দুশমনরা তাঁর ক্ষতি সাধনে সক্ষম হয়নি। তাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا

"(হে রসূল!) যদি আমি আপনাকে অবিচলিত না রাখতাম তবে আপনি কিছুটা তাদের দিকে ঝুঁকে পড়তেন"।

যেহেতু নবীগণ নিঃস্পাপ হন এবং তাঁদের হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাক গ্রহণ করেন, তাই দূরাত্মা কাফেরদের ষড়যন্ত্র তাঁদের ব্যাপারে ব্যর্থ হয়। আলোচ্য আয়াতে تركن শব্দটি ركن থেকে নিঃস্পন্ন। এর অর্থ হলো, কোন দিকে সামান্যতম ঝোঁক বা আকষর্ণ হওয়া। যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরে কাফেরদের হেদায়েতের আগ্রহ ছিল অত্যন্ত প্রবল, তাই এদিকে তাঁর মনের ঝোঁক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এরপর আল্লাহ পাক شَيْـًٔا قَلِيْلًا বলে ঐ ঝোঁক বা আকর্ষণকে আরও হালকা করে দিয়েছেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, এ বাচন-ভঙ্গীতে কোন অভিযোগের ভাব নেই; বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ পাকের অসাধারণ প্রীতি এবং মহব্বতের ভাবই প্রকাশ পেয়েছে। এ মর্মে যে, (হে রসূল!) আপনি আমার দরবারে এত প্রিয় এবং পছন্দনীয় যে কাফেরদের এসব ষড়যন্ত্র থেকে আমি আপনাকে রক্ষা করেছি।[১]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ আয়াত দ্বারা কয়েকটি মাসআলা প্রমাণ করেছেন।

(১) কোন ভাল কাজ মন্দ পন্থায় হতে পারেনা; বরং ভাল কাজ উত্তম পন্থায়ই হয়ে থাকে। যেমন আলোচ্য ঘটনায় একথা প্রমাণিত হয়েছে। কাফেরদের ইসলাম গ্রহণ নিঃসন্দেহে উত্তম কাজ, কিন্তু এজন্যে তারা যে পন্থা অবলম্বন করেছে তা ছিল মন্দ।

(২) কোন অবস্থাতেই শরীয়তের বিধানকে পরিবর্তন করা যায় না, শরীয়তের বিধান যা আছে তাই থাকে।

(৩) ভাল কাজের তৌফিক শুধু আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই হয়, অর্থাৎ আল্লাহ পাক তৌফিক না দিলে ভাল কাজ করা সম্ভব হয়না।

(৪) নবী রসূলগণ নিঃস্পাপ হন, আল্লাহ পাকই তাঁদের হেফাজত করেন।[২]

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তাকওয়া, নৈতিক গুণাবলী এবং সত্যের উপর তাঁর দৃঢ়তা এবং অনমনীয়তার উজ্জল দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا

১। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৫৭৭
২। তফসীরে মাজেদী, খণ্ড-১ পৃষ্ঠা-৫৯৩

"আমি তখন আপনাকে জীবনে দ্বিগুণ এবং মরণেও দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম, এরপর আপনি আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী খুজেও পেতেন না"।

বস্তুতঃ যার মর্যাদা যত বেশী, তার ভুল-ভ্রান্তির গুরুত্বও তত বেশী। তাই আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে যে হে নবী! যেভাবে আপনার মর্তবা সর্বোচ্চ, আপনার মর্যাদা অসাধারণ, ঠিক তেমনি যদি আপনার দ্বারা কোন ভুল-ভ্রান্তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায় তবে তার গুরুত্বও হবে সমধিক, অর্থাৎ তার শাস্তিও হবে কঠিন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, (হে রসূল!) আমি যদি আপনাকে সত্যের উপর অবিচলিত না রাখতাম তবে কাফেরদের হেদায়েতের পরম আকাংক্ষায় আপনি কিছুটা তাদের প্রতি ঝুঁকে যেতেন, যদি আপনি তা করতেন তবে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে আপনার দ্বিগুণ শাস্তি, অর্থাৎ এ অন্যায় যদি অন্য মানুষ করতো তবে যে শাস্তি হতো, আপনি তা করলে তার দ্বিগুণ শাস্তি হতো। আলোচ্য আয়াতে لَوْلَا শব্দটি তাৎপর্যবহ যার অর্থ হলো প্রথম কাজটি না হলে দ্বিতীয়টি হতো। কিন্তু প্রথমটি হওয়ার কারণে দ্বিতীয়টি অস্তিত্ব লাভ করেনি, তাই আয়াতের অর্থ হলো হে নবী! যদি আল্লাহ পাকের নিরাপত্তা-ব্যবস্থা আপনার সাথে না থাকত তবে আপনি তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ার নিকটবর্তী হতেন। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাকের নিরাপত্তা-ব্যবস্থা আপনার সাথে ছিল, তাই আপনি কাফেরদের প্রতি সামান্যও আকৃষ্ট হননি।

প্রিয়নবী (সাঃ)-এর উচ্চতম মর্যাদার কথা ঘোষণা

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চতম মর্যাদার ঘোষণা রয়েছে যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁর হেফাজত করা হয়েছে। যেহেতু তিনি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মদদপুষ্ট তাই তিনি ষড়যন্ত্রকারী কাফেরদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দেননি, এরশাদ হয়েছেঃ যদি আপনি তাদের প্রতি সামান্যও ঝুঁকে পড়তেন তবে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানেই আপনার শাস্তি হতো দ্বিগুণ, কেননা আপনার মর্তবা সর্বোচ্চে। তাই আপনার সামান্য ভুলও অনেক বড়।

ইমাম সাআলবী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অধিক পরিমাণে এই দোয়া পাঠ করতেন,

"হে আল্লাহ! ক্ষণিকের জন্যও আমাকে আমার প্রবৃত্তির হাতে সঁপে দিওনা। সর্বক্ষণ তোমার হেফাজতে আমাকে রাখ"।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম শক্তির কথা স্মরণ করে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া এবং শংকিত চিত্তে এ দোয়াটি পাঠ করা মোমেন মাত্রেরই একান্ত করণীয় কাজ।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, ضِعْفَ الْحَيٰوةِ শব্দ দ্বারা দুনিয়ার আযাবকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর ضِعْفَ الْمَمَاتِ শব্দ দ্বারা মৃত্যুর পরের আযাবকে

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-২১
তফসীর মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৪৬-৪৭

বোঝানো হয়েছে।[১]

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا

"আর তারাতো আপনাকে দেশ থেকে উৎখাত করার চেষ্টা চূড়ান্ত করেছিল, আপনাকে সেখান থেকে বহিস্কার করার লক্ষ্যে ষড়যন্ত্র করেছিল, যদি তা হতো তবে আপনার পরে তারাও সেখানে অল্প কালই টিকে থাকত"।

শানে নজুল

বায়হাকী দালায়েলে এবং এবনে আবি হাতেম শহর এবনে হাওসাব এবং আবদুর রহমান এবনে গণমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ইহুদীরা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলো, যদি আপনি নবী হন তাহলে সিরিয়া চলে যান, কেননা সিরিয়া হলো নবী রসূলগণের এলাকা, আর হাশরের ময়দানও হবে সিরিয়ায়। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের একথা সত্যায়িত করলেন এবং তাবুক তশরীফ নিয়ে গেলেন যা সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত। তাবুক গমনের উদ্দেশ্য ছিল সিরিয়া গমন করা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক পৌঁছলেন তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ

অর্থাৎ আর (হে রসূল!) তারা আপনাকে দেশ থেকে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল যদি তা হতো তবে আপনার পরে তারাও সেখানে অল্পকাল টিকে থাকতো।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াত মক্কার কাফেরদের উদ্দেশে নাজিল হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ হে নবী! মক্কার কাফেররা আপনাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে মক্কা থেকে বহিস্কারের প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে কিন্তু তাদের একথা জানা উচিত যে আপনার পরে তারাও বেশীদিন এ শহরে টিকতে পারবে না।

এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদীনা শরীফ হিজরত করেন, তখন ইহুদীরা তাঁকে হিংসা করে এবং মদীনা মুনাওয়্যারায় অবস্থানকে অপছন্দ করে, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে বলে, হে আবুল কাসেম! নবীগণ সিরিয়াতে প্রেরিত হয়েছেন আর তা হলো অত্যন্ত পবিত্র স্থান। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আবাসস্থল ছিল সিরিয়া। যদি আপনি সিরিয়া গমন করেন তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবো এবং আপনার অনুসরণ করবো। এরপর তারা আরো বলে, আপনি হয়তো রুমীদের ভয়ে সিরিয়া যেতে ইচ্ছুক নন, কিন্তু আপনি যদি সত্য রসূল হন তবে আল্লাহ পাক আপনাকে রক্ষা করবেন। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে জুলহোলায়ফা পর্যন্ত পৌঁছেন যাতে করে

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১০৯

সাহাবায়ে কেরাম তাঁর নিকট পৌঁছতে পারেন এবং তিনি তাঁদের নিয়ে সিরিয়া গমন করেন, এ উদ্দেশে যেন লোকেরা আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।[১]

পরে আল্লাহ পাকের হুকুম পেয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ প্রত্যাবর্তন করেন। জীব্রাঈল (আঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ পাকের নিকট থেকে কিছু চেয়ে নিন, কেননা প্রত্যেক নবীর একটি দোয়া অবশ্যই কবুল হয়, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জীব্রাঈল (আঃ)-কে বললেন, আমাকে পরামর্শ দিন আমি কি দোয়া করবো, তখন জীব্রাঈল (আঃ) বললেন আপনি বলুনঃ

قُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

আল্লামা বগভী (রঃ) কালবী (রঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা শরীফে আগমন করলেন, তখন ইহুদীরা তাঁকে কষ্ট দিতে লাগল এবং তারা তাঁকে বললো, আম্বিয়ায়ে কেরামতো সিরিয়ায় বাস করতেন, আপনিও সিরিয়ায় বাস করুন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে তিন মাইল দূরে জুলহোলায়েফা নামক স্থানে অবস্থান করেন যেন সাহাবায়ে কেরাম সেখানে সমবেত হন এবং সকলে একত্রিত হয়ে তাবুক বা সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হতে পারেন। তখন এ আয়াত নাজিল হয় এবং কাতাদা (রঃ)-এর মতে, এ আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর আয়াতে الارض শব্দটির দ্বারা মক্কাকে বোঝানো হয়েছে। আল্লামা বগভী (রঃ) উভয় বিবরণ পেশ করার পর লিখেছেনঃ মক্কাশরীফ সম্পর্কীয় মতটি অধিকতর সঠিক মনে হয়। কেননা ইতিপূর্বে মক্কাবাসীর অবস্থাই বর্ণিত হয়েছে, আর এ সূরাও মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতে কাফেরদের যে ষড়যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে, তারা শুধু মদীনা শরীফের ইহুদী নয় বা মক্কা শরীফের মুশরেকও নয়; বরং এর দ্বারা সকল কাফেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা জাযিরাতুল আরব থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উৎখাত করার চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেফাযত করেছেন।

وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا

"এমন অবস্থা হলে আপনার পর তারাও সেখানে অতি সামান্য সময়ই টিকতে পারবে"।

অর্থাৎ যদি এ কাফেররা আপনাকে মক্কা শরীফ থেকে বের করতো, অথবা ইহুদীরা

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-২৩

আপনাকে মদীনা শরীফ থেকে বের করতো, তবে তারা সেখানে দীর্ঘদিন টিকতে পারত না। কেননা আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সেখান থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতেন।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের এ ভবিষ্যদ্বাণী অবশেষে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছে। মক্কার মুশরেকরা সুদীর্ঘ তেরটি বছর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করেছে এবং তাঁকে মক্কা শরীফ থেকে বহিঃস্কারের অনেক ষড়যন্ত্র করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ পাক তাঁর হেফাজত করেছেন। অবশেষে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ মোতাবেক তিনি মক্কাশরীফ থেকে হিজরত করেছেন এবং এর দেড় বছরের মধ্যেই মক্কার পৌত্তলিক নেতারা বদর রণাঙ্গণে নিহত হয়।

এদিকে মদীনা শরীফে ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে সর্বক্ষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। তাই আল্লাহ্ পাকের হুকুমে ইহুদী গোত্র বণী কুরায়জাকে খন্দকের যুদ্ধের পর হত্যা করা হয়। অপর ইহুদী গোত্র বণী নজীরকে মদীনা শরীফ থেকে বহিঃস্কার করা হয়। হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলে ইহুদীদেরকে খায়বর থেকেও বহিস্কার করা হয়। এভাবে সমগ্র জাযিরাতুল আরব থেকে সকল কাফেরকে বের করে দেয়া হয়।

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا

"হে রসূল!) আপনার পূর্বে যে রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, এটিই ছিল তাদের ব্যাপারে চিরাচরিত নিয়ম, আর আমার নিয়মে কোন পার্থক্য পাবেন না"।

অর্থাৎ ইতিপূর্বে যে আম্বিয়ায়ে কেরাম পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম কার্যকর ছিল যে, যে সম্প্রদায় বা যে এলাকাবাসী তাদের নিকট প্রেরিত নবীকে বহিঃস্কার করেছে, আল্লাহ্ পাক সে সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর যেহেতু আপনিও আল্লাহর নবী, তাই যদি আপনার সঙ্গে তারা এ ব্যবহার করে তবে আল্লাহ্ পাক তাদেরকেও ধ্বংস করে দেবেন। আলোচ্য আয়াতে تحويلا শব্দের অর্থ পরিবর্তন অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের চিরাচরিত নিয়মে কোন পরিবর্তন নেই।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১০৯-১০
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৪৭

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَ
قُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۭ إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴿٧٨﴾ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ
نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿٧٩﴾ وَقُلْ رَّبِّ أَدْخِلْنِيْ
مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ
سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿٨٠﴾ وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۭ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ
زَهُوْقًا ﴿٨١﴾ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا
يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَ
نَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوْسًا ﴿٨٣﴾ قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ۭ
فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿٨٤﴾

তরজমা

(৭৮) সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামাজ কায়েম কর এবং কায়েম কর ফজরের নামাজ। নিশ্চয় ফজরের নামাজ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

(৭৯) আর (হে রসূল!) রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করুন, এটি আপনার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় আপনার প্রতিপালক অচিরেই আপনাকে 'মাকামে মাহমুদে' প্রতিষ্ঠিত করবেন।

(৮০) (হে রসূল!) বলুন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সাথে এবং আমাকে নিষ্ক্রান্ত করাও কল্যাণের সাথে এবং আমাকে দান কর তোমার তরফ থেকে ক্ষমতা'।

(৮১) (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিদায় নিয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিদায় নেয়ারই যোগ্য।

(৮২) আর আমি কোরআন থেকে রোগের নিরাময় এবং মোমেনদের জন্যে রহমত বিতরণ করি কিন্তু তা পাপীষ্ঠদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

(৮৩) আর আমি যখন মানুষকে নেয়ামত দান করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পাশ কেটে চলে, আর যখন তাকে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করে তখন সে একেবারে নিরাশ

হয়ে বসে পড়ে।

(৮৪) (হে রসূল!) আপনি বলুন, প্রত্যেকেই তার নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে। এবং আপনার প্রতিপালক খুব ভাল করেই জানেন কে সর্বোত্তম পথে রয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়তের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের শত্রুতার কথা ছিল। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক আদেশ দিয়েছেন, (হে রসূল!) আপনি আল্লাহ পাকের এবাদতে মশগুল থাকুন। কাফেরদের শত্রুতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না, আল্লাহ পাক আপনার সাহায্যকারী। সকল এবাদতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো নামাজ। এজন্যে সর্ব প্রথম নামাজের তাগিদ করা হয়েছে এবং সবশেষে তাহাজ্জুদের নামাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ নির্দেশ সাধারণের জন্যে নয়; বরং বিশেষ ব্যক্তিদের জন্যে। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মাকামে মাহমুদ প্রদানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যা তাহাজ্জুদের অন্যতম বরকত।

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ

"তোমরা সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় থেকে নামাজ কায়েম কর"।

আলোচ্য আয়াতের دلوك শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ), হযরত যাবের (রাঃ), তফসীরকার কাতাদা (রঃ), আতা (রঃ), হাসান বসরী (রঃ) সহ অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরামের মতে, এ শব্দটির অর্থ সূর্য ঢলে যাওয়া।

এবনে মরদবিয়া (রঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও শব্দটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস যা এছহাক এবনে রাহবিয়া তাঁর মসনদে, আর এবনে মরদবিয়া তাঁর তফসীরে এবং বায়হাকী আল মা'রেফাতে এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জীব্রাইল (আঃ) সূর্যের دلوكএর সময় যখন সূর্য ঢলে গিয়েছিল, তখন আমার নিকট আসেন এবং আমাকে জোহরের নামাজ আদায় করান। অন্য একদল তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরামের মতে دلوك অর্থ হলো সূর্য অস্ত যাওয়া। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এ মতই পোষণ করেছেন।

ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ), এবনে হাব্বান (রাঃ), যাহ্যাক (রাঃ) এবং সুদ্দীও (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন।

دلوك শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো ঝুঁকে যাওয়া, অর্থাৎ কোন জিনিস কোন একদিকে ঝুঁকে যাওয়া। এ ব্যাখ্যার আলোকে সূর্য ঢলে যাওয়া এবং ঝুঁকে যাওয়া-উভয় অবস্থায়ই ঝুঁকে যাওয়ার মর্ম পাওয়া যায়। আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ কামুসে রয়েছেঃ

دلكت الشمس دلوكا

অর্থাৎ সূর্য ডুবে গেছে এবং মধ্য আসমান থেকে ঢলে গেছে।

আল্লামা বয়জাবী (রঃ) লিখেছেন যে, এ শব্দটির মধ্যে পরিবর্তন বা বদল হওয়ার মর্ম পাওয়া যায়। دلك শব্দটি মর্দন করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেননা যে মর্দন করে তার হাত এক স্থানে থাকেনা। তাই অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম دلك শব্দটির অর্থ বলেন, সূর্য ঢলে যাওয়া।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ যদি শব্দটির অর্থ সূর্য ঢলে যাওয়া গ্রহণ করা হয়, তবে আলোচ্য আয়াতে পাঁচটি নামাজের কথা এসে যায়। সূর্য ঢলে যাওয়া থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত জোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং 'কোরআনুল ফজর' তথা ফজরের নামাজ- এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের তাগিদ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে।

قُرْاٰنَ الْفَجْرِ

যেহেতু পবিত্র কোরআন পাঠ নামাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাই 'কোরআনুল ফজর' বলে ফজরের নামাজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

"নিশ্চয় ফজর ফেরেশতাদের উপস্থিতির সময়"।

ফজরের নামাজের সময় দিন এবং রাতের ফেরেশতাগণ একত্রিত হয়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি নিজে শ্রবণ করেছি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, জামাআতে নামাজ একা নামাজের চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশী ফজিলত রাখে, আর ফজরের নামাজের সময় রাতের ফেরেশতা এবং দিনের ফেরেশতা একত্রিত হয়। এই হাদীস বর্ণনা করার পর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বললেন, যদি তোমরা এর প্রমাণ দেখতে চাও তবে পবিত্র কোরআনের এ আয়াত দেখ। তখন তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন। (বোখারী শরীফ)

ইমাম বয়জাবী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে ফজরের নামাজকে مشهود বলে আখ্যায়িত করার একাধিক কারণ রয়েছে। ফজরের সময় আল্লাহ পাকের কুদরতের বহিঃপ্রকাশ হয়। আঁধার কেটে যায়, আলো দেখা যায়, ঘুম ভেঙ্গে যায়। তার স্থলে জাগরণ আসে। অথবা এর কারণ হলো, তখন অনেক নামাজী একত্রিত হয় অথবা এ শব্দ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, অধিক পরিমাণে মুসল্লীদের এই জামাআতে শামিল হওয়া উচিত।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১১২

এবনে জরীরে সংকলিত একখানি হাদীসে একথাও রয়েছে যে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়, আছে কি কেউ যে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে? যাকে আমি ক্ষমা করবো? আছে কি কেউ যে আমার কাছে কিছু চায়, যাকে আমি কিছু দান করি? আছে কি কেউ যে আমার নিকট দোয়া করে, আমি তার দোয়া কবুল করি? এতে একথা প্রমাণিত হয় যে ফজর দোয়া কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময়।[১]

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ

(আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করুন।)

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ফরজের পর কোন্ নামাজ উত্তম? তিনি এরশাদ করেনঃ রাতের নামাজ, যাকে তাহাজ্জুদ বলা হয় (যা কিছু পরিমাণ নিদ্রার পর আদায় করা হয়)।

হাদীস শরীফে একথাও বর্ণিত হয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদত মোবারক ছিল যে তিনি কিছু সময় নিদ্রিত হওয়ার পর উঠে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতেন। অবশ্য হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, যে নামাজ এশার নামাজের পরে হয়, তা-ই তাহাজ্জুদ।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হয়তো এর দ্বারা এ অর্থ হবে, যে নামাজ কিছুক্ষণ নিদ্রার পরে হয়।

نَافِلَةً لَّكَ — এটি হলো আপনার জন্যে অতিরিক্ত কর্তব্য।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তাহাজ্জুদের নামাজ শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপরই ফরজ ছিল।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ একথাও বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ বৈশিষ্ট্যর কারণ হলো, আল্লাহ পাক তাঁর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদের নামাজের বরকতে তাঁর উম্মতের গুণাহ সমূহ মাফ হয়।[২]

আল্লামা কান্দলভী (রঃ) লিখেছেনঃ ইসলামের শুরুতে তাহাজ্জুদ সকলের উপরই ফরজ ছিল। পরে উম্মতের উপর থেকে এ ফরজ রহিত হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে দু'টি কথা আছে (১) এটি তাঁর জন্যে বিশেষ ফরজ ছিল। (২) তাঁর জন্যে ফরজ ছিলনা তবে তাঁর উচ্চ মর্তবা এবং বিশেষ ফজিলতের উপকরণ ছিল।[৩]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) তাঁর তফসীরে মাজহারীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৬১
২। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৩০
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৬১
৩। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৫০

আলোচনা করেছেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, 'তাহাজ্জুদ' শব্দটি জাগ্রত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাই এ নামাজ জাগ্রত হওয়ার পরে হবে, অতএব সারারাত জাগ্রত হওয়া এবং নামাজ পড়ার নাম তাহাজ্জুদ নয়। আল্লামা বগভীর একথার উদ্ধৃতি দেয়ার পর আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, তাহাজ্জুদ শব্দটির মর্ম হলো নামাজের জন্যে নিদ্রা পরিত্যাগ করা। এর তিনটি পন্থা হতে পারে (১) সারা রাত নিদ্রিত না হওয়া এবং নামাজ আদায় করতে থাকা। (২) রাতের প্রারম্ভে জাগ্রত থেকে নামাজ আদায় করা (৩) রাতের শুরুতে ঘুমিয়ে থাকা ও পরে জাগ্রত হয়ে নামাজ পড়া।

হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত রসূলুল্লাহ আল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে রোযা পালন করেছিলাম। তিনি রাতে আমাদের উঠিয়ে নামাজ আদায় করাননি। কিন্তু রমজানের শেষ দশকে যখন সাত রাত অবশিষ্ট ছিল, তখন তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামাজে দণ্ডায়মান হন এবং রাতের এক তৃতীয়াংশ তাতে অতিবাহিত হয়। এর পরবর্তী রাতে তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামাজে দণ্ডায়মান হন এবং অধিক রাত তাতে অতিবাহিত হয়। আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি আমাদেরকে সারা রাত এ নফল আদায়ের হুকুম করতেন, তখন তিনি এরশাদ করলেন, যখন মানুষ ইমামের সাথে নামাজ আদায় করে প্রত্যাবর্তন করে তখন সারা রাত এবাদত করার সওয়াব তার জন্যে লিপিবদ্ধ হয়। এ পর্যায়ে চতুর্থ রাত যখন আসলো তখন তিনি আমাদেরকে নামাজ পড়াননি। এভাবে প্রত্যেক মাসে তিন রাতের বিধান রয়ে গেল। যখন তৃতীয় রাত আসলো, তখন বাড়ীর সমস্ত লোকদেরকে, স্ত্রীগণকে একত্রিত করলেন এবং আমাদেরকে নিয়ে নামাজের জন্যে দণ্ডায়ান হন। (আর ঐ নামাজ এত সুদীর্ঘ ছিল যে) আমাদের সাফল্য বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিল। বর্ণনাকারী আবু জর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, এ পর্যায়ে সাফল্য হওয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন, সেহরী (অর্থাৎ নামাজ এত সুদীর্ঘ হতো যে সেহরীর সময় শেষ হওয়ার আশংকা হতো)। এরপর দু' রাত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করাননি।

সায়েব এবনে এজীদ বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) এবং হযরত তমীমে দারী (রাঃ)-কে আদেশ দিয়েছিলেন যে, লোকদেরকে নিয়ে এগারো রাকাআত নামাজ যেন আদায় করা হয় (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)।

কোন কোন তত্বজ্ঞানী বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি তাহাজ্জুদ সর্বদাই ওয়াজিব ছিল। কখনও রহিত হয়নি। উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার জন্য তিনটি বিষয় ফরজ কিন্তু তোমাদের জন্যে সুন্নত (১) বেতের (২) মেছওয়াক (৩) রাতের নামাজ (তাহাজ্জুদ)।

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, তাহাজ্জুদের নামাজ বাড়তি কর্তব্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যেই, উম্মতের জন্যে বাড়তি কর্তব্য নয়, কেননা উম্মত গুনাহগার, আর গুনাহ মাফ করার জন্যে চাই নফল এবাদত। কিন্তু প্রিয়নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যেহেতু কোন গুনাহ নেই, তাই তাঁর জন্যে এটি বাড়তি কর্তব্য।[১]

তাহাজ্জুদের নামাজ প্রিয়নবী সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে নফল বা বাড়তি কর্তব্য, একথার প্রমাণ পাওয়া যায় হযরত মগীরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস থেকে। তিনি বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এত অধিক পরিমাণে দণ্ডায়মান থাকতেন যে তাঁর কদম মোবারকে রস জমে যেত, কদম মোবারক ফুলে যেত। তাঁর খেদমতে আরজ করা হয়, আপনার পূর্বাপর সব কিছু আল্লাহ পাক মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এত কষ্টের কি প্রয়োজন? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জবাব দিয়েছেন, আমি কি আল্লাহ পাকের শোকর গুজার বন্দা হবো না? এ পর্যায়ে তিনি একথা বলেননি যে আমার উপর রাত্রের নামাজ ফরজ ।

মাছআলা

উম্মতের জন্যে তাহাজ্জুদের নামাজ সুন্নতে মোয়াক্কাদা। কেননা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বদা এ নামাজ আদায় করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এক ব্যক্তির আলোচনা হয় এবং বর্ণনা করা হয় যে সে সকাল পর্যন্ত নিদ্রিত থাকে। তাহাজ্জুদের নামাজের জন্যে ওঠেনা, তখন তিনি এরশাদ করেনঃ তার কানে শয়তান প্রস্রাব করে দিয়েছে।

যদি তাহাজ্জুদের নামাজ সুন্নতে মোয়াক্কাদা না হতো তবে এ নামাজ পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে এমন কঠোর মন্তব্য করা হতো না।

প্রিয়নবী (সাঃ)-এর তাহাজ্জুদ নামাজের বিবরণ

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রমজান এবং রমজান ব্যতীত সকল সময়েই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতের নামাজ এগারো রাকাআতের বেশী আদায় করতেন না। প্রথম চার রাকাআতের সৌন্দর্য এবং দৈর্ঘ কল্পনাতীত। এরপরের চার রাকাআতের সৌন্দর্য এবং দৈর্ঘও বর্ণনাতীত। এরপর তিনি তিন রাকাআত আদায় করতেন। আমি আরয করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! বেতের আদায়ের পূর্বে কি আপনি নিদ্রিত হয়ে পড়েন? তিনি এরশাদ করেনঃ আয়েশা! আমার চক্ষু নিদ্রিত হয়, অন্তর নয়। (বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এশার নামাজ শেষ করার পর ফজর পর্যন্ত রাতে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এগারো রাকাআত নামাজ আদায় করতেন, প্রত্যেক দু' রাকাআতের পর সালাম ফেরাতেন। আর অবশেষে এক রাকাআত আদায় করতেন, তিনি দু' সেজদা করতেন, আর এতে এতো সময় অতিবাহিত করতেন

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৩০

যে, কোন লোক পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করতে পারতো। আর মোয়াজ্জেন ফজরের আযান দিয়ে যখন নীরব হতেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু' রাকাআত সংক্ষিপ্ত নামাজ আদায় করতেন। এরপর তিনি ডান কাতে শায়িত হতেন, যখন মোয়াজ্জেন এসে নামাজের খবর দিতো, তখন তিনি নামাজের জন্যে তশরীফ নিয়ে যেতেন। (বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা যখনই ইচ্ছা করতাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রাত্রের নামাজ আদায়রত অবস্থায় দেখতে, তখনই দেখতে পেতাম (তিনি রাত্রে নামাজ আদায় করতেন এবং নিদ্রিতও হতেন)। আর হযরত আনাস (রাঃ) থেকে এ-ও বর্ণিত আছে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন মাসে এতো রোযা রাখতেন যে আমরা ধারণা করতাম যে এ মাসে হয়তো আর রোযা বাদ দেবেন না। আর কোন কোন মাসে রোযা থেকে এতো বিরত থাকতেন যে আমরা মনে করতাম এ মাসে আর রোযা রাখবেন না। (নেসায়ী শরীফ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রে তের রাকাআত নামাজ আদায় করতেন, তাতে বেতের ও ফজরের দু' রাকাআত অন্তর্ভুক্ত থাকত।

হরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তোমাদের কেউ রাতের নামাজের ইচ্ছা করলে প্রথম হালকা দু' রাকাআত দিয়ে শুরু করবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি এক রাত্রে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গৃহে নিদ্রিত হই, (আমি লক্ষ্য করি যে) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হয়ে মেসওয়াক করলেন, এরপর إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন, এরপর (অযু করে) নামাজে দণ্ডায়মান হলেন এবং দু' রাকাআত নামাজ আদায় করলেন। যাতে দণ্ডায়মান অবস্থা, রুকু, সেজদা অনেক সুদীর্ঘ ছিল, এরপর নামাজ শেষ করে তিনি নিদ্রিত হলেন। (এই নিদ্রা এতো গভীর ছিল) যে তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দ শ্রুত হতে লাগলো। এরপর উঠে পুনরায় নামাজ আদায় করলেন। এভাবে তিনবারে ছয় রাকাআত হলো। প্রত্যেকবার উঠে মেসওয়াক করতেন, অজুও করতেন এবং উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করতেন। সবশেষে তিন রাকাআত বেতের নামাজ আদায় করতেন। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে, যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারক ভারী হয়ে গেলো, তখন তিনি রাতের নামাজ অনেক সময় বসে আদায় করতেন।

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রাতের নামাজ আদায় করতে দেখেছি। তিনি সর্বপ্রথম তিনবার আল্লাহু আকবার বললেন, এরপর

ذوالملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة

পাঠ করলেন, এরপর নামাজ শুরু করলেন এবং সূরা বাকারা পাঠ করলেন, এরপর রুকু করলেন, যতক্ষণ দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলেন প্রায় ততক্ষণই রুকুতে ছিলেন, এ সময় তিনি পাঠ করেন لربى الحمد এরপর সেজদা করলেন এবং দাঁড়ানো অবস্থার সমান সুদীর্ঘ সেজদা করলেন, এরপর সেজদা থেকে মাথা মুবারক তুললেন আর দু' সেজদার মধ্যে সেজদার সমান সময় উপবিষ্ট রইলেন, সেজদা অবস্থায় سبحان ربى الاعلى পাঠ করছিলেন। উভয় সেজদার মধ্যে উপবিষ্ট অবস্থায় পাঠ করেছেন, رب اغفر لى رب اغفرلى।এভাবে চার রাকাআত আদায় করেছেন, এ রাকাআত সমূহে তিনি সূরা বাকারা, সূরা আলে-এমরান, সূরা নিসা ও সূরা মায়েদা অথবা সূরা আল আনআম পাঠ করেন। (আবু দাউদ শরীফ)

হযরত আবু জর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওয়াসাল্লাম রাতে নামাজে দণ্ডায়মান অবস্থায় ফযর পর্যন্ত এই একখানি আয়াত তেলাওয়াত করতে থাকেন। সূরা মায়েদার এ আয়াতখানি হলোঃ

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যতক্ষণ নিদ্রিত থাকতেন ততক্ষণ সময় নামাজেও অতিবাহিত করতেন। এরপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতেন, পুনরায় নামাজ আদায় করতেন, আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতেন, এভাবে সকাল হতো। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

তফসীরকারগণ বলেছেন, যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মর্যাদা সর্বোচ্চে, তাই তাঁকে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায়ের এবং পবিত্র কোরআন পাঠের এ বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাঁর এ উচ্চতম মর্যাদা যেমন দুনিয়াতে সুপ্রতিষ্ঠিত, তেমনি তা আখেরাতেও রয়েছে সুরক্ষিত। এজন্যে পরবর্তী আয়াত এরশাদ হয়েছেঃ

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا

"অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে "মাকামে মাহমুদে" সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন"।

মাকামে মাহমুদ

মাকামে মাহমুদ (প্রশংসিত স্থান) কি? এর জবাব সংক্ষেপে দেয়া যায়। এ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ শাফাআতের স্থান, কেয়ামতের দিন যখন আম্বিয়ায়ে কেরাম পর্যন্ত অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবেন, তখন আল্লাহ পাকের দরবারে আরজী পেশ করার সাহস কারোই থাকবেনা। ঐ কঠিনতম সংকটময় মুহূর্তে সমগ্র মানব জাতির পক্ষে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করার অনুমতি লাভ করবেন একমাত্র আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। সেদিন সকলেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন, এমনকি স্বয়ং আল্লাহ পাকও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করবেন। এটিই মাকামে মাহমুদ। আর এটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লামেরই বৈশিষ্ট্য।

(মাকামে মাহমুদ) এমন অবস্থান যার প্রশংসা করবে পূর্বাপর সকলে। আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বন্ধু বানিয়েছিলেন আর তোমাদের সাথী আল্লাহর বন্ধু, আল্লাহ পাকের দরবারে সর্বাধিক সম্মানিত, এরপর তিনি (আলোচ্য) এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আল্লাহ পাক তাঁকে আরশের উপর বসিয়ে নেবেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক তাঁকে কুরসীর উপর বসিয়ে দেবেন। প্রথম বর্ণনা দ্বারা মনে হয় মাকামে মাহমুদ হলো আরশ, আর দ্বিতীয় বর্ণনা দ্বারা মনে হয় মাকামে মাহমুদ হলো কুরসী তবে এ পর্যায়ে সঠিক মত হলো মাকামে মাহমুদ দ্বারা সে স্থানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যেখান থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শাফাআত করবেন।

আহমদ, এবনে আবি হাতেম এবং তিরমিযী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) সংকলিত হাদীস সংকলন করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মাকামে মাহমুদ হলো সে স্থান, সেখানে আমি আমার উম্মতের জন্যে সুপারিশ করবো।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন মুসলমানদের এ আকাংক্ষা হবে, যদি তাদের জন্যে কেউ সুপারিশ করতো এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে রক্ষা করতেন, তাই লোকেরা হযরত আদম (আঃ)-এর কাছে এসে আরজ করবেঃ আপনি আমাদের আদি পিতা, আল্লাহ পাক আপনাকে স্বহস্ত মোবারকে তৈরী করেছেন এবং জান্নাতে আপনাকে স্থান দিয়েছেন আর ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সেজদা করিয়েছেন, আমাদেরকে এ স্থান থেকে রেহাই দেয়ার ব্যবস্থা করুন। আদম (আঃ) বলবেন, আমি এমন অবস্থায় নেই যে, তোমাদের উপকার করতে পারি, নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার অপরাধ আমার দ্বারা হয়েছে তা স্মরণ হয়েছে, তোমরা নূহ (আঃ)-এর নিকট যাও, (তুফানের পর) তিনি পয়গম্বর ছিলেন, যাঁকে আল্লাহ পাক বিশ্ববাসীর হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছেন। লোকেরা হযরত নূহ (আঃ)-এর নিকট গমন করবে, হযরত নূহ (আঃ) বলবেন, আমি এ অবস্থায় নেই যে, তোমাদের জন্যে সুপারিশ করতে পারি। আমার সে অপরাধের কথা স্মরণে আছে যে আমার পুত্রের নাজাতের জন্যে আমি দরখাস্ত করেছিলাম। তখন তিনি বলবেনঃ তোমরা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ'র নিকট যাও। লোকেরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকটু যাবে, তিনি বলবেন আমি এ অবস্থানে নেই যে, তোমাদের জন্যে সুপারিশ করতে পারি। তিনি তাঁর সে কথাগুলো স্মরণ করবেন যা তাঁর জবান থেকে বের হয়েছিলো, মিশরের বাদশাহর নিকট তিনি হযরত সারাকে তাঁর নিজের বোন বলেছিলেন। দ্বিতীয়ত যখন তাঁর সম্প্রদায়ের

লোকেরা মেলায় অংশগ্রহণ করতে বলেছিল তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমি অসুস্থ'। মূর্তিগুলোকে তিনি নিজেই ভেঙ্গেছিলেন, যখন তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, কে মূর্তি ভেঙ্গেছে? তার জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের বড় মূর্তিটিকে জিজ্ঞাসা কর'। অতএব, তোমরা মুসা (আঃ)-এর নিকট যাও, আল্লাহ্ পাক তাঁকে তৌরাত দান করেছেন; তাঁর সাথে কথা বলেছেন এবং তাঁকে নৈকট্য-ধন্য করে সম্বোধন করেছেন। লোকেরা মুসা (আঃ)-এর কাছে যাবে। তিনি বলবেন আমি এ অবস্থানে নেই যে, সুপারিশ করতে পারি। তাঁর সেই ভুলের কথা মনে হবে যে তিনি ভুলক্রমে একজন মানুষকে হত্যা করেছিলেন। তিনি বলবেন, তোমরা ঈসার (আঃ) নিকট যাও, তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ, রসূলুল্লাহ, রুহুল্লাহ এবং কালেমাতুল্লাহ। তখন লোকেরা ঈসা (আঃ)-এর নিকট যাবে, তিনি বলবেন আমি এ অবস্থানে নেই যে, তোমাদের জন্যে সুপারিশ করতে পারি। তোমরা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যাও, তাঁর পূর্বাপর সবকিছু আল্লাহ্ পাক মাফ করে দিয়েছেন। লোকেরা তখন আমার নিকট আসবে, আমি তখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করবো। অনুমতি লাভের পর হাযির হবো, যখনই তাঁর দীদার নসীব হবে ঠিক তখনই আমি সেজদায় পড়ে যাব। আর যতক্ষণ আল্লাহ্ পাকের মর্জি হবে ততক্ষণ আমি সেজদায় পড়ে থাকব, এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! মাথা উত্তোলন করুন, যা কিছু বক্তব্য আছে পেশ করুন, আপনার কথা শ্রবণ করা হবে, যা কিছু চাওয়ার আছে প্রার্থনা করুন, মঞ্জুর করা হবে। এরপর আমি সেজদা থেকে মাথা তুলবো এবং আমার প্রতিপালকের হামদ পেশ করবো যা তিনি আমাকে শিক্ষা দেবেন। এরপর আমি শাফাআত করবো, আল্লাহ্ পাক আমার জন্যে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেবেন অর্থাৎ নির্দিষ্ট লোকের নাজাতের আদেশ দেবেন। আমি তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে জান্নাতে পৌঁছে দেবো। এরপর ফিরে এসে পুনরায় দরবারে এলাহীতে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করবো, আমাকে অনুমতি দান করা হবে। আমি তখন দরবারে হাযির হবো। এরপর যখন দীদার নসীব হবে তখন আমি অনতিবিলম্বে সেজদায় পড়ে যাব আর যতক্ষণ আল্লাহ্ পাকের মর্জি হবে ততক্ষণ সেজদায় পড়ে থাকব। এরপর আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! মাথা উত্তোলন করুন এবং স্বীয় উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন, আপনার কথা শ্রবণ করা হবে, সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে, আরজী পেশ করুন আপনার আরজী কবুল করা হবে। আমি তখন মাথা তুলব এবং আল্লাহ্ পাক যেভাবে আমাকে শিক্ষা দেবেন, সেভাবেই আমি তাঁর প্রশংসা করবো। এরপর আমি সুপারিশ করবো, তখন আল্লাহ্ পাক আমার জন্যে একটি সীমা নির্ধারণ করে দেবেন, আমি দরবারে এলাহী থেকে বিদায় হয়ে এসে তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে জান্নাতে পৌঁছে দেবো।

তৃতীয়বার আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হওয়া, সেজদায় পড়ে থাকা, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে সম্বোধন করা, সেজদা থেকে মাথা উত্তোলন করে আল্লাহ্ পাকের হাম্‌দ পেশ করা, বন্দীদের নির্দিষ্ট সংখ্যাকে রেহাই দেয়ার হুকুম লাভ করা এবং দোযখ থেকে

তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়ার কথা এই হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, যাদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে তারা চিরদিন দোযখে থাকবে, তাদের ব্যতীত আর কেউ দোযখে থাকবেনা।

এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (আলোচ্য) এ আয়াত তেলাওয়াত করেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত শাফাআত সম্পর্কীয় হাদীস সংকলিত হয়েছে। তার বিবরণ এভাবে রয়েছে, আমি আমার প্রতিপালকের দরবারে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করবো, তখন আমাকে অনুমতি দেয়া হবে, আর আল্লাহ পাক আমার অন্তরে কয়েকটি প্রশংসা সূচক বাক্য এলকা করবেন, যা দ্বারা আমি স্বীয় প্রতিপালকের শানে হাম্‌দ পেশ করবো। ঐ শব্দগুলো এখন আমার জানা নেই। হাম্‌দ পেশ করার পর আমি সেজদায় পড়ে যাব। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! মাথা তুলুন যা আরজী আছে পেশ করুন। আপনার কথা শ্রবণ করা হবে, প্রার্থনা করুন, আপনাকে প্রদান করা হবে। শাফাআত করুন, আপনার শাফাআত কবুল করা হবে। আমি আরজ করবো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত! আমার উম্মত'! হুকুম হবে যাও, 'যার অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমান হবে তাকে দোযখ থেকে বের করে আন'। আমি এ হুকুম পালন করবো। এরপর পূর্বের ন্যায় আল্লাহ পাকের শানে হামদ পেশ করবো। এরপর আমি সেজদায় পড়ে যাব। তখন হুকুম হবে সে ব্যক্তিকেও দোযখ থেকে বের করে আন যার অন্তরে কণা মাত্র ঈমান আছে। আমি তাই করবো। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তৃতীয়বার এবং চতুর্থবার দরবারে হাযিরী দিয়ে শাফাআতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, আমি আরজ করবো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সে সব লোকদেরকে দোযখ থেকে বের করার অনুমতি দান করুন, যারা কলেমায়ে তৈয়্যেবায় বিশ্বাসী ছিল'। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, 'আমার সম্মান এবং উচ্চ মর্তবা ও শ্রেষ্ঠত্বের শপথ! যে কেউ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ কথাটির প্রতি বিশ্বাসী হবে, আমি অবশ্যই তাকে দোযখ থেকে বের করবো'।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে লোকেরা দ্রুত এদিক সেদিক দৌড়াতে থাকবে, প্রত্যেক উম্মত তার নবীর পেছনে থাকবে এবং শাফাআতের আবেদন করবে। অবশেষে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শাফাআতের অনুমতি দেয়া হবে। এটিই হলো একথার তাৎপর্য যে, আল্লাহ পাক তাঁকে মাকামে মাহমুদে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, সূর্য এত নিকটে আসবে যে গরমের কারণে শরীরের ঘাম কান পর্যন্ত পৌঁছবে। আর সে অবস্থায় লোকেরা হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট ফরিয়াদ করবে, তিনি বলবেন, আমার এ এখতিয়ার নেই। অবশেষে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট সকলে আসবে এবং তিনি শাফাআত করবেন।

বাজ্জার এবং বায়হাকী হযরত হোজায়ফা (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক সমগ্র মানব জাতিকে একটি ময়দানে একত্রিত করবেন (কিন্তু) কেউ কারো সঙ্গে কথা বলবেনা, সর্বপ্রথম হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ডাকা হবে, তিনি জবাব দেবেনঃ

لبيك وسعديك

"আমি হাযির, আর আমি হাযির হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করছি"।

والخير فى يديك واشر ليس اليك

"সকল কল্যাণ তোমারই হাতে, তোমার সাথে কোন অকল্যাণের সম্পর্ক নেই"।

والمهدى من هديت وعبدك بين يديك

"সে ব্যক্তি হেদায়েত প্রাপ্ত, যাকে তুমি হেদায়েত করেছ, তোমার বন্দা তোমার সম্মুখে উপস্থিত"।

وبك واليك لا منجاء منك الا اليك

"আর তোমারই কারণে সে অস্তিত্ব লাভ করেছে, আর তোমারই নিকট তার প্রত্যাবর্তন"।

অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি জগত তোমার ইচ্ছাতেই অস্তিত্ব লাভ করেছে, আর তোমারই নিকট তাকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছে, তোমার নিকট থেকে কেউ পলায়ন করতে পারেনা। একমাত্র প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট।

تباركت وتعاليت رب البيت

"হে কা'বার মালিক! তুমি বরকতময় এবং সবচেয়ে উচ্চতম"।

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শাফাআত করবেন। এটি সে অবস্থান যে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করেছেন। তিরমিযী, এবনে খোযায়মা এবং এবনে মরদবিয়া হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'আমি আদম সন্তানদের সর্দার, এ কথায় কোন গর্ব নেই। (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ্ পাকের হাম্দের পতাকা আমার হাতেই থাকবে, আর একথায় কোন গর্ব নেই। সেদিন আদম (আঃ) সহ প্রত্যেক নবী আমার পতাকা তলে থাকবেন। জমীন যখন ফেটে যাবে তখন সর্ব প্রথম আমি বের হয়ে আসবো, আর এ কথায় কোন গর্ব নেই। (সেদিন) মানুষের উপর তিনটি ভয়ের অবস্থা হবে, মানুষ আদম (আঃ)-এর নিকট যাবে এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে সুপারিশ করার জন্যে তাঁর নিকট আবেদন করবে এবং বলবে আপনি আমাদের পিতা, আমাদের জন্যে সুপারিশ করুন। হযরত আদম (আঃ) জবাব দেবেন, আমি একটি বড় অপরাধ করেছি, যে জন্যে আমাকে পৃথিবীতে অবতরণ করানো হয়, তোমরা নূহের (আঃ)

নিকট যাও, সকল লোক নূহের (আঃ) নিকট যাবে। তিনি জবাব দেবেন, আমি জমিনের সকল অধিবাসীর জন্যে বদদোয়া করেছিলাম, আমার বদদোয়ায় তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে, তোমরা ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট যাও। লোকেরা ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট যাবে। তিনি বলবেন, 'আমি তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলাম' (এ স্থলে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তিনি কোন মিথ্যা কথা বলেননি, বস্তুতঃ তাঁর কথা ছিল মিথ্যার আকারে, যার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দ্বীনের হেফাজত)। যাহোক, তোমরা মুসার নিকট যাও। মুসা (আঃ) বলবেন, আমি এক ব্যক্তিকে নিতান্ত অজান্তে হত্যা করেছিলাম, তোমরা ঈসা (আঃ)-এর নিকট যাও। ঈসা (আঃ) বলবেন, আমার তো অবস্থা এই যে আল্লাহ ব্যতীত আমার উপাসনা করা হয় (পৃথিবী থেকে আমার বিদায়ের পর লোকেরা আমাকে উপাস্য বানিয়ে ফেলেছে), তোমরা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যাও। তখন লোকেরা আমার নিকট আসবে, আমি তাদের সাথে যাব এবং জান্নাতের দ্বারে করাঘাত করবো। জিজ্ঞাসা করা হবে, কে? আমি বলবো, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম), তখন জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে। ফেরেশতাগণ বলবে, মারহাবা। আমি তখন সেজদায় পড়ে যাব, তখন আল্লাহ পাক আমার অন্তরের মধ্যে হাম্‌দ, সানা এলকা করবেন, আর হুকুম হবে মাথা উত্তোলন করুন, আরজী পেশ করুন, আরজী কবুল করা হবে। শাফায়াত করুন, শাফাআত কবুল করা হবে। মনের কথা পেশ করুন, আপনার কথা শ্রবণ করা হবে। বস্তুতঃ এটিই হলো 'মাকামে মাহমুদ'।

আল্লামা কুরতবী বলেছেন, আমার ধারণায় তিনটি ভয় তখন হবে, যখন দোযখকে লাগাম দিয়ে টেনে আনা হবে এবং লোকেরা তা দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে।

এবনে খোযায়মা এবং তেবরানী হযরত সালমান (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কেয়ামতের দিন সূর্যকে দশ বছরের তাপ দিয়ে দেয়া হবে এবং তা মানুষের মাথার কাছে আনা হবে।

এই হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, লোকেরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হবে এবং আল্লাহ পাকের দরবারে শাফাআতের আরজী পেশ করবে। তিনি বলবেন, হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো, তাই তিনি জান্নাতের দ্বারের শেকল ধরে করাঘাত করবেন। জিজ্ঞাসা করা হবে, কে? তিনি জবাব দেবেন, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)। তখন জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দণ্ডায়মান হবেন এবং সেজদায় পড়ে যাবেন। ঘোষণা আসবে স্বীয় মস্তক উত্তোলন করুন, দরখাস্ত করুন, দরখাস্ত মঞ্জুর করা হবে, সুপারিশ করুন, সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। এটিই হলো 'মাকামে মাহমুদ' যে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে।

তেবরাণী হযরত কা'ব এবনে মালেকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক মানুষকে উঠাবেন, আমি এবং আমার উম্মত সেদিন একটি টিলার উপর থাকব, আমার প্রতিপালক

সেদিন আমাকে সবুজ বর্ণের পোশাক পরিধান করাবেন। এরপর আমাকে অনুমতি দেয়া হবে, আমি আল্লাহ পাকের শানে হাম্‌দ পেশ করবো, সে ভাষায় যে ভাষার তিনি যোগ্য। আর এটিই মাকামে মাহমুদ।

সর্বশ্রেষ্ঠ শাফাআত

ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেন, এটি সেই শাফাআত বা সুপারিশ– আল্লাহ পাক যার অধিকার দিয়েছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে। হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে, তাতে রয়েছে যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ পাক একটি দোয়া করার অধিকার দিয়েছেন যা তাঁরা এ জীবনেই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু আমি আমার উম্মতের শাফাআতের জন্যে সে দোয়াকে সংরক্ষিত রেখেছি। কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে অনেক লোককে আটক করে রাখা হবে। তাদেরকে রেহাই দেয়ার জন্যে এ সুপারিশ করা হবে।

আল্লামা কুরতবী (রঃ) লিখেছেন, এ শাফাআত হবে কেয়ামতের ময়দানের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে শাফাআত উম্মতের জন্যে সংরক্ষণ করে রেখেছেন, তা হলো– গুনাহগার উম্মতীদেরকে দোযখ থেকে নাজাত দেয়ার জন্যে তিনি যে সুপারিশ করবেন।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তিনটি শাফাআতের অধিকার দেয়া হবে। এবনে জরীর তাঁর তফসীরে, তেবরানী আল মুতাওয়ালাতে, আবু ইয়ালা মসনদে, বায়হাকী আলবাছে, আবু মুসা মাদিয়ানী আল মুতাওয়ালাতে, আলী এবনে মা'বাদ কেতাবুত ত্যাআত ওয়াল এসীয়ানে এবং আবুশ শেখ কিতাবুল আজমাতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে একখানি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতে শিংগা সৃষ্টি, তাতে ফুঁক দেয়া, ফলে মানুষের ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সংজ্ঞাহীন হওয়া, কবর থেকে বের হয়ে আসা, অবশেষে জান্নাতীদের জান্নাতে এবং দোযখীদের দোযখে প্রবেশ করার বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর এই হাদীসে সে সব লোকের উল্লেখ রয়েছে, যাদের ঘাড়ে লিপিবদ্ধ থাকবে 'এ হলো সেই দোযখী, যাকে আল্লাহ পাক দোযখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন'।

এই হাদীসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এরূপঃ

"সমগ্র মানব জাতিকে একটি স্থানে দাঁড় করানো হবে। আর এ অবস্থায় তাদেরকে কতদিন রাখা হবে তার সিদ্ধান্ত জানা যাবেনা। লোকেরা চিৎকার করতে থাকবে এবং সুপারিশকারীর অন্বেষণ করতে থাকবে। সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-এর নিকট যাবে, হযরত আদম (আঃ) বলবেন, আমার এ অধিকার নেই। এরপর একের পর এক নবীর নিকট লোকেরা যাবে এবং তাঁরা অস্বীকার করবেন। এমনকি, লোকেরা অবশেষে আমার নিকট আসবে। আমি তাদের সঙ্গে রওয়ানা হবো, আরশে এলাহীর সম্মুখে সেজদায় রত হবো।

যদিও আল্লাহ পাক সবকিছু জানেন তবুও জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার কি প্রয়োজন? আমি আরজ করবো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে শাফাআতের অধিকার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। এখন সৃষ্টির ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল কর আর তাদের সম্পর্কে মীমাংসা কর।

আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, আমি সুপারিশ কবুল করেছি এবং মানুষের মধ্যে ফয়সালা করে দিচ্ছি। এ সুদীর্ঘ হাদীসে চতুঃস্পদ জন্তুর ফয়সালার বিবরণও স্থান পেয়েছে। এরপর মানুষের পরস্পরের হক্ব, হত্যা সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত হবে। এরপর আদেশ হবে প্রত্যেক ব্যক্তি বা প্রত্যেক উম্মত তার নিজ নিজ উপাস্যের সঙ্গে একত্রিত হও। তখন সকল লোক তাদের উপাস্যদের সাথে একত্রিত হবে, শুধু মোমেনগণ থেকে যাবেন আর তাদের মধ্যে মুনাফেকরাও থাকবে। তখন হঠাৎ আল্লাহ পাক তাঁর কদম মোবারকের গোড়ালী উন্মুক্ত করে দেবেন। তখন মোমেনগণ সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় পড়ে যাবেন, কিন্তু মুনাফেকরা উল্টো হয়ে পেছনের দিকে পড়ে যাবে, (সেজদা করতে সক্ষম হবেনা, তাদের কোমর ঝুঁকবে না, গাভীর পৃষ্ঠের মত তাদের পৃষ্ঠদেশ হয়ে যাবে। এরপর পুলসিরাত কায়েম হবে। লোকেরা তা অতিক্রম করবে। কিছু লোক নিরাপদে পার হয়ে যাবে। আর কিছু লোকের চেহারা জখম হবে এবং তারা অগ্নিতে পড়ে যাবে। যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে পৌছে যাবেন, তখন ভেতরে প্রবেশ করার জন্যে কোন সুপারিশকারীর সাহায্যপ্রার্থী হবেন, কেউ যেন সুপারিশ করে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের ব্যবস্থা করে দেয়। তাই সর্বপ্রথম আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট যাবে, কিন্তু তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করে নূহ (আঃ)-এর নিকট যাওয়ার কথা বলবেন। লোকেরা নূহ (আঃ)-এর নিকট যাবে, তিনিও তাঁর অক্ষমতার কথা প্রকাশ করলে লোকেরা যথাক্রমে ইব্রাহীম (আঃ), মুসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ)-এর নিকট যাবে, তাঁরাও একই জবাব দিলে লোকেরা আমার নিকট আসবে, আমাকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তিনটি শাফাআতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তিনি আমাকে এর অঙ্গীকার করেছেন। আমি জান্নাতের কাছে পৌঁছে তার দ্বারের শেকল ধরে দ্বার খোলার আরজী পেশ করবো। তখন দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। আর যখনই আমার প্রতিপালকের দীদার নসীব হবে তখনই আমি সেজদায় পড়ে যাব এবং আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর হাম্‌দ ও সানা এবং শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার এমন বিশেষ অনুমতি দান করেবেন যা আর কোন লোককে দেয়া হবেনা। এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! মাথা উত্তোলন করুন, শাফাআত করুন, আপনার শাফাআত গ্রহণ করা হবে। আমি আরজ করবো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনি শাফাআতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, জান্নাতবাসীর পক্ষে আমার শাফাআত কবুল করুন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দান করুন। আল্লাহ পাক আমার শাফাআত কবুল করবেন।

এই হাদীসেই রয়েছে, যখন দোযখীরা দোযখে যাবে এবং এক বিরাট জনসংখ্যা তাতে প্রবেশ করবে যাদের অন্যায় অপকর্ম তাদেরকে সেখানে বেঁধে রাখবে, তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও হবে যাদের পা পর্যন্ত অগ্নি থাকবে, তার উপরে থাকবেনা। কিছু লোকের

পায়ের গীরার অর্ধেক অগ্নিতে থাকবে, আর কিছু লোকের হাঁটু পর্যন্ত অগ্নি থাকবে আর কারো কোমর পর্যন্ত। আর কোন কোন লোকের চেহারা ব্যতীত সমস্ত শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হতে থাকবে। শুধু চেহারার জন্যে আল্লাহ্ পাক অগ্নিকে হারাম করে দেবেন। আমি আরজ করবো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতের কিছু লোক দোযখে রয়েছে'। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, 'যাকে চেন তাকে দোযখ থেকে বের কর'। নির্দেশ মোতাবেক তাদেরকে দোযখ থেকে বের করা হবে, এমনকি তাদের মধ্যে আর কেউ দোযখে থাকবে না। এরপর আল্লাহ্ পাক আমাকে শাফাআতের অনুমতি দেবেন আর কোন পয়গম্বর ও শহীদ এমন হবেন না যে সুপারিশ করবেন না। এরপর আল্লাহ্ পাক আদেশ দেবেন যার অন্তরে একটি দীনারের সমান ঈমান থাকবে তাকেও দোযখ থেকে বের করে আনো। এরপর পুনরায় এরশাদ করবেনঃ যার অন্তরে দীনারের দু' তৃতীয়াংশ সমান ঈমান থাকবে, যার অন্তরে অর্ধেক দীনারের সমান ঈমান থাকবে, যার অন্তরে এক চতুর্থাংশের সমান ঈমান থাকবে, এমনকি সামান্য কণা পরিমাণ ঈমানও থাকবে তাকে দোযখ থেকে বের কর। তখন আর কেউ এমন থাকবে না। যখন দোযখে এমন কেউ আর থাকবেনা যে আল্লাহ্ পাকের 'সন্তুষ্টি লাভের জন্যে কখনো কোন কাজ করেছে এবং প্রত্যেক সুপারিশকারী সুপারিশ করে ফেলবে, তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেনঃ এখন আমি রয়ে গেছি, আমি আরহামুর রাহিমীন (সকল দয়াবানদের মধ্যে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান)। একথা বলার পর আল্লাহ্ পাক নিজের হস্ত মোবারক দোযখের উপর স্থাপন করবেন এবং অগণিত সৃষ্টিকে দোযখ থেকে বের করবেন। তাদের দেহ পুড়ে কয়লার মত হয়ে যাবে

তিনবার শাফাআত

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, লোকেরা তিনবার শাফাআত প্রার্থী হবে (১) কেয়ামতের ময়দানে যখন সমস্ত লোক আটক থাকবে তখন রেহাই পাওয়ার জন্যে (২) জান্নাতে প্রবেশের অনুমতির জন্যে (৩) দোযখ থেকে গুনাহগার মোমেনদের নাজাতের জন্যে। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার প্রতিপালকের সম্মুখে আমাকে তিনটি শাফাআতের অনুমতি দেয়া হবে যার প্রতিশ্রুতি তিনি আমাকে দান করেছেন। এ বাক্যটির তাৎপর্য এই, তিনি তিনবার শাফাআত করবেন। আর মাকামে শাফাআতের নামই হলো মাকামে মাহমুদ। (শাফাআত তিনবার হবে কিন্তু শাফাআত করার স্থান একটিই হবে) আর তাকেই 'মাকামে মাহমুদ' বলা হয়ে থাকে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি আমার উম্মতের জন্যে শাফাআত করবো। এমনকি আমার প্রতিপালক আমাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন? আমি আরজ করবো, জ্বি-হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ

করেছেনঃ আমার প্রতিপালক আমাকে দু'টি কথার একটিকে গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেনঃ

(১) আমার উম্মতের অর্ধেককে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন,

(২) তিনি আমাকে শাফাআত করার অনুমতি দান করবেন। আমি শাফাআতের অনুমতিকে পছন্দ করেছি, এখন আমার শাফাআত প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে হবে। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেছেন, 'আমার শাফাআত সে ব্যক্তির জন্যে হবে যে মুশরেক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেনি'।

এবনে আবি হাতেম হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি উম্মতের জন্যে আমার প্রতিপালকের নিকট শাফাআত করতে থাকব, আর তিনি আমার শাফাআত কবুল করতে থাকবেন। অবশেষে আমি আরজ করবো, হে আমার প্রতি প্রতিপালক! যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুতে বিশ্বাসী ছিল তাদের ব্যাপারে আমার শাফাআত কবুল করুন। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, হে মোহাম্মদ (সাঃ)! এ অধিকার আপনারও নয় আর কারো নয়, এটি শুধু আমার অধিকার। আমার ইজ্জত, উচ্চ মর্যাদা এবং রহমতের শপথ! যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলতো আমি তাকে দোযখে রেখে দেবোনা।

তেবরানী হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ শপথ সেই মহান সত্তার, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, কেয়ামতের দিন আমি সমগ্র মানব জাতির সর্দার থাকব, আর আমার এ কথায় কোন গর্ব নেই। (আল হাদীস).

তেবরানী আল আওসাতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এ সূত্রেও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহু সালাইহে আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি দোযখের দরজায় করাঘাত করবো, দরজা খুলে দেয়া হবে, আমি ভেতরে গমন করে আল্লাহ পাকের এমন প্রশংসা করবো যা ইতিপূর্বে কেউ করেনি এবং আমার পরও কেউ করবে না। এরপর আমি সে ব্যক্তিকে বের করবো যে আন্তরিকতার সঙ্গে তওহীদে বিশ্বাসী ছিল। কোরায়েশ গোত্রের কিছু লোক আত্মীয়তার দাবীতে আমার দিকে এগিয়ে আসবে কিন্তু তাদেরকে দোযখেই ছেড়ে দেব।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত এমরান এবনে হোসাইন (রাঃ)-এর সূত্রে এই হাদীস সংকলন করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফাআতের কারণে কিছু লোককে দোযখ থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, জান্নাতীদের মধ্যে তাদেরকে জাহান্নামী বলা হবে।

তেবরাণী হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, কেবলায় বিশ্বাসী লোকদের মধ্যে পাপাচারের কারণে এত লোককে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, যাদের সংখ্যা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ জানেনা। আমাকে শাফাআত করার অনুমতি দেয়া হবে, আমি সেজদায় রত হয়ে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করবো, যেমন

দন্ডায়মান অবস্থায় করবো, তখন আদেশ হবে, 'মাথা উত্তোলন করুন যা চাওয়ার তা চান, আপনার চাহিদা পূর্ণ করা হবে এবং আপনার শাফাআত কবুল করা হবে'।

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ

"হে রসূল!) আপনি বলুন, আমাকে কল্যাণের সাথে প্রবেশ করার তওফিক দান কর, আর কল্যাণের সাথে বের হওয়ার তওফিক দান কর"।

আলোচ্য আয়াতের مُدْخَلَ صِدْقٍশব্দটির অর্থ হলো মদীনা মুনাওয়্যারা আর مُخْرَجَ صِدْقٍশব্দটির অর্থ হলো মক্কা মোয়াজ্জমা। হাসান এবং কাতাদা (রঃ) এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন। এর অর্থ হলো-

(১) হে আল্লাহ! আমাকে এভাবে মদীনা মুনাওয়্যারায় প্রবেশের তওফিক দান কর, যেন আমার সম্মুখে কোন অপছন্দনীয় ঘটনা না ঘটে, আর মক্কা থেকে আমাকে এমন পছন্দনীয় পন্থায় বের হওয়ার তওফিক দান কর যেন আমার মন মক্কায় অবস্থানের প্রতি আকৃষ্ট না থাকে।

(২) তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, 'আমাকে নিরাপদে এমন অবস্থায় মক্কা থেকে বের কর যেন মুশরেকরা আমাকে কোন কষ্ট দিতে না পারে, আর মদীনা মুনাওয়্যারায় এভাবে প্রবেশ করার তওফিক দান কর যেন সেখানে কর্তৃত্ব আমার হাতে থাকে'।

(৩) বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রবেশ করাবার তাৎপর্য হলো নবুওয়্যতের দায়িত্ব পালনে প্রবেশ করা, আর বের হওয়ার অর্থ হলো নবুওয়্যতের দায়িত্ব পালন করে অবসর পাওয়া। অর্থাৎ হে আল্লাহ! নবুওয়্যতের যে মহান দায়িত্ব তুমি আমার প্রতি অর্পণ করেছে তাতে আমাকে সঠিক ভাবে প্রবেশ করার তওফিক দান কর, আর এমনিভাবে এ মহান দায়িত্ব পালনের তওফিক দান কর। আর আমি যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নেই, তখন যেন আমি এ পর্যায়ের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আদায় করি।

(৪) হাসান বসরী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, مُدْخَلَ صِدْقٍ এর অর্থ হলো জান্নাত আর مُخْرَجَ صِدْقٍ এর অর্থ হলো মক্কা।

(৫) আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, مُدْخَلَ صِدْقٍএর অর্থ যদি জান্নাত হয় তবে مُخْرَجَ صِدْقٍ এর অর্থ হবে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করা।

(৬) ইমাম বয়জাবী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আমাকে উত্তম ভাবে কবরে প্রবেশ করাও, আর কেয়ামতের দিন সম্মানের সাথে কবর থেকে বের কর।

(৭) কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো আমাকে তোমার বন্দেগীতে প্রবেশ করাও এবং তোমার নিষিদ্ধ কাজ সমূহ থেকে দূরে রাখ।

وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

"আর নিজের তরফ থেকে আমাকে এমন প্রভাব-প্রতিপত্তি দান কর, যাতে থাকবে তোমার সাহায্য"।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا এর অর্থ হলো প্রতিপত্তি।

আর হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো এমন ক্ষমতা যা বিরোধীদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী হয়। এমন শক্তি যার দ্বারা দ্বীন ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। এ দোয়ার বরকতেই আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের ক্ষমতা দান করেছিলেন।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানতেন যে আল্লাহ্ পাকের সাহায্য ব্যতীত দ্বীন ইসলাম কায়েম হবেনা এবং কোরআনী বিধানের বাস্তবায়নও হবেনা, এজন্যে তিনি এ দোয়া করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, দ্বীন ইসলাম কায়েম করতে হলে আল্লাহ্ পাকের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে, তাই এ দোয়া করার জন্যে আদেশ দিয়েছেন।[১]

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, কুফরী ও নাফরমানীর উপর ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের নিকট সুস্পষ্ট দলিল এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রদানের জন্যে দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ্ পাক এ দোয়া কবুল করেছেন এবং এ সুসংবাদ দিয়েছেনঃ

اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (সূরা মুজাদেলা)

(নিশ্চয় আল্লাহর দল বিজয়ী হবে।)

আরও এরশাদ হয়েছে,

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ .....لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ (সূরা মোহাম্মদ)

"তিনিই সেই আল্লাহ্ পাক যিনি তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত এবং সত্য ধর্ম নিয়ে যেন সকল বাতিল ধর্মের উপর সত্য ধর্মকে বিজয়ী করেন"[২]

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন সত্য এসেছে, মিথ্যা বিদায় নিয়েছে আর মিথ্যা বিদায় নেয়ারই যোগ্য"।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৩৫-৩৬
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা- ১৩৬
তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৩৩

কাফেরদের বিরুদ্ধে শুধু সাহায্যের আশ্বাসই দেননি, বরং সত্যের বিজয়ের নিশ্চয়তা বিধান করে আলোচ্য আয়াতও নাজিল করেছেন। লক্ষ্যনীয়, মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নির্যাতীত-উৎপীড়িত মুসলমানদের আত্মরক্ষা করা ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ, সে অবস্থায় আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনের এ আয়াত নাজিল করেছেন এবং ইসলামের বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন যে সেদিন দূরে নয়, যখন সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, বাতিল পদদলিত এবং নিঃষ্পেষিত হবে। পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণা কয়েক বছরের মধ্যেই বাস্তবে রূপায়িত হলো। আল্লাহ্ পাকের নির্দেশক্রমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম প্রিয় মাতৃভূমি মক্কায়ে মোয়াজ্জমা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়্যারায় চলে গেলেন আর মাত্র দেড় বছরের মধ্যেই বদরের যুদ্ধে কাফেররা পরাজিত হলো। আর অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় হলো। এভাবে আল্লাহ্ পাকের এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হলো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে মক্কা বিজয়ের দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পবিত্র কা'বা শরীফে রক্ষিত ৩৬০টি মূর্তি তাঁর হস্ত মোবারকের লাঠির আঘাতে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন, আর আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছিলেন।[১]

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين

পবিত্র কোরআনের দু'টি বৈশিষ্ট্য

"আর আমি পবিত্র কোরআনে এমন কিছু নাজিল করেছি যা হলো মোমেনদের জন্যে রোগ নিরাময় এবং রহমত"।

অর্থাৎ কুফরী, নাফরমানী ও মূর্খতার দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের অব্যর্থ মহৌষধ হলো পবিত্র কোরআন। মানব-মনের আঁধার দূরীভূতকারী আলো এবং মানুষের চারিত্রিক দূর্বলতা ও নৈতিক অবক্ষয় দূরীভূত করার মাধ্যম হলো পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের شفاء শব্দটির অর্থ হলো, পবিত্র কোরআনে রয়েছে মানুষের দৈহিক রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা। কেননা সূরা ফাতেহা সহ অন্যান্য সূরা দ্বারা রোগ নিরাময় হয়, হযরত রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

عليكم بالشفائين العسل والقران

তোমরা দু'টি রোগ নিরাময় গ্রহণ কর, একটি মধু, আরেকটি পবিত্র কোরআন। মধু দ্বারা অনেক রোগের নিরাময় হয়, এর পাশাপাশি পবিত্র কোরআনের উল্লেখ রয়েছে, এর অর্থ হলো পবিত্র কোরআন দ্বারাও দৈহিক রোগের নিরাময় হয়। আর পবিত্র কোরআন

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-৩৩

মোমেনদের জন্যে রহমত হওয়ার তাৎপর্য হলো, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়নেই আল্লাহ পাকের রহমতের বারিধারা বর্ষিত হয়। এর মাধ্যমেই মিথ্যা, ধোকার অবসান ঘটে। অন্যায়-অনাচার, বাতিল আকীদা, ভ্রান্ত ধারণা এবং কুসংস্কারের আঁধার দূরীভূত হয়, আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয়। যারা পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা মেনে চলে তাদের জীবন-সাধনা হয় সার্থক, সুন্দর, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে তারা হয় সফলকাম।

পক্ষান্তরে, যারা পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করে, মিথ্যা ও বাতিল আকীদায় বিশ্বাসী হয়, তাদের সর্বনাশ তারা নিজেরাই ডেকে আনে। কোন রুগ্ন ব্যক্তি যদি চিকিৎসকের বিরোধিতা করে এবং তার প্রদত্ত চিকিৎসা-ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে তবে তার সর্বনাশের জন্য সে নিজেই দায়ী হয়। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে,

وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا

"আর জালেমদের শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়"।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, যে কোরআন নিয়ে বসে, সে কিছু নিয়েই ওঠে, অর্থাৎ সে অবশ্যই উপকৃত হয়। আল্লাহ পাক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন পবিত্র কোরআনে রয়েছে মোমেনদের জন্যে রোগ নিরাময়, পবিত্র কোরআন হলো রহমতের প্রতীক, শান্তি এবং কল্যাণের প্রতীক। পক্ষান্তরে, যারা পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করবে, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা বর্জন করবে, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য করবে তাদের শাস্তি হবে অবধারিত।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, মানুষের রোগ দু' প্রকার। দৈহিক ও আধ্যাত্মিক, পবিত্র কোরআনে উভয় প্রকার রোগেরই চিকিৎসা রয়েছে। পবিত্র কোরআন মানব-জীবনকে সুন্দরতর করে গড়ে তোলে এবং তাকে উচ্চতর মর্যাদায় আসীন করে। সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং অন্যায়-অনাচার পরিহার করতে উদ্বুদ্ধ করে।

যারা বাতিল আকীদায় বিশ্বাসী হয়, যারা নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হয়, তারা নিঃসন্দেহে রুগ্ন। এ রোগ নিরাময়ের সর্বাধিক কার্যকর ঔষধ হলো পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা। বর্বরতার যুগের অন্ধকার দূরীভূত হয়েছিল পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার মাধ্যমেই, যখন মানুষ পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত হতো, যখন হত্যা, খুন-জখম ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার তখন পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষায় মানবতার কলংক পৌত্তলিকতা সহ যাবতীয় অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে।

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ

(আর আমি মানুষকে যখন নেয়ামত দান করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয়।)

আলোচ্য আয়াতে নেয়ামত শব্দ দ্বারা স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য, অর্থ-সম্পদ প্রভৃতি এবং পবিত্র কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। আর মুখ ফিরিয়ে নেয়ার তাৎপর্য হলো আল্লাহ পাকের

অকৃতজ্ঞ হওয়া, অর্থাৎ এই সমস্ত নেয়ামত লাভ করা সত্বেও মানুষ নেয়ামতদাতা আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা, বরং মহান দাতার দান নিয়ে মুগ্ধ মত্ত থাকে এবং স্বয়ং দাতাকে ভুলে যায়। শুধু তাই নয়, বরং দাতার দানকে তাঁর নাফরমানীর কাজে ব্যয় করে।

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا

পক্ষান্তরে, যখন তার কোন কষ্ট হয়, যেমন সে অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা দারিদ্র্যের কষাঘাত তাকে বিপদগ্রস্ত করে তোলে তখন সে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায়, আল্লাহ পাকের রহমতের আশাও তার অন্তরে থাকেনা।

মানব চরিত্রের বৈচিত্র

আলোচ্য আয়াতে মানব চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, মানব প্রকৃতি কত বিচিত্র যে আল্লাহ পাক যখন মানুষকে তাঁর নেয়ামত দান করেন যথা স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি-সামর্থ, জনপ্রিয়তা প্রভৃতি তখন মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞ থাকা এবং এ সত্য উপলব্ধি করা যে, সবকিছু আল্লাহ পাকের দান স্বরূপই সে পেয়েছে। এতে তার নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নেই। অতএব, আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং প্রদত্ত দানকে তাঁর বিধি-নিষেধ মোতাবেক ব্যবহার করা তার কর্তব্য। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষ আল্লাহ পাকের নেয়ামত পেয়ে তাঁর অকৃতজ্ঞ হয় এবং নেয়ামতকে অন্যায় পথে ব্যবহার করে আল্লাহ পাককে ভুলে যায়, আর যতবেশী নেয়ামত পায় ততবেশী অকৃতজ্ঞ, অবাধ্য হয়।

পক্ষান্তরে, মানুষ যখন নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয় তথা অসুস্থ বা দরিদ্র হয়ে পড়ে তখন সে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে এবং আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে। অথচ অকৃতজ্ঞতা যেমন আল্লাহ পাকের নিকট অপছন্দনীয়, ঠিক তেমনি আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হওয়াও অপ্রিয়। বস্তুতঃ সুখ দুঃখ সর্বাবস্থায়ই মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক রাখা। সুখে শোকর আদায় করা, দুঃখে সবর অবলম্বন করে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখা।

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, প্রত্যেক ব্যক্তি কৃতজ্ঞ হোক বা অকৃতজ্ঞ, নিজ নিজ পন্থায় কাজ করে"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো প্রত্যেকে নিজের পছন্দনীয় পন্থা-হেদায়েত বা গোমরাহীর পথে কাজ করে থাকে।

কাতাদা এবং হাসান বলেছেন, এর অর্থ হলো প্রত্যেকে তার নিয়ত মোতাবেক কাজ করে থাকে, যার ইচ্ছা দুনিয়ার লাভ-লোভে মত্ত রয়েছে এবং যার ইচ্ছা আখেরাতের সাফল্য অর্জনে তথা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় রত রয়েছে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) এর অর্থ বলেছেন, প্রত্যেককে জন্মগতভাবে যে প্রকৃতি

এবং চরিত্র প্রদান করা হয়েছে সে ঐ চরিত্র মোতাবেক কাজ করে থাকে এবং এ সত্যটিই প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীসে রয়েছে। তিনি এরশাদ করেছেন, প্রত্যেককে সে কাজেরই তওফিক দেয়া হয়, যার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আলী (রাঃ)।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির ছিলাম এবং পরস্পর কথা বলছিলাম যে, ভবিষ্যতে কি হবে, তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি তোমরা একথা শ্রবণ কর যে কোন পাহাড় তার স্থান থেকে সরে গেছে, তখন একথা তোমরা বিশ্বাস কর, আর যদি একথা শ্রবণ কর যে, কোন মানুষের জন্মগত চরিত্র বদলে গেছে, তবে তা বিশ্বাস করোনা। (আহমদ)

আল্লামা বয়জাবী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি সে পথে চলে, যা তার অবস্থা মোতাবেক, তা হেদায়েত হোক বা গোমরাহী।

আল্লামা কান্দলভী (রঃ) লিখেছেন, বন্দা আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞ হোক বা অকৃতজ্ঞ প্রত্যেকে তার সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য মোতাবেকই কাজ করে থাকে। কেননা আল্লাহ পাক তাঁর হেকমতে মানুষকে বিভিন্ন প্রকার বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কেউ সৃষ্টিগত ভাবে নেক, আর কেউ সৃষ্টিগতভাবেই বদ, মানব সৃষ্টির উপাদানেই রয়েছে ভাল বা মন্দ হওয়ার উপকরণ। আর এ উপকরণ মানুষ মাত্রের মধ্যেই সুপ্ত এবং গুপ্ত রয়েছে, যা প্রকাশ পায় পবিত্র কোরআন মানা এবং না মানার মাধ্যমে। যারা পবিত্র কোরআনের বিধি-নিষেধ মেনে চলে এবং যারা কল্যাণকর কাজ করে তাদের মধ্যে কল্যাণের উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে বলে প্রকাশ পায়।

পক্ষান্তরে, যারা পবিত্র কোরআনকে অমান্য করে, মন্দ কাজে লিপ্ত হয় তাদের সম্পর্কে একথা প্রকাশ পায় যে, এ ব্যক্তির চরিত্র মন্দ।

فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

তবে আল্লাহ পাক পূর্ব থেকেই ভালভাবে জানেন যে, কে ভাল আর কে মন্দ, কে কল্যাণকামী আর কে অকল্যাণকামী, কে হেদায়েতপ্রাপ্ত আর কে পথভ্রষ্ট, এ বিষয়টি আল্লাহ পাকের নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। অতএব, তোমরা যেমন আমল করবে তেমনই ফল পাবে।[১]

কাফেরদের উদ্দেশে সতর্কবাণী

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে কাফেরদের উদ্দেশে সর্তকবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এ মর্মে যে, তোমরা নিজেদের জন্যে যে পথ অবলম্বন করেছ আর যে জীবন-ধারা নিজেদের জন্যে পছন্দ করেছ, তার পরিণতি কত ভয়াবহ হবে তা তখনই

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫২, ২৫৩

জানতে পারবে, যখন তোমরা কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হবে, তোমাদের সকল অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। মনে রেখো, ভাল-মন্দের বিনিময় কেয়ামতের দিনই পাবে, দুনিয়াতে নয়।[১]

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۖ قُلِ
الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٨٥﴾ وَلَئِنْ
شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ﴿٨٦﴾
اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۖ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ﴿٨٧﴾ قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ
الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَ
لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا
الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٨٩﴾

তরজমা

(৮৫) (হে রসূল!) তারা আপনাকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, রুহ আমার প্রতিপালকের আদেশ থেকে। আর তোমাদেরকে অতি সামান্য পরিমাণ জ্ঞানই দান করা হয়েছে।

(৮৬) আর আপনাকে যে ওহী প্রদান করেছি আমি ইচ্ছা করলে তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম, তাহলে (হে রসূল!) এ বিষয়ে আপনি আমার বিরুদ্ধে কোন কর্ম বিধায়ক প্রাপ্ত হতেন না।

(৮৭) প্রত্যাহার না করা আপনার প্রতিপালকের দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। নিশ্চয় আপনার প্রতি তাঁর বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে।

(৮৮) (হে রসূল!) যদি এই কোরআনের অনুরূপ কোরআন আনয়নের জন্যে মানব জাতি ও জ্বীন জাতি একত্রিত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবুও তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না।

(৮৯) আর আমি মানুষের জন্যে এই কোরআনে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু তবুও অনেক লোকই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে থাকেনা।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৬৮

তফসীরুল কোরআন

শানে নজুল

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফের এক জায়গায় গমন করছিলেন। আমি সঙ্গে ছিলাম। তাঁর হাতে খেজুরের একটি শাখা ছিল। তিনি চলছিলেন। কিছু সংখ্যক ইহুদী পরস্পর বলতে লাগলো, তাঁকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। তন্মধ্যে একজন বললো, এ প্রশ্ন করোনা, হয়তো তিনি এমন জবাব দেবেন যা তোমাদের অপছন্দনীয় হবে। কিন্তু প্রথম ব্যক্তি বললো, আমি অবশ্যই এ প্রশ্ন করবো এবং সে একথা জিজ্ঞাসা করলো যে, রুহ বা আত্মা কি? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন কিছুক্ষণের জন্যে নীরব ছিলেন। (বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন) আমি উপলব্ধি করলাম, এখন ওহী নাজিল হবে। তাই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে যখন ওহী নাজিল হওয়ার অবস্থা শেষ হয়ে গেল, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন।[১]

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে এ বর্ণনা সংকলিত হয়েছে যে, ইহুদীরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা করার জন্যেই এ প্রশ্ন করেছিল। ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, ইহুদীরা মক্কার কোরায়েশদেরকে পরামর্শ দিয়েছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তিনটি প্রশ্ন কর।

১. আসহাবে কাহাফ সম্পর্কে,

২. জুলকারনাঈন সম্পর্কে,

৩. রুহ সম্পর্কে।

ইহুদীরা মক্কাবাসীকে এ সংবাদও দেয়, যদি এ তিনটি প্রশ্নের উত্তর তিনি না দেন তবে তিনি নবী নন। আর যদি তিনি সব কথারই জবাব দেন, কিন্তু তৃতীয় কথা অর্থাৎ রুহ সম্পর্কে জবাব না দেন তবে মনে করবে যে তিনি সত্য নবী। কেননা রুহের প্রকৃত অবস্থা কোন আসমানী গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি। আর তৌরাতে রয়েছে রুহের তাৎপর্য সম্পর্কে আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ অবগত নয়। তাই যদি তিনি রুহের সংজ্ঞা বর্ণনা না করেন, তবুও জানবে তিনি নবী। তাই মক্কার কোরায়েশরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করে। তার মধ্যে একটি হলো রুহ কি? এর মাহাত্ম কি? অবশিষ্ট প্রশ্ন দু'টির জবাব পবিত্র কোরআনের অন্যত্র স্থান পেয়েছে। আলোচ্য আয়াতের এ শানে নজুল হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, এ আয়াত মক্কী বা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭ পৃষ্ঠা-১৩৯-৪০

রয়েছে। হতে পারে আলোচ্য আয়াতখানি দু'বার নাজিল হয়েছে। প্রথমবার যখন কোরায়েশরা মক্কায় এ প্রশ্ন করে তখন এ আয়াত নাজিল হয়। আর দ্বিতীয় বার তখন নাজিল হয়, যখন মদীনা শরীফের ইহুদীরা এ প্রশ্ন উত্থাপন করে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ একথাও বলেছেন, মক্কার পৌত্তলিক অথবা মদীনার ইহুদীদের একই অবস্থা ছিল। জীবনকে সার্থক করার জন্যে যে বিষয় জানা দরকার সে সম্পর্কে জানতে চেষ্টা না করা এবং অবান্তর বা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ প্রকাশ করা ছিল এদের কাজ। পবিত্র কোরআনের অমর বাণীতে জীবনকে সার্থক-সুন্দর করার যে বাস্তব শিক্ষা রয়েছে, সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে রুহের মাহাত্ম সম্পর্কে কাফেররা জানতে চায়। অথচ রুহের মাহাত্ম না জানলে কোন ক্ষতি হয়না, আর জানতে পারলেও কোন লাভ হয়না।

হযরত শাহ আবদুল কাদের (রঃ) তাঁর বিখ্যাত তফসীর গ্রন্থ 'মোজেহুল কোরআনে' লিখেছেন যে, ইহুদীরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শুধু পরীক্ষা করার জন্যেই প্রশ্ন করেছে। তাই আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় বিস্তারিত ভাবে কোন জবাব দেননি, কেননা তাদের মধ্যে এ সত্য উপলব্ধি করার যোগ্যতাই ছিলনা। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا

"আর তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে"।

আর রুহ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ

"(হে রসূল) আপনি বলুন, রুহ আমার প্রতিপালকের আদেশ থেকে"।

রুহ এমনই একটি বস্তু যা মানব দেহে যখন প্রবেশ করে তখন দেহ জীবিত হয়। আর যখন দেহ থেকে বের হয়ে যায় তখন মানুষটির মৃত্যু হয়।

ইমাম রাজী (রঃ) এবং আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) সহ তফসীরকারগণ এ আয়াত সম্পর্কে একটি বিবরণ দিয়েছেন। কোরায়েশরা যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উপরোক্ত তিনটি প্রশ্ন করে তখন তিনি এরশাদ করেন, আমি আগামীকাল তোমাদের এ প্রশ্নের জবাব দেব। একথা বলার সময় তিনি 'ইনশাআল্লাহ' বলেননি। এজন্যে ওহী নাজিল হওয়ার ব্যাপারে বিলম্ব হয়। মুজাহেদ (রঃ) বলেন, ১২ দিন ওহী নাজিল হওয়া বন্ধ ছিল। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, ১৫ দিন ওহী বন্ধ ছিল। আর একরামা (রঃ)-এর মতে, ৪০ দিন ওহী নাজিল হওয়া বন্ধ ছিল। মক্কাবাসী তখন বলতে লাগলো, (হযরত) মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে কাল বলবেন বলে অঙ্গীকার করলেন, কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদের প্রশ্নের কোন জবাব নেই। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। এ সময় হঠাৎ একদিন জীব্রাঈল (আঃ) এ আয়াত নিয়ে আসলেন,

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَاْىْءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ (সূরা কাহফ)

অর্থাৎ (হে রসূল) কোন বিষয় ইনশাআল্লাহ না বলে আগামীকাল করবেন একথা বলবেন না।

এরপর একে একে তিনটি প্রশ্নের উত্তরই ওহীর মাধ্যমে নাজিল হয়। আর আলোচ্য আয়াত তন্মধ্যে একটি।[১]

রুহের অস্তিত্ব

পবিত্র কোরআনের এ আয়াত দ্বারা একথা জানা যায় যে, মানব দেহে কোন বস্তু রয়েছে যা চোখে দেখা যায়না তবে সে বস্তুটির কারণেই আমরা জীবিত রয়েছি। যদি তা না থাকে তবে আমাদের মৃত্যু হয়। এ বস্তুটির নাম হলো রুহ। যতক্ষণ রুহ মানব দেহে বিদ্যমান থাকে ততক্ষণই মানুষের অস্তিত্ব বিরাজমান থাকে। যদিও মানুষের বিবেক-বুদ্ধি রুহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তাই বলে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। দ্বিতীয়তঃ মানুষ যখন নিদ্রিত হয় তখন তার শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি অকার্যকর হয়ে যায় কিন্তু রুহানী শক্তি তখন বৃদ্ধি পায়। মানুষ তখন স্বপ্নে অনেক দৃশ্য দেখে। এমনকি পারলৌকিক জীবনের অনেক বিষয় সম্পর্কেও অবগত হয়। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, দৈহিক শক্তি অকার্যকর হওয়ার পর যে বস্তুটি মানুষকে পর জগতের দৃশ্য দেখায় তা হলো রুহ।

এতদ্ব্যতীত, কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ..... (সূরা বাকারা)

"আর যারা আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করে তোমরা তাদেরকে মৃত বলোনা, কেননা তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা জান না"।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শহীদ জীবিত বরং চিরঞ্জীব, তাকে মৃত বলা বৈধ নয়। অথচ তার দেহ মৃত্যুবরণ করেছে। এতে একথাও প্রমাণিত হয় যে শুধু মানব দেহকে মানুষ বলা যায় না তার মধ্যে থাকে অন্য আরেকটি বস্তু তারই নাম রুহ।

এমনিভাবে একথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হয় এবং জান্নাত অথবা দোযখে প্রেরণ করা হয়, অথচ এসব অবস্থায় মানব দেহ মৃতই থাকে। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে দেহ ব্যতীত মানুষের আরও একটি পরিচয় আছে। এখানে উল্লেখ্য, রুহ দেখা যায়না কিন্তু দেখা না যাওয়া তার অস্তিত্ব না থাকার প্রমাণ নয়। আমরা ইথার বা তরঙ্গকে দেখিনা, তা সত্বেও তার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করি। এমনিভাবে আমরা ফেরেশতাদেরকে দেখিনা কিন্তু ফেরেশতাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৩৬-৩৭
তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৪৩

করতে পারিনা, ঠিক এমনিভাবে মানব দেহে রুহ রয়েছে অথচ আমরা তা দেখিনা।[১]

রুহ এবং প্রবৃত্তি

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, মানুষের মধ্যে রুহ এবং প্রবৃত্তি নামক দুটি স্বতন্ত্র বস্তু রয়েছে। রুহ মানুষকে কল্যাণকর কাজের দিকে তথা আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে উপকারী হবে এমন কাজের প্রতি আহ্বান জানায়। আর প্রবৃত্তি মানুষকে দুনিয়ার জীবনের সুখ-সম্পদের দিকে ডাকে। প্রবৃত্তি পানাহারের দিকে আকৃষ্ট, ভোগ-বিলাসে মত্ত, আরাম-আয়াশে নিরত। ক্রোধের সময় পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত। প্রতারণায় শয়তানের সঙ্গে রয়েছে তার ভ্রাতৃত্ব। কিন্তু রুহ মানুষকে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর নাজাতের পথে আহ্বান জানায়। রুহ এবং প্রবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য হলো যেমন ফেরেশতা এবং শয়তানের মধ্যে। ফেরেশতা নূর দ্বারা তৈরী আর ইবলিস শয়তান অগ্নি দ্বারা। ফেরেশতা বাধ্য, ইবলিস শয়তান অবাধ্য।

হাফেজ এবনুল বার (রঃ) শরহে মোয়াত্তার ভূমিকায় একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, শিশ্চয আল্লাহ পাক আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মধ্যে নফস বা প্রবৃত্তি এবং রুহ আমানত রেখেছেন। তাই রুহ থেকেই চরিত্র-মাধুর্য, বিবেক-বুদ্ধি, ধৈর্য ও সহনশীলতা, দানশীলতা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলী অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে, নফস বা প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য হলো অনাচার, ব্যভিচার, অহংকার, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি চারিত্রিক দুর্বলতা।[২]

রুহের তাৎপর্য ও মাহাত্ম

রুহ কি? রুহের তাৎপর্য এবং মাহাত্ম কি? এ সম্পর্কে মানব মনে প্রশ্ন উত্থিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু মানুষের নাজাতের জন্যে এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরীও নয় এবং এটি নবী রসূলগণের তবলীগের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তও নয়। তাহলে মক্কার কাফেররা বা মদীনার ইহুদীরা এ সম্পর্কে কেন প্রশ্ন করেছে? এর একই জবাব, শুধু পরীক্ষা করার উদ্দেশে, সত্যকে উপলব্ধি করে তা গ্রহণের জন্যে নয়।

রুহ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের অভিমত

রুহ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীগণ একাধিক অভিমত প্রকাশ করেছেন। কেননা মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধান যখন মানুষের মধ্যে কার্যকর হয় তখন প্রকাশ্যে রক্ত ব্যতীত মানব দেহ থেকে আর কিছুই বের হয় না। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, 'এটি হলো নিঃশ্বাস'। কেননা নিঃশ্বাস বন্ধ হলে মানুষের মৃত্যু হয়। পাশ্চাত্যের দার্শনিকরা বলেন, রুহ হলো একটি সূক্ষ্ম বাষ্প, যার দ্বারা সমস্ত দেহের কল-কব্জা চলমান থাকে। যখন এ বাষ্প রুদ্ধ হয়ে যায় তখন মানুষের মৃত্যু হয়।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৫৮-৬০
২। আর রউজুল আনফ শরহে সিরাতে এবনে হিশাম, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা৯৭
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৬৫-৬৬

আউলিয়ায়ে কেরাম এবং আরেফীনদের মতে, রুহ হলো এমনি একটি সূক্ষ্ম নূরানী বস্তু যা সমগ্র দেহে প্রবাহিত থাকে। যেমন গোলাপের পাপড়িতে সুগন্ধ এবং বৃক্ষে পানি। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সূক্ষ্ম বস্তুটির সম্পর্ক দেহের সঙ্গে থাকে ততক্ষণ মানুষটি জীবিত থাকে। পক্ষান্তরে, যখন মানব দেহের সঙ্গে এ সূক্ষ্ম নূরানী বস্তুটির সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন মানুষটির মৃত্যু হয়। ইমাম রাজী (রঃ) এ মতই প্রকাশ করেছেন।[১]

এতে কোন সন্দেহ নেই যে রুহের তাৎপর্য বা মাহাত্ম উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এজন্যে পবিত্র কোরআনে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, রুহ আমার প্রতিপালকের আদেশ থেকে"।

এ থেকে একথা প্রমাণিত হলো, আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে মানব দেহে কোন কিছু প্রবেশ করে। ফলে মানুষ জীবনী শক্তির অধিকারী হয়। কিন্তু যখন ঐ বস্তুটি বের হয়ে যায় তখন মানুষের মৃত্যু ঘটে। এটিই আল্লাহ পাকের বিধান। একমাত্র আল্লাহ পাকের ইচ্ছা মর্জি এবং নির্দেশক্রমেই সৃষ্টি এবং লয় হয়ে থাকে।

মানব জাতির সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে একথাও ঘোষণা করেছেনঃ

خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (সূরা আলে-এমরান)

"আল্লাহ পাক তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তাকে বলেছেন, 'হও'। তাই সে হয়ে গেছে"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (সূরা নহল)

"আমি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করি তখন শুধু বলি 'হও' আর তা হয়ে যায়"।

এখানে উল্লেখ্য, রুহের চেতনা, গুণাবলী পর্যায়ক্রমে পূর্ণতা লাভ করে এবং ধীরে ধীরে উন্নতি করতে থাকে। যেমন আম্বিয়ায়ে কেরামের রুহ এবং অন্য মানুষের রুহের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। ঠিক এমনিভাবে আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যে রুহ উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহন করেছে তা হলো রুহে মোহাম্মদী, কেননা প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রুহ মোবারক উন্নতির এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যা অন্যদের জন্যে কল্পনাতীত। এই চরম ও পরম উন্নতির কিছু ইঙ্গিত আলোচ্য আয়াতের ভাষায়ও রয়েছেঃ

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

এখানে রব শব্দের সঙ্গে امر শব্দের সম্পর্ক অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। তদুপরি "রব" শব্দটির সঙ্গে "ইয়া" অক্ষরটির সম্পর্ক (যার অর্থ হলো 'আমার') আরও তাৎপর্যবহ।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৫৬-৫৭

এতদ্ব্যতীত, রুহের যে উন্নতির কথা বলা হলো তা তার নিজস্ব নয়, অর্থাৎ তার নিজের এখতিয়ারে নয়, বরং আল্লাহ্ পাকের মহান দানে ধন্য হয়েই রুহ উন্নতি করে, আল্লাহ্ পাক যাকে যতখানি উন্নতি প্রদানের মর্জি করেন সে ততখানি উন্নতি করতে পারে।

এ পর্যায়ে একথাও উল্লেখ্য, মানুষের রুহ্ বা মানবাত্মা যত উন্নতিই করুক না কেন এবং তার পরিধি যত বিস্তৃতই হোক না কেন তা একটি সীমার মধ্যে থাকবে, অসীম হতে পারেনা। যেমন আল্লাহ্ পাকের গুণাবলী অনন্ত অসীম, মানবাত্মার উন্নতি তেমন নয়। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মাঝে এটিই পার্থক্য।

মানুষ যত কামেল বা পরিপূর্ণই হোক না কেন তার রুহ্ যত উন্নতিই করুক না কেন, রূহানী বা আধ্যাত্মিক সাধনায় সে যে মাকামেই পৌঁছুক না কেন, আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে সকল গুণাবলী মুহূর্তের মধ্যে ছিনিয়ে নিতে পারেন। কেননা তিনি সর্বশক্তিমান। এজন্যে তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ

قربان رابیش بود حیرانی

'যারা আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য-ধন্য হন তাঁদের অস্থিরতা হয় অধিকতর'।

এজন্যেই বলা হয়েছেঃ

الایمان بین الخوف والرجاء

'ঈমান হলো আশা এবং ভয়ের মাঝখানে'।

আল্লাহর রহমতের আশা যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ঠিক তেমনি আল্লাহর গজবের ভয়ও অপরিহার্য। যেমন কোরআনে করীমের একখানি আয়াতে আশা ও ভয়কে একত্রিত করে ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ

(সূরা হিজর)

"(হে রসূল!) আমার বন্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান, আর একথাও জানিয়ে দিন যে নিশ্চয় আমার আযাব অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক"।

মোটকথা, রুহের উন্নতি পুরোপুরি আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাধীন। দান করা বা দান ছিনিয়ে নেয়া সবই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের কর্তৃত্বাধীন। এ পর্যায়ে একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। বিখ্যাত সুফী সাধক হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (রঃ) প্রায় সারা রাত ক্রন্দণ করতেন। কোন কোন সময় এত বেশী ক্রন্দণ করতেন যে তাঁর প্রতিবেশীরা মনে করতো হয়তো তাঁর বাড়ীতে কারো মৃত্যু হয়েছে। একবার তাঁর খাদেম জিজ্ঞাসা করলেনঃ হযরত! আপনার এ ক্রন্দণ কি জান্নাত লাভের জন্যে? তিনি বললেনঃ জান্নাতের জন্যে ক্রন্দণের কি প্রয়োজন? কেননা আল্লাহ্ পাক যদি জান্নাত আমাদেরকে না দেন তবে কি কাফেরদেরকে দেবেন? লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করলোঃ তাহলে আপনার এ ক্রন্দণ কি দোযখের ভয়ে? তিনি বললেনঃ যদি আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করেন তবে কাফেরদেরকে কোথায় রাখবেন? লোকটি বললোঃ তাহলে আপনার ক্রন্দণ কিসের জন্যে? হযরত

জোনায়েদ বোগদাদী (রঃ) বললেনঃ আমার ক্রন্দণের কারণ হলো, রাতের শেষ প্রহরে যখন সমগ্র বিশ্ববাসী নিদ্রায় বিভোর থাকে, তখন আল্লাহ্ পাক আমাকে তাঁর দরবারে দণ্ডায়মান হওয়ার এবং সেজদা রত হয়ে নৈকট্য-ধন্য হওয়ার তওফিক দান করেছেন। আমার ভয় হয় আমার কোন আচরণে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে নৈকট্যের এ মাকাম থেকে বঞ্চিত না করেন। এজন্যে আমি ক্রন্দণ করি। মূলতঃ কোরআনে করীমে এ কথাটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে এভাবে-

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ

"আর আমি ইচ্ছা করলে যা কিছু নাজিল করেছি এর সব কিছু কেড়ে নিতে পারি কিন্তু আপনার প্রতিপালকের রহমত যে তিনি তা করেননি"।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে দশজন সাহাবায়ে কেরামকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হলো, তন্মধ্যে সর্বপ্রথম নামই ছিল হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর। তখন সাহাবায়ে কেরাম তাঁদেরকে আন্তরিক মোবারাবাদ জানাচ্ছিলেন। কিন্তু এ অবস্থায় দেখা গেল হযরত আবু বকর (রাঃ) ক্রন্দণরত রয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ এত বড় সুসংবাদ পাওয়ার পর ক্রন্দণের কারণ কি? তিনি বলেছিলেনঃ আল্লাহ পাক জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন সত্য, কিন্তু যদি আমার কোন আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে এ সিদ্ধান্ত বাতিল করেন তখন আমার গতি কি হবে?

বস্তুতঃ এটিই হলো রুহানী উন্নতির উচ্চ মাকাম। এ পর্যায়ে স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবস্থা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। একখানি হাদীসে রয়েছেঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তি আরজ করলেনঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করুন। তিনি বললেনঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন্ কাজটি আশ্চর্যজনক নয়? একদিন তিনি আমার নিকট আগমন করলেন, আমার বিছানায় আমার লেপের নীচেই শায়িত হলেন। একটু পরই তিনি উঠলেন এবং উঠে বললেনঃ আমি তো আমার প্রতিপালকে এবাদত করবো। একথা বলে তিনি অজু করে নামাজের নিয়ত করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। এমনকি তাঁর অশ্রুতে বক্ষ মোবারক ভেসে গেল। এভাবে রুকু ও সেজদার অবস্থাতেও তিনি ক্রন্দণ করতে থাকলেন। আর ক্রন্দণ করে রাত অতিবাহিত করলেন। অবশেষে ফজরের নামাজের জন্যে হযরত বেলাল (রাঃ) ডাকতে আসলেন। আমি আরজ করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ পাক তো আপনাকে মাফ করে দিয়েছেন, তবু এত ক্রন্দণ করেন কেন? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি কি আল্লাহ পাকের শোকর গুজার বন্দা হবো না? এরপর এরশাদ করলেনঃ আমি কেন ক্রন্দণ করবো না? অথচ আজ রাতেই (আলোচ্য) এ আয়াত সমূহ নাজিল হয়েছে। এরপর এরশাদ করলেনঃ ঐ ব্যক্তির জন্যে ধ্বংস অনিবার্য যে এ আয়াত সমূহ পড়ে এবং চিন্তা করেনা।

রুহের মাহাত্ম অনুভব করতে হলে একটি দৃষ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। সমগ্র বিশ্ব একটা বিরাট কারখানা। তাতে নানাবিধ যন্ত্র রয়েছে। যথাঃ শ্রবণ-যন্ত্র, দর্শন-যন্ত্র, শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র, চিন্তা করার যন্ত্র, পানাহার গ্রহণের যন্ত্র, খাদ্য-দ্রব্য পরিপাকের যন্ত্র, পানি নিস্কাশনের যন্ত্র, চলাচল করার যন্ত্র প্রভৃতি। আর এজন্যেই কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক মানুষকে তার নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার আহ্বান জানিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۭ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ (সূরা যারিয়াত)

(আর তোমাদের নিজেদের মধ্যেই স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের অনেক নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।)

বস্তুতঃ মানব দেহ একটি বিরাট কারখানা, এতে অনেক যন্ত্রের বিপুল সমাবেশ ঘটেছে। কারখানার সত্বাধিকারী যখন তাতে বিদ্যুত সংযোগ দেন তখনই তাতে জীবনের স্পন্দন দেখা দেয়। ঠিক এমনিভাবে মানুষের দেহ-যন্ত্র রুহ বিহীন অসার, জীবনীশক্তি বিহীন হয়ে থাকে। কিন্তু যখনই তাতে রুহ ফুঁকে দেয়া হয় তখন তা জীবন্ত, বলন্ত, চলন্ত হয়ে ওঠে। কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক কথাটি এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ (সূরা হিজর)

"আর আমি তাতে আমার রুহকে ফুঁকে দিলাম"।

ঠিক যেমন অচল কারখানায় বিদ্যুত সংযোগ দিলে তা চলমান হয় এবং যন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জীবনী শক্তি প্রবাহিত হয়, ঠিক তেমনি মানব দেহে যখন রুহ প্রবেশ করে তখন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জীবনী শক্তি অনুভূত হয়। বিদ্যুতের কোন স্বতন্ত্র আকৃতি যেমন লক্ষ্য করা যায় না, ঠিক তেমনি রুহও অদৃশ্য, তাকে কেউ দেখে না, এমনকি রুহের বিস্ময়কর রহস্য আজও মানুষের কাছে উদ্‌ঘাটিত নয়।

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ

"(হে রসূল!) আপনি জানিয়ে দিন যে রুহ হলো আমার প্রতিপালকের নির্দেশ"।

প্রশ্ন হলো, এ নির্দেশটি কি? কোরআনে করীমে এ প্রশ্নের জবাব রয়েছেঃ

اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ (সূরা ইয়াসীন)

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যখন কোন কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন, 'হও', তখন তা হয়ে যায়। এই كن শব্দটি امر বা আদেশ। যখনই আল্লাহ পাক কোন কিছু সৃষ্টির ব্যাপারে আদেশ প্রদান করেন তখন তা সৃষ্টি হয়ে যায়। এটিই সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকের অমোঘ বিধান। আর এজন্যেই পবিত্র কোরআনে امر خلق সৃষ্টি এবং আদেশ উভয় শব্দকে একত্র করে ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ (সূরা আ'রাফ)

সতর্ক হও, আল্লাহর জন্যেই সৃষ্টি এবং আদেশ অর্থাৎ সৃষ্টি করার শক্তি শুধু তাঁরই। আর আদেশ প্রদানের একচ্ছত্র অধিকারও শুধু তাঁরই, এতে আর কেউ শরীক নয়।

অতএব, মানব দেহকে একটি কারখানা মনে করা যেতে পারে। আর রুহকে কারখানায় প্রবাহিত বিদ্যুত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। যেভাবে বিদ্যুত সংযোগ দেয়া হলে বিদ্যুত প্রবাহিত হয়, ঠিক তেমনি আল্লাহ্ পাকের আদেশ হলে মানব দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জীবনী শক্তি প্রবাহিত হয়।

রুহের গন্তব্যস্থল

হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, মানব দেহ থেকে যখন রুহ বের হয় তখন কোথায় যায়? তিনি বলেন, মানব দেহের রুহ সাতটি স্থানে যায়ঃ

(১) নবী রসূলগণের রুহ, এর অবস্থান জান্নাতে আদন।

(২) ওলামায়ে কেরামের রুহ, এর স্থান হলো জান্নাতুল ফেরদাউস।

(৩) নেককার মোমেনদের রুহ ইল্লীয়্যিনে স্থান পায়।

(৪) আল্লাহর রাহে শহীদের রুহ বেহেশতে উড়তে থাকে এবং যে কোন স্থানে যেতে পারে।

(৫) গুনাহগার মোমেনদের রুহ আকাশে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, জমিনেও নয়; আসমানেও নয়। এ অবস্থা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

(৬) মোমেনদের শিশু সন্তানদের রুহ কস্তরীর পাহাড়ে থাকে।

(৭) কাফেরদের রুহ সিজ্জীনে থাকে, তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত তাদের দেহ সহ আযাব দেয়া হয়ে থাকে।

কোরআনে করীমে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ (সূরা মুতাফ্ফিফীন)

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ কারো কারো ধারণা আলোচ্য আয়াতের

مِنْ أَمْرِ رَبِّى

বাক্যটির অর্থ হলো من وحى الله অর্থাৎ রুহ হলো আল্লাহর ওহী বা প্রত্যাদেশ মাত্র।

وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

(আর তোমাদেরকে সামান্য পরিমাণই জ্ঞান দান করা হয়েছে)।

এই 'সামান্য' বলতে কতখানি তার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে, মহাসমুদ্রে কোন মানুষ তার আঙ্গুল ডুবিয়ে দিলে মহা সমুদ্রের অথৈ পানির অনুপাতে ঐ আঙ্গুলের শীর্ষে যতখানি পানি ধারণ করে, ততখানি এলমই মানুষকে দান করা হয়েছে। কেননা মানুষের

জ্ঞান অর্জনের পন্থা সীমিত। মানুষ শ্রবণ এবং দর্শনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে। কোরআনে করীমেই রয়েছে এর ঘোষণাঃ

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا (সূরা নহল)

"আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃ-উদর থেকে বের করে এনেছেন, যখন তোমরা কিছুই জানতেনা তথা তোমাদের কোন জ্ঞানই ছিল না"।

এর পরবর্তী আয়াতে জ্ঞান অর্জনের পন্থা সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ

"আর আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেছেন শ্রবণ-শক্তি, দর্শন-শক্তি ও অন্তঃকরণ"।

অতএব, মানুষকে সীমিত পরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে আল্লাহ্ পাকের এলমের অনুপাতে সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষকে অতি সামান্য এলমই দান করা হয়েছে। তফসীরকারগণ একথাও লিখেছেনঃ পূর্ববর্তী আয়াতে রুহ্ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে। আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে মানুষকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো, রুহ সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করা বা রুহের মাহাত্ম উপলব্ধি করা তোমাদের শক্তির উর্দ্ধে। আর তা তোমাদের দ্বীনি প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্তও নয়, তাই এ সম্পর্কে তোমাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়নি।[১]

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا

"যদি আমি ইচ্ছা করি তবে (হে রসূল!) আপনাকে যে ওহী দান করেছি তা কেড়ে নিয়ে যেতে পারি। এরপর আপনি আমার বিরুদ্ধে তা এনে দেয়ার দায়িত্ব নিতে কাউকে পাবেন না"।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে মানুষকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যে সামান্য জ্ঞানটুকু দেয়া হয়েছে আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তা-ও ছিনিয়ে নিতে পারেন। মানুষের অন্তর থেকে তা ভুলিয়ে দিতে পারেন। অথবা গ্রন্থে লিখিত অংশ মুছে দিতে পারেন। কেননা আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান। আর আল্লাহ পাক যদি তার মহান বাণী তুলে নেন তবে পৃথিবীর কোন শক্তি নেই যা ফিরিয়ে দিতে পারে।[২]

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে সেই ভ্রান্ত ধারণাকারীদের প্রতিবাদ রয়েছে যারা এ অন্যায় কথা বলেছে যে পবিত্র কোরআন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

১। তফসীরে মাজেদী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৯৫
২। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৫৩

আলাইহে ওয়াসাল্লাম রচনা করেন। কেননা এতে আল্লাহ্ পাকের শ্রেষ্ঠত্বের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে যে-ওহী তাঁর নবীর প্রতি প্রেরণ করা হয় তা আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে ছিনিয়ে নিতে পারেন। সে শক্তি এবং অধিকার তাঁর আছে।

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ

"কিন্তু আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে রহমতের কারণে"।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআন আপনার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেন না। কেননা আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম রহমত আপনার প্রতি রয়েছে।

অথবা এর অর্থ হলোঃ যদি আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআন ছিনিয়ে নেন তবে কেউ তা আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু যদি আল্লাহ্ পাক আপনার প্রতি রহমত করেন তবে তিনিই ফিরিয়ে দিতে পারেন।

ইমাম রাজী (রঃ) আরও লিখেছেন, পবিত্র কোরআন যে আল্লাহ্ পাক রেখে দিয়েছেন তা মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্ পাকের বিরাট এহসান। বিশেষতঃ ওলামায়ে কেরামের প্রতি আল্লাহ্ পাকের দু'টি বিশেষ দান রয়েছে। একঃ কোরআনের এলম হাছিল করা আল্লাহ্ পাক তাদের জন্যে সহজ করেছেন। দুইঃ পবিত্র কোরআনকে হেফজ করে রাখার তৌফিক দান করেছেন।

إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا

"(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতি তাঁর বিরাট দান রয়েছে"।

কেননা আল্লাহ্ পাক আপনাকে সমগ্র মানব জাতির সরদার নির্বাচন করেছেন। আর আপনাকেই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বানিয়েছেন, আর আপনাকে মাকামে মাহমুদ দান করেছেন। এমনিভাবে আপনার প্রতি কোরআন নাজিল করা অব্যাহত রেখেছেন।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) আলোচ্য আয়াতের فضل كبير এর ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নবী ও রসূল মনোনীত করেছেন, তাঁর প্রতি পবিত্র কোরআন নাজিল করেছেন এবং পবিত্র কোরআনকে সংকলিত এবং লিপিবদ্ধ করার তৌফিক দান করেছেন, এমনিভাবে তা বর্ণনা করার আদেশ দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মাকামে মাহমুদ এবং হাউজে কাউছার দান করেছেন।

পবিত্র কোরআন তুলে নেয়া হবে

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ কেয়ামতের পূর্বে পবিত্র কোরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। অতএব সে সময় আসার পূর্বে তোমরা তা পাঠ করতে থাক, তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করতে থাক। এক ব্যক্তি বললোঃ এই

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৫৩

লেখা তো মুছে ফেলা যাবে কিন্তু যে কোরআন মানুষের অন্তরে রয়েছে তা কীভাবে মোছা যাবে? তিনি জবাব দিলেনঃ

মানুষ রাতের বেলায় কোরআনে পাক কণ্ঠস্ত অবস্থায় নিদ্রিত হবে তখন তাদের অন্তর থেকে তা উঠিয়ে নেয়া হবে। সকাল বেলা যখন জাগ্রত হবে তখন দেখবে কিছুই স্মরণ নেই। কাগজেও লিপিবদ্ধ অবস্থায় কিছুই থাকবেনা। তারা তখন কাব্য চর্চায় মগ্ন হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনে আছ (রাঃ) বলেনঃ কেয়ামতের পূর্বে পবিত্র কোরআন সেখানেই ফিরে যাবে যেখান থেকে নাজিল হয়েছিল। মৌমাছির গুণ গুণ শব্দের মত আরশের চারিদিকে তার গুন গুন শব্দ হবে। আল্লাহ পাক তখন জিজ্ঞাসা করবেনঃ কেন কি হয়েছে? কোরআন আরজ করবেঃ হে আমার মালিক, আমাকে পাঠ করা হয় বটে কিন্তু আমার উপর আমল করা হয় না।

আলেমগণের মৃত্যুর মাধ্যমে এলম উঠে যাবে

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক এলমকে এভাবে ছিনিয়ে নেবেন না যে মানুষের অন্তর থেকে বের করে দেন, বরং ওলামাদেরকে মৃত্যু মুখে পতিত করবেন। যখন কোন আলেম থাকবে না তখন লোকেরা জাহেলদেরকে নিজেদের নেতা বানিয়ে নেবে। যারা এলম ব্যতীতই ফতোয়া দেবে। নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।

ইমাম আহমদ এবং এবনে মাজা (রঃ) হযরত যিয়াদ এবনে লবীদের সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন কোন বিষয়ের উল্লেখ করলেন এবং এরশাদ করলেনঃ এই অবস্থা তখন হবে যখন এলম চলে যাবে। আমি আরজ করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এলম কীভাবে যাবে? আমরা তো কোরআন পাঠ করবো এবং আমাদের সন্তানদেরকে পাঠ করাবো। এরপর আমাদের সন্তানেরা তাদের সন্তানদেরকে পাঠ করাবে এবং এ ধারাবাহিকতা এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। তিনি এরশাদ করলেনঃ যিয়াদ, আমি তোমাকে মদীনার একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলে মনে করতাম। ইহুদী ও খৃষ্টানরা কি তৌরাত ও ইঞ্জিলের কিতাব পাঠ করেনা? কিন্তু তৌরাত ও ইঞ্জিলের বিধি-নিষেধের উপর আমল করে না (মুসলমানদেরও এ অবস্থা হয়ে পড়বে)। তিরমিযী শরীফে এই হাদীস এভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে আমি নিজে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ এলম শিক্ষা কর এবং মানুষকে শিক্ষা দান কর, ফারায়েজ শিক্ষা কর এবং মানুষকে শিক্ষা দান কর, কোরআন শিক্ষা কর ও মানুষকে শিক্ষা দান কর। কেননা আমার মৃত্যু হবে এবং এলমও উঠিয়ে নেয়া হবে আর ফেতনা পয়দা হবে। উত্তরাধিকার বিতরণের ব্যাপারে দু' ব্যক্তির মধ্যে মতভেদ হবে, কিন্তু তাদের মধ্যে মীমাংসা করতে পারে এমন তৃতীয় ব্যক্তি পাওয়া যাবে না (অর্থাৎ কোন আলেমই থাকবে না যে মীমাংসা করবে)।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়,

(কেয়ামতের পূর্বে) এলম ছিনিয়ে নেয়ার পন্থা হবে আলেমগণ থাকবেন না, এর এই অর্থ নয় যে তাদের অন্তর থেকে কোরআন বের করে নেয়া হবে। হযরত যিয়াদের সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানা যায় যে এলম উঠিয়ে নেয়ার অর্থ হবে এলমের উপর আমল করা হবেনা অর্থাৎ আমল করার তৌফিক খতম হয়ে যাবে। এই হাদীস সমূহের মর্মে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে যে প্রথমে এলম অনুযায়ী আমল করার তৌফিক উঠিয়ে নেয়া হবে। এরপর তত্বজ্ঞানী, হাক্কানী আলেমগণের সংখ্যাও কমে যাবে যেমন বর্তমান যুগে আলেমদের সংখ্যা কমে গেছে, ইতিপূর্বে আলেমদের সংখ্যা বেশী ছিল। এখন দ্বীনি এলম শিক্ষা ব্যবস্থাও দূর্বল হয়ে পড়েছে।[১]

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, যদি এমন কোরআন আনয়নের জন্যে সমগ্র মানব জাতি এবং জ্বীন জাতি একত্রিত হয় এবং তারা যদি একে অন্যকে সাহায্যও করে, তবুও এমন কোরআন তারা আনতে পারবে না"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, পবিত্র কোরআনে রয়েছে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা, সে রোগ আধ্যাত্মিক হোক বা দৈহিক সকল প্রকার রোগ নিরাময় হয় পবিত্র কোরআন দ্বারা, কিন্তু যারা ইসলামের দুশমন তারা পবিত্র কোরআনের দ্বারা উপকৃত হওয়ার স্থলে তার বিরোধিতা করে এবং আল্লাহ পাকের রহমতের সঠিক মূল্যায়ন তারা করে না।

আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, পবিত্র কোরআন একটি অলৌকিক গ্রন্থ, যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ও রেসালতের দলিল। আর এমনি মহান গ্রন্থ নাজিল করে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। এটি এমনি এক মহান গ্রন্থ যার মোকাবেলা করা সমগ্র মানব ও জ্বীন জাতির পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।[২]

শানে নজুল

এবনে জরীর এবং এবনে এসহাক হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে ইহুদীদের এক দল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললো, আমরা কীভাবে আপনার অনুসারী হতে পারি। আপনি তো আমাদের কেবলা (বায়তুল মোকাদ্দাস) পরিত্যাগ করেছেন। আর আপনি যে কোরআন আমাদের নিকট নিয়ে এসেছেন, তাতো তৌরাতের মত আমাদের মনে হয়না। আমাদের জন্য এমন কোন গ্রন্থ নিয়ে আসুন, যার সত্যতা আমরা উপলব্ধি করতে পারি, অন্যথায় আপনি যে

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৪৬
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৩৮

কালাম নিয়ে এসেছেন অনুরূপ কালাম আমরাও পেশ করতে পারি। তখন এ আয়াত নাজিল হয় এ মর্মে, তোমরা পবিত্র কোরআনের অনুরূপ বাণী কি করে আনবে? কেননা সমগ্র মানব জাতি এবং জ্বীন জাতি যদি একত্রিত হয় এবং পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও এমন মহান বাণী পেশ করতে সক্ষম হবেনা। যদিও আরবের লোকেরা ছিল কবি-সাহিত্যিক, ভাষা-জ্ঞানে অভিজ্ঞ, ভাষার অলংকার সম্পর্কে পারদর্শী। কিন্তু পবিত্র কোরআনের অনুরূপ বাণী পেশ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, কেননা এটি স্বয়ং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের কালাম।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত তখন নাজিল হয়েছে যখন কাফেররা বলেছিল-

لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا

অর্থাৎ আমরা ইচ্ছা করলে, পবিত্র কোরআনের অনুরূপ বাণী পেশ করতে পারি, তারই জবাবে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। আর বাস্তবেও তাই হয়েছে। বিগত প্রায় দেড় হাজার বছরে কেউ পবিত্র কোরআনের অনুরূপ বাণী পেশ করতে সক্ষম হয়নি।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

আর আমি কোরআনের মধ্যে প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তই বার বার বর্ণনা করেছি।

فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا

তবুও অনেকেই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে থাকেনা। পবিত্র কোরআনের পয়গামকে তারা গ্রহণ করেনা। অথচ পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশে। বারে বারে বিভিন্নভাবে সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে পবিত্র কোরআনে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই পবিত্র কোরআনের এ সত্য বাণী গ্রহণ করেনা। আল্লাহ পাকের এ নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা; বরং অকৃতজ্ঞ ও নাফরমান হয়।

এ আয়াত সম্পর্কে আল্লামা বগভী (রঃ) একরামার সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে একবার ওতবা এবনে রবীয়া, শায়বা এবনে রবীয়া, আবু সুফিয়ান এবনে হারব, আবুল বোখতারী, আসওয়াদ এবনুল মোত্তালেব, জোমায়া এবনে আসওয়াদ গং একত্রিত হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বললো। তারা বললোঃ আপনি আমাদের পূর্ব পুরুষকে গালি দিয়েছেন, আমাদের ধর্মকে মন্দ বলেছেন, আমাদের উপাস্যকে বাতিল বলেছেন, এমনি অনেক কিছু করেছেন যা ইতিপূর্বে কেউ করেনি। যদি এর দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য হয় অর্থ-সম্পদ তাহলে বলুন, আমরা আপনার নিকট সর্বাধিক পরিমাণে অর্থ-সম্পদ একত্রিত করে আপনাকে দেই যেন আপনি আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হয়ে যান। আর যদি আপনি সম্মানের প্রয়াসী হন তবে আমরা আপনাকে সরদার মনোনীত করি। আর যদি আপনি ক্ষমতা চান তবে আপনাকে আমরা শাসনকর্তা হিসেবে মেনে নিতে পারি। আর যদি এ

অবস্থা হয় যে কোন জ্বীন আপনার প্রতি ভর করেছে তবে তারও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে আমরা রাজি রয়েছি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা এ পর্যন্ত যা কথা বলেছো কোনটিই সঠিক নয়, আমি পবিত্র কোরআন পেশ করে কোন ধন-সম্পদ চাইনা, ক্ষমতা, নেতৃত্ব আমার কাম্য নয়। আমাকে আল্লাহ্ পাক তোমাদের নিকট নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন, আমাকে একটি কিতাব দান করেছেন এবং আমাকে আদেশ দিয়েছেন, যারা আল্লাহ্ পাকের বিধান মেনে চলে তাদেরকে আমি জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করি। আর যারা আল্লাহ্ পাকের বাণীকে অমান্য করবে তাদেরকে দোযখের ভয় প্রদর্শন করি। আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ পাকের বাণী পৌঁছে দিয়েছি, তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি। যদি তোমরা এ উপদেশ মেনে চল তবে তোমরা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সফলকাম হবে।

পক্ষান্তরে, যদি তোমরা তা অমান্য কর, আমি আল্লাহ্ পাকের হুকুমে সবর করবো। আর অপেক্ষা করবো আল্লাহ্ পাক আমার এবং তোমাদের মধ্যে কি ফয়সালা করেন।[১]

وَقَالُوْا لَنْ
نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ﴿٩٠﴾ اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ
مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ﴿٩١﴾ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ
كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ﴿٩٢﴾ اَوْ يَكُوْنَ
لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ؕ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ
حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا
رَّسُوْلًا ﴿٩٣﴾

তরজমা

(৯০) আর তারা বলে, আমরা কখনও আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো না যতক্ষণ না আমাদের জন্যে ভূমি থেকে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করেন।

(৯১) অথবা আমাদের খেজুর বা আঙ্গুরের একটি বাগান হবে এবং তার ফাঁকে ফাঁকে উত্তম রূপে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত করবেন।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৪৮

(৯২) অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন সে অনুযায়ী আমাদের উপর খণ্ড খণ্ড করে আসমান পতিত করবেন। অথবা আমাদের সম্মুখে আল্লাহ ও ফেরেশতাগণকে উপস্থিত করবেন।

(৯৩) অথবা আপনার একটি সোনালী গৃহ হবে অথবা আপনি আসমানে আরোহণ করবেন আর আপনার এই আসমানে আরোহণ করাতেও আমরা বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ না আপনি আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ করেন যা আমরা পাঠ করবো। (হে রসূল!) আপনি বলুন, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক, আমি তো শুধু একজন প্রেরিত মানুষই।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে পবিত্র কোরআনের অলৌকিকতার উল্লেখ ছিল। মুশরেকরা যখন পবিত্র কোরআনের মোকাবেলা করতে অক্ষম হয় তখন তারা হিংসার বশবর্তী হয়ে অনেক আজগুবি ফরমায়েশ করতে লাগলো আর বললো, যদি আপনি সত্য নবী হন তবে আমাদেরকে এসব নিদর্শন দেখিয়ে দিন (যার আলোচনা পরে আসছে)। কাফেরদের সন্দেহ নিরসন-কল্পে আলোচ্য আয়াত সমূহ নাজিল হয়। এতে রয়েছে তাদের ভিত্তিহীন কথাবার্তার জবাব।[১]

শানে নজুল

আল্লামা বগভী (রঃ) একরামার সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে উতবা, শায়বা, আবু সুফিয়ান, আবু জেহেল, আবদুল্লাহ এবনে আমি উমাইয়া, উমাইয়া এবনে খালফ সহ মক্কার দুরাত্মা কাফেরদের একটি দল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দেখা করে বললো, আমরা আপনার রেসালতে বিশ্বাস করতে পারিনা যে পর্যন্ত না আপনি আমাদের ফরমায়েশ পূর্ণ করেন। আমাদের এই মক্কা শহর চারিপার্শ্বের পাহাড়ের কারণে সংকীর্ণ এবং সংকুচিত হয়ে আছে। এর সম্প্রসারণ সম্ভব হচ্ছে না। ইয়েমেন এবং সিরিয়াবাসীর ন্যায় আমাদের সম্পদও নেই। তাই আপনার প্রতিপালকের নিকট আবেদন করে এ পাহাড়গুলো এখান থেকে সরিয়ে দিন। যাতে করে মক্কা শহরকে সম্প্রসারণ করা যায়। এমনিভাবে আমাদের পূর্ব পুরুষকে জীবিত করতে হবে, তাদের মধ্যে কুশাই এবনে কেলাব কোরায়েশ গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি। সে ছিল অত্যন্ত সত্যবাদী। আমরা তাকে আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো যে আপনি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী। যদি সে আপনাকে সত্যায়িত করে তবে আমরাও আপনাকে সত্যবাদী মনে করবো। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমাকে এজন্যে প্রেরণ করা হয়নি, যে মহান বাণী নিয়ে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে আমি তা তোমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছি। যদি তোমরা মেনে নাও তবে দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের জন্যে তা সৌভাগ্যের কারণ হবে। আর যদি অমান্য কর তবে আমি আল্লাহ পাকের হুকুমের অপেক্ষায় সবর করবো। কাফেররা বললো, আচ্ছা যদি এসব না করেন

তবে আপনি এতটুকু করুন যেন আপনাকে সত্যায়িত করার জন্যে আসমান থেকে ফেরেশতা প্রেরিত হয়। আর আপনাকে যেন কিছু বাগান এবং সোনা-রূপার ভাণ্ডার প্রদান করা হয়, তাতে আমরা আপনাকে যেরূপ দারিদ্র এবং দুঃখ-কষ্টে পতিত দেখতে পাচ্ছি তা লাঘব হয় এবং আমাদের ন্যায় বাজারে গিয়ে আপনাকে রুজির অন্বেষণের চিন্তা না করতে হয়। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ পাক আমাকে এজন্যে প্রেরণ করেননি। আমাকে সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। তখন কাফেররা বললো, তাহলে আমাদের উপর আসমানকে নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা করা হোক। কেননা আপনার দাবী হলো, আপনার প্রতিপালক এমনটি করতে পারেন। এর জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ তোমাদের উপর আসমান ফেলে দেয়া সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন, তিনি ইচ্ছা করলে তা করবেন। তখন জনৈক কাফের বললো, আমরা আপনার কথা ততক্ষণ পর্যন্ত মানবো না যতক্ষণ না আপনি আল্লাহকে এবং ফেরেশতাগণকে আমাদের সম্মুখে এনে আপনার সত্যতার স্বাক্ষ্য প্রদানের ব্যবস্থা করবেন (নাউযুবিল্লাহ)। কাফেরদের এসব কথা শ্রবণ করে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর সাথে তাঁর ফুফু আতেকা বিনতে আবদুল মুত্তালেবের পুত্র আবদুল্লাহ এবনে আবি উমাইয়াও দাঁড়িয়ে গেল। পথে সে বললো, আপনার সম্প্রদায় আপনাকে কয়েকটি কথা বললো, আপনি তার কোনটিই গ্রহণ করেননি। এরপর তারা আরও কিছু বিষয় আপনার কাছে চেয়েছে, এর দ্বারা মনে হয় যে আল্লাহ পাকের দরবারে আপনার বিশেষ মরতবা রয়েছে কিন্তু আপনি সেগুলোও মানেননি। এরপর তারা আপনার নিকট আযাব নিয়ে আসার কথা বলেছে যে সম্পর্কে আপনি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। এখন আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি শুধু তখনই বিশ্বাস করবো যখন আপনি আমার সম্মুখে সিঁড়ি লাগিয়ে আসমানে আরোহণ করবেন আর সেখান থেকে আমার সম্মুখে উন্মুক্ত গ্রন্থ নিয়ে আসবেন এবং আপনার সঙ্গে চারজন ফেরেশতাও আসবে যারা আপনার সত্যতার স্বাক্ষ্য দেবে এবং আমার ধারণা এ কাজটি করলেও আমি আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবো না। কাফেরদের এসব কষ্টদায়ক কথা শ্রবণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন এ আয়াত সমূহ নাজিল হয়।

এবনে জরীর এবনে এসহাকের সূত্রে একরামার বর্ণনা অবলম্বনে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর সায়ীদ এবনে মনছুর সায়ীদ এবনে জুবায়েরের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত সমূহ আবদুল্লাহ এবনে উমাইয়া সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।[১]

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا

"আর তারা বলে, আমরা আপনার কথা মানবো না যতক্ষণ না আপনি আমাদের জন্যে

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৩৮

জমীন থেকে একটা ঝর্ণা প্রবাহিত করেন"।

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনের মোজেযা বা অলৌকিক প্রভাবে কাফেররা পরাজিত হয়ে অত্যন্ত উদ্ভট এবং ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলতে শুরু করে। কখনও বলে, মক্কার বুক চিরে আমাদের জন্যে ঝর্ণা বের করে দিন। কখনও বলে, মক্কার পাহাড়গুলোকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করুন। আর কখনও বলে, যে পর্যন্ত খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান না হয় আর তার ফাঁকে ফাঁকে নহর সমূহ প্রবাহিত না হয় সে পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবো না।

এ আয়াত সমূহের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, যেহেতু কাফেরদের এ সমস্ত কথা শুধু হিংসা-বিদ্বেষ এবং শত্রুতার কারণেই ছিল তাই তাদেরকে এ জবাব দেয়া হয়েছে। যদি ঈমান আনয়নের উদ্দেশে তারা এসব কথা বলতো তবে হয়তো আল্লাহ্ পাক এসব মোজেযাও দেখিয়ে দিতেন। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে এরশাদ হয়েছে, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে তাদের চাহিদা মোতাবেক এসব মোজেযা আমি দেখিয়ে দেব। তবে একথা স্মরণ রাখুন, যদি তারা এসব মোজেযা দেখার পরও ঈমান না আনে, তবে তাদেরকে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেব যা ইতিপূর্বে কোন জাতিকে দেয়া হয়নি। আর যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে আমি তাদের জন্যে তওবা কবুল হওয়ার এবং রহমতের দ্বার উন্মুক্ত রাখবো। হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় কথাটি পছন্দ করেছেন, কেননা তিনি হলেন রহমতে নবী। তাঁর প্রতি অগণিত দরূদ ও সালাম।[১]

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا

"অথবা আপনি যেমন বলেন আমাদের উপর খণ্ড খণ্ড ভাবে আসমান পতিত করবেন অথবা আল্লাহ্ তাআলা এবং ফেরেশতাদেরকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবেন"।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে قبيل শব্দটির অর্থ كفيل অর্থাৎ আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণকে নিজের দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্যে সাক্ষী হিসেবে পেশ করুন। তারা এ মর্মে সাক্ষ্য দেবেন যে আপনার কথা সত্য। আর একথা বিশ্বাস করার কারণে যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তার দায়িত্ব নেবেন আল্লাহ্ পাক, তাঁর রসূল এবং ফেরেশতাগণ।

ইমাম কাতাদা (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে قبيلا শব্দটির অর্থ হলো সামনা সামনি। অর্থাৎ আমাদের চোখের সম্মুখে আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর ফেরেশতাগণকে নিয়ে আসুন।

ফররা বলেছেন, আরবরা বলে لقيت فلا ناقبيلا وقبلا (আমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গে

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৪৯-৫০
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৭২-৭৩
তফসীরে কবর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৫৮

সামনা-সামনি মোলাকাত করেছি)।

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ ۖ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ

"অথবা আপনার একখানি স্বর্ণনির্মিত গৃহ থাকবে কিংবা আপনি আসমানে আরোহণ করবেন আর আপনার এই আসমানে আরোহণেও আমরা বিশ্বাস করবো না যে পর্যন্ত না আপনি একখানি গ্রন্থ নিয়ে আসেন যা আমরা পাঠ করতে পারি"।

ইতিপূর্বে শানে নজুলে বর্ণিত হয়েছে যে এসব কথা আবদুল্লাহ এবনে উমাইয়া নামক কাফের বলেছিল। সে একথাও বলেছিল, শুধু আসমানে আরোহন করা আমাদের ঈমান আনয়নের জন্যে যথেষ্ট হবে না যে পর্যন্ত না এমন গ্রন্থ নিয়ে আসেন যার মধ্যে আপনার সত্যতার বিবরণ থাকবে। আর তাতে আমাদেরকে আপনার অনুসরণ করার আদেশ দেয়া হবে, এমন অবস্থায় আমরা ঈমান আনতে পারি।

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, পবিত্র আমার প্রতিপালক! আমি তো শুধু একজন প্রেরিত মানুষই"।

কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যে সব অযথা আবদার করেছে তার জবাবে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ (হে নবী!) আপনি তাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন যে ইতিপূর্বে পৃথিবীতে যত নবী রসূলগণের আগমন হয়েছে তাঁরা সকলেই মানুষ ছিলেন। আমিও তাঁদের ন্যায় একজন মানুষ। তবে আমি আল্লাহ পাকের মনোনীত রসূল। মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অযথা কোন ফরমায়েশ বা আবদার করা আমার পক্ষে শুধু যে অশোভন তাই নয়, বরং অসম্ভবও। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে বিধি-নিষেধ আসে তা মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই নবী রসূলগণের কাজ। তাই তোমাদের এসব অনর্থক কথা-বার্তা আল্লাহ পাকের দরবারে পৌঁছানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ পাক যুগে যুগে যে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন তাঁদেরকে সে যুগ, পরিবেশ এবং পরিস্থিতি মোতাবেক অনেক মোজেযাও দিয়েছেন। যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার, তাঁর আঙ্গুল মোবারক থেকে পানি প্রবাহিত হওয়ার, সামান্য খাদ্যে তিন হাজার লোকের তৃপ্তি লাভ করার মোজেযা প্রদান করা হয়েছে। এমনিভাবে শবে মে'রাজে মহাশূণ্য পরিশ্রমণ করার তথা আসমানে আরোহণ করার, জান্নাত-দোযখ দেখার এবং আল্লাহ পাকের আরো অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছে। সবার

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৭৩

উপরে স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের দীদার লাভে তিনি ধন্য হয়েছেন যা তাঁর নবুওয়্যতের সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট। এরপরও কাফেররা অনর্থক মোজেযা প্রদর্শনের যে ফরমায়েশ করছে তা শুধু তাদের হিংসা-বিদ্বেষ এবং কালিমালিপ্ত, ঘৃণ্য ও মন্দ স্বভাবের কারণেই করেছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়া হয়েছে। অন্য আয়াতে আরও বিস্তারিতভাবে দূরাত্মা কাফেরদের অযথা আবদারের জবাবে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ..... (সূরা আনআম)

"যদি আপনার প্রতি (হে রসূল!) কাগজে লিখিত কিতাবও অবতরণ করতাম তবুও তারা বলতো এটা স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ..... (সূরা হিজর)

"যদি তাদের জন্যে আসমানের দরজা খুলে দেই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহন করতে থাকে তবুও তারা বলবে, "আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে, বরং, আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়"।

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْقُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ.....

"যদি কোন কোরআন এমন হতো যার দ্বারা পাহাড়কে গতিশীল করা যেত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের সঙ্গে কথা বলা যেত তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করতো না"।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا
اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ﴿٩٤﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ
مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿٩٥﴾ قُلْ كَفٰى
بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ﴿٩٦﴾ وَمَنْ
يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ
دُوْنِهٖ ۭ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ۭ مَاْوٰىهُمْ
جَهَنَّمُ ۭ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿٩٧﴾ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٨﴾ اَوَلَمْ
يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ
مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۭ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ﴿٩٩﴾
قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَاۗىِٕنَ رَحْمَةِ رَبِّىْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ۭ
وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ﴿١٠٠﴾

তরজমা

(৯৪) মানুষের নিকট যখন হেদায়েত উপস্থিত হয়, তখন এই একটি কথাই তাদেরকে ঈমান আনয়নে বারণ করে যে, তবে কি আল্লাহ পাক মানুষকেই রসূল করে প্রেরণ করেছেন?

(৯৫) (হে রসূল!) আপনি বলুন, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারাই নিশ্চিন্ত মনে বিচরণ করতো তবে আমি আসমান থেকে কোন ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করতাম।

(৯৬) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমাদের এবং আমার মধ্যে স্বাক্ষী হিসেবে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট, নিশ্চয় তিনি ভাল ভাবেই তাঁর বন্দাদের খবর রাখেন, লক্ষ্য করেন।

(৯৭) আল্লাহ পাক যাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন তারাই সুপথ প্রাপ্ত হয়। আর

যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, আল্লাহ পাক ব্যতীত আপনি তাদের কোন সহায় পাবেন না। আর কেয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করবো। তাদেরকে অন্ধ, বোবা এবং বধির করে উত্থিত করবো। তারা মুখের উপর চলবে। দোযখই হবে তাদের আবাসস্থল। যখনই তা স্তিমিত হবে তখনই আমি তাদের জন্যে অগ্নি শিখা বাড়িয়ে দেব।

(৯৮) এটিই তাদের শাস্তি। কেননা তারা আমার আয়াত সমূহকে অমান্য করেছিল এবং বলেছিল, আমরা যখন অস্থিতে পরিণত এবং চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যাব, তখন কি আবার নতুন সৃষ্টি হিসেবে পুনরুত্থিত হবো?

(৯৯) তারা কি লক্ষ্য করেনা? যে নিশ্চয় আল্লাহ পাক যিনি আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি তাদের জন্যে স্থির করেছেন এক নির্ধারিত সময়, যাতে কোন সন্দেহ নেই। তবুও সীমালংঘনকারীরা কুফরী করা ব্যতীত ক্ষান্ত হলো না।

(১০০) (হে রসূল!) আপনি বলুন, যদি আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডার তোমাদের হাতে থাকত তবে তা ব্যয় হয়ে যাবে– এ আশংকায় তোমরা তা বন্ধ করে রাখতে, আর মানুষ তো অত্যন্ত কৃপণ।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কে

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেররা রেসালত ও নবুওয়্যত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে বিদ্বেষমূলক যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করে সেগুলোর জবাব স্থান পেয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের আরও একটি সন্দেহের জবাব রয়েছে। কাফেররা বলে, যদি আল্লাহ পাকের রসূল প্রেরণ করার ইচ্ছা হয়েই থাকে, তবে আসমান থেকে কোন ফেরেশতাই পাঠাতেন। মানুষ আবার রসূল হবে কি করে? মূলতঃ কাফেরদের এমনি ভিত্তিহীন, অমূলব কথারই জবাব রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا

"মানুষের নিকট যখন হেদায়েত উপস্থিত হয় তখন এই একটি কথাই তাদেরকে ঈমান আনতে বারণ করে তবে কি আল্লাহ পাক মানুষকেই পয়গম্বর করে প্রেরণ করেছেন"?

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, অনেক লোক ঈমানের নেয়ামত থেকে এজন্যে বঞ্চিত হয়েছে যে তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারেনি যে, কোন মানুষ আল্লাহর রসূল হতে পারেন। তারা প্রথমে আশ্চর্যন্বিত হয়েছে এবং পরে অস্বীকার করেছে, এমনকি তারা সুস্পষ্টভাবে বলে ফেলেছে যে একজন মানুষই কি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে? ফেরআউন এবং তার সম্প্রদায়ও একথাই বলেছিল, আমরা আমাদের ন্যায়

দু'জন মানুষের প্রতি কিভাবে ঈমান আনবো? বিশেষতঃ যখন তাদের সমগ্র সম্প্রদায়ই আমাদের অধীনস্থ রয়েছে। এ ধরণের কথা অন্য নবীগণের পথভ্রষ্ট উম্মতরাও বলেছে। আর কেউ কেউ নবী রসূলগণকে একথাও বলেছে, 'তুমি তো আমাদেরই ন্যায় মানুষ, এমন অবস্থায় তুমি আল্লাহর রসূল কি করে হবে? তুমি তো আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বল। অতএব, বড় এবং বিস্ময়কর কোন নিদর্শন পেশ কর'।

قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا

(হে রসূল!) আপনি বলুন, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা নিশ্চিন্ত মনে বাস করতো আর তাদের আসমানে গমনের অধিকার না থাকত তাহলে আমি আসমান থেকে তাদের জন্যে ফেরেশতাকে রসূল বানিয়ে প্রেরণ করতাম। কিন্তু পৃথিবীতে তো মানুষ বাস করে যারা আসমান থেকে বিধি-নিষেধ নিয়ে আসতে পারেনা, তাই মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে মানুষকে রসূল মনোনীত করে প্রেরণ করা জরুরী ছিল। মানুষের হেদায়েতের জন্যে ফেরেশতা প্রেরণ করা যায় না। আর ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করার মাধ্যমে উদ্দেশ্যও সফল হবেনা। কেননা ফেরেশতা যদি তাদের প্রকৃত রূপে আসে তাহলে মানুষ তাকে দেখতে সক্ষম হবেনা, বরং হেদায়েত লাভের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। আর যদি ফেরেশতা মানব রূপ ধারণ করে আসে, তবে ফেরেশতা রসূল ও মানব রসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকেনা। এখন মানুষ রসূলের ব্যাপারে তোমরা যে অলিক সন্দেহ পোষণ করছো তখনও তাই করবে। অতএব, ফেরেশতাকে রসূল হিসেবে প্রেরণের দাবী সম্পূর্ণ অর্থহীন।

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমাদের ও আমার মাঝে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট"।

কাফেররা বলেছিল, আল্লাহ পাক অথবা ফেরেশতাগণ যদি সামনা-সামনি এসে আমাদেরকে আপনার সত্যতার কথা না বলেন তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবোনা। কাফেরদের এ অন্যায় আবদারের জবাবে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, এর আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহ পাক সর্বদা কার্যতঃ আমার সত্যতার কথা ঘোষণা করছেন। আর আল্লাহ পাকের সাহায্যই যথেষ্ট, তিনি আমার নবুয়্যতের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ অনেক মোজেযা প্রকাশ করার তৌফিক দান করেন।

অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাকের সাক্ষ্য এ বিষয়ে যথেষ্ট যে আমি রেসালতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছি, আল্লাহ পাকের মহান বাণী তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছি এবং সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত ও প্রমাণিত হবার পরও তোমরা নিতান্ত বিদ্বেষের কারণে এর বিরোধিতা করেছ। আর আল্লাহ পাকই আমার ও তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন। যে সত্যকে গ্রহণ করবে, তাকে তিনি সওয়াব দান করবেন, আর যে সত্যকে

প্রত্যাখ্যান করবে, তাকে তিনি শাস্তি দেবেন।

إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

"নিশ্চয় তিনি তাঁর বন্দাদের খবর রাখেন"।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। ভয় প্রদর্শক নবী অথবা তাঁর উম্মত সকলের গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয় সম্পর্কে তিনি ওয়াকেফহাল। তোমাদের নিকট আমার নবুওয়্যতের দাবী সম্পর্কেও তিনি অবগত এবং আমার মাধ্যমে তিনি বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ প্রকাশ করছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ এতে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে এক প্রকার সান্ত্বনা এবং কাফেরদের উদ্দেশে উচ্চারিত হয়েছে কঠোর সতর্কবাণী এ মর্মে, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করছে, যাদের দ্বারা মুসলমানগণ নির্যাতীত-উৎপীড়িত হয়েছেন তাদের শাস্তি অবধারিত।

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ

"আর আল্লাহ্ পাক যাকে পথ প্রদর্শন করেন সে-ই পথ পায়, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আপনি তার কোন সহায় পাবেন না"।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে যারা অস্বীকার করেছে পূর্ববর্তী আয়াতে তাদের সকল সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে। এরপর তাদের উদ্দেশে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আর যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের হেদায়েতের ব্যাপারে অত্যন্ত উদগ্রীব থাকতেন, এজন্যে আলোচ্য আয়াতে তাঁকে বিশেষভাবে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাকের তৌফিক হলেই হেদায়েত লাভ সম্ভব হয়, যাদেরকে আল্লাহ্ পাক হেদায়েতের তৌফিক দান করেন, তারাই হেদায়েত লাভে ধন্য হয়। পক্ষান্তরে, যারা নিজেদের জেদ এবং হঠকারীতার কারণে আল্লাহ্ পাকের সাহায্য এবং তৌফিক থেকে বঞ্চিত হয়, তারা পথভ্রষ্ট হয়। এমনি অবস্থায় তাদেরকে সাহায্য করার মত সাধ্য কারো থাকেনা। কেননা হেদায়েত লাভের ব্যাপারে সাহায্য শুধু আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকেই আসতে পারে। কিন্তু তাদের অন্যায়-অনাচার এবং জেদ ও হঠকারীতা আল্লাহ্ পাকের সাহায্য লাভ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে। পরিণামে তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্নই থেকে যায়।[১]

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا

আর কেয়ামতের দিন আমি তাদেকে অন্ধ, বোবা ও বধির করে উঠাবো। তারা তাদের

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৬৩-৬৪

মুখের উপর চলবে। অথবা তাদেরকে ফেরেশতাগণ মুখের উপর টেনে টেনে নেবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রসূল! তারা মুখের উপর কেমন করে চলবে? তখন তিনি এরশাদ করেনঃ যে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে তাদের পায়ের উপর চালাতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহে তাদেরকে মুখেরও উপরে চালাতে পারবেন।

কেয়ামতের দিন পুনরুত্থানের পন্থা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস আবু দাউদ শরীফে সংকলিত হয়েছে। কেয়ামতের দিন মানুষকে তিনটি পন্থায় পুনরুত্থান করানো হবে। কিছু লোক আরোহী অবস্থায় থাকবে। আর কিছু লোক পদব্রজে চলবে। আর কিছু লোককে ফেরেশতাগণ মুখের উপর টেনে নেবে। তখন এক সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! মুখের উপর কি করে চলবে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যে আল্লাহ্ পাক পায়ের উপর চালাতে পারেন, নিঃসন্দেহে তিনি মুখের উপরও চালাতে পারেন।

নেসায়ী, হাকেম এবং বায়হাকী হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন মানুষকে তিনটি দলে বিভক্ত করে উঠানো হবে।

একদল পোশাক পরিহিত অবস্থায় পানাহার করে যানবাহনে আরোহী অবস্থায় থাকবে। আর এক দল পদব্রজে চলবে এবং দৌড়াতে থাকবে। আর এক দলকে ফেরেশতাগণ মুখের উপর টানতে থাকবে।

عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا

অর্থাৎ তাদেরকে অন্ধ, বোবা ও বধির করে উঠানো হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ, অন্ধ, বোবা ও বধির করে পুনরুত্থানের অর্থ এই নয় যে তারা কিছুই দেখতে পারবে না, কিছুই বলতে পারবে না বা কিছুই শ্রবণ করতে পারবে না; বরং এর অর্থ হলো- যেভাবে তারা পৃথিবীতে আল্লাহ্ পাকের আয়াত সমূহ দেখতে রাজী হতো না, আর সত্যের বাণী গ্রহণ করার উদ্দেশে শ্রবণ করতো না এবং তাদের রসনা দ্বারা আল্লাহ্ পাকের বাণী উচ্চারণ করতো না, ঠিক এমনিভাবে কেয়ামতের দিন তারা এমন কোন দৃশ্য দেখবে না যা তাদের শান্তি ও আনন্দের কারণ হতে পারে এবং তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে এমন কোন কৈফিয়তও পেশ করতে পারবে না যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে, আর এমন কোন কথাও তারা শ্রবণ করবে না, যা তাদের আনন্দের কারণ হতে পারে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে সে সব আয়াতের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যাতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ

"সেদিন পাপীষ্ঠরা দোযখকে দেখবে"।

دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا

"সেখানেই তারা তাদের ধ্বংসকে ডাকবে"।

سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا

"পাপীষ্ঠরা সেখানে ক্রোধ এবং বিরক্তির কথা শ্রবণ করবে"।

এ আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কাফেররা কেয়ামতের দিন দেখবে শুনবে, এমনকি চিৎকারও করবে। অন্য একখানি আয়াতে তিনটি বিষয়কে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا

"কেয়ামতের দিন কাফেররা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখেছি, আমরা শুনেছি, আমাদেরকে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিন, আমরা নেক কাজ করবো"।

এ আয়াত সমূহে প্রকৃত অর্থে দেখা ও শোনার কথা বলা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে পূর্বে বর্ণিত অর্থে দেখা ও শোনার কথা বলা হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হাশরের দিন প্রকৃত অর্থেই কাফেররা অন্ধ, বোবা এবং বধির থাকবে, কিন্তু যখন হিসাবের জন্যে ডাকা হবে এবং দোযখের মুখোমুখি হবে তখন তাদেরকে শ্রবণ শক্তি সহ অন্যান্য ইন্দ্রিয় শক্তি দেয়া হবে।

কোন কোন তফসীরকার একথাও লিখেছেন, হিসাবের পর যখন কাফেরদেরকে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তাদের দেখা-শোনার শক্তি ছিনিয়ে নেয়া হবে।

সায়ীদ এবনে মনসুর এবং বায়হাকী মোহাম্মদ এবনে কা'বের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। দোযখের ভেতর দোযখীরা পাঁচবার আল্লাহ্ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করবে। প্রত্যেক বারই আল্লাহ্ পাক তাদের ফরিয়াদের জবাব দান করবেন। এরপর তারা আর কথা বলতে পারবে না।

مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا

"আর তাদের ঠিকানা হবে দোযখ, যখনই অগ্নি স্তিমিত হবে তখনই আমি তা বাড়িয়ে দেব"।

অর্থাৎ কাফেরদের প্রতি দোযখের আযাব কোন অবস্থাতেই মূলতবী হবে না, কমও হবেনা। যখন তাদের দেহের চামড়া এবং গোশ্ত পুড়ে যাবে এবং অগ্নি কিছুটা স্তিমিত হবে, তাদের শাস্তি লাঘব হবার উপক্রম হবে, তখনই পুনরায় তা বৃদ্ধি করা হবে। কঠোর শাস্তি দেয়ার লক্ষ্যে তাদেরকে নতুন চর্ম ও গোশ্ত দেয়া হবে। আর এভাবেই তাদের শাস্তি হতে থাকবে। তারা অনবরত দোযখের অগ্নিতে দগ্ধ হতে থাকবে। এর কারণ এই যে, পৃথিবীতে তারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবনে বিশ্বাস করতো না। এজন্যে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে বার বার মৃত্যু দেবেন এবং বার বার জীবিতও করবেন। তাদের এ শাস্তি অব্যাহত থাকবে। পরবর্তী আয়াতেও এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এরশাদ

হয়েছেঃ

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا

"এটিই তাদের শাস্তি কেননা তারা আমার আয়াত সমূহকে অমান্য করেছে এবং বলেছে, আমরা যখন অস্থিতে পরিণত এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখন কি পুনরায় নতুন করে উত্থিত হবো"।

বস্তুতঃ এটিই হবে তাদের সমুচিত শাস্তি। পৃথিবীতে অবস্থানকালে যে সত্যকে তারা অবিশ্বাস করেছে, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে তারা সে সত্যেরই মুখোমুখি হবে। দোযখের অগ্নিতে জ্বলে-পুড়ে তারা মর্মে মর্মে এ সত্য উলব্ধি করতে থাকবে। যারা এ যুগেও এসব মূর্খতা প্রসূত খোঁড়া যুক্তির আড়ালে থেকে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তাদের উদ্দেশে রয়েছে এ আয়াতে বিশেষ সতর্কবাণী।[১]

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا

"তারা কি দেখেনা যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক যিনি আসমান ও জমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি তাদের জন্যে একটি সময় নিদৃষ্ট করে দিয়েছেন, পাপীষ্ঠরা তবুও না-শোকরী না করে থাকতে পারেনা"।

এখানে লক্ষ্যনীয়, বিশাল-বিস্তৃত আসমান জমীনের সৃষ্টি নিঃসন্দেহে মানুষের সৃষ্টির চেয়ে অনেক বিরাট, অতীব কঠিন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক তাঁর অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের জীবন্ত নিদর্শন স্বরূপ আসমান জমীন যখন সৃষ্টি করেছেন তখন মানুষের ন্যায় ক্ষুদ্রকায় সৃষ্টিকে পুনর্জীবন দান করা তাঁর পক্ষে আদৌ কঠিন কিছু নয়। কোন প্রকার নমুনা বা দৃষ্টান্ত ব্যতীতই তিনি আসমান জমীন সৃষ্টি করেছেন। এমন অবস্থায় মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে আদৌ কঠিন কাজ নয়। অথচ এ সহজ সত্যকে তারা উপলব্ধি করতে পারেনা।

কাফেররা বলতো, 'এ পর্যন্ত কত মানুষেরই মৃত্যু হয়েছে, কত লোকই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে কিন্তু কাউকেই তো পুনঃর্জীবন লাভ করতে দেখলাম না'।

কাফেরদের এ প্রশ্নের জবাবে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যদি তোমরা পুনর্জীবনের ব্যাপারে এমন সন্দেহ পোষণ কর তবে জেনে রাখ মৃতকে জীবিত করার এবং বিশ্ব মানবকে পুনঃর্জীবন দান করার একটি সময় আল্লাহ পাক নিদৃষ্ট করে রেখেছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সে নিদৃষ্ট সময় আসা মাত্রই তাদের পুনঃর্জীবিত করা হবে এবং তাদের শাস্তি বিধান করা হবে। ঐ নিদৃষ্ট সময় আসতে বিলম্ব হলেও তা অবিশ্বাস

১। তফসীরে মাজেদী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৯৮

করার কোন যুক্তি নেই, কিন্তু এ সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কাফেররা তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাই তাদের শাস্তি অবধারিত আর সে শাস্তি অবশ্যই আসবে। বস্তুতঃ যখন মানুষের মৃত্যু হয় তখনই মানুষের কেয়ামত শুরু হয়।

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّىْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا

"(হে রসূল!) আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালকের করুণা-ভাণ্ডার যদি তোমাদের হাতে থাকত, তবে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এ আশংকায় তোমরা তা বন্ধ করে রাখতে। মূলতঃ মানুষ বড়ই সংকীর্ণ চিত্ত"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম দান ও রহমতের উল্লেখ রয়েছে, আর এ দান স্বরূপই আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নবুওয়্যত ও রেসালত প্রদানে ধন্য করেছেন। এজন্যেই এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا

"নিশ্চয় আপনার প্রতি আল্লাহ পাকের বিরাট দান রয়েছে"।

এরপর ইসলামের শত্রুদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে, তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন হলো, আমরা তখনই আপনার প্রতি ঈমান আনবো যখন আপনি আমাদের শহরে নহর সমূহ প্রবাহিত করবেন এবং খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সমূহ তৈরী করে দেখাবেন, তারই জবাবে আল্লাহ পাক এ আয়াতে এরশাদ করেছেন, (হে রসূল!) আপনি কাফেরদেরকে বলুন, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের করুণা-ভাণ্ডারের মালিক হতে তবে তা শেষ হয়ে যাবে- এ আশংকায় বন্ধ করে রাখতে। মূলতঃ মানুষ বড়ই সংকীর্ণ চিত্ত।

আল্লাহ পাকের মহান দান স্বরূপ তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নবুওয়্যত দান করেছেন এবং তাঁর প্রতি পবিত্র কোরআন নাজিল করেছেন। এমন মহা মূল্যবান নেয়ামত তিনিই দান করতে পারেন, যাঁর রহমত অনন্ত অসীম, অফুরন্ত। যাঁর উদারতা ও মহানুভবতা অন্তহীন, যাঁর এ আশংকা নেই যে নেয়ামত দান করলে ভাণ্ডার ফুরিয়ে যাবে। যদি তোমাদের হাতে আল্লাহ পাকের রহমতের ভাণ্ডার থাকত তবে কি তোমরা বণী হাশেমের অনাথ এক এতীমকে নবুওয়্যতের মহা সম্পদ দান করতে? মূলতঃ এটি হলো আল্লাহ পাকের এক মহান দান। তিনি যাঁকে যোগ্য মনে করেন তাঁকেই এ দানে ধন্য করেন। যে দানের জন্যে তোমরা তাঁকে হিংসা কর, মনে রেখ তোমাদের হিংসা এবং পরশ্রীকাতরতায় আল্লাহ পাকের কাজ বিঘ্নিত হবেনা; বরং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দ্বারা পরিচালিত সত্য ও ন্যায়ের অভিযান স্বাভাবিক গতিতে অব্যাহত থাকবে। তাঁর সৌজন্যে এবং বরকতে তাঁর সাহাবায়ে কেরামের যে নেয়ামত

প্রাপ্য তা তারা পাবে। তাতে কোন ব্যতিক্রম হবেনা।

আলোচ্য আয়াতের رَحْمَةَ رَبِّىْ শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো নবুওয়্যত। আর আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো রিয্ক বা সর্ব প্রকার নেয়ামত।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আরো লিখেছেন, মানুষ সংকীর্ণ চিত্ত, কৃপণ, সে পরমুখাপেক্ষী, সে যদি কোথাও কিছু ব্যয়ও করে তবে তা করে বিনিময় লাভের আকাংক্ষায়। কিন্তু আল্লাহ্ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন তাই তিনি যত ইচ্ছা তত দান করে থাকেন, তাঁর ভাণ্ডার কখনও শেষ হয়না।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ আয়াতে মানুষের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যদি মানুষ আল্লাহ পাকের নেয়ামত লাভ করে তবে তা কৃপণতার কারণে ব্যয় করতে রাজী হয়না। তবে যে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে হেদায়েত লাভ করে সে এরূপ চারিত্রিক দূর্বলতা থেকে মুক্তি পেয়ে থাকে।[২]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ
بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى
مَسْحُوْرًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
بَصَآئِرَ ۚ وَاِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ﴿١٠٢﴾ فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ﴿١٠٣﴾ وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ
لِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ
لَفِيْفًا ﴿١٠٤﴾ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ
نَذِيْرًا ﴿١٠٥﴾

তরজমা

(১০১) আর আমি মুসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দান করি। (হে রসূল) বণী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করুন, মুসা যখন তাদের নিকট উপস্থিত হন, ফেরআউন তাকে বলেছিল, হে মুসা! আমি মনে করি নিশ্চয় তুমি যাদুগ্রস্ত।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৫৬
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৭৬

(১০২) মুসা বলেছিলেন, তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এ সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আসমান যমীনের প্রতিপালকই প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ নাজিল করেছেন। হে ফেরআউন! আমি মনে করি তোমার ধ্বংস আসন্ন।

(১০৩) এরপর ফেরআউন তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করার ইচ্ছা করলো, তখন আমি ফেরআউন ও তার সকল সঙ্গীকে ডুবিয়ে দিলাম।

(১০৪) এরপর আমি বণী ইসরাঈলকে বললাম, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস কর। যখন আখেরাতের ওয়াদার সময় আসবে তখন আমি তোমাদের সকলকে একত্রিত করে হাযির করবো।

(১০৫) আর আমি সত্য সহ কোরআন নাজিল করেছি, আর সত্য নিয়েই তা নাজিল হয়েছে এবং (হে রসূল!) আপনাকে আমি শুধু সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করেছি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে ইসলামের দুশমনদের অনেক প্রশ্নের জবাব ছিল। এ আয়াত সমূহে হযরত মুসা (আঃ)-এর মোজেযা সমূহের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ)-কে ফেরআউন এবং তার দলবলের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দান করেছেন। এতদসত্বেও ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় ঈমান আনেনি। অবশেষে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে। এভাবে হে মক্কার কাফেররা! তোমরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকটও মোজেযার দাবী কর। যদি তোমাদের আবদার অনুযায়ী সে সব মোজেযা প্রকাশ করা হয় তবু তোমরা সর্বশেষ নবীর প্রতি ঈমান আনবে না। যেভাবে দূরাত্মা ফেরআউন তার সকল শক্তি দিয়ে আল্লাহর নবী হযরত মুসা (আঃ)-এর মোকাবেলা করতে পারেনি, ঠিক এমনিভাবে তোমরা আমার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোকাবেলা করতে পারবে না। মুসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক লাঠির মোজেযা দিয়েছেন এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে কোরআনের মোজেযা দিয়েছেন। মুসা (আঃ) ফেরেশতা ছিলেন না মানুষই ছিলেন, প্রকাশ্যে অসহায়, নিরুপায় ছিলেন, কিন্তু আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান ছিলেন। অতএব, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রকাশ্য অসহায় অবস্থা দেখে তোমরা প্রতারিত হয়োনা। তাঁর নিকট রয়েছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের শক্তি। যেভাবে ফেরআউন ও হামান মুসা (আঃ)-এর মোকাবেলা করতে পারেনি; বরং ফেরআউনের ধ্বংসের পর বণী ইসরাঈলকে আল্লাহ পাক মিসরেই আবাদ করেছেন, ঠিক তেমনি পৃথিবীর কোন শক্তিই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোকাবেলা করতে পারবে না। অদূর ভবিষ্যতে মক্কা বিজয় হবে। সারা আরবের নেতৃত্ব আসবে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতে, বণী ইসরাঈলের পূর্ব পুরুষদের জন্মস্থান সিরিয়াও হবে তাঁর করতলগত। এসব কথা দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের

সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।[১]

তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এ আয়াতের সম্পর্কের ব্যাপারে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে উল্লেখিত হয়েছেঃ

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ

(আর কাফেররা বলে, যে পর্যন্ত আমাদের ফরমায়েশ মোতাবেক এই নিদর্শন সমূহ না দেখাবেন সে পর্যন্ত আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবো না।)

তারই জবাবে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ

অর্থাৎ তোমরা যে সব মোজেযার দাবী করছো এর চেয়ে শক্তিশালী এবং শ্রেষ্ঠ মোজেযা আমি ইতিপূর্বে মুসাকে দান করেছি কিন্তু ফেরআউন ও তার দলবল ঐ মোজেযা সমূহ দেখা সত্বেও তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি, পরিণামে তারা হয়েছে ধ্বংস।[২]

আলোচ্য আয়াতে যে নয়টি নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে এ সম্পর্কে তফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ)-এর মতে, এ নয়টি মোজেযা হলো (১) হযরত মুসা (আঃ)-এর রসনার অসুবিধা দূরীভূত হওয়া (২) হযরত মুসা (আঃ)-এর লাঠির আঘাতে সমুদ্রের পানি ফাঁক হয়ে যাওয়া (৩) বণী ইসরাঈলের প্রতি তুফান আসা, (৪) পঙ্গপালের দ্বারা তাদের ফসল বিনষ্ট হওয়া (৫) তাদের খাবারে ব্যাঙ এর সমাবেশ হওয়া (৬) রক্ত প্রবাহিত হওয়া (৭) হযরত মুসা (আঃ)-এর লাঠি (৮) তাঁর হাত চমকদার হওয়া এবং (৯) তাদের গায়ে উকুন হওয়া।

একরামা (রঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ)-এর মতে, নয়টি মোযেজা হলো (১) তুফান (২) পঙ্গপাল (৩) উকুন (৪) ব্যাঙ (৫) রক্ত (এসব দ্বারা বণী ইসরাঈলের প্রতি আযাব হয়) (৬) হযরত মুসা (আঃ)-এর লাঠি, (৭) হযরত মুসা (আঃ)-এর হাত চমকদার হওয়া (৮) দুর্ভিক্ষ এবং (৯) ফল-ফলারী কম হওয়া।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, কিবতীদের এক ব্যক্তি তার স্ত্রী সহ নিদ্রিত ছিল। (হযরত মুসা (আঃ)-এর বদ দোয়ায়) উভয়েই পাথরে পরিণত হয়।

এমনিভাবে একজন স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান অবস্থায় রুটি তৈরী করছিল কিন্তু সে হযরত মুসা (আঃ)-এর শানে বেআদবী করেছিল। এর শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ পাক তাকে পাথরে পরিণত করেন।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭৪-৭৫
২। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৬৩-৬৪

মোহাম্মদ এবনে কা'ব কারযী (রঃ) আল্লাহর অবাধ্য কাফেরদের চেহারা পরিবর্তন হওয়া এবং সমুদ্রে ফাঁক হওয়ার ঘটনাকেও নয়টি স্পষ্ট নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১]

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আদদুররুল মানসুরে আবদুর রাজ্জাক, সায়ীদ এবনে মনসুর, এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম প্রমুখ তফসীরকারগণের উদ্ধৃতি দিয়ে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উল্লেখ করেছেন, নয়টি নিদর্শন হলো (১) হযরত মুসা (আঃ)-এর হাত চমকদার হওয়া (২) লাঠি (৩) তুফান (৪) পতঙ্গ (৫) উকুন (৬) ব্যাঙ (৭) রক্ত (৮) দুর্ভিক্ষ এবং (৯) ফল-ফলারীর অভাব হওয়া।[২]

এ আয়াতের আরও একটি তফসীর

'আয়াত' শব্দের অর্থ বিধান, তথা বণী ইসরাঈল জাতিকে নয়টি বিধান দেয়া হয়েছে। তিরমিযী শরীফ, এবনে মাজা শরীফ সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সংকলিত, হযরত সাফওয়ান এবনে আস্যাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, এক ইহুদী অন্য এক ইহুদীকে বলেছিল, চল এই নবীর নিকট যাই। সে বললো, আরে! নবী বলবেনা, তাহলে সে অত্যন্ত আনন্দিত হবে। যাহোক, তারা উভয়ে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয় এবং নয়টি সুস্পষ্ট বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, নয়টি বিধান হলো (১) কোন কিছুকে আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করোনা (২) চুরি করোনা (৩) ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়োনা (৪) অন্যায় ভাবে কাউকে হত্যা করোনা। (৫) কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে (হত্যা বা বিদ্রোহের অপবাদ দিয়ে) তার শাস্তি বিধানের জন্যে শাসনকর্তার নিকট হাযির করোনা (৬) যাদু করোনা (৭) সুদ গ্রহণ করোনা (৮) কোন সতী নারীর প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ দিয়োনা (৯) জেহাদের সময় পলায়ন করোনা।

'হে ইহুদীরা! তোমাদের ব্যাপারে একটি বিশেষ নির্দেশ হলো, তোমরা শনিবারের ব্যাপারে সীমালংঘন করোনা'।

এসব কথা শ্রবণ করে উভয় ইহুদী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হস্ত মোবারক ও পা মোবারক চুম্বন করলো এবং বললো, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি সত্য নবী। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'তাহলে আমার অনুসরণে তোমাদেরকে কে বাধা দিচ্ছে'? তারা বললো, 'আমরা যদি আপনার অনুসরণ করি, তাহলে ইহুদীরা আমাদেরকে হত্যা করবে'।[৩](আবু দাউদ, নেসায়ী, এবনে মাজা ও তিরমিজী)

তবে আল্লামা কান্দলভী (রঃ) লিখেছেনঃ অধিকাংশ তত্বজ্ঞানীগণ পূর্ববর্তী তফসীরই

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৫৭
২। আদ দুররুল মানসুর, খণ্ড-৪ পৃষ্ঠা-২২৫
৩। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৫৭
আদ দুররুল মানসুর, খণ্ড-৪পৃষ্ঠা-২২৫
তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৬৪

গ্রহণ করেছেন যে আলোচ্য আয়াতের تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ অর্থ হলো নয়টি নিদর্শন। হতে পারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসা (আঃ)-এর ৯টি মোজেযার উল্লেখ করার পর তৌরাতে বর্ণিত ৯টি বিধান বর্ণনা করেছেন, কিন্তু বর্ণনাকারী শুধু বিধানেরই উল্লেখ করেছেন।

অথবা ইহুদীরা যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন সম্পর্কে জানতে চায় তখন তিনি তাদেরকে নিদর্শনের স্থলে নয়টি নির্দেশ জানিয়ে দেন। কেননা নিদর্শন সম্পর্কে অবগত হয়ে কোন কল্যাণ নেই কিন্তু নির্দেশ পালনে রয়েছে সার্বিক কল্যাণ। এজন্যেই ইহুদীদের প্রশ্নের জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বর্ণিত নয়টি নির্দেশ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন, যা উপরোক্ত হাদীসে সংকলিত হয়েছে।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ হযরত মুসা (আঃ)-কে যে সকল মোজেযা দেয়া হয়েছিল সেগুলো তাঁর নবুওয়্যত প্রাপ্তির প্রকাশ্য এবং জ্বলন্ত প্রমাণ ছিল। মোজেযাগুলো হলোঃ (১) লাঠি (২) হাত (৩) দুর্ভিক্ষ (৪) সমুদ্র (৫) তুফান (৬) পতঙ্গ (৭) উকুন (৮) ব্যাঙ এবং (৯) রক্ত।

মোহাম্মদ এবনে কা'ব বলেন যে সে মোজেযাগুলো হলোঃ হাত আলোকিত হয়ে যাওয়া, লাঠি সর্পে পরিণত হওয়া, পাঁচটি হলো সেগুলো যা সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে, আর সম্পদ সমূহ মাটিতে মিশে যাওয়া এবং পাথরের মোজেযা।

হযরক এবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে ঐ মোজেযাগুলো হলোঃ তাঁর হাত, লাঠি, দুর্ভিক্ষ, ফল-ফসলের অভাব, তুফান, পতঙ্গ, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্ত।

এ বর্ণনাটিই অধিক সুস্পষ্ট, সুন্দর। হাসান বসরী (রঃ) এগুলোর মধ্যে দুর্ভিক্ষ এবং ফল-ফসলের অভাব এ দু'টিকে একটি হিসেবে গণনা করেছেন এবং নবম মোজেযা হিসেবে তাঁর লাঠি যাদুকরদের সাপ গিলে খাওয়াকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ সকল মোজেযা থাকা সত্বেও এবং তাদের অন্তরে নবুওয়্যতের প্রতি বিশ্বাস থাকার পরও তারা অহংকার করলো এবং জেদের বশবর্তী হয়ে গুনাহ করতে লাগলো আর জুলুম ও বাড়াবাড়ি স্বরূপ কুফরীর উপর অটল হয়ে থাকলো।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এ আয়াতের সম্পর্ক এই, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট মক্কাবাসী যেভাবে মোজেযা তলব করেছে, সেরূপ মুসা (আঃ)-এর নিকটও তাঁর জাতি তলব করেছিল এবং মোজেযা প্রকাশিতও হয়েছিল কিন্তু তবুও তারা ঈমান আনেনি। ফলে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল। এভাবে যদি আপনার জাতি মোজেযা প্রকাশিত হওয়ার পরও কাফের থেকে যায় তবে তাদেরকেও ছাড়া হবে না। সকলকে এক সঙ্গে ধ্বংস করা হবে।[২]

১। *ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৩৭৯*
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৭৭

যাহোক, আলোচ্য আয়াতে تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ অর্থ হলো ফেরাউন ও তার দলবলকে হযরত মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ দেখানো হয়, যা ছিল হযরত মুসা (আঃ)-এর মোজেযা। হযরত মুসা (আঃ) যখন ফেরআউনকে ভয় প্রদর্শন করেন, তখন ফেরআউন অহংকার করে বললো,

اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا

"আমি মনে করি হে মুসা! তুমি যাদুগ্রস্ত"।

হযরত মুসা (আঃ) তার জবাবে বললেন,

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ

তুমি অবশ্যই অবগত আছ, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকই এসব নিদর্শন নাজিল করেছেন, তিনি ব্যতীত এমন বিস্ময়কর নিদর্শন কেউ পেশ করতে সক্ষম হবেনা। তুমি মনে মনে এসব কথা মেনেও নিয়েছ। কিন্তু জেদ, হঠকারীতা এবং শত্রুতার কারণেই তা অস্বীকার করছো, অথচ এ নিদর্শন সমূহ এত সুস্পষ্ট যা দেখলে অন্তরের দ্বার উন্মুক্ত হয়, সত্যকে গ্রহণ করা সহজ হয়। এসব শুধু আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের নিদর্শনই, এতে যাদুকরী বলতে কিছু নেই। হে ফেরআউন! তুমি যদি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ দেখার পরও এক আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর এবং সত্যকে গ্রহণ না কর তবে তোমার ভয়াবহ পরিণতির কথা আমাকে অবশ্যই বলতে হয়, আর তা হলো-

وَاِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا

(ফেরআউন তোমার ধ্বংস আসন্ন ও অনিবার্য।)

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বণী ইসরাঈল জাতি যুগ যুগ ধরে ফেরআউনের দ্বারা উৎপীড়িত-নির্যাতীত ছিল। হযরত মুসা (আঃ) নির্যাতীত বণী ইসরাঈল জাতিকে সেই মানবেতর জীবন থেকে তথা ফেরআউনের অকথ্য জুলুম থেকে নাজাত দিতে প্রয়াসী হন। বণী ইসরাঈল জাতির নিকট এ ঘটনা সর্বজনবিদিত। তাই আয়াতের শুরুতেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَسْئَلْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ

অর্থাৎ (হে রসূল!) বণী ইসরাঈলের লোকেরা যখন আপনার কাছে আসে তখন আপনি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন, তাদের অভিজ্ঞ এবং নিরপেক্ষ লোকেরা এ ঘটনার বিবরণ দিতে পারবে এবং আপনার কথার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে, এভাবে মুশরেকদের নিকট আপনার সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে।

অথবা এর অর্থ হলো, তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন, এর দ্বারা আপনি নিজেও সান্ত্বনা লাভ করবেন। আর একথা নিশ্চিতভাবে জানতে পারবেন যে, যদি কাফেরদের সকল ফরমায়েশ আপনি পুরো করে দেন, তবুও তারা ঈমান আনবে না।

فَسْئَلْ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আলোচ্য আয়াতের আরও একটি অর্থ বর্ণনা করেছেন তা হলো, 'এরপর আমি মুসাকে বলেছি, ফেরআউন থেকে বণী ইসরাঈলকে চেয়ে নাও'- অর্থাৎ ফেরআউনকে বল সে যেন বণী ইসরাঈলকে তোমার সাথে ছেড়ে দেয়। আর মুসাকে (আঃ) আমি একথা তখন বলেছিলাম, যখন তিনি ফেরআউন ও তার লোকদের নিকট গমন করেছিলেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, আলোচ্য আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মুসা (আঃ)-কে। তফসীরকারগণ উভয় অর্থই গ্রহণ করেছেন। ইমাম রাজী (রঃ)-ও আলোচ্য আয়াতের এ দু'টি অর্থই বর্ণনা করেছেন।[১]

فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّیْ لَاَظُنُّكَ یٰمُوْسٰی مَسْحُوْرًا

ফেরআউন মুসা (আঃ)-কে বললো, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হে মুসা! তোমার প্রতি যাদু করা হয়েছে তথা তুমি যাদুগ্রস্ত, তুমি একটি অসম্ভব কথার দাবীদার তথা তুমি নিজেকে আল্লাহর রসূল বলে দাবী কর। مسحورا শব্দটির অনুবাদ সম্পর্কে কালবী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়া। আর ফররা এবং আবু ওবায়দা বলেছেন, এ শব্দটির অর্থ হলো যাদুকর। আর মোহাম্মদ এবনে জরীর বলেছেনঃ এর অর্থ হলো, তোমাকে যাদু শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তুমি যেসব বিস্ময়কর কথা বল তা যাদুবিদ্যারই ফলশ্রুতি।

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ.....

হযরত মুসা (আঃ) তার জবাবে বললেন, হে ফেরআউন! তুমি যে আমার সত্যতাকে অস্বীকার করছো তা কোন প্রকার ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে নয়; বরং জেনে শুনে এবং ইচ্ছাকৃতভভাবেই তা করছো। তুমি এ সত্য উপলব্ধি করছো যে আমাকে কেউ যাদু করেনি; বরং তুমি নিজেই তোমার সর্বনাশ ডেকে আনছো, তুমি আমার সাথে যে আচরণ করছো তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো তোমার ধ্বংস, তুমি মুখে স্বীকার কর আর না কর, একথা ভাল করেই তুমি জান যে এসব সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো যা তুমি দেখেছ, নিখিল বিশ্বের অধিকর্তা, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী পরাক্রমশালী আল্লাহ পাকই প্রেরণ করেছেন। এ অসাধারণ সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো আমার নিজের তৈরী করাও নয় এবং কোন যাদু বিদ্যার ফলেও নয় এবং কোন দেব-দেবীর শক্তিতেও নয়; বরং যিনি আসমান জমীন সৃষ্টি করেছেন, সেই মহান আল্লাহ পাকই আমার নবুওয়্যতের দাবীর সাহায্যার্থে এসব মোজেযা দান করেছেন যাতে করে পথহারা মানুষ এসব দেখে সঠিক পথের সন্ধান পায়। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি যে তুমি জেদ ও হঠকারীতার বশবর্তী হয়ে এর বিরোধিতা করছো এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে বদ্ধপরিকর হয়ে আছ। এর পরিণাম তোমার ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ফেরআউন

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৫৮
তফসীরে কবীর, ঘণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৬৫

হযরত মুসা (আঃ)-কে নবুওয়্যতের দাবীতে সত্য জানতো কিন্তু জেদের বশবর্তী হয়ে সে অস্বীকার করতো, আল্লাহ্ পাক এ সম্পর্কে অন্যত্র এরশাদ করেছেনঃ

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ (সূরা নমল)

"আন্তরিক বিশ্বাস থাকা সত্বেও তারা অহংকার করে অন্যায়ভাবে তা অস্বীকার করেছে"।

শুধু জানা নয় মানার নাম ঈমান

এতে একথা প্রমাণিত হয়, কোন বিষয় সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হওয়া বা সে সম্পর্কে জানার নাম ঈমান নয়, অর্থাৎ ঈমানের জন্যে শুধু জানা যথেষ্ট নয়, বরং জানার পাশাপাশি মানাও পূর্বশর্ত। যেমন ফেরআউন জানতো যে হযরত মুসা (আঃ) সত্য নবী কিন্তু সে তাঁকে মানতো না, আর এ কারণেই সে বেঈমান অবস্থায় নিমজ্জিত হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে মক্কার কাফরদের অনেকেই জানতো যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের প্রেরিত সত্য নবী, কিন্তু একথা জানা সত্বেও তারা তাঁকে মানতো না। এজন্যে তাদের ঐ জানা কোন কাজে আসেনি। যেমন এ যুগেও অনেক তথাকথিত গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তি ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে জানে কিন্তু মানেনা, এমনকি ইসলামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তারা ভাষণ দেয়, গ্রন্থ রচনা করে কিন্তু ইসলামের কোন বিধি-নিষেধ মানেনা। তাই তারাও এর সুফল লাভ করতে পারেনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতের مسبورا শব্দটির তরজমা হলো, ملعون (অভিশপ্ত), আর মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এ শব্দটির অর্থ হলো ধ্বংসপ্রাপ্ত, আর কাতাদা (রঃ) বলেছেন, যাকে ধ্বংস করা হয়েছে। ফররা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো সে ব্যক্তি যে জন্মগতভাবে কল্যাণমুখী নয়।

হযরত মুসা (আঃ) ফেরআউনের কথার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। কেননা ফেরআউন হযরত মুসা (আঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছে, আমার মনে হয় তুমি যাদুগ্রস্ত। হযরত মুসা (আঃ) বলেছেন, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে তোমার ধ্বংস আসন্ন, তুমি ধ্বংসের দিকেই ধাবিত।

فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ

ফেরআউন তখন মনে করলো মুসা (আঃ)-এর কারণে বণী ইসরাঈলের সাহস বেড়ে না যায় এবং বণী ইসরাঈলরা তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে না দাঁড়ায়, এজন্যে ফেরআউন তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন করে তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুললো এবং তাদেরকে সে দেশ থেকে বিতাড়নের ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। আলোচ্য আয়াতের الارض এর অর্থ হলো, মিসরের জমিন। অথবা সারা পৃথিবী। ফেরআউন চেয়েছিল বণী ইসরাঈলকে হত্যা করে তাদের মূলোৎপাটন করে ফেলে। কিন্তু জীবন ও মৃত্যুর মালিক যে একমাত্র আল্লাহ পাক, এতে কারো চাওয়া না চাওয়ায় কিছু হয়না; বরং যা আল্লাহ পাক চান তাই হয়, আর যা তিনি চান না তা কখনই হয়না। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا

"অতঃপর আমি তাকে এবং তার সকল সঙ্গীকে নিমজ্জিত করি"।

ফেরআউন ও তার দলবলের সলিল সমাধি হয় লোহিত সাগরে। এভাবে সত্য প্রকাশিত হয় এবং বাতিল বিদায় গ্রহণ করে।[১]

وَّقُلْنَا مِنْ بَعْدِهٖ.....

এরপর আমি বণী ইসরাঈলীদের বলি, তোমরা দেশের মধ্যেই অবস্থান কর।

ফেরআউনকে ধ্বংস করার পর আল্লাহ পাক বণী ইসরাঈলীদের জানিয়ে দিলেন ফেরআউন যে জমিন থেকে তোমাদেরকে বহিস্কার করার ষড়যন্ত্র করেছিল, তোমরা সেখানেই বাস কর অর্থাৎ তোমরা সিরিয়া বা মিসর যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিরাপদে বাস কর।

فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا

এরপর আখেরাতের ওয়াদা যখন আসবে তখন আমি তোমাদের সকলকে একত্রিত করে হাযির করবো। সেদিন তোমাদেরকে এবং তোমাদের শত্রুকে একত্রিত করা হবে।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, কেয়ামতের দিন প্রথমে কাফের-মোমেন, ভাল-মন্দ সকলে একত্রিত থাকবে। এরপর আল্লাহ পাক আদেশ দেবেন,

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ (সূরা ইয়াসীন)

"হে পাপীষ্ঠরা, তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও"।

এভাবে কাফেরদেরকে মোমেনদের থেকে পৃথক করে ফেলা হবে।[২]

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ

"আর আমি সত্য সহ পবিত্র কোরআন নাজিল করেছি এবং সত্য নিয়েই তা নাজিল হয়েছে"।

পবিত্র কোরআন সত্যের প্রতীক

যেভাবে আমি মুসা (আঃ)-কে সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ এবং উজ্জল নিদর্শন দিয়ে মানুষকে হেদায়েত করার জন্যে প্রেরণ করেছিলাম ঠিক তেমনি (হে রসূল!) আপনাকেও সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের দায়িত্ব অর্পণ করেছি। সত্য সহ আপনার প্রতি পবিত্র কোরআন নাজিল করেছি। পবিত্র কোরআন হলো সত্যের মূর্ত প্রতীক। যা সত্য তার সন্ধান দেয় পবিত্র কোরআন। আর যা সত্য তাই রয়েছে পবিত্র কোরআনে, আর পবিত্র কোরআন এমনি এক সত্য যার মৃত্যু নেই, যার বিনাশ নেই, যা চির সত্য, যা চির সংরক্ষিত, যার

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন, খণ্ড-১ পৃষ্ঠা-২৯৭-৩০১
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৬০

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবই সত্য।

মূলতঃ হযরত মুসা (আঃ)-এর মোজেযা বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন সম্পর্কে এ ঘোষণা দিয়েছেন যে পবিত্র কোরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জ্ঞান, হেকমত এবং সত্যতার মূর্ত প্রতীক। যেভাবে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআন প্রেরণ করেছেন, অবিকল সেভাবেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তা নাজিল হয়েছে। এতে কোথাও কোন প্রকার হেরফের বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়নি।

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের তফসীর এভাবে করেছেন, আমি পবিত্র কোরআন আসমান থেকে প্রেরণ করছি আর ফেরেশতাদের মাধ্যমে ও হেফাজতে রেখেই আমার রসূলের নিকট নাজিল করেছি। শয়তানের যে কোন হেরফের থেকে তাকে হেফাজত করেছি।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে দু'বার الحق শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, প্রথম বারের অর্থ হলো সেই হেকমত এবং মুসলেহাত যা পবিত্র কোরআন নাজিল করার কারণ হয়েছে। দ্বিতীয়বার যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার তাৎপর্য হলো জ্ঞান ও সত্যতা অর্থাৎ জ্ঞান ও সত্যতার প্রতীক রূপেই পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেযার উল্লেখ করেছেন। সত্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণের জন্যেই চির সত্য পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে। এতে শুধু সত্যই রয়েছে, যে সত্য কোন দিন বিদায় নেয়না, কেননা পবিত্র কোরআনে রয়েছে বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের তওহীদ বা একত্ববাদের দলিল-প্রমাণ, তাঁর গুণাবলীর বিবরণ, আম্বিয়ায়ে কেরামের নবুওয়্যতের কথা, হাশর, নশর এবং কেয়ামতের আসন্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা। মানব জীবনের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে পবিত্র কোরআনে। ইহকাল ও পরকাল উভয় জাহানে মানুষের জীবন-সাধনার সাফল্যের সন্ধান দেয়া হয়েছে পবিত্র কোরআনে। আর এজন্যে সকল প্রকার হেরফের বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে পবিত্র কোরআনকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এর ঘোষণা।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (সূরা হিজর)

"নিশ্চয় আমিই কোরআন নাজিল করেছি, আর নিশ্চয় আমিই এর হেফাজতকারী"।

দ্বিতীয়তঃ وبالحق انزلنا অর্থ হলো শুধু সত্যকে প্রকাশ করার লক্ষ্যেই পবিত্র কোরআন নাজিল করা হয়েছে, অন্য কোন উদ্দেশে নয়।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করছেনঃ আমিই পবিত্র কোরআন নাজিল করেছি, আর

এর হেফাজতের দায়িত্ব আমিই নিয়েছি। পবিত্র কোরআন যেমন সত্য, চিরসত্য এবং মহাসত্য, ঠিক এমনিভাবে পরবর্তী আয়াতাংশে আল্লাহ পাক আরও একটি মহা সত্যের সন্ধান দিয়েছেনঃ

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

অর্থাৎ (হে রসূল!) আমি আপনাকে শুধু সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপেই প্রেরণ করেছি। আপনি আমার তরফ থেকে প্রেরিত সত্য নবী। যারা আল্লাহ পাকের তওহীদের প্রতি, আপনার রেসালতের প্রতি বিশ্বাস করে, ঈমান আনে তাদেরকে সওয়াব এবং নাজাতের সুসংবাদ দেয়া এবং কাফেরদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করাই আপনার কাজ। যদি কোন লোক আপনার প্রতি ঈমান না আনে তবে তার জন্যে আপনি দায়ী নন। যে সত্যকে গ্রহণ করে, সে নিজেই তার দ্বারা উপকৃত হয়।

পক্ষান্তরে, যে অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয় সে নিজেই তার শোচনীয় পরিণাম ভোগ করে।

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴿١٠٦﴾
قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى
عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ
وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ
خُشُوْعًا ﴿١٠٩﴾ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ
الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١١٠﴾
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي
الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ﴿١١١﴾

তরজমা

(১০৬) আমি কোরআন নাজিল করেছি খণ্ড খণ্ড করে যাতে করে (হে রসূল!) আপনি তা মানুষের নিকট থেমে থেমে পাঠ করতে পারেন। আর আমি তা ক্রমশঃ অবতীর্ণ করেছি।

(১০৭) (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, তোমরা কোরআনে বিশ্বাস কর আর নাই

কর, যাদেরকে ইতিপূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন তা পাঠ করা হয়, তখনই তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে।

(১০৮) এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান, আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে।

(১০৯) এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তা তাদের বিনয়কে আরো বাড়িয়ে দেয়।

(১১০) (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহর নামে ডাক, অথবা রহমান নামে, যে নামেই তোমরা ডাক না কেন সকল সুন্দর নামই তো তাঁর। আর তোমরা নামাজে স্বর উচ্চ করোনা এবং অত্যন্ত ক্ষীণও করোনা। এ দু'য়ের মধ্য-পথ অবলম্বন কর।

(১১১) (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকেরই, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, যাঁর কোন শরীক বা অংশীদারও নেই, যিনি কখনও দুর্দশাগ্রস্ত হননা, যে কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। অতএব, সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম ঘোষণা করতে থাক।

তফসীরুল কোরআন

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে পবিত্র কোরআন সত্য সহ নাজিল হয়েছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ 'কোরআনকে আমি নাজিল করেছি'। তাই কাফেররা এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে আল্লাহ পাক কোরআনকে একবারেই কেন নাজিল করলেন না? যার দ্বারা এর আলৌকিকত্ব প্রকাশিত হতে, তারই জবাবে আল্লাহ পাক এ আয়াতে ঘোষণা করেছেনঃ থেমে থেমে পড়ার জন্যে, মর্মার্থ চিন্তা ও গবেষণা করে আমল করাকে সহজ করার জন্য পবিত্র কোরআন ভাগ ভাগ করে নাজিল করা হয়েছে, খণ্ড খণ্ড করে নাজিল করার আরেকটি হেকমত হলো যেন তা হেফজ করা সহজ হয়, যেমন অন্য আয়াতে বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ

(সূরা ছোয়াদ)

(এই বরকতময় কিতাব যা আমি নাজিল করেছি যেন তারা এর আয়াত সমূহ সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে এবং বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।)

অতএব খণ্ড খণ্ড করার কারণ হলো পাঠক সমাজের উপকার করা। তেইশ বছরের সুদীর্ঘ সময়ে পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের فرقنه শব্দের অর্থ সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আমি পবিত্র কোরআনে হক্বকে বাতিল থেকে পৃথক করে দিয়েছি, হক্ব ও

বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করেছি।

আল্লামা সয়ূতী (রঃ) এবনে জরীরের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ পবিত্র কোরআন দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে লাইলাতুল কদরে একবারেই নাজিল হয়েছে। এরপর মুশরেকরা কোন প্রশ্ন করলে, তার জবাব আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নাজিল হতো বা কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সমাধান পেশ করা হতো। এজন্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا (সূরা ফোরকান)

অর্থাৎ আমি খণ্ড খণ্ড করে কোরআন এজন্যে নাজিল করেছি যেন আপনি কাফেরদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন।

তেবরানী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আরেকটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ পাক কোরআনে করীমকে একই সঙ্গে নাজিল করে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে বায়তুল ইজ্জতে রেখে দিয়েছেন। এরপর জিব্রাঈল (আঃ) প্রয়োজন মোতাবেক খণ্ড খণ্ড করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে দেন।

বায়হাকী 'শোআবুল ঈমানে' হযরত ওমর (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা পবিত্র কোরআনের পাঁচ পাঁচখানি আয়াত করে শেখো, কেননা জিব্রাঈল (আঃ) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পাঁচ পাঁচ আয়াত করে নাজিল করতেন।

এবনে আসাকের আবি নাজরার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) আমাদেরকে সকালে পবিত্র কোরআনের পাঁচখানি আয়াত এবং বিকালে পাঁচখানি আয়াত শিক্ষা দিতেন আর তিনি এ খবরও দিতেন যে জিব্রাঈল (আঃ) পাঁচ আয়াত করে নিয়ে আসতেন।

এবনে আবি শায়বা, এবনে জরীর, এবনুল মুনজের হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হলো আমি কোরআনকে নাজিল করেছি সহজ ও সুস্পষ্টভাবে।

এবনে জরীর ও এবনুল মুনজের হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে এর অর্থ হলো, আমি কোরআনকে নাজিল করেছি বিস্তারিতভাবে।[১]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা মাজেদী (রঃ) বলেছেন, পবিত্র কোরআন হেফজ করা এবং তার মর্মবাণী উপলব্ধিকে সহজ করতে আমি তাকে খণ্ড খণ্ড করে নাজিল করেছি।

১। আদ্ দুররুল মানসুর-খণ্ড-৪ পৃষ্ঠা-২২৬

لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ

অর্থাৎ (হে রসূল!) যাতে করে আপনি থেমে থেমে মানুষের নিকট পাঠ করতে পারেন এবং লোকেরা কোরআন শরীফ হেফজ করতে পারে এবং তার মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পারে এবং পবিত্র কোরআন থেকে জীবন-সমস্যার সমাধান গ্রহণ করতে পারে।

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন, তোমরা পবিত্র কোরআনকে সত্য মান বা না মান তাতে কিছু আসে যায় না। অর্থাৎ কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের কোন ফায়দা নেই। আর অবিশ্বাস করলেও পবিত্র কোরআনের কোন ক্ষতি নেই।

বস্তুতঃ যদি তোমরা ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন কর তবে তোমরাই উপকৃত হবে। পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্যে কোন সংযোজন হবেনা। পক্ষান্তরে যদি তোমরা পবিত্র কোরআনকে অবিশ্বাস কর তবে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, তোমাদের ঈমানের উপর পবিত্র কোরআনের সত্যতা নির্ভরশীল নয়, তোমরা তা মান বা না মান তাতে কিছু যায় আসেনা। কেননা পবিত্র কোরআন আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী, পাক কালাম, চির সত্য, চির প্রশংসিত।

اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ

"ইতিপূর্বে যারা জ্ঞান লাভ করেছে, যখন তাদের নিকট পবিত্র কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা সেজদায় পতিত হয়"।

অর্থাৎ তোমরা ঈমান না আনলে কি হয়? যারা ইতিপূর্বে জ্ঞান লাভ করেছে, যখন তাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআন পাঠ করা হয় তখন তারা পবিত্র কোরআনের সত্যতা স্বীকার করে এবং চিবুকের উপরেই সেজদায় পতিত হয়। কেননা তারা ওহীর তাৎপর্য বোঝে, নবুওয়্যতের নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে অবগত হয় এবং হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে, তাছাড়া তারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলীও পাঠ করেছে।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ (যাদেরকে ইতিপূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে) কথাটি দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বেই সত্য ধর্মের অনুসন্ধান করতো আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল। যেমন, যায়েদ এবনে আমর এবনে নফীল (রাঃ), সালমান ফারসী (রাঃ) এবং হযরত আবুজর গেফারী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম। তাঁরা পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সমূহের মাধ্যমে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ

শুনেছিলেন। তাই তাঁর আগমনের জন্যে তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন। এজন্যে পবিত্র কোরআন শ্রবণ করা মাত্রই তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে এটি সেই মহা সত্যবাণী যার সুসংবাদ ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। আর এ অবস্থায় তাদের অন্তরে পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম বেড়ে যায় আর তাঁরা আল্লাহ্ পাকের দরবারে সেজদা রত হন।

প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা শুধু যে পবিত্র কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসীদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে তাই নয়, বরং এর দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এ মর্মে যে, এই জাহেলরা যদি আপনার প্রতি ঈমান না আনে তাতে আপনি চিন্তিতও হবেন না। যারা জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ এবং নিরপেক্ষ তারা তো ঈমান এনেছে। অতএব, যারা ঈমান আনেনি তাদের জন্যে আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না।[১]

وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا

আর তারা আরও বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান, আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্যে পরিণত হবেই হবে, অর্থাৎ পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সমূহে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে যে ঘোষণা করা হয়েছিল তার বাস্তবায়ন হবেই। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের ওয়াদা পূর্ণ হলো।

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ

"তারা চিবুকের উপর সেজদায় পড়ে যায় এবং ক্রন্দন করতে থাকে"।

ইতিপূর্বেও তাদের সেজদায় পতিত হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে, আর তা ছিল সেজদায়ে শোকর। এজন্যে যে আল্লাহ্ পাক তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। আর দ্বিতীয়বার যে সেজদার উল্লেখ রয়েছে তা হলো পবিত্র কোরআনের হেদায়েত লাভের কারণে তাদের অন্তরে যে শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের উপলব্ধি সৃষ্টি হয়েছে তারই বহিঃপ্রকাশ।

وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

"আর এভাবে তাদের বিনয় ও মিনতি আরও বেড়ে যায়"।

অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের বরকতে তাদের অন্তরে বিশ্বাস, ভক্তি, এলম, একীন বৃদ্ধি পায়।

মাসআলা

পবিত্র কোরআন শ্রবণের সময় ক্রন্দন করা মুস্তাহাব, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৬১
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৭৮

থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ভয়ে ক্রন্দণ করে সে দোযখে প্রবেশ করবে না, আর আল্লাহর রাহের বালু এবং দোযখের ধোঁয়া মুসলমানের নাকে একত্রিত হবেনা (অর্থাৎ আল্লাহর রাহে জেহাদ রত অবস্থায় তার নাসিকায় ধূলা প্রবেশ করেছে, এমন মুসলমানের নাসিকায় দোযখের ধোঁয়া প্রবেশ করবে না)।

অবশ্য বায়হাকী সংকলিত এই হাদীসের ভাষা এরূপ। দু' প্রকার চক্ষুর প্রতি দোযখের অগ্নি হারাম করে দেয়া হয়েছে।

(১) যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দণ করেছে। (২) সে চক্ষু যা সারারাত কাফেরদের হামলা থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাজত করেছে।

হাকিম এবনে হাজাম (রাঃ)-এর বর্ণনা এই, আমি নিজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিন প্রকার চক্ষুর উপর দোযখের অগ্নি হারাম করা হয়েছে। (১) সে চক্ষু যা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে, (২) সে চক্ষু যা আল্লার রাহে জাগ্রত রয়েছে, (৩) সে চক্ষু যা আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ দেখার ব্যাপারে বন্ধ রাখা হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবু রায়হানার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সে চক্ষুর উপর দোযখ হারাম, যা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে, যা আল্লাহর রাহে জাগ্রত রয়েছে, আর সে চক্ষুর উপরও দোযখ হারাম যা নিষিদ্ধ বস্তু দেখা থেকে বন্ধ রাখা হয়েছে। তেবরানী এ বর্ণনাকে আল কবীরে সংকলন করেছেন এবং বলেছেন, এ বর্ণনাটি সঠিক।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে মোমেন বন্দার চক্ষু থেকে আল্লাহর ভয়ে অশ্রু নির্গত হয় আর তা যদি মাছির মাথার সমানও হয় তবুও আল্লাহ পাক দোযখকে তার জন্যে হারাম করে দিয়েছেন। (এবনে মাজা)

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ নামে ডাক অথবা রহমান নামে, যে নামেই ডাক না (উভয়ই সঠিক) সকল ভাল নামই আল্লাহ পাকের"।

শানে নজুল

এবনে মরদবিয়া প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেন, একবার হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায় করেছেন এবং ইয়া আল্লাহ, ইয়া রাহমান বলে দোয়া করেছেন। তখন মুশরেকরা বলতে লাগলো, এর অবস্থা দেখ, তিনি আমাদের উপাস্যদেরকে ডাকতে বিরত রাখেন আর নিজে দু'জনকে ডাকেন।

আল্লামা বগভী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রের উল্লেখ করে

লিখেছেন, এক রাত্রে মক্কায় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেজদারত অবস্থায় ইয়া আল্লাহ্, ইয়া রহমান বলেছেন, তখন আবু জেহেল বলেছিল, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে আমাদের মা'বুদকে ডাকতে নিষেধ করে, অথচ নিজে দু'জন উপাস্যকে ডাকে। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

আয়াতের মর্মকথা

আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তা এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই, তিনি ব্যতীত আর কেউ বন্দেগীর যোগ্য নয়। তাঁকে আল্লাহ বলেও ডাকতে পার, অথবা কোন গুণবাচক নাম যেমন, রহমান, রহীম শব্দ দ্বারাও ডাকতে পার। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী লিখেছেন, ইহুদীরা বলেছিল, আপনি আল্লাহকে রহমান বলে ডাকেন অথচ এই শব্দটি তৌরাতে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ পাককে তাঁর যে নামেই ডাক, উদ্দেশ্য তাঁকেই ডাকা হয়।

অতএব, এতে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ পাকের জন্যে রয়েছে উত্তম নাম সমূহ।

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا

"আর নামাজে স্বর উচ্চ করবেন না এবং অত্যন্ত ক্ষীণও করবেন না, তবে এ দু'য়ের মধ্যপথ অবলম্বন করুন"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথম কাফেরদেরকে দ্বীন ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান, তখন কাফেররা শুধু যে দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করেনি তাই নয়; বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি নির্যাতন শুরু করে। সে সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যদি নামাজে উচ্চস্বরে কোরআনে করীম পাঠ করতেন তখন দূরাত্মা কাফেররা আল্লাহ পাক, তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কোরআনকে উপহাস করতো, অকথ্য ভাষায় গালি দিত। এমন অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত নিম্ন স্বরে কোরআনে করীম পাঠ করতে শুরু করেন। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ

(নামাজে পবিত্র কোরআনকে উচ্চস্বরে পাঠ করবেন না যে কাফেররা গালমন্দ দেয়।)

وَلَا تُخَافِتْ بِهَا

(আর এত নিম্নস্বরেও পাঠ করবেন না যে আপনার সাহাবায়ে কেরামও শুনতে না পারে; বরং)

وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا

(এ দু'য়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন।)

অর্থাৎ এত উচ্চস্বরে নয় যে কাফেররা নির্যাতন করতে উপস্থিত হবে। আর এত নিম্ন স্বরেও নয় যে সঙ্গী-সাথীগণও শুনতে পারবেনা; বরং এর মাঝামাঝি স্বরে পবিত্র কোরআন পাঠ করুন, অর্থাৎ মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন, এতে শ্রোতাদের মনও আকৃষ্ট হয় এবং দুশমনদের অত্যাচার থেকেও আত্মরক্ষা করা যায়।

যাহোক, নামাজে পবিত্র কোরআন পাঠ সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) রাতের নামাজে নিম্নস্বরে কোরআনে করীম তেলাওয়াত করতেন, আর হযরত ওমর (রাঃ) অত্যন্ত উচ্চ স্বরে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছেনঃ আপনি নিম্নস্বরে কেন পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন? তিনি বললেন, এটি হলো আমার প্রতিপালকের সঙ্গে গোপন কথা, তিনি আমার সকল প্রয়োজনের কথা ভালভাবেই জানেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এটি অত্যন্ত ভাল। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এত উচ্চস্বরে কেন পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন? তখন তিনি জবাব দিলেন, আমি এর দ্বারা শয়তানকে পলায়নে বাধ্য করি আর ঘুমন্ত লোকদেরকে জাগ্রত করি। এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে একটু উচ্চস্বরে এবং হযরত ওমর (রাঃ)-কে একটু নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করার নির্দেশ দিলেন।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন যে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে দোয়া সম্পর্কে। এভাবে সুফিয়ান সওরী (রঃ) এবং মালেক হেশাম ওরওয়া তাঁর পিতার সূত্রে হযরত আয়েশার (রাঃ) বর্ণনা সংকলন করেছেন যে এ আয়াত নাজিল হয়েছে দোয়া সম্পর্কে। আর এ মত পোষণ করেছেন মুজাহেদ (রঃ), সায়ীদ এবনে জুবায়ের (রঃ) এবং হযরত আবুল ইয়াজ (রঃ), হযরত মাকহুল (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে الصلوة শব্দটি দ্বারা রাত্রের নামাজ উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তা ফরজ হোক যেমন মাগরিব, এশা অথবা নফল যেমন তাহাজ্জুদ। কেননা দিনের নামাজের ব্যাপারে সকলেই একমত যে নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করতে হবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) ইমাম বোখারী (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ঐ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এবনে মরদবিয়া হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন কা'বা শরীফের নিকট নামাজ আদায় করতেন তখন

১। আদদুররুল মানসুর খণ্ড- (৪) পৃষ্ঠা-২২৭
তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৭০
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৮০

উচ্চস্বরে দোয়া করতেন। এ সময় আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

নামাজে প্রিয়নবী (দঃ)-এর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের অবস্থা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনও উচ্চস্বরে কখনও নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর স্বগৃহে থাকতেন তখন উচ্চ স্বরে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতেন যেন গৃহের লোকেরা তেলাওয়াত শ্রবণ করতে পারে। (আবু দাউদ শরীফ)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিভাবে পবিত্র কোরআন পাঠ করতেন, হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) তা পাঠ করে শুনিয়েছেন এবং এক এক শব্দ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পাঠ করেন। (আবু দাউদ, তিরমিজী, নেসায়ী)

হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি আমার বাড়ীতে থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কেরাতের শব্দ শ্রবণ করতাম। (তিরমিজী, নেসায়ী, এবনে মাজা)

আর হযরত উম্মে হানী (রাঃ)-এর ঘর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গৃহের সাথেই ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে কায়েস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র কোরআন পাঠের পন্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, তিনি বলেন, তিনি কখনও উচ্চস্বরে কখনও নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করতেন।[১]

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا

"আর (হে রসূল!) আপনি বলুন, প্রশংসা মাত্রই সেই আল্লাহ পাকের জন্যে যিনি কোন সন্তান-সন্ততি রাখেন না, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীক নেই, যিনি কখনও দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সহায়কের প্রয়োজন হতে পারে, অতএব সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম ঘোষণা কর"।

নামাজের মধ্যে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের নিয়ম-কানুন বর্ণনার পর আল্লাহ পাকের তওহীদ বা একত্ববাদের কথা আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাঁর মাহাত্ম ঘোষণার জন্যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ পাক সর্বগুণে গুণান্বিত, তিনি এক, অদ্বিতীয়, তিনি সর্ব প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র, তিনি সকল প্রকার কলংকের উর্দ্ধে, তাঁর কোন শরীক নেই, কখনও কারো নিকট তাঁকে সাহায্যপ্রার্থী হতে হয়না, তাঁর কারো পরামর্শেরও প্রয়োজন হয়না, তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা, পালনকর্তা, রিয্কদাতা।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৬৬

তিনিই সকলের অধিকর্তা, কোন প্রকার দুর্বলতা তাঁর নেই, তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, সার্বভৌমত্ব শুধু তাঁরই, কোন অবস্থাতেই তিনি কারো নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন না, কোন সহায়ক গ্রহণ করেন না। অতএব, আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মাহাত্মের কথা বর্ণনা করতে থাক, তাঁর মহিমা ঘোষণা করতে থাক।

যেহেতু ইহুদী খৃষ্টানরা বলতো আল্লাহ পাকের সন্তান রয়েছে, তাই তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার বাতুলতা প্রকাশ করে এরশাদ হয়েছে,

لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا

অর্থাৎ তিনি কোন সন্তান-সন্ততি রাখেন না, তিনি এ সব কিছুর উর্দ্ধে। আর যেহেতু মুশরেকরা বলতো যে তাঁর শরীক রয়েছে, তাই তাদের প্রতিবাদে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ

যাঁর রাজত্বে কোন শরীক নেই।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ

অর্থাৎ তাঁর এমন কোন দুর্দশা হয়না যাতে তাঁর কোন সাহায্যের দরকার হতে পারে।

আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্রতার কথা ঘোষণা করে এবং তাঁর শানে হামদ ও সানা পেশ করার নির্দেশ দিয়ে এই সূরা শেষ করেছেন। কারো কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের তিনটি পথ হতে পারে।

(১) কোন বড় তার ছোট থেকে সাহায গ্রহণ করে। যেমন, পিতা তার সন্তান-সন্ততি থেকে সাহায্য গ্রহণ করে।

(২) এমনিভাবে ছোট বড় থেকে সাহায্য গ্রহণ করে। যেমন, পিতা তার সন্তান-সন্ততিকে সাহায্য করে, যেভাবে চাকর তার মনিবের সাহায্য গ্রহণ করে।

(৩) অথবা কেউ তার কোন শরীক বা অংশীদার থেকে সাহায্য গ্রহণ করে।

আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক কারো নিকট সাহায্য প্রার্থী হন না। এই ত্রিবিধ সাহায্যের কোন প্রয়োজন তাঁর নেই।

অতএব, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে মাথা নত করে রাখা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। বস্তুতঃ কাফের-মুশরেক, সাবী এবং মজুসী সহ সকল বাতিল ফেরকার ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াতকে সম্মানের আয়াত বলে নামকরণ করেছেন, কোন কোন হাদীসে রয়েছে, যে গৃহে এ আয়াত পাঠ করা হয়, সে গৃহে চুরি হয়না বা কোন বালা-মসিবত আসেনা।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বের হয়েছি। তাঁর হস্তে মোবারকে আমার হাত ছিল। তিনি একজন

বিপদগ্রস্ত মানুষকে দেখলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি অবস্থা? সে বললো, রোগ এবং বিপদাপদের কারণে আমার এ অবস্থা হয়েছে। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ আমি কি তোমাকে এমন কয়েকটি বাক্য শিখিয়ে দেবনা, যার কারণে তোমার বিপদ কেটে যাবে? তখন সে বললো, অবশ্যই ইয়া রসূলাল্লাহ! শিক্ষা দিন। তিনি এরশাদ করলেন, তুমি বলঃ

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَايَمُوْتُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا

কয়েকদিন পরে লোকটি আসলো, তখন তার অবস্থা ভাল হয়ে গেছে। সে বললো, আপনি যে দোয়া শিখিয়েছিলেন, তার বরকতে আল্লাহ পাক আমার অবস্থা ভাল করে দিয়েছেন।

বর্ণিত আছে যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের সকলকে এই দোয়া শিক্ষা দিতেন।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, ইমাম আহমদ (রঃ) মসনদে হযরত মাআজ জোহানীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে আলোচ্য আয়াত হলো ইজ্জত ও সম্মানের আয়াত। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে মানুষ আল্লাহ পাকের যত হাম্‌দ ও প্রশংসা করুক না কেন এবং তাঁর যত বন্দেগীই করুন না কেন আল্লাহ পাকের হামদ বা বন্দেগীর হক্ব আদায় করতে অক্ষম।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহবান করা হবে যারা সুখ-দুঃখ সকল অবস্থায় অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাকের হাম্‌দ করতো। (তেবরানী বায়হাক্কী, হাকেম)

হযরত আব্দুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, শোকর হাম্‌দের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ যে হাম্‌দ করেনা, সে আল্লাহর শোকরও আদায় করেনা। (বায়হাকী)

হযরত জাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, সর্বোত্তম দোয়া হলো, আলহামদুলিল্লাহ। আর সর্বোত্তম জিকর হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (তিরমিযী, এবনে মাজা)

হযরত সামুরা এবনে জুন্দব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ চারটি বাক্য সর্বাধিক প্রিয়ঃ

(১) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ,

১। আদদুররুল মানসুর, খন্ড-৪ পৃষ্ঠা-২২৯
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৮১

(২) সোবহানাল্লাহ,

(৩) আল্লাহু আকবার,

(৪) আলহামদুলিল্লাহ।

যে বাক্য দিয়েই শুরু কর কোন অসুবিধা নেই। (মুসলিম, আহমদ)

হযরত এমরান এবনে হোসায়েন (রাঃ) বর্ণিত হাদীস তেবরানী সংকলন করেছেন। কেয়ামতের দিন সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে সে সব লোক, যারা সর্বাধিক হাম্‌দ পেশ করেছে।

হযরত আবুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, বন্দার 'সোবহানাল্লাহি বিহামদিহী' বলা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশঃ আবদুল মোত্তালেবের বংশের শিশুদের যখন কথা বলবার সময় হয় তখন এ দোয়াখানি শিক্ষা দাওঃ

الحمد لله الذى لم يتخذ.....

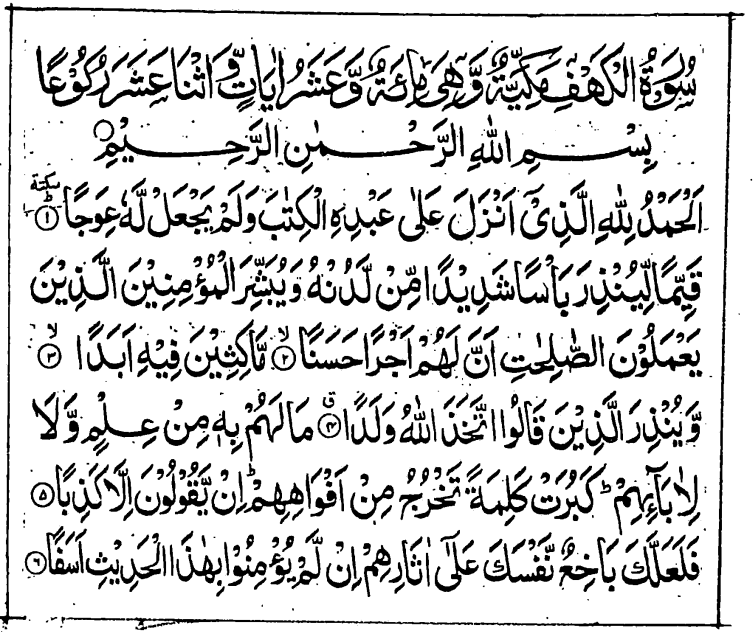
এই আমলের কথা আল্লামা সয়ূতি আদদুররুল মানসুরে লিখেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ২৭শে রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২৬শে সেপ্টেম্বর রোজ শনিবার বা'দ আসর আল্লাহ পাকের বিশেষ তৌফিকে সূরা বণী ইসরাঈলের তফসীর শেষ হলো। হে আল্লাহ! দয়া করে তফসীরে নূরুল কোরআনকে কবুল কর এবং এই তফসীরকে সম্পূর্ণ করার তওফিক দান কর, আমীন।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৬৭

بسم الله الرحمٰن الرحيم

সূরা কাহফ


سُوْرَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةٌ وَّعَشْرُ اٰيَاتٍ وَّاثْنَا عَشَرَ رُكُوْعًا
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۜ ①
قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ
يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۙ ② مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۙ ③
وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ④ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا
لِاٰبَآئِهِمْ ۭ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۭ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ⑤
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ⑥

তরজমা

(১) প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ পাকের জন্যে, যিনি তাঁর বন্দার উপর কিতাব নাজিল করেছেন এবং তাতে কোন প্রকার বক্রতা রাখেননি।

(২) তিনি এ গ্রন্থকে সম্পূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তা এক কঠোর আযাবের ভয় প্রদর্শন করে, যা আসবে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে। আর সুসংবাদ প্রদান করে নেককার মোমেনদেরকে যে, তাদের জন্যে রয়েছে উত্তম বিনিময়।

(৩) ঐ উত্তম প্রতিদানের মধ্যে তারা থাকবে চিরদিন।

(৪) আর সে সব লোকদেরকে সাবধান করার জন্যে, যারা বলে আল্লাহ পাক সন্তান-সন্ততি রাখেন।

(৫) এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই নেই এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরও ছিলনা। কি সাংঘাতিক কথাই না তাদের মুখ থেকে বের হয়। তারা যা বলে সবই মিথ্যা।

(৬) অতঃপর (হে রসূল!) যদি তারা এ বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান না আনে তবে

হয়তো আপনি আক্ষেপ করতে করতে নিজের জীবন বিসর্জন দেবেন।

সূরা কাহফ প্রসঙ্গে

সূরা কাহফ মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ১১০, রুকু-১২।

সূরা কাহফের ফজিলত

হাদীস শরীফে এ সূরার অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। মসনদে আহমদে রয়েছে, একজন সাহাবী এ সূরা তেলাওয়াত করছিলেন, তাঁর গৃহে একটি চতুঃষ্পদ জন্তু ছিল। সে ছুটোছুটি করতে লাগলো। সাহাবী লক্ষ্য করলেন, আকাশে তাঁর গৃহের উপরে একটি মেঘমালা খণ্ড চাদোয়ার মত ছায়া করে রয়েছে। উক্ত সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে যখন এ ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন তিনি এরশাদ করলেন এটি হলো 'সাকীনা', যা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কোরআনে করীম তেলাওয়াতের কারণে নাজিল হয়েছে। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এ সাহাবীর নাম ছিল হযরত ওসায়েদ এবনে হোজায়ের (রাঃ)। মসনদে আহমদে রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত কণ্ঠস্ত করে তাকে দজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করা হবে। অবশ্য তিরমিযীতে তিন আয়াতের উল্লেখ রয়েছে।

মসনদে আহমদে আরো রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম ও শেষাংশ পাঠ করবে, তার জন্যে তা মাথা থেকে পা পর্যন্ত নূর হবে। আর যে সম্পূর্ণ সূরা পাঠ করবে সে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত নূর লাভ করবে।

এবনে মরদবিয়ায় রয়েছে, জুমআর দিন যে ব্যক্তি সূরা কাহফ পাঠ করবে তার পায়ের তলা থেকে আসমান পর্যন্ত নূর প্রদান করা হবে। যা কেয়ামতের দিন অত্যন্ত উজ্জল হবে এবং পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত তার সকল গুনাহ মাফ করা হবে।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি সূরা কাহফ জুমআর দিন পাঠ করে, তার নিকট থেকে বায়তুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত নূরে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

হাকেম অন্য একটি বর্ণনা সংকলন করেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহফ পাঠ করে তার জন্যে দু' জুমআর মধ্যে নূরের আলো হবে।

বায়হাকীতে রয়েছে, যে ব্যক্তি সেভাবে সূরা কাহফ তেলাওয়াত করে যেভাবে নাজিল হয়েছে তবে কেয়ামতের দিন তা তার জন্যে নূর হবে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) প্রত্যেক রাতে এ সূরা পাঠ করতেন। এবনে মরদবিয়া আবদুল্লাহ এবনে মোগাফ্ফালের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে গৃহে এ সূরা কোন রাত্রে পাঠ করা হয় তাতে ঐ রাত্রে ইবলিস শয়তান প্রবেশ করতে পারেনা।

মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নেসায়ী, আহমদ, এবনে হাব্বান প্রমুখ হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করে রাখবে তাকে দজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করা হবে। অন্য একটি বর্ণনায় এ কথাটি সূরায়ে কাহফের শেষ দশ

আয়াত সম্পর্কেও বলা হয়েছে।

কাতাদা (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ সূরা সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি কি সেই সূরা সম্পর্কে তোমাদেরকে বলবো না? যা নাজিল হয়ার সময় সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরণ করেছিল, তা হলো সূরা কাহফ।

সূরা কাহফের আমল

যে ব্যক্তি সূরা কাহফ লিপিবদ্ধ করে একটি বোতলে সংরক্ষণ করে স্বগৃহে রাখবে, সে কারো মুখাপেক্ষী হবেনা এবং ঋণগ্রস্ত হবেনা, আর তার পরিবারবর্গকে কেউ কষ্ট দিতে পারবে না।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

সূরা বণী ইসরাঈল শুরু হয়েছে তসবীহ দ্বারা, আর শেষ হয়েছে হাম্‌দ দ্বারা। আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে হাম্‌দ দ্বারা।

দ্বিতীয়তঃ সূরা বণী ইসরাঈলে একখানি আয়াতের তফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তিনটি প্রশ্ন করেছে। একটি রুহ সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি আসহাবে কাহফ সম্পর্কে তৃতীয়টি জুলকারনাঈন সম্পর্কে। প্রথম প্রশ্নটির জবাব সূরা বণী ইসরাঈলে প্রদান করা হয়েছে, অবশিষ্ট প্রশ্ন দু'টির জবাব এ সূরায় স্থান পেয়েছে।

যেহেতু কাফেরদের এসব প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ও রেসালতকে অস্বীকার করা, তাই এ সূরার শুরুতে পবিত্র কোরআন নাজিল হওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। কেননা পবিত্র কোরআন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ও রেসালতের সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল। এরপর আসহাবে কাহফের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ আসহাবে কাহফের ঘটনা দ্বারা হাশর-নশর তথা মানব জাতির পুনরুত্থানের কথা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য ছিল। এজন্যে আসহাবে কাহফের বর্ণনার পর দুনিয়ার স্থায়িত্বহীনতা এবং কেয়ামত ও আখেরাতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যেভাবে রুহ সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا

অর্থাৎ তোমাদেরকে খুবই অল্প জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে।

ঠিক এমনিভাবে আসহাবে কাহফের বর্ণনার পর এ সূরায় হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত খিজির (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যাতে এ সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাক বন্দাকে যে এলম দান করেছেন তা অতি সামান্য। কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক বিশেষ কোন বিষয়ে এলম দিয়েছেন, আর কাউকে সে এলম না দিয়ে অন্য এলম

দিয়েছেন। হযরত মুসা (আঃ) ও খিজির (আঃ)-এর ঘটনা এ কথারই প্রমাণ যে মানুষকে আল্লাহ পাক অতি সামান্য এলমই দান করেছেন। এ সূরার শেষাংশে জুলকারনাঈনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরপর কেয়ামত এবং আখেরাতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তওহীদ ও রেসালতের বর্ণনার মাধ্যমে সূরা শেষ করা হয়েছে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যেতে পারে। সূরা বণী ইসরাঈলে নবুওয়্যতের শান, উচ্চ মর্তবা এবং সম্মান বর্ণিত হয়েছে এবং নবীর মোজেযার বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর এ সূরায় আল্লাহর ওলীগণের বেলায়েত, তাঁদের কারামত এবং ফকিরী ও দরবেশীর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন এ সূরায় আসহাবে কাহফের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এরা ক'জন সাহসী যুবক ছিলেন। যারা কুফরী, নাফরমানী এবং শেরক থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার নিমিত্তে পলায়ন করেছিলেন এবং একটি গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন। ইমাম বোখারী (রঃ) এ সম্পর্কে কিতাবুল ঈমানে একটি পরিচ্ছেদ সংযোজন করেছেন, যার অর্থ হলো- 'তাদের কথা যারা কুফর ও শেরক থেকে আত্মরক্ষার্থে কোন পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় নিয়েছেন'। এটিও ঈমানের একটি বড় শাখা, কেননা আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ পাকের দিকে পলায়ন কর, দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করা এ কর্মসূচীরই একটি অংশ। যেভাবে সূরা বণী ইসরাঈলে উল্লেখিত হয়েছে যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মদীনা মুনাওয়্যারায় হিজরত করেছেন, ঠিক তেমনি এ সূরায় আসহাবে কাহফের কথা বর্ণিত হয়েছে। যারা ঈমানের হেফাজতের জন্যে এবং কুফর ও শেরক থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

একথা সর্বজনবিদিত, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে পাপাচারের স্থান পরিত্যাগ করা, পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করা একটি বিরাট এবাদত। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নবুওয়্যত লাভের পূর্বক্ষণে লোক সমাজ থেকে দূরে হেরা নামক গুহায় সাধনায় রত হতেন। এর তাৎপর্য হলো, আধ্যাত্মিক সাধনায় সৃষ্টি থেকে দূরে থেকে স্রষ্টার নৈকট্য-ধন্য হওয়ার চেষ্টা সর্বজন স্বীকৃত একটি পন্থা।

যেভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহাশূণ্য পরিভ্রমণ তথা মে'রাজের কথা সূরা বণী ইসরাঈলে বর্ণিত হয়েছে, এমনিভাবে সূরা কাহফে আসহাবে কাহফের পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ ও সাধনায় রত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর জুলকারনাঈনের ঘটনা বর্ণনার পর এ সূরা শেষ করা হয়েছে। এভাবে উভয় সূরার মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

শানে নজুল

এবনে জরীর একরামার সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার

উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কোরায়েশ গোত্রের লোকেরা নজর এবনে হারেস এবং আকাবা এবনে আবি মুয়ীত নামক দু' ব্যক্তিকে মদীনা মুনাওয়্যারায় প্রেরণ করে এবং এ নির্দেশ দেয়, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবস্থা মদীনার ইহুদী ধর্মযাজকদের নিকট বর্ণনা কর এবং ইহুদী ধর্মযাজকদের নিকট তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। কেননা তাদের নিকট জ্ঞানের যে ভাণ্ডার রয়েছে তা আমাদের নেই। আর তারা তাঁর সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত দেয় তা আমাদেরকে অবগত কর। উভয় দূত যথা সময়ে মদীনা শরীফে পৌঁছে ইহুদী ধর্মযাজকদের সঙ্গে সাক্ষাত করে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবস্থা তাদের নিকট বর্ণনা করে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তখন ইহুদী ধর্মযাজকরা বলে, তোমরা তাঁকে তিনটি প্রশ্ন কর, যদি তিনি সঠিক উত্তর দেন, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে তিনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল। আর যদি এ প্রশ্নগুলোর জবাব তিনি না দেন তবে জেনে রাখ যে তিনি সত্যবাদী নন। তিনটি প্রশ্ন হলোঃ

১. সে যুবকগণ কে ছিলেন যারা অতীতকালে বিদায় নিয়েছেন এবং যাদের ঘটনা সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত বিস্ময়কর আর সে ঘটনাগুলো কি?

২. সে ব্যক্তি কে? যে সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়িয়েছে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তার ঘটনাবলী কি?

৩. রুহের তাৎপর্য কি?

কোরায়েশদের প্রেরিত ঐ দু' ব্যক্তি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে এবং কোরায়েশদেরকে তাদের ভ্রমণের ফলাফল জানিয়ে দেয়। এরপর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করে। তিনি এরশাদ করেন, আমি আগামীকাল বলবো।

হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কথা দিলেন যে আগামীকাল তিনি তাদের কথার জবাব দেবেন। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলেননি। ফলে প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে পনের দিন বিলম্ব হয়। এর মধ্যে জীব্রাঈল (আঃ)-ও আসেননি এবং আল্লাহ পাক কোন ওহী প্রেরণ করেননি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত অস্থির হলেন। এদিকে দুবৃত্ত কাফেররা ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলতে লাগলো। অবশেষে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে জীব্রাঈল (আঃ) সূরা কাহফ নিয়ে আগমন করলেন। এ সূরায় দু'টি প্রশ্নের জবাব রয়েছে। আর রুহ সম্পর্কীয় প্রশ্নের জবাব সূরা বণী ইসরাঈলে রয়েছে।[১]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ

"প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ পাকের জন্যে যিনি তাঁর বন্দার উপর কিতাব নাজিল করেছেন"।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৬৭

পবিত্র কোরআন আল্লাহ্ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত

পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের জন্যে সমস্ত প্রশংসা, যিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দা, সর্বাধিক প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান-গর্ভ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন নাজিল করেছেন। মূলতঃ সমস্ত প্রশংসার একমাত্র অধিকারী তিনিই। তাই তাঁর মহান দরবারে পেশ করি সকল প্রশংসা। পবিত্র কোরআন আল্লাহ্ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত যা মানবতার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ পাক বিশ্ববাসীকে এই মহান নেয়ামত দানে বাধিত করেছেন। পবিত্র কোরআন অদ্বিতীয়, মহান আসমানী গ্রন্থ, যার ভাষা প্রাঞ্জল, সরল, যার বর্ণনা-ধারা অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল। পবিত্র কোরআনের বর্ণনায় কোন বক্রতা নেই, এতে নেই কোন জটিলতা, এর জ্ঞান-গর্ভ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য বিবেকবান মানুষ মাত্রেরই মনে দাগ কাটে, আকৃষ্ট করে।

এ আয়াতের ব্যাখায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, পবিত্র কোরআনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, যখনই আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতা বর্ণনার কথা আসে তখনই তার পাশাপাশি আল্লাহ্ পাকের হাম্‌দ বা প্রশংসার কথা উল্লেখিত হয়। যেমন বলা হয় সোবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ। যেহেতু পূর্ববর্তী সূরা বণী ইসরাঈলের শুরুতেই

سُبْحٰنَ الَّذِیْٓ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ.....

বলে আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতা বর্ণনার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তাই এ সূরার শুরুতে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ

বলে আল্লাহ্ পাকের হাম্‌দের কথা এরশাদ হয়েছে। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতা ঘোষণার কথা হবে প্রথমে, এরপর ঘোষণা করা হবে তাঁর হাম্‌দ বা প্রশংসার কথা। এতদ্ব্যতীত এর দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, মে'রাজ হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সর্ব প্রথম উচ্চ মতর্বার কথা। আর তাঁর নিকট পবিত্র কোরআন নাজিল করা হলো তাঁর প্রতি আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করা।

এ পর্যায়ে একথাও উল্লেখ্য, মে'রাজের মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উপরের দিকে গমন করেছেন। আর পবিত্র কোরআন নাজিল হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী উপর থেকে নীচের দিকে এসেছে। এ কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো যারা পথভ্রষ্ট এবং আদর্শচ্যুত, তাদেরকে সতর্ক করা এবং যারা ঈমানদার ও নেককার তাদেরকে উত্তম বিনিময়ের সুসংবাদ প্রদান করা।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আল্লাহ্ পাকই দয়া করে স্বীয় বন্দাদেরকে পবিত্র কোরআনের নেয়ামত দান করেছেন। আর এজন্যে কোরআনের নেয়ামতের উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসার শিক্ষা দিয়েছেন যেন মানব জাতি আল্লাহ্ পাকের এ মহান নেয়ামতের জন্যে তাঁর দরবারে শোকর গুজার হয়। এ শিক্ষার প্রতি আলোচ্য

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৭৩-৭৪

আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে।[১]

وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا

"আর তাতে কোন বক্রতা রাখেননি"।

অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের প্রাঞ্জল ভাষায় এবং তার বর্ণনা-ধারায় কোন প্রকার জটিলতা বা বক্রতা নেই বা তার অর্থের মধ্যেও সামঞ্জস্যহীন কিছু নেই। পবিত্র কোরআনের মাধ্যমেই মানব জাতি গোমরাহীর অন্ধকার থেকে বের হয়ে হেদায়েতের আলোর দিকে আসতে পারে।

قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ

(আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অত্যন্ত কঠিন বিপদ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনকারী।)

তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের قَيِّمًا শব্দটির একাধিক অর্থ বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন, قَيِّمًا শব্দের অর্থ مستقيم অর্থাৎ সরল সঠিক। আর কেউ বলেছেন, এ শব্দটির অর্থ হলো, সকল আসমানী কিতাবের সত্যতার সমর্থক এবং প্রতিপাদক হলো পবিত্র কোরআন। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের قَيِّمًا শব্দটির অর্থ হলো, পবিত্র কোরআন সমগ্র মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন জিন্দেগীর যাবতীয় প্রয়োজনের আয়োজনকারী এবং সার্বিক কল্যাণের ব্যবস্থাকারী।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, পবিত্র কোরআন সম্পর্কে এর প্রত্যেকটি অর্থই প্রযোজ্য।

وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ

আর পবিত্র কোরআন এজন্যে নাজিল হয়েছে যেন তা ঈমানদার নেককার লোকদেরকে উত্তম বিনিময়ের সুসংবাদ প্রদান করে।

পবিত্র কোরআন যেভাবে আল্লাহ্ পাকের কঠিন-কঠোর আযাবের ব্যাপারে মানুষকে ভয় প্রদর্শন করে, ঠিক তেমনি যারা ঈমানদার এবং নেককার তাদেরকে তাদের সত্য-সাধনার জন্যে উত্তম বিনিময়ের সুসংবাদও প্রদান করে।

اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا

অর্থাৎ যারা ঈমানদার ও নেককার, যারা জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে আল্লাহ্ পাকের বিধান মোতাবেক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে থাকে, তাদের জন্যে পরম সুখ ও শান্তির কেন্দ্র বেহেশতের খোশখবরী দেয় পবিত্র কোরআন। আর একথার নিশ্চয়তা বিধানও করে যে বেহেশতবাসীগণ জান্নাতে সাময়িকভাবে কিছু দিনের জন্যে বাস করবে না; বরং তাদের অবস্থান হবে সেখানে চিরস্থায়ী। যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, ঈমানকে সুদৃঢ় করে এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নেক আমল করে তাদের জন্যেই রয়েছে এ সুসংবাদ। আর এ

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৬৯

সুসংবাদ প্রদানের জন্যেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহর বিধি-নিষেধকে অমান্য করে এবং আল্লাহ পাকের রসূলের মহান আদর্শকে উপেক্ষা করে তাদের উদ্দেশে এই পবিত্র কোরআন সতর্কবাণী উচ্চারণ করে কেননা এমন লোকদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। তারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে।

وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا

"(আর পবিত্র কোরআন এজন্যে নাজিল হয়েছে) যেন সে সব লোকদেরকে সতর্ক করে যারা বলে আল্লাহ পাক সন্তান-সন্ততি রাখেন"।

খৃষ্টানরা এ অন্যায় কথা বলে যে, আল্লাহ পাকের সন্তান-সন্ততি রয়েছে (নাউজুবিল্লাহি মিন জালেক) আর ইহুদীরাও এ অন্যায় আচরণে পিছিয়ে নেই, তারা হযরত ওজায়ের (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলেছে (নাউজুবিল্লাহি মিন জালেক)। আর মুশরেকরাও এ অন্যায়ে সম্পূর্ণ শরীক রয়েছে। কেননা তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ পাকের কন্যা বলে বিশ্বাস করতো (নাউজুবিল্লাহি মিন জালেক)। এই সমস্ত পথভ্রষ্ট দূরাত্মা পাপাচারী লোকদেরকে চরম শাস্তির ব্যাপারে ভয় প্রদর্শনের জন্যে পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে।

مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ

"এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই নেই, আর তাদের পূর্ব পুরুষদেরও কোন জ্ঞান ছিল না"।

কেননা, এ কথাটি নিতান্ত অকথ্য, এটি ভিত্তিহীন, বিভ্রান্তিকর এবং সর্ব শ্রেষ্ঠ মিথ্যা। এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আর তাদের নিকট এর স্বপক্ষে কোন দলিল-প্রমাণও নেই। শুধু যে তারা এ ব্যাপারে অজ্ঞ তাই নয়; বরং তাদের পূর্ব পুরুষরাও এ ব্যাপারে ছিল পুরোপুরি অজ্ঞ। মহান আল্লাহ পাকের গুণাবলী সম্পর্কে তারা এবং তাদের পূর্ব পুরুষরা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তারা রয়েছে গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا

"কত সাংঘাতিক কথাই না তাদের মুখ থেকে বের হয়, তারা যা বলে সবই মিথ্যা"।

অর্থাৎ তাদের এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান-বুদ্ধি নেই, কিন্তু তারপরও তারা মহান আল্লাহ পাকের শানে এমন উদ্ভট এবং ভয়ংকর আপত্তিকর মন্তব্য করার মাধ্যমে অমার্জনীয় অপরাধ করে। তারা যা বলে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, তাদের এ মিথ্যা কথার শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর এবং ভয়াবহ।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا

"অতএব, (হে রসূল!) যদি তারা এ বিষয়গুলোর উপর ঈমান না আনে তবে হয়তো আপনি তাদের জন্যে আক্ষেপ করতে করতে নিজের জীবন বিপন্ন করবেন"।

শানে নজুল

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোরায়েশের একটি দলের সঙ্গে এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে কথা বলেন। তাদেরকে পবিত্র কোরআনের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানান। এ দলে ছিল রবীয়ার দু' পুত্র ওতবা এবং শায়বা, আবু জেহেল এবনে হিশাম, নজর এবনে হারেস, আস এবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ এবনে মতলব এবং আবুল বোখতারী।

কিন্তু তারা কোন যুক্তি-প্রমাণ মানতে রাজী হলোনা। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ মজলিস থেকে মনক্ষুণ্ন হয়ে উঠে গেলেন। কোরায়েশ সর্দারদের বিরোধিতা, তাদের আপত্তিকর মন্তব্য, তাঁর উপদেশ গ্রহণ না করা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামর জন্যে ছিল অত্যন্ত কষ্টদায়ক। তাঁর পক্ষে এ কষ্ট যেন অসহনীয় ছিল।

প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে (হে রসূল!) যদি কাফেররা আপনার আহ্বানে সাড়া না দেয়, সরল সঠিক পথ অবলম্বন না করে, পবিত্র কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন না করে, আপনার রেসালতকে অস্বীকার করে তবে এ হতভাগাদের জন্যে আপনি কি আক্ষেপ করতে করতে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে তুলবেন? হে নবী! এর কোন প্রয়োজনই নেই, আপনার দায়িত্ব হলো আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছে দেয়া। এ ব্যাপারে আপনি সফলকাম হয়েছেন, সত্যের প্রচার-প্রসারে আপনি আত্মনিয়োগ করেছেন, হতভাগারা যদি ঈমান না আনে তবে তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না এবং তারা ঈমান না আনলে আপনার কোন ক্ষতি নেই, তাদের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে আপনার প্রচেষ্টা সফল হয়নি, একথা চিন্তা করেও দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা (হে রসূল!) আপনাকে প্রেরণ করেছি ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দাতা রূপে। আর এ কাজটি আপনি সঠিক ভাবেই করেছেন। তাদের ঈমান না আনার জন্যে আপনি দায়ী নন। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন।[১]

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-৭৯
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা ৮৩
আদদুররুন মানসুর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৩২

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝٧
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝٨ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ
وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝٩ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا
رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝١٠ فَضَرَبْنَا
عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝١١ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ
الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۝١٢

তরজমা

(৭) পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে তার শোভা-সৌন্দর্য স্বরূপ করেছি, যেন আমি মানুষকে পরীক্ষা করি যে তাদের মধ্যে কে উত্তম কাজ করে।

(৮) এর উপর যা কিছু আছে সব কিছু কেটে আমি উদ্ভিদ-শূণ্য ময়দানে পরিণত করতে চাই।

(৯) (হে রসূল!) আপনি কি মনে করেন গুহা এবং গর্তবাসীরা আমার কুদরতের নিদর্শন সমূহের মধ্যে বিস্ময়কর?

(১০) যখন উক্ত যুবকরা পর্বত গর্তে গমন করে বসে এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে তোমার রহমত থেকে দান কর এবং আমাদের কাজ-কর্মকে সঠিক ভাবে সম্পন্ন করার তৌফিক দান কর।

(১১) এরপর আমি তাদেরকে গুহায় কয়েক বছর যাবত ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম ।

(১২) পরে আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম। উভয় দলের মধ্যে কে তাদের অবস্থান স্মরণ রেখেছে তা জানার জন্যে ।

তফসীরুল কোরআন

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ

"পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে, তা আমি শোভা-সৌন্দর্য স্বরূপ করেছি যেন মানুষকে পরীক্ষা করি কে ভাল কাজ করে"।

অর্থাৎ পৃথিবীর সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য মানব জাতির জন্যে এক বিরাট পরীক্ষা স্বরূপ। এ শোভা-সৌন্দর্যে মেতে উঠে কে এর স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাককে ভুলে যায়? এ

ক্ষণস্থায়ী জগতের ঐশ্বর্যের আহরণে মুগ্ধ-মত্ত থেকে কে আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর ব্যাপারে গাফলত করে, আর কে একথা চিন্তা করে যে এ বিশ্ব-সভা আর তার বিস্ময়কর শোভা-সৌন্দর্য যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর অসংখ্য নেয়ামত আমরা অহরহ ভোগ করছি। অতএব, আমাদের কর্তব্য হলো তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা এবং তাঁর বিধি-নিষেধ যথাযথ ভাবে পালন করা।

(হে রসূল!) আপনি এ কাফেরদের ব্যাপারে চিন্তিত থাকবেন না যে তারাও জীবন-সংগ্রামে সফল হবে। কেননা যে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে তার শাস্তি অবধারিত। আর যে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চলবে তার জন্যে আখেরাতের চিরশান্তি সুনিশ্চিত।

أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

অর্থাৎ পৃথিবীর সব কিছু পরীক্ষা স্বরূপ এ মর্মে যে কে ভাল কাজ করে, কে উত্তম আদর্শ গ্রহণ করে? আর কে মন্দ কাজ করে?

مَا عَلَى الْأَرْضِ

মুজাহেদ (রঃ) বলেন, পৃথিবীতে যা আছে, এতে মানব-দানব, বৃক্ষ-তরুলতা, ফল-ফুল এক কথায় সৃষ্টি মাত্রই এর অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ বাক্যটি দ্বারা শুধু মানুষকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরকারের মতে, এ শব্দটি দ্বারা ওলামায়ে কেরাম এবং নেককারদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা তাঁরাই পৃথিবীর সৌন্দর্য।

এবনে আবি হাতেম হাসান বসরী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ বাক্যটি দ্বারা সে সব লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যারা আল্লাহ পাকের এবাদতে মশগুল থাকে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যদি এ শব্দটি দ্বারা পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকে উদ্দেশ্য করা হয়, তবে তা অযৌক্তিক হবেনা। কেননা পৃথিবীর সৌন্দর্যে প্রতিটি বস্তুরই অংশ রয়েছে। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা সে সব বস্তুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যার দ্বারা কোন কিছুকে সুসজ্জিত করা হয়। যেমন সুন্দর মনোরম পরিবেশ, সুন্দর বাড়ী-ঘর, বাগ-বাগিচা।[১]

أَحْسَنُ عَمَلًا

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ বাক্যটির ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি এরশাদ করেছিলেনঃ

احسنكم عقلا واورعكم عن محارم الله واسرعكم فى طاعته سبحانه

অর্থাৎ বুদ্ধি যার ভাল, যে আল্লাহর ভয়ে হারাম বস্তুকে বর্জন করে, আল্লাহ পাকের

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৩৩

হুকুম পালনে যে ছুটে চলে তাকেই উত্তম আদর্শের অনুসারী বলা হয়েছে।

এবনে আবি হাতেম হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে এ বাক্যটির অর্থ হলো যারা দুনিয়াত্যাগী হয়, তাদের আমলই উত্তম।

وَإِنَّا لَجٰعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا

"এর উপর যা কিছু রয়েছে, সব কিছু কেটে আমি ময়দান করতে চাই"।

অর্থাৎ দুনিয়ার ঐশ্বর্য এবং সৌন্দর্য যতই মনোরম এবং মনোহর হোক না কেন, এর কোন স্থায়িত্ব নেই। যে যত সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য, ক্ষমতা-প্রভাব-প্রতিপত্তি, জনপ্রিয়তা অর্জন করুক না কেন, কোন কিছুই টিকে থাকবেনা; বরং প্রত্যেককেই বিদায় গ্রহণ করতে হবে এ পৃথিবী থেকে। যদি আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি করা হয় তথা পারলৌকিক সম্পদ অর্জন করা হয় তবে দুনিয়ার সম্পদের সার্থকতা রয়েছে। কেননা আল্লাহ পাক অবশেষে একদিন পৃথিবীর শোভা-সৌন্দর্য, বৃক্ষ-তরুলতা এক কথায় সব কিছু ভেঙ্গে একাকার করে দেবেন এবং সমগ্র পৃথিবীকে সমতল প্রান্তরে পরিণত করবেন। তখন পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য দূরীভূত হবে। এজন্যেই পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ (সূরা নেছা)

(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, দুনিয়ার সম্পদ অতি সামান্য।)

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى (সূরা আ'লা)

(আর আখেরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী।)

মূলতঃ এ কারণেই যারা বাস্তববাদী, পরিণামদর্শী, তারা দুনিয়ার সম্পদের লোভে আল্লাহ পাকের নাফরমানী করেনা, এমনিভাবে কারো ভয়-ভীতি তাদেরকে আল্লাহর অবাধ্য হতে বাধ্য করতে পারেনা। আসহাবে কাহফের ঘটনা এ সত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ যা পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا

"(হে রসূল!) আপনি কি মনে করেন গুহা এবং গর্তবাসীরা আমার কুদরতের নিদর্শন সমূহের মধ্যে বিস্ময়কর"?

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের যে সব বিস্ময়কর নিদর্শন আকাশে-পাতালে ছড়িয়ে আছে তার তুলনায় আসহাবে কাহফের ঘটনা আদৌ এমন বিস্ময়কর কিছু নয়। যিনি কোন স্তম্ভ ব্যতীত নীলাভ আকাশকে চাঁদোয়ার মত করে তুলে রেখেছেন, যিনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টিকে সর্বক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করছেন, যাঁর নির্দেশে এবং মর্জিতে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা সদা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে চলেছে, তাঁর অনন্ত অসীম ক্ষমতার

নিকট আসহাবে কাহফের ঘটনা এমন আর কি আশ্চর্যজনক হতে পারে! যিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হিজরতের রাতে অগণিত কাফেরদের সম্মুখ দিয়ে নিরাপদে বের করে নিয়ে গেলেন আর তারা কিছুই দেখলো না, যিনি মক্কার অদূরে অবস্থিত সওর নামক গুহায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর একমাত্র সাথী হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে দুশমনের কবল থেকে নিরাপদে রাখলেন, তাঁর অনুসন্ধানকারী শত্রুদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করলেন, যিনি নিরস্ত্র-প্রায় ৩১৩জন মুসলমানকে বদরের রণাঙ্গনে বিজয়ী করলেন এবং সহস্র অশ্বারোহী হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করলেন এবং সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পথ সুগম করে দিলেন। ইতিপূর্বে যিনি হযরত মুসা (আঃ)-এর মোকাবেলায় ফেরআউনকে এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মোকাবেলায় নমরুদকে ধ্বংস করলেন, তাঁর অনন্ত অসীম কুদরতের তুলনায় আসহাবে কাহফের ঘটনাকে খুব একটা বিস্ময়কর বলা যায়না। কিন্তু যেহেতু ইহুদীরা এ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছে তাই আলোচ্য আয়াতে এ প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ও রেসালতের বর্ণনা ছিল। আর এ আয়াতে আসহাবে কাহফের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ও রেসালতের প্রমাণ এবং কেয়ামতের সত্যতা ও বাস্তবতার সুস্পষ্ট দলিল। আসহাবে কাহফের ঘটনা কেয়ামতের দলিল এ মর্মে যে আল্লাহ পাক যখন শত শত বছর নিদ্রিত অবস্থায় রাখার পর তাদেরকে জাগ্রত করতে পারেন তখন হাজার হাজার বছর ধরে মৃত অবস্থায় থাকার পর জীবিতও করতে পারেন। কেননা প্রবাদ বাক্য হলো–

"নিদ্রা হলো মৃত্যুর ভাই"।

আসহাবে কাহফ ও রকীম

الكهف। সেই প্রশস্ত গর্তকে বলা হয় যা পাহাড়ের অভ্যন্তরে থাকে। আর رقيم শব্দটির অর্থ লিপিবদ্ধ বস্তু। যেহেতু লোকেরা আসহাবে কাহফের নাম ও তাঁদের ঘটনা একটি পাহাড়ের উপর লিপিবদ্ধ করে এ গর্তের মুখে রেখে দিয়েছিল, তাই তাদেরকে আসহাবে কাহফ ও রকীম বলা হয়। আসহাবে কাহফ ও আসহাবে রকীম একই দলের দু'টি খেতাব। গর্তের অধিবাসী হওয়ার কারণে আসহাবে কাহফ বলা হয়। আর যেহেতু একটি ফলকে তাদের নাম লিপিবদ্ধ ছিল, এজন্যে তাদেরকে আসহাবে রকীম বলা হয়।[১]

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), বলেছেন, رقيم সেই উপত্যকার নাম, যেখানে আসহাবে কাহফ ছিল। আর কাবে আহবার বলেছেন, رقيم সেই শহরের নাম যেখান থেকে আসহাবে কাহফ বের হয়েছিল। কোন কোন ব্যাখ্যাকার

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৮৮

বলেছেন, رقيم ঐ পাহাড়ের নাম যাতে আসহাবে কাহফ এর গর্ত ছিল। এসব অভিমত যাদের, তারা এ মতও পোষণ করেন যে আসহাবে কাহফ ও আসহাবে রকীম একই দল ছিল, ভিন্ন ভিন্ন কিছু ছিলনা। কিন্তু কোন কোন তফসীরকারের মতে, আসহাবে কাহফ ভিন্ন, আসহাবে রকীম ভিন্ন।

আবদ এবনে হোমায়েদ, এবনুল মুনজের, তেবরানী, এবনে আবি হাতেম এবং এবনে মরদবিয়া হযরত নোমান এবনে বশীর (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসহাবে রকীম সম্পর্কে এরশাদ করেছেন যে এরা তিন ব্যক্তি ছিল, যারা একটি গর্তে প্রবেশ করেছিল।

ইমাম আহমদ ও এবনুল মুনজের হযরত আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে পূর্ব কালে তিন ব্যক্তি উপজীবিকার সন্ধানে বের হয়েছিল। পথে বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ায় তারা একটি গর্তে আশ্রয় নেয়। গর্তের ভেতর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড গর্তের মুখে এসে পড়লো। ফলে গর্তের দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। এক ব্যক্তি বললো, আমাদের যে কেউ জীবনে কোন নেক কাজ করে থাকে, সে নেক কাজটির কথা মনে করে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করা উচিত, হয়তো আল্লাহ পাক এর বরকতে আমাদের উপর রহমত নাজিল করবেন। তাদের মধ্যে একজন বললো, আমি একদিন কিছু লোককে কাজের জন্যে রেখেছিলাম। তন্মধ্যে একটি লোক দ্বিপ্রহরে আমার কাছে বিদায় নেয়ার জন্যে আসলো। কেননা সে অর্ধেক দিনে এত কাজ করেছে যে অন্যরা তা সারা দিনে করেছে। আমি তাকে অন্যদের সমান পারিশ্রমিক দান করি। অন্য শ্রমিকদের একজন এ কারণে রাগান্বিত হলো এবং তার পারিশমিক সে আমার নিকট রেখে চলে গেল। আমি তার পারিশ্রমিক ঘরে সংরক্ষণ করলাম। কিছুদিন পর তার ঐ পারিশ্রমিক দ্বারা একটি বকরীর বাচ্চা ক্রয় করলাম। পরবর্তী কালে আল্লাহ পাকের হুকুমে ঐ বকরীর বংশ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সুদীর্ঘ সময় পর সে শ্রমিক আমার নিকট ফিরে আসলো। সে তখন বৃদ্ধ হয়ে গেছে এবং অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে। আমি তাকে চিনতেও পারিনি। সে বললো, আপনার নিকট আমার কিছু হক্ব রয়েছে। এরপর সে তার হক্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তখন আমি তাকে চিনতে পারলাম। পরে আমি তার সমস্ত সম্পদ অর্থাৎ বকরীর পাল তাকে দিয়ে দিলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি তা শুধু তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে করে থাকি তবে আমাদের জন্যে এ বন্ধ দুয়ার খুলে দিও। তখন সঙ্গে সঙ্গে একটু ফাঁক হল, বাইরের আলো আসতে লাগলো।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, আমার কাছে সম্পদ ছিল। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মানুষ জঠর-জ্বালায় কষ্ট পেতে লাগলো। একজন অভাবগ্রস্ত স্ত্রীলোক আমার কাছে আসলো এবং সাহায্যপ্রার্থী হলো। আমি বললাম, আমি তোমার বিনিময় দিতে পারি, শুধু সাহায্য করতে প্রস্তুত নই। সে তাতে অস্বীকতি জানিয়ে প্রত্যাবর্তন করলো। তিনবারই এমন হলো। অবশেষে এ সম্পর্কে সে তার স্বামীর সাথে পরামর্শ করলো। সে বললো, তোমার দুর্দশা এবং অভুক্ত সন্তান-সন্ততির প্রয়োজনে তুমি রাজী হতে পার। তাই স্ত্রীলোকটি আমার কাছে

আসলো। কিন্তু সে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল এবং তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ কম্পমান ছিল। আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, আল্লাহ্ পাকের ভয়ে আমি ভীত-সন্ত্রস্ত। আমি বললাম, এত কষ্টে থেকেও তুমি আল্লাহ্ পাককে ভয় কর আর আমি এমন স্বাচ্ছন্দে থেকেও আল্লাহ্ পাককে ভয় করিনা! তখন আমি অসৎ কাজ থেকে তওবা করলাম এবং ঐ অবস্থায় তার চাহিদা মোতাবেক সম্পদ দ্বারা সাহায্য করলাম। হে আল্লাহ্! যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে ঐ নিঃস্ব স্ত্রীলোকটিকে সাহায্য করে থাকি, তবে আজ তুমি আমাদের এ বিপদ দূর করে দাও এবং এ বন্ধ দুয়ার খুলে দাও। তখন পাথরটি এতখানি সরে গেল যে তারা একে অন্যকে চিনতে পারলো।

তৃতীয় ব্যক্তি বললো, আমার পিতা-মাতা বৃদ্ধ ছিলেন। আমার কাছে কয়েকটি বকরী ছিল। আমি আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে আহার করিয়ে বকরী নিয়ে জঙ্গলে চলে যেতাম। একদিন বকরীগুলো হারিয়ে যাওয়ার কারণে সেগুলোকে একত্রিত করতে বিলম্ব হয়ে গেল। অনেক রাত্রে আমি বাড়ী ফিরলাম এবং দুধের পাত্র হাতে নিয়ে পিতা-মাতাকে পান করাবার উদ্দেশে অপেক্ষায় দাড়িয়ে রইলাম। ভোরে যখন তাঁরা জাগ্রত হলেন, তখন আমি তাঁদেরকে দুধ পান করালাম।

হে আল্লাহ্! যদি আমি এ কাজটি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে করে থাকি, তবে তুমি আমাদের এ বিপদ দূর করে দাও এবং বন্ধ দ্বার খুলে দাও। তখন আল্লাহ্ পাক দয়া করে পাথরটি সরিয়ে দিলেন এবং সকলে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসল।

কোন কোন তফসীরকার বলেন, আসহাবে রকীম বাক্যটি এদের উদ্দেশেই ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

আসহাবে কাহফের ঘটনা

মোহাম্মদ এবনে এসহাক ও অন্যান্য ইতিহাস-বেত্তাগণ লিখেছেন, দাকয়ানুস নামক এক ব্যক্তি রোমের সম্রাট ছিল। লোকটি ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং জালেম। সে শুধু গোঁড়া পৌত্তলিক ও মূর্তিপূজক ছিল তাই নয়, বরং সে জনসাধারণকে বল প্রয়োগ করে মূর্তি পূজার জন্যে বাধ্যও করতো। তাই অনেকেই তার ভয়ে অথবা অর্থ-সম্পদের লোভে মূর্তি পূজা করতো। যার সম্পর্কে সে জানতে পারতো যে সে এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস করে তখন সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করে হাযির করে বলা হতো, হয় মূর্তির সম্মুখে মাথা নত কর, অথবা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও। এভাবে যারা মূর্তি পূজা করতে অস্বীকার করতো তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করা হতো। সমগ্র সাম্রাজ্যে তখন সে তওহীদপন্থীদের বিরুদ্ধে জুলুম-অত্যাচারের স্টীম রোলার চালাচ্ছিল। ঐ দেশেরই কয়েকজন যুবক যারা রাজ পরিবারেরই লোক ছিল তারা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করতো, তওহীদের উপর কায়েম ছিল এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঠিক অনুসারী ছিল। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৭৩-৭৪
তফসীরে দুররে মানসুর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৩৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৮৯

বলেছেন যে তারা ঈসা (আঃ)-এর পূর্বের লোক ছিল। হযরত ঈসা (আঃ)-কে আসমানে তুলে নেয়ার পর তারা জাগ্রত হয়েছেন।[১]

ইমাম তাবারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর পরে এসেছেন। আর তাদের ঘটনা ঘটেছে ঈসা (আঃ)-এর পূর্বে। আল্লামা এবনে কাসীরও (রঃ) লিখেছেন, এ ঘটনা ঈসা (আঃ)-এর পূর্বের। যাহোক, কয়েকজন সত্য-পন্থী যুবক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, আমরা রাজা দাকয়ানুসের জন্যে আল্লাহ পাককে অসন্তুষ্ট করতে পারিনা এবং তওহীদকে বাদ দিয়ে মূর্তিপূজকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারিনা। রাজা দাকয়ানুস তার দরবারে তাদেরকে হাযির করলো এবং বললো, তোমরা যদি মূর্তিপূজা করতে প্রস্তুত না হও এবং আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী থাক তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা করবো। কিন্তু তারা তওহীদি বিশ্বাসে সুদৃঢ় ছিলেন। তাই রাজা দাকয়ানুসের মুখের উপর বলে দিলেন, তোমার যা ইচ্ছা কর, আমরা এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করেছি— যিনি আসমান জমীনের মালিক, তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই, যুবকদের একথা শ্রবণ করে সকলেই বিস্মিত হলো। সে তাদের পরিধেয় মূল্যবান বস্ত্র এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের যে অলংকার তাদের সাথে ছিল তা খুলে নিল এবং বললো, তোমাদের জন্যে যে শাস্তি অপেক্ষা করছে তা অবশ্যই তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। কিন্তু তোমরা বিষয়টি আরো চিন্তা-ভাবনা করে দেখ, তাই তোমাদেরকে আরো কিছু দিনের জন্যে অবকাশ দেয়া হলো। নওজোয়ানরা তখন পরস্পর পরামর্শ করলেন, কঠিন পরীক্ষা সম্মুখে রয়েছে, রাজার নিষ্ঠুর অত্যাচারের সম্মুখে আমরা টিকতে পারবো কি-না, তা জানিনা। তাই আপাততঃ কোন পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করা সমীচিন মনে করি। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তারা আল্লাহ পাকের দরবারে এই বলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তোমার বিশেষ রহমতে আমাদেরকে রক্ষা কর এবং আমাদের কাজকে সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর। তখন তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ী থেকে অনেক সম্পদ নিয়ে নেন। তন্মধ্যে কিছুটা আল্লাহর রাহে খয়রাত করলেন এবং অবশিষ্ট সঙ্গে নিয়ে গর্তের দিকে রওয়ানা হলেন। পথে একজন কৃষক এবং তার কুকুরটিও সাথে সাথে চলতে লাগলো। অনেক চেষ্টা করার পরও তাদেরকে বিদায় করা সম্ভব হলোনা। আল্লাহ পাক সে কুকুরটিকেও বাক শক্তি দান করলেন। সে বললো, তোমরা আমাকে ভয় করোনা, আমি আল্লাহর বন্ধুদেরকে আপন জানি, আমি তোমাদের নিরাপত্তা এবং প্রহরার দায়িত্ব পালন করবো। যখন তারা পাহাড়ের নিকটবর্তী হলো, তখন কৃষক ব্যক্তিটি বললো, আমি এ পাহাড়ের একটি গর্ত সম্পর্কে অবগত, সেখানে আমরা আশ্রয় নিতে পারি। তখন তারা একমত হয়ে পাহাড়ের গর্তের দিকে রওয়ানা হলেন। গর্তে পৌঁছে তারা নামাজ, তসবীহ-তাহলীলে মশগুল হলেন এবং তাদের মধ্যে তামলীখা নামক ব্যক্তির নিকট সকলে নিজ নিজ অর্থ-সম্পদ জমা দেন। তিনি রাত্রি কালে গোপনে নিজের বেশ পরিবর্তন করে শহরে গমন করতেন এবং তাদের জন্যে খাবার নিয়ে আসতেন। শহরের

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২২১

খবরও তিনি তাদেরকে সরবরাহ করতেন। দাকয়ানুস সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে ঐ সাতজন যুবকের অনুসন্ধানের আদেশ দেয়। তালমীখা যখন জানতে পারলেন যে সরকারের তরফ থেকে তাদের খোঁজ করা হচ্ছে এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনকে বাধ্য করা হচ্ছে তাদের ঠিকানা বলার জন্যে, তখন তিনি সামান্য খাবার সংগ্রহ করে ক্রন্দণরত অবস্থায় সাথীদের নিকট আসলেন এবং অবস্থা বর্ণনা করলেন যে সেই নিষ্ঠুর জালেম পুনরায় শহরে এসেছে এবং আমাদের খোঁজ করছে। এ খবর শ্রবণ করে সকলে সেজদারত হলেন এবং আল্লাহ পাকের নিকট ক্রন্দণরত হয়ে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই জালেম থেকে রক্ষা কর। তাঁদের সকলের চক্ষু থেকে অশ্রু ঝরছিল। তারা দোয়া শেষ করে পরস্পর আলাপ করছিলেন এবং একে অন্যকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। তখন আল্লাহ পাক হঠাৎ তাদেরকে নিদ্রিত করে দিলেন এবং কুকুরটি গর্তের মুখে পড়ে রইলো।

এদিকে দাকয়ানুস তাদের খোঁজ করে কোথাও পেল না। শহরের গণ্যমান্য লোকদের সে বললো, এই যুবকদেরকে না পেয়ে আমি অত্যন্ত দুঃখিত, তারা যদি মত পরিবর্তন করতো এবং আমার উপাস্যদের পূজা করতো; তবে আমি তাদের মাফ করে দিতাম। শহরের সর্দাররা বললো, আপনি তো তাদের প্রতি অনেক দয়া করেছেন, তাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন, কিন্তু তারা নিজেদের মত পরিবর্তন করলো না, তারা অবাধ্যই রয়ে গেল। তখন রাজা দাকয়ানুস অত্যন্ত রাগান্বিত হলো এবং ঐ যুবকদের পিতাদের হাযির করার আদেশ জারি করলো। তারা বললো, আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে এই যুবকরা আপনার অবাধ্য হয়েছে এবং কোথাও আত্মগোপন করেছে, যে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিনা, আমরা তো আপনার অবাধ্য নই, দয়া করে আমাদেরকে হত্যা করবেন না। তখন দাকয়ানুস তাদের পিতাদের ছেড়ে দিল এবং যুবকদের অনুসন্ধানে লিপ্ত হলো। দাকয়ানুস এ তথ্য সম্পর্কে অবগত হলো যে তারা পাহাড়ের কোন গর্তে আত্মগোপন করেছে। তাই পরদিন নিজেই সৈন্য দল নিয়ে তাদের খোঁজে বের হলো এবং সে গর্তের কাছে পৌঁছে গেল, যেখানে তারা আত্মগোপন করেছিল। কিন্তু সেখানে দাকয়ানুস এবং তার সঙ্গীদের মনে এমন ভয়-ভীতির সঞ্চার হলো যে, কেউ ঐ গর্তে প্রবেশ করতে সাহস পেলনা। এভাবে আল্লাহ পাক তাঁর নেক বন্দাদেরকে নিষ্ঠুর জালেম দাকয়ানুসের হাতে থেকে রক্ষা করেছেন। আর এভাবেই আল্লাহ পাক হিজরতের রাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর একমাত্র সাথী হযরত আবু বকর (রঃ)-কে আবু জেহল গয়রহের জুলুম থেকে রক্ষা করেছিলেন। কেননা দুশমন গারে সওরের কাছে এসেছিল। এতদসত্বেও তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে দেখতে পায়নি।

যাহোক, দাকয়ানুস যখন তাদের সন্ধান পেলোনা তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তার অন্তরে এই ইচ্ছা হলো যে গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়া হোক, যাতে করে তারা ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত অবস্থায় গর্তের ভেতরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর এ গর্তই তাদের কবরে পরিণত হয়।

দাকয়ানুসের ধারণা ছিল, তারা গর্তের ভেতর জাগ্রত আছে আর তাদের গর্তের দ্বার

বন্ধ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে তারা অবগত আছে। কিন্তু সে জানতো না যে তারা নিদ্রিত অবস্থায় রয়েছে এবং তাদের কুকুরটিও দুয়ারে পড়েছিল। দাকয়ানুসের সঙ্গীদের মধ্যে দু'জন এমন ব্যক্তি ছিল যারা তাদের ঈমানকে গোপন রেখেছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল মুসলমান। তাদের একজনের নাম ছিল বেদরস। আর দ্বিতীয় জনের নাম ছিল রোনাস। তারা দু'টি ফলকের মধ্যে এ নওজোয়ানদের নাম এবং বংশ পরিচয় বিস্তারিতভাবে লিখে তামার সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করে ঐ গর্তে রেখে দেয়। হয়তো আল্লাহ পাক কেয়ামতের পূর্বে কখনও এই নওজোয়ানদের অবস্থা সম্পর্কে কোন মোমেন সম্প্রদায়কে অবগত করবেন।

হাফেজ আসকালানী (রঃ) লিখেছেন, যখন অনেক অনুসন্ধানের পরও আসহাবে কাহফের কোন সন্ধান পাওয়া গেলনা, তখন রাজা দাকুয়ানুস নিজেই এ আদেশ দিয়েছে যে এদের নাম লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা হোক।[১]

যাহোক, সাতজন যুবক যে গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন, সেখানে একাধারে তিনশত বছর নিদ্রিত অবস্থায় রইলেন, এ সময় দাকুয়ানুসের মৃত্যু হয়। তার জুলুমের রাজত্ব শেষ হলো। আর একের পর এক রাজা হয়। কিন্তু আসহাবে কাহফ তিনশত নয় বছর যাবত গভীর নিদ্রায় অতিবাহিত করলেন। যখন তাদের জাগ্রত হওয়ার সময় ঘনিয়ে এল, তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সে দেশে এমন একজন বাদশাহ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন, যিনি তওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন, যিনি এবাদত গুজার, পরহেযগার এবং সুবিচারক ছিলেন। যিনি মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তাঁর আমলেই আসহাবে কাহফ জাগ্রত হলেন। এই রাজা অত্যন্ত নেককার ছিলেন। তাঁর নাম ছিল বেদরোস। ৫৮ বছর তিনি রাজত্ব করেন। সে যুগে কেয়ামত সম্পর্কে অনেক মতভেদ দেখা দেয়। অনেকে কেয়ামতকে অবিশ্বাস করে এবং তারা বলে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন হবেনা। আর কোন কোন লোক বলে, কেয়ামত অবশ্যই হবে তবে আধ্যাত্মিকভাবে হবে, শারীরিক ভাবে নয়। রুহগুলো একত্রিত হবে, দেহগুলো নয়। কেননা মৃত্যুর পর দেহগুলোকে মাটি খেয়ে ফেলে, শুধু রুহ বাকি থাকে। আর কোন কোন লোক বলতো, আত্মা এবং দেহ উভয়েরই হাশর হবে।

যেহেতু তখনকার বাদশাহ ছিলেন অত্যন্ত নেককার ঈমানদার। তাই কেয়ামত সম্পর্কে মানুষের এই মতভেদ তাঁর জন্যে বড় কষ্টদায়ক হয়। তিনি মানুষকে এ সম্পর্কে উপদেশ দেন কিন্তু লোকেরা তা মানতে চায়না।

এ অবস্থা লক্ষ্য করে বেদরোস স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করে দ্বার বন্ধ করে দেন এবং রাত দিন আল্লাহ পাকের দরবারে ক্রন্দন করে এই দোয়া করতে থাকেন, হে পরওয়ারদেগার! তুমি মানুষের মতভেদ সম্পর্কে অবগত রয়েছ, তুমি গায়ব থেকে এমন কিছু নিদর্শন প্রেরণ কর, যার দ্বারা সত্য উদ্ভাসিত হয় এবং বাতিলের বাতুলতা প্রকাশিত হয়। আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করেছেন। ঐ শহরের আলিয়াস নামক এক ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ পাক এ কথাটি এলহাম করলেন যে 'বেণ্যুস' নামক গর্তের উপর যে ইমারত নির্মিত হয়েছে তা

১। ফতহুল বারী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৬৬

ভেঙ্গে তাকে তার বকরী রাখার স্থান করবে। সঙ্গে সঙ্গে তার শ্রমিকরা ঐ ইমারতটি ভাঙ্গতে শুরু করলো। যখন গর্তের মুখের পাথরটি ভেঙ্গে দিল তখন আল্লাহ পাক আসহাবে কাহফকে জাগ্রত করলেন। তাদের ধারণা হলো তারা কিছুক্ষণ নিদ্রিত হওয়ার পর জাগ্রত হয়েছেন। একদিন বা অর্ধেক দিন নিদ্রিত অবস্থায় ছিলেন। অথচ ৩০৯ বছরের এক সুদীর্ঘ সময় এরই মধ্যে অতীতের গর্ভে বিলীন হয়েছে। এই সময়ে জালেম নিষ্ঠুর দাকয়ানুস বিদায় নিয়েছে। তারা জাগ্রত হয়ে নামাজ আরম্ভ করলেন। নামাজের পর তারা ক্ষুধা অনুভব করে তামলীখাকে বললেন, শহরে যাও, আহার্য দ্রব্য সংগ্রহ করে আন। জালেম দাকয়ানুস এবং শহরবাসীর অবস্থাও জানার চেষ্টা কর। তামলীখা বললেন, গতকাল শহরে তোমাদের খোঁজ করা হয়েছে। জালেম রাজার ইচ্ছা হলো, তোমাদেরকে পাকড়াও করে মূর্তির সম্মুখে সেজদা করতে বাধ্য করবে, যদি তোমরা তাতে প্রস্তুত না হও তবে তোমাদেরকে হত্যা করবে। তাদের মধ্যে মেকসালমীনা নামক ব্যক্তি বললেন, ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমরা জান, একদিন অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে হাযির হতে হবে, অতএব আল্লাহর এ দুশমনের কথায় তোমরা কুফর ও শেরক করোনা। এরপর তামলীখাকে বললেন, তুমি শহরে যাও এবং জানার চেষ্টা কর দাকয়ানুস আমাদের সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, খুব সতর্ক হয়ে যাবে আর অতি সত্বর আমাদের নিকট ফিরে আসবে, কেননা আমরা সকলেই ক্ষুধার্ত। তামলীখা তার পোশাক পরিবর্তন করলো। শ্রমিকদের ন্যায় অপরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করলেন। দাকয়ানুসের যুগের কিছু মুদ্রা সংগ্রহ করে শহরের দিকে রওয়ানা হন। যেহেতু মনে দাকয়ানুসের ভয় অত্যন্ত বেশী ছিল সেজন্যে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সতর্কতা অবলম্বন করলেন এবং ধীর গতিতে অগ্রসর হলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, শহরের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অনেক ঈমানদার লোকও দেখলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি আশ্চর্যন্বিত হন এবং চিন্তা করলেন যে হয়তো এটি সেই তারসুস শহর নয়। এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাস করলেন, এই শহরটির কি নাম? সে বললো, তারসুস। যাহোক তামলীখা রুটি বিক্রেতার দোকানে পৌঁছে দাকয়ানুসের যুগের মুদ্রা দোকানদারকে দেন এবং বললেন, এর বিনিময়ে খাদ্য দ্রব্য দাও। দোকানদার ঐ মুদ্রা দেখে বিস্মিত হলো এবং অন্য দোকানদারকে দেখিয়ে বললো, এটিতো দাকয়ানুসের যুগের মুদ্রা। পরে দোকানদাররা বললো, মনে হয় এ ব্যক্তি মাটির নীচে রক্ষিত মুদ্রা পেয়েছে এবং নিজের রহস্য সে প্রকাশ করতে চায়না। তখন লোকেরা তাকে বললো, তুমি সত্য সত্য বল এই মুদ্রা কোথায় পেয়েছ? হয়তো তুমি মাটির নিচের সম্পদ পেয়ে গেছ। তামলীখা এসব কথা শ্রবণ করে অত্যন্ত ভীত হলেন। তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কম্পন সৃষ্টি হলো। তিনি ধারণা করলেন, হয়তো এরা আমার পরিচয় পেয়ে গেছে এবং সকলে মিলে আমাকে পাকড়াও করে দাকয়ানুসের নিকট নিয়ে যাবে। এরপর শহরে একথা প্রচার হতে লাগলো। সকলের মুখে একই কথা যে এ ব্যক্তি মাটির নিচে রক্ষিত সম্পদ পেয়েছে। এ কারণে শহরের অনেক লোক তার চারিপার্শ্বে একত্রিত হলো এবং বলতে লাগলো, এ ব্যক্তি অবশ্যই এ শহরের অধিবাসী নয়। কিন্তু তামলীখার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তার পিতা ও তার ভাই এ শহরের অধিবাসী। তারা সংবাদ পেলে অবশ্যই আমাকে মুক্ত

করবে। কিন্তু অনেক সময় অতিবাহিত হলেও তারা আসলো না। তখন শহরবাসী তামলীখাকে শহরের দু'জন কর্মকর্তার নিকট হাযির করলো। তারা দু'জন অত্যন্ত নেককার ব্যক্তি ছিলেন। তাদের একজনের নাম ছিল আরইউস, আর একজনের নাম ছিল তানতিউস। তারা অনেক সওয়াল-জওয়াব করার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এ ব্যক্তিকে বাদশাহর নিকট হাযির করতে হবে। তামলীখা তখন ধারণা করলেন যে, হয়তো তাকে জালেম দাকয়ানুসের নিকট হাযির করা হবে। তখন তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে জালেম দাকয়ানুসের মৃত্যু হয়েছে বহু পূর্বে, তখন তাঁর ভয়-ভীতি দূর হলো এবং ক্রন্দন বন্ধ হলো। এ সময় তিনি তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন, আমরা কয়েকজন যুবক দাকয়ানুসের ভয়ে আত্মগোপন করেছিলাম এবং সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আজকে আমি সকলের জন্যে খাবার নিতে এসেছি, আমি জমিনের গুপ্তধন পাইনি। এ শহরেই এগুলো তৈরী হয়েছে এবং নিজের সাথীদের নাম প্রকাশ করলেন এবং বললেন, যদি আমার কথায় আপনাদের কোন সন্দেহ থাকে, তবে আপনারা আমার সঙ্গে চলুন, ঐ গর্ত খুব দূরেও নয়। তখন তারা সকলেই আসহাবে কাহফকে স্বচক্ষে দেখার জন্য রওযানা হলো।

এদিকে তামলীখার সাথীগণ গর্তে অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন। কেননা খাবার আনতে তামলীখার অনেক বিলম্ব হয়েছে। খোদা না করুন, যদি সে ধরা পড়ে যায়, তখন কি হবে! তাই তারা আল্লাহ পাকরে দরবারে কান্নাকাটি করতে এবং নামাজ পড়তে লাগলেন। নামাজের পর একে অন্যকে ওসিয়ত করলেন। ঠিক সেই সময় আরইউস ও তার সাথীরা গর্তের সম্মুখে হাযির হলেন। তামলীখা তাদের পূর্বে গর্তে প্রবেশ করলেন এবং সকল অবস্থা বর্ণনা করলেন। তখন তারা জানতে পারলেন যে তারা ৩০৯ বছর নিদ্রিত ছিলেন। আর তাদেরকে শুধু এজন্যে জাগ্রত করা হয়েছে যেন তারা মানুষের জন্যে কেয়ামতের একটি নিদর্শন হিসেবে হাযির হয় এবং হাশরের ময়দানে যে প্রত্যেকটি মানুষকে স্বশরীরে হাযির হতে হবে-একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসেবে তারা লোকালয়ে উপস্থিত হবে। এ সুদীর্ঘ সময় নিদ্রিত থাকার পর জাগ্রত হয়ে লোকালয়ে উপস্থিত হলে লোকেরা কেয়ামত এবং হাশর সম্পর্কে নিঃসন্দেহে ঈমান আনবে।

যাহোক, তামলীখা প্রথমে গর্তে প্রবেশ করেন এবং তারপর আরইউস গর্তে প্রবেশ করেন। তিনি সেখানে একটি তামার সিন্দুক দেখতে পেলেন, যার উপর রুপালী সীলমোহর লাগানো রয়েছে। গর্তের দ্বারে দণ্ডায়মান হয়ে আরইউস সে দেশের তদানীন্তন গণ্যমান্য লোকদের ডাকলেন এবং সকলের সম্মুখে ঐ সিন্দুকটি খোলার আদেশ দেন। তা থেকে দু'টি ফলক বের করা হলো। শিশার ফলকে ঐ যুবকদের নাম, পরিচয় এবং তাদের অন্তর্ধানের কথা লিপিবদ্ধ ছিলঃ

আসহাবে কাহফের নাম মেকসালমীনা, মেখশালমীনা, তামলীখা, মরতুনাস, কাশতুনাস, মেরুনাস তাইমুনাস, লাতবুয়াস, কাবুস, আর কুকুরটির নাম কেতমীর। এ যুবকগণ জালেম রাজা দাকয়ানুসের ভয়ে নিজেদের ঈমান রক্ষার্থে পলায়ন করে এ গর্তে আত্মগোপন করেন।

যখন জালেম দাকয়ানুস তাদের আত্মগোপনের খবর পায় তখন সে এ গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়, আমরা তাদের অবস্থা লিপিবদ্ধ করে দিলাম, যাতে করে পরবর্তী কালের লোকেরা তাদের সত্যিকারের পরিচয় পায়।

এ শিশার ফলকটি পাঠ করার পর তামলীখা বললেন, আমিই তামলীখা এবং এরা আমার সাথী। আরইউস ফলকের লেখা পাঠ করে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে বিস্মিত হলেন যে সুদীর্ঘ ৩০০ বছর কাল নিদ্রিত থাকার পর আল্লাহ পাক তাদেরকে জাগ্রত করেছেন। এজন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে হামদ ও সানা পেশ করলেন যে তিনি কেয়ামতের দিন সকলকে জীবিত করার নমুনা উপস্থাপন করেছেন। নেককার বাদশাহ বেদরুসের নিকট এ ঘটনার বিবরণ পেশ করা হলো এবং তাঁকে আহ্বান করা হলো যে আপনি স্বয়ং এসে আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন দেখুন। আপনার শাসনামলেই আল্লাহ পাক মানুষের সম্মুখে হাশরের নমুনা দেখিয়ে দিয়েছেন, যাতে করে মানুষ ঈমানের নূর অর্জন করতে পারে এবং শারীরিক ভাবে হাশর হবে একথা বিশ্বাস করে। আর সে নিদর্শন হলো, আল্লাহ পাক কয়েকজন যুবককে সুদীর্ঘ ৩০৯ বছর যাবত নিদ্রিত রেখেছেন। এরপর তাদেরকে সুস্থ অবস্থায় জাগ্রত করেছেন। ঠিক এভাবে কেয়ামতের দিন রুহ এবং দেহকে একত্রিত করে তোলা হবে। মূলতঃ আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতের এক বিস্ময়কর নমুনা এবং মহিমা প্রকাশ করেছেন, যেন মানুষ এ সত্য উপলব্ধি করে যে কেয়ামতের দিন মানুষ মাত্রকে স্বশরীরে হাযির করা হবে।

বাদশাহ বেদরুস এ সংবাদ পাওয়া মাত্র অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং গর্তে প্রবেশ করে ঐ যুবকদেরকে দেখলেন। আনন্দের আতিশয্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তিনি সেজদারত হলেন। এরপর আসহাবে কাহফের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন। আসহাবে কাহফ জমীনে বসে আল্লাহ পাকের তসবীহ পাঠ করছিলেন। বাদশাহ বেদরুসের মোলাকাতের পর তাঁরা বাদশাহকে বললেন, আমরা তোমাকে আল্লাহ পাকের সোপর্দ করি। আল্লাহ পাক তোমার এবং তোমার রাজত্বের হেফাজত করুন, জ্বীন ও মানুষের ক্ষতি থেকে তোমাকে রক্ষা করুন। আর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। একথা বলে বাদশাহকে তারা বিদায় দিলেন এবং নিজেরা শোবার স্থানে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরই আল্লাহ পাক সেখানেই তাঁদেরকে ওফাত দান করলেন। বাদশাহ তাদেরকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন এবং আদেশ দিলেন, তাদের প্রত্যেককে স্বর্ণনির্মিত সিন্দুকে রাখা হোক। রাত্রে বাদশাহ স্বপ্নে দেখলেন, তারা বলেছেন, আমরা স্বর্ণ দিয়ে নয়, মাটি দিয়ে সৃষ্টি হয়েছি, আর মাটির সাথে মিশে যাব, যেভাবে আমরা ইতিপূর্বে ছিলাম, সেভাবেই আমাদেরকে গর্তের ভেতর মাটিতে রেখে দাও যতক্ষণ না আল্লাহ পাক আমাদেরকে পুনরুত্থান করান। বাদশাহ এবং তার সঙ্গীরা যখন গর্ত থেকে বের হয়ে আসলেন, তখন তারা এত ভীত হন যে দ্বিতীয় বার তাতে প্রবেশ করার সাহস আর তাদের হলোনা। বাদশাহ গর্তের মুখে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন।

আসহাবে কাহফের ঘটনা কেয়ামতের নমুনা

বস্তুতঃ আসহাবে কাহফের এ বিস্ময়কর ঘটনা নিঃসন্দেহে কেয়ামতের নমুনা এবং জীবন্ত নিদর্শন। এর দ্বারা একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কেয়ামত বরহক্ব। আল্লাহ পাক আসহাবে কাহফকে ৩০৯ বছর যাবত নিদ্রিত রাখার পর সুস্থ সবল অবস্থায় জাগ্রত করেছেন। তাঁর পক্ষে মৃতদেরকে জীবিত করা আদৌ কঠিন কিছু নয়।[১]

যেহেতু আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ.....

"(হে রসূল!) গুহাবাসীরা আমার কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন বলে আপনার ধারণা"?

ইহুদীদের কাছে আসহারে কাহফের এ ঘটনা বিস্ময়কর বলেই, তারা এ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট প্রশ্ন করে পাঠিয়েছে। কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদীয়ার জন্যে এটি তেমন বিস্ময়কর ঘটনা নয়। কেননা আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবনে এর চেয়ে অধিকতর বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে। যার দু'একটির উল্লেখ ইতিপূর্বে আমরা করেছি। এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নয়; বরং সাহাবায়ে কেরামের জীবনে যেসব বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে তার কয়েকটি উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ওসীয়ত

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় তিনি ওসীয়ত করেছিলেন যে আমার এন্তেকালের পর আমার লাশকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রওজায়ে মুবারকের সম্মুখে নিয়ে যাবে, যদি আপনা আপনি রওজায়ে পাকের দরজা খুলে যায়, তবে আমাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কদম মোবারকের কাছে দাফন করবে। এ ওসীয়ত মোতাবেক সাহাবায়ে কেরাম যখন তাঁকে নিয়ে রওজায়ে পাকের সম্মুখে হাযির হলেন এবং বললেনঃ

'ইয়া রসূলাল্লাহ! আবুবকর (রাঃ) আপনার দ্বারে উপস্থিত'।

তখন সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি দরজা খুলে গেল এবং কবর থেকে গায়বী আওয়াজ আসলো,

أدخلوا الحبيب إلى الحبيب

অর্থাৎ তোমরা বন্ধুকে বন্ধুর কাছে নিয়ে আস।

এ ঘটনাটি কি কম আশ্চর্যজনক?

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৯০-৩৯৬
তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭ পৃষ্ঠা-২৩৬-২৩৭
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৮৪, পৃষ্ঠা ৮৪-৮৬
তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-২১৬-১৭
তফসীরে সেরাজেমুনীর, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৯৩
তফসীরে কুরতবী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৫৭

সেনাপতির প্রতি হযরত ওমরের (রাঃ) নির্দেশ

হযরত ওমর (রাঃ) যখন খলীফাতুল মুসলেমীন তখন ইরাকের রণাঙ্গনে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল। মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন হযরত সারীয়া এবনুল হোসাইন। দুশমনরা দু'দিক থেকে মুসলমানদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছিল। হযরত ওমর (রাঃ) শুক্রবার মদীনা মুনাওয়্যারার মসজিদে নববীতে খোতবা দিচ্ছিলেন। ঐ সময় তিনি তিনবার একটি বাক্যকে উচ্চারণ করলেন,

يا سارية الجبل الجبل

(হে সারীয়া! পাহাড়কে পেছনে রেখে যুদ্ধ কর)।

লক্ষ্যণীয়, এ যুদ্ধ চলছিল ১২শ' মাইল দূরবর্তী ইরাকের রণাঙ্গনে। হযরত ওমর (রাঃ) মদীনার মসজিদ থেকে ইরাকের রণাঙ্গনের দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করলেন-দুশমনরা মুসলমানদেরকে দু'দিক থেকে ঘেরাও করেছে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে এ নির্দেশ প্রদান করলেনঃ "হে সারীয়া! তোমরা পাহাড়কে পেছনে রেখে যুদ্ধ কর"। আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নমুনা এই, খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঐ কথা হযরত সারীয়া (রাঃ) যুদ্ধরত অবস্থায় শুনতে পেলেন এবং তাঁর নির্দেশ মোতাবেক পাহাড়কে পেছনে রেখে যুদ্ধ করলেন। ফলে দুশমন পরাজিত হলো। পরবর্তীকালে মুসলমানদের বিজয়ী দল প্রত্যাবর্তন করে বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আমরা আপনার নির্দেশ শুনেছি এবং পালন করেছি, এর বদৌলত আল্লাহ পাক আমাদেরকে বিজয় দান করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর ঘটনা। এটি হযরত ওমর (রাঃ)-এর কারামত এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোজেযা। কেননা তিনি বলেছিলেন আবু বকর এবং ওমর আমার কর্ণ ও চক্ষুর ন্যায়।

নীল নদের নামে খলীফাতুল মুসলেমীনের চিঠি

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। মিসরের নীল নদই হলো সেদেশের কৃষি ব্যবস্থার প্রাণ অর্থাৎ সে দেশের কৃষিক্ষেত্রে পানির সংস্থান হয় নীল নদ থেকে। জাহেলিয়া যুগে যখন নীল নদে প্লাবন না আসতো তখন মিসরের অধিবাসীরা একটি ষোড়শী মেয়েকে বিয়ের সাজে সজ্জিত করে নীল নদে বলি দিত। এরপর তাতে প্লাবন আসতো। খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর জমানায় মিসর মুসলমানদের করতলগত হলো। হযরত আমর এবনুল আস (রঃ) ছিলেন মিসর বিজয়ী সেনাপতি এবং তাঁকেই মিসরের গভর্ণর নিয়োগ করা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে ঐ বছর নীল নদে প্লাবন আসলো না। মিসরবাসী জাহেলিয়া যুগের প্রথা মোতাবেক একটি ষোড়শী মেয়েকে নীল নদে বলি দেয়ার ইচ্ছা করলো। হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ) এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বললেন যে, এ সম্পর্কে আমি আমীরুল মোমেনীন ওমর (রাঃ)-কে লিখবো এবং তাঁর নির্দেশ মোতাবেক তোমাদেরকে জানাব। হযরত ওমর (রাঃ) তখন নীল নদের নামে একটি পত্র লিখলেন যে, হে নীলনদ! যদি তুমি আল্লাহ পাকের হুকুমে পরিচালিত হয়ে থাক, তবে আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের

খলীফা নির্দেশ দিচ্ছি তুমি প্লাবিত হও, কিন্তু যদি তুমি শয়তানের কথায় পরিচালিত হও, তবে তোমার পানির আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, আল্লাহ পাক আমাদের জন্যে যথেষ্ট। আর একটি চিঠি হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ)-কে এ মর্মে লিখলেন, নীল নদের নামে আমার প্রেরিত এই চিঠি সম্বন্ধে সে দেশের জনসাধারণের মধ্যে ঘোষণা দাও যে অমুক তারিখে অমুক সময়ে খলীফা ওমরের (রাঃ) চিঠি নীল নদকে দেয়া হবে, অতএব উক্ত সময়ে তোমরা সকলে সমবেত হও।

নীল নদের নামে চিঠি লিখেছেন মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক হযরত ওমর (রাঃ)-এ বিস্ময়কর কথাটি যখন সারা দেশে প্রচারিত হয়, তখন দেশবাসী এ সম্পর্কে দারুন কৌতূহল উপলব্ধি করে এবং নিদৃষ্ট সময়ে অগণিত জনতা সমবেত হয়, এ বিস্ময়কর দৃশ্য দেখার জন্যে। যথা সময়ে হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ) লাখো জনতার সম্মুখে আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর চিঠি নীল নদে ফেললেন। এরপর আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে নীল নদে প্লাবন আসলো। বর্ণিত আছে যে সেদিন ষোল হাত উঁচু প্লাবন এসেছিল। এরপর আজ পর্যন্ত আর কখনো নীল নদের পানি বন্ধ হয়নি।

যাঁরা প্রিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে এমন আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়েছিলেন যে, নদ-নদীও তাদের কথা শ্রবণ করতো এবং তাঁদের নির্দেশ মেনে চলতো।

ভূমিকম্প বন্ধ হলো-

এমনি আরও বহু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে তাঁদের জীবনে। একবার মদীনা মুনাওয়্যারায় ভূমিকম্প শুরু হলো। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে মাটিতে আঘাত করলেন এবং বললেন, اسكنى باذن الله হে জমীন, আল্লাহর হুকুমে থেমে যাও। সঙ্গে সঙ্গে জমীন থেমে গেল এবং ভূমিকম্প বন্ধ হয়ে গেল। এরপর আর কোন দিন মদীনা মুনাওয়্যারায় ভূমিকম্প আসেনি।

অগ্নির নামে চিঠি

একবার মদীনা শরীফের কয়েকটি বাড়ীতে আগুন লাগলো। হযরত ওমর (রাঃ) আগুনের নামে একটি চিঠি লিখলেনঃ

يا نار اسكنى باذن الله

"হে আগুন! আল্লাহর নামে থেমে যাও"।

লোকেরা চিঠিটি আগুনে ফেললো। তখন আগুন সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল।

রোমক দূত ও হযরত ওমর (রাঃ)

একবার রোমক সম্রাটের দূত মদীনা শরীফে আসলো এবং খলীফাতুল মুসলেমীনের ভবনের (রাষ্ট্রপতি ভবন) অনুসন্ধান করলো। কেননা সে মনে করেছে অন্যান্য রাজা -বাদশাহদের ন্যায় ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিরও তেমন একটা কিছু থাকবে। কিন্তু লোকেরা বললো, আমাদের রাষ্ট্র প্রধানের কোন ভবন নেই, তিনি বিশ্রাম করেন অমুক বাগানে। দূত

সঙ্গে সঙ্গে ঐ বাগানে হাযির হলো। সে যে বিস্ময়কর ঘটনাটি দেখলো তা হলো, হযরত ওমর (রাঃ) মাথার নীচে তাঁর ছড়িটি রেখে মাটির উপর ঘুমিয়ে আছেন। রোমের রাষ্ট্রদূত এ অভাবনীয় দৃশ্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হলো এবং বললো, সারা পৃথিবীর মানুষ এই মানুষটিকে ভয় করে, অথচ তিনি এ অবস্থায় মাটিতে শুয়ে আছেন! এরপর ঐ দূত মনে করলো এখানে তো কোন প্রহরী নেই, আমি তাঁকে এখনই হত্যা করতে পারি। এ অসৎ উদ্দেশে তরবারী হাতে নিয়ে সে অগ্রসর হলো, আর ঐ মুহূর্তে আল্লাহ পাক জমিন থেকে দু'টি বাঘ সৃষ্টি করলেন। দু'টি বাঘই তার প্রতি হামলায় উদ্যত হল, তখন সে হাতের তরবারী ফেলে দিল এবং হযরত ওমর (রাঃ)-কে জাগ্রত করলো। এরই মধ্যে বাঘ অদৃশ্য হলো, তখন সে ঘটনা বর্ণনা করলো এবং ইসলাম গ্রহণ করলো।

হযরত আলী (রাঃ)-এর দোয়ায় হাত ঠিক হলো

আমীরুল মোমেনীল হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফতের আমলে একজন হাবশী গোলাম চুরি করেছিল। সে হযরত আলী (রাঃ)-এর ঘণিষ্ঠ সমর্থক ছিল। লোকেরা তাকে হযরত আলীর (রাঃ) নিকট হাযির করলো। হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি চুরি করেছো? সে বললো, জ্বী-হ্যাঁ। তখন আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (রাঃ) তাঁর হস্ত কর্তনের নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ কার্যকর হলো। ফেরার পথে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এবং এবনুল কাররার সাথে তার দেখা হলো। এবনুল কাররা জিজ্ঞাসা করলো, তোমার হাত কে কেটে দিয়েছে? সে বললো, আমীরুল মোমেনীন, যিনি মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতা, যিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জামাতা, যিনি হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর স্বামী। তখন এবনুল কাররা বললেন, যিনি তোমার হাত কেটে দিলেন, তুমি তাঁর এত প্রশংসা করছো? সে বললো, কেন তাঁর প্রশংসা করবো না? তিনি আমার হাত কেটেছেন, তা অন্যায় ভাবে নয়; বরং তা শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক, আর এভাবে তিনি আমাকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এসব কথা শ্রবণ করে হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেন। তখন তিনি ঐ হাবশী গোলামকে ডাকলেন এবং তার হাতকে নিজের দেহের উপর রেখে একটি রুমাল দিয়ে ঢেকে দিলেন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতে থাকলেন। তখন আকাশ থেকে একটি গায়বী আওয়াজ শ্রুত হলোঃ

ارفع الرداء عن اليد

অর্থাৎ হাত থেকে চাদর সরাও তখন দেখা গেল হাতটি পূর্ববত ঠিক হয়ে গেছে।

হযরত খালেদ এবনে ওলীদ (রাঃ) বিষপান করলেন

হযরত খালেদ এবনে ওলীদকে রণাঙ্গণে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়ে কাফের দুশমনরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলো। তাদের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এক যুবক মুসলমানদের হাতে বন্দী হলো। সেনাপতি হযরত খালেদ (রাঃ)-এর গোলামে পরিণত হলো এবং তাঁর ব্যক্তিগত সেবা-যত্নের দায়িত্ব পালন করতে লাগলো। কিছুদিন পর সে যে হীন উদ্দেশে

এসেছে তা কার্যকর করতে প্রয়াসী হলো। হযরত খালেদ এবনে ওলীদ (রাঃ)-এর খাবারে সে বিষ মেশাতে শুরু করলো, পরিণামে তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন। অথচ প্রকাশ্যে তাঁর কোন অসুখ ছিল না। তিনি একদিন ঐ গোলামকে ডেকে বললেন, তুমি যে আমার খাবারে বিষ মিশ্রিত করছো, তা কি সব শেষ করে দিয়েছ, না কিছু অবশিষ্ট রয়েছে? সে বললোঃ জ্বী-না শেষ করতে পারিনি, এখনও কিছু পরিমাণ রয়ে গেছে। হযরত খালেদ এবনে ওলীদ (রাঃ) বললেন, বিষের ঐ অবশিষ্টাংশ নিয়ে আস। হযরত খালেদ এবনে ওলীদ (রাঃ) দেখলেন যে প্রায় অর্ধেক পরিমাণ বিষ এখনো রয়ে গেছে। তখন তিনি এই দোয়াটি পাঠ করলেনঃ

بسم الله الذى لايضرمع اسمه شىء فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم

এরপর শিশিতে যে বিষ ছিল তা তিনি সম্পূর্ণ একসঙ্গে পান করলেন এবং ঐ গোলামকে বিদায় করে দিয়ে বললেন, তুমি এখনই এখান থেকে চলে যাও, তোমার এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমার লোকেরা জানতে পারলে তোমার বিচার হবে। আল্লাহ্ পাকের নামের বরকতে হযরত খালেদ এবনে ওলীদ (রাঃ)-এর উপর বিষ পানে কোন প্রতিক্রিয় হয়নি।

হযরত আলাউল হাজরামী (রাঃ) সমুদ্রের উপর হাঁটলেন

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিখ্যাত সাহাবী হযরত আলাউল হাজরামী (রাঃ)-কে জেহাদে প্রেরণ করলেন। কিন্তু যে স্থানে গমনের নির্দেশ তাঁদের প্রতি ছিল, সেখানে পৌঁছার পথে সমুদ্র থাকার কারণে তাঁরা নিদৃষ্ট স্থানে পৌঁছতে পারছিলেন না। হযরত আলাউল হাজরামী (রাঃ) আল্লাহ পাকের এসমে আযম উল্লেখ করে দরবারে এলাহীতে দোয়া করলেন। ফলে তাঁরা সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন।

ব্যঘ্র অনুগত হলো-

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফে হজ্জের উদ্দেশ গমন করছিলেন। পথে দেখলেন, একটি পাহাড়ের পাদদেশে অনেক লোক সমবেত। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এখানে কেন সমবেত? তারা বললেন, সম্মুখে রাস্তার উপর একটি বাঘ বসে আছে, এই ভয়ে আমরা অগ্রসর হতে পারছিনা। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তোমরা এখানেই থাক, আমি যাই। এরপর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বললেনঃ

ايها الدسد نحن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

(হে বাঘ! আমরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবী।)

একথা বলে তিনি বাঘের কানে ধরলেন এবং অপেক্ষমান হজ্জ যাত্রীদেরকে বললেন,

তোমরা রাস্তা অতিক্রম কর। এভাবে সমস্ত লোক মক্কা শরীফের দিকে অগ্রসর হলো। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) তখন বাঘের কান ছেড়ে দিলেন। এটি তখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্য একজন সাহাবী সকীনা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার আমরা সমুদ্রের সফর করছিলাম, কিন্তু আমাদের নৌযানটি পানির তোড়ে ভেঙ্গে গেল। আমি একটি কাষ্ঠ খণ্ডে ভর করে ভাসতে লাগলাম এবং একটি অরণ্যে পৌঁছে গেলাম। আমি সমুদ্র থেকে তীরে উঠে দেখলাম, ঐ অরণ্যে একটি বাঘ দাড়িয়ে, সে আমার দিকে আসছে। তখন আমি বললাম, হে অরণ্যরাজ! আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবী। তখন সে আমার আগে আগে চলতে লাগলো এবং আমাকে পথ প্রদর্শন করতে লাগলো এবং একটি আবাদি স্থানে পৌঁছে সে তার লেজ নাড়তে লাগলো। আমি ধারণা করলাম, সে আমাকে বিদায় জানাচ্ছে এবং পুনরায় সে জঙ্গলে চলে গেল।

বস্তুতঃ সাহাবায়ে কেরামের এবং আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে, যার বিবরণ পেশ করা সত্যিই কঠিন। অতএব, আসহাবে কাহফের ঘটনা উম্মতে মোহাম্মদীয়ার জন্যে তেমন আশ্চর্যজনক কিছু নয়। এর কারণ কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

(সতর্ক হও, আল্লাহর ওলীগণের কোন ভয় নেই, কোন দুশ্চিন্তা নেই।)

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

অর্থাৎ আল্লাহ হলেন মোমেনদের বন্ধু।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

(আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলই তোমাদের বন্ধু।)

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

(তা এজন্যে যে আল্লাহ পাক হলেন মোমেনদের অভিভাবক। আর কাফেরদের কোন অভিভাবক নেই।)

এ আয়াত সমূহ দ্বারা আল্লাহ পাক একথা ঘোষণা করেছেন যে তিনি মোমেনদের বন্ধু। আর আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে একথাও ঘোষণা করেছেন যে, তিনি মোমেনদেরকে ভালবাসেন। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ

(আল্লাহ পাক ভালবাসেন মোমেনদেরকে এবং তারাও আল্লাহ পাক ভালবাসে)।

এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

(আর যারা প্রকৃত মোমেন তাদের অন্তরে আল্লাহ্ পাকের জন্যে অত্যন্ত বেশী মহব্বত থাকে।)

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন"।

এ আয়াত সমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, যখন কোন বন্দা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির অন্বেষণে তাঁর যাবতীয় বিধি-নিষেধ আক্ষরিক ভাবে মেনে চলে, তখন আল্লাহ্ পাক তাকে ভালবাসেন এবং বন্দার সকল ইচ্ছা আল্লাহ্ পাক পূর্ণ করে দেন।

এটি বন্দার প্রতি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দয়া ও মেহেরবানী। আর এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাদীসে কুদসী বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ যখন কোন বন্দা নফল এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন আমি তখন তাকে ভালবাসতে শুরু করি। এমনকি আমি তার কর্ণ হয়ে যাই, চক্ষু হয়ে যাই এবং তার রসনা হয়ে যাই। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করে দেন। তাই আল্লাহ্ পাকের কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে বন্দার মাধ্যমে। যদি তিনি আল্লাহ্র নবী হন তবে তাকে বলা হয় মোজেযা, যদি তিনি ওলী হন তবে তাকে বলা হয় কারামত। আসহাবে কাহফের ঘটনা সহ সাহাবায়ে কেরামের যে সব ঘটনা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে তা এরই অন্তর্ভুক্ত।

এখন পবিত্র কোরআনের ভাষায় লক্ষ্য করুন,

اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً

"স্মরণ কর সে সময়কে যখন ঐ যুবকরা পর্বত গুহায় গিয়ে বসে এবং বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দান কর তোমার তরফ থেকে রহমত, আর আমাদের কাজকে সঠিকভাবে সুসম্পন্ন করার তৌফিক দান কর"।

وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا

অর্থাৎ ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকার এবং কুফরী ও নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করার তৌফিক দান কর।

অথবা এর অর্থ হলো, আমাদের জীবনের সকল বিষয় যেন সঠিকভাবে সুসম্পন্ন হয় তার তৌফিক দান কর। আমরা যেন সর্বক্ষেত্রে সত্যের উপর সুদৃঢ় থাকতে পারি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন যে, আসহাবে কাহফ কেন ঐ গর্তে আশ্রয় নিয়েছিলেন? মুহাম্মদ এবনে এসহাকের বর্ণনায় রয়েছে, তৎকালীন রোম সাম্রাজ্যের বাদশাহ ছিল দাকয়ানুস নামক এক মূর্তি পূজক। সে মানুষকে

মূর্তিপূজায় বাধ্য করত। যারা তওহীদে বিশ্বাসী থাকত তাদেরকে হত্যা করতো। ঐ কঠিন মুহূর্তে আসহাবে কাহফ পাহাড়ের গর্তে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا

(এরপর গণনার কয়েক বছর পর্যন্ত আমি তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে রাখি।)

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদেরকে অনেক দিন পর্যন্ত নিদ্রিত অবস্থায় রেখে দেন। ঐ গর্তে তাদের কর্ণের উপর নিদ্রার এমন আবরণ রেখে দেন যে কোন শব্দ তাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করতে পারতো না অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদেরকে এমন ভাবে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন যে যুগ যুগ ধরে তারা নিদ্রিত অবস্থায় অতিবাহিত করে।

ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ

এরপর আমি তাদেরকে জাগ্রত করি। অর্থাৎ সুদীর্ঘ কাল নিদ্রিত অবস্থায় থাকার পর তাদেরকে আল্লাহ পাক জাগ্রত করলেন।

لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا

এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে তাদের অবস্থান কাল কে স্মরণ রেখেছে তা জানার জন্যে আমি তাদেরকে উত্থিত করি।

অর্থাৎ তাদের নিদ্রিত হওয়া এবং সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত নিদ্রামগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত হওয়া, এরপর জাগ্রত হওয়া– কোন কিছুই অকারণে নয়, বরং এর পেছনে ছিল একটি উদ্দেশ্য, আর সে উদ্দেশ্য হলো নিদ্রাকালের সঠিক পরিমাণ কার স্মরণ আছে? এবং কে ভুলে গেছে? কে বলতে পারে? এসব পরীক্ষা করাই হলো উদ্দেশ্য। কেননা এ সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করা অস্বাভাবিক নয়। কেউ এমন ঘটনাকে অসম্ভব বলেই উড়িয়ে দেবে, কেউ বিস্মিত হয়ে স্বীকার করবে, আর কেউ বলবে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কেননা আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতে সবই সম্ভব।

বস্তুতঃ মানুষের মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ব্যাপারে কে বিশ্বাস করে, আর কে না করে, তা এ পর্যায়ে একটি কঠিন পরীক্ষা।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ
بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ
قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ
دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴿١٤﴾ هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
آلِهَةً ۖ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى
الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ
مِرْفَقًا ﴿١٦﴾ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ
وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ
آيَاتِ اللَّهِ ۗ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا
مُرْشِدًا ﴿١٧﴾

তরজমা

(১৩) (হে রসূল) আমি আপনার নিকট তাদের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক, যারা নিজেদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল আর আমি তাদেরকে সৎ পথে চলার বিচার বুদ্ধি অধিক পরিমাণে দান করেছিলাম।

(১৪) আর আমি তাদের চিত্তকে সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম, যখন তারা দাঁড়ায় তখন বলে আসমান জমীনের প্রতিপালকই আমাদের প্রতিপালক, আমরা কখনো তিনি ভিন্ন আর কোন উপাস্যকে ডাকবো না। যদি তা করে বসি তবে তা হবে অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

(১৫) আমাদের এই জাতি যারা আল্লাহ পাকের পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে, তারা এ সম্পর্কে কোন প্রকাশ্য দলিল-প্রমাণ কেন উপস্থাপন করেনা? যে আল্লাহ পাক সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার চেয়ে অধিকতর সীমা লংঘনকারী আর কে?

(১৬) তোমরা যখন তাদের থেকে এবং আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদেরকে তারা উপাসনা করতো, তাদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছ, তখন পর্বতগুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে তাঁর দান বিস্তার করবেন, আর তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।

(১৭) আর হে শ্রোতা! তুমি দেখতে পাবে সূর্য যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে ডান দিকে পাশ কাটিয়ে চলে, আর অস্তকালে তাদের বাম দিকে সরে যায়, তারা তখন গুহার মুক্ত আঙ্গিনায়, এসব আল্লাহ পাকের নিদর্শন, আল্লাহ পাক যাকে হেদায়েত দেন সে-ই হেদায়েত লাভ করে। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন (হে শ্রোতা!) কখনো তুমি তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আসহাবে কাহফের ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াত থেকে উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হচ্ছে যাতে করে সত্য-সাধনায় যারা রত, যারা ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং সংকল্পের দৃঢ়তা অর্জন করে আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাহায্য কামনা করে তাদের জন্যে এ ঘটনা হেদায়েতের আলোকবর্তিকা হয়।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ

অর্থাৎ হে নবী! আমি আপনার নিকট আসহাবে কাহফের ঘটনাটি সঠিকভাবে বর্ণনা করছি।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আল্লাহ পাক এ বাক্যটি এজন্যে এরশাদ করেছেন যে, আসহাবে কাহফের এ ঘটনা মানুষের মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রচারিত হয়। এর মধ্যে অনেক অসত্য কথাও অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই ঘটনা বর্ণনার পূর্বেই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ (হে রসূল!) আমি আপনার নিকট এ ঘটনার সঠিক বিবরণ পেশ করছি। আসহাবে কাহফ কয়েকজন নওজোয়ান, স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল অথচ তাঁদের সম্প্রদায় ছিল সম্পূর্ণ মূর্তিপূজক। শেরক, কুফর মূর্তি পূজা বা পৌত্তলিকতায় তারা ছিল লিপ্ত এবং অন্যদেরকে মূর্তি পূজায় তারা বাধ্য করতো।

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

"আর আমি তাদের মনকে সুদৃঢ় করে দিলাম"।

অর্থাৎ সত্যের জন্যে ন্যায়ের জন্যে ঈমানকে তাদের অন্তরে আল্লাহ পাক সুদৃঢ় করে দিলেন যেন এ উদ্দেশে যে কোন ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিতে তারা কুণ্ঠিত না হয়, বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-স্বজন, একান্ত আপনজন, অর্থ-সম্পদ, সুখ-সামগ্রী সব কিছু পরিত্যাগ করার এবং জালেম দাকয়ানুসের বিরুদ্ধে ঈমান ও তওহীদের কথা সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করার সৎসাহস আল্লাহ পাক তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দিলেন। এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের

মায়া-মমতার কথা তারা ভুলে গেলেন। এ ক্ষণভঙ্গুর জগতের কোন গুরুত্ব তাদের দৃষ্টিতে রইলো না। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ পাকের মহব্বত ও ভালবাসা, তাঁর আজমত ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর প্রতি ভয়-ভীতি কানায় কানায় ভরে গেল।

إِذْ قَامُوا

অর্থাৎ দাকয়ানুস যখন তাদেরকে মূর্তিপূজা করতে আহ্বান জানায় তখন তারা তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এ কু-প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। ঈমানের প্রতি আল্লাহ্ পাক তাদেরকে এভাবে দৃঢ় সংকল্প এবং অবিচলিত রাখেন।

فَقَالُوا

তাই তারা সেদিন জালেম দাকয়ানুসের সকল নির্যাতনের কথা উপেক্ষা করে দৃপ্ত কণ্ঠে সকলের সম্মুখে ঘোষণা করে,

رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُونِهٖٓ إِلٰهًا

আসমান জমিনের প্রতিপালকই আমাদের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত আর কোন কিছুকে আমরা উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করিনা, যদি এমন অন্যায় কাজ আমরা করি,

لَّقَدْ قُلْنَآ إِذًا شَطَطًا

তবে আমরা মারাত্মক ভুল করবো, এমন অবস্থায় নিশ্চয় আমরা সীমা লংঘন করবো, আমাদের দ্বারা এমন কথা হবে যা সত্য থেকে অনেক দূরে, এমন অন্যায় কথা বলার কোন অধিকারই আমাদের নেই।

هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهٖٓ ءَالِهَةً

আমাদের এই জাতি, যারা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে তাদের এ অন্যায় আচরণের তথা শেরক ও কুফরের কোন প্রমাণ কি তাদের কাছে আছে?

لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ

যদি এমন কিছু তাদের কাছে থাকে, তারা সে প্রমাণ পেশ করেনা কেন? কোন সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ ব্যতীত বা শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে অথবা পথভ্রষ্ট পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণ করা যায় না। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

যার আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে তাদের থেকে বড় জালেম আর কে হতে পারে?

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করে অথবা কাউকে আল্লাহ্ পাকের সন্তান-সন্ততি মনে করে- তাদের চেয়ে বড় জালেম আর কেউ নেই। কেননা অপবাদ মাত্রই অন্যায়, তা-ও আল্লাহ্ পাকের উপর? এমন অন্যায় কাজ যারা করে তারা নিঃসন্দেহে

সর্বশ্রেষ্ঠ জালেম।

আসহাবে কাহফ যখন জালেম দাকয়ানুসকে সুস্পষ্ট ভাষায় জবাব দেয়, তখন দাকয়ানুস এ বিষয়ে আরও চিন্তা করার অবকাশ দিয়ে তাদেরকে বিদায় করে। তখন তারা ঐ শহর থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং পরস্পর পরামর্শ করতে থাকে।

وَاِذِ اعتزلتموهم وما يعبدون اِلا اللّٰه فاوٗا اِلى الكهف

যখন তোমরা মনে প্রাণে এ মূর্তি পূজকদের সংশ্রব পরিত্যাগ করেছ এবং আল্লাহ পাক ব্যতীত তারা যাদের উপাস্য মনে করে তাদেরকেও বর্জন করেছ, তখন তোমরা পর্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। সেখানেই হবে তোমাদের ঠিকানা, যাতে করে কাফেরদের সংসর্গ থেকে এবং তাদের জুলুম-অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে পার।

... ينشر لكم ربكم مِن رحمته ويهيئ لكم مِن امركم مِرفقا

"তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেবেন এবং তোমাদের কাজের স্বচ্ছন্দ ব্যবস্থা করবেন"।

অর্থাৎ পর্বত গুহায় তোমাদের অবস্থান কষ্টকর হবে এ ভয় করোনা। কেননা আল্লাহ পাক তাঁর অনন্ত অসীম রহমত তোমাদের জন্যে ছড়িয়ে দেবেন, যা তোমাদেরকে পরিবেষ্টন করবে এবং তিনি তোমাদের কাজকে সহজ করে দেবেন এবং তোমাদের কল্যাণ সাধনের পথ তিনি নিজেই বের করে দেবেন। এসব কথাবার্তা আসহাবে কাহফের পরস্পরের মধ্যে হয়েছিল। কেননা আসহাবে কাহফের জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ছিল এমন একটি নিরাপদ স্থান যেখানে দুরাত্মা কাফেররা তাঁদের প্রতি নির্যাতন করতে না পারে। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা যেন নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকতে পারেন। পর্বতের গুহায় এ দু'টি উদ্দেশ্যই সফল হবে এবং সেখানে তাঁদের প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত নাজিল করা হবে, তাঁদের কাজ সহজ করে দেয়া হবে। এর নিশ্চয়তা বিধান করা হবে-এ বিষয়ের উপর আসহাবে কাহফের বিশ্বাস ছিল। তাঁরা তাদের সিদ্ধান্তে ছিলেন অটল, অবিচল। আর তাঁদের ভরসা ছিল এক আল্লাহ পাকের প্রতি, তাই তাঁরা একথা বলেছেন।

وترى الشمس اذا طلعت تزورعن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فى فجوة منه

"(হে শ্রোতা!) তুমি দেখতে পাবে, যখন সূর্য উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে ডানদিকে পাশ কাটিয়ে চলে এবং অস্ত যাওয়ার সময় তাদের বাম দিকে সরে যায়, তারা তখন থাকে গুহার মুক্ত আঙ্গিনায়"।

বস্তুতঃ যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে সত্য-সাধনায় রত হয়, আল্লাহ পাকের রহমতের বারিধারা নেমে আসে তাদের জন্যে এবং আল্লাহ পাক তাদেরকে উত্তম

আশ্রয় দান করেন। একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আসহাবে কাহফ, কেননা যেখানে তারা আশ্রয় নিয়েছে তা ছিল প্রশস্ত আয়তন বিশিষ্ট গুহা। শুধু তাই নয়; বরং তাতে আল্লাহ পাক আলো-বাতাসের পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। স্থানের সংকীর্ণতার কারণেও তাদের কোন কষ্ট হয়নি এবং আলো-বাতাসের অভাবেও তাদের আরামে এতটুকু ব্যাঘাত হয়নি। তফসীরকারগণের মতে, গুহাটি ছিল দক্ষিনমুখী। প্রয়োজন মোতাবেক সূর্যের আলো এবং রৌদ্র তাতে যথারীতি পৌঁছত আর রৌদ্রের কারণে তাদের কোন কষ্টও হতোনা; বরং সারাদিন তাদের উপর এক প্রকার ছায়া থাকত। আল্লাহ পাক রৌদ্রের কষ্ট থেকে তাদেরকে হেফাজত করেছেন; প্রয়োজন মত আলো-বাতাস তাদের নিকট পৌঁছত।

ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ

"এটি আল্লাহ পাকের কুদরতের এক বিশেষ নিদর্শন"।

তিনি যাকে ইচ্ছা এভাবেই তাঁর দানে ধন্য করেন।

অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাক আসহাবে কাহফকে পথভ্রষ্টতার ঘন অন্ধকার থেকে বের করে আনেন, তাদেরকে হেদায়েত দান করেন, জালেম দাকয়ানুসের জুলুম-অত্যাচারর মোকাবেলায় তাদেরকে অটল অবিচল রাখেন এবং দুশমনের জুলুম-অত্যাচার থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন, পর্বতের নিরাপদ গুহার সন্ধান দেন এবং সেখানে আলো-বাতাস দিয়ে তাদেরকে আরাম পৌঁছান।

অথবা এর অর্থ হলো, আসহাবে কাহফের এ ঘটনা সঠিক ভাবে বর্ণনা করা আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের একটি নিদর্শন যা পবিত্র কোরআনের সত্যতার স্বাক্ষর বহন করে।

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ

আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন, সে-ই হেদায়েত প্রাপ্ত হয়।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা হেদায়েত লাভের তৌফিক দান করেন, সে-ই হেদায়েত লাভে সফলকাম হয়। কেননা আসহাবে কাহফের প্রতি আল্লাহ পাকের যে বিশেষ দান রয়েছে তা একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে আল্লাহ পাক যাকে তৌফিক দান করেন, সে-ই এমন সৌভাগ্য অর্জন করে। যারা নেককার, তারা এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং হেদায়েত লাভ করে। কিন্তু যারা ভাগ্যাহত, তারা হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

আর যাকে আল্লাহ পাক পথভ্রষ্ট করেন অর্থাৎ যাকে তিনি হেদায়েত করেন না তার জন্যে কোন সহায় এবং পথ প্রদর্শনকারী পাবে না। অর্থাৎ সে থাকবে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত, আর তার শাস্তি হবে অবধারিত।

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ
وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ
عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ
لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ
أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٢٠﴾

তরজমা

(১৮) (আর হে শ্রোতা!) তুমি ধারণা করবে যে তারা জাগ্রত, অথচ তারা ছিল নিদ্রিত আর আমি তাদেরকে ডানে বামে পাশ ফিরিয়ে দেই এবং তাদের কুকুরটি ছিল চৌকাঠে বাহু বিস্তার করে। যদি তুমি তাদেরকে তাকিয়ে দেখ তবে পেছনে ফিরে পলায়ন করতে এবং ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে।

(১৯) আর এভাবেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বললো, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? কেউ কেউ বললো, একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ। কেউ কেউ বললো, তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ তা তোমাদের প্রতিপালকই জানেন। এখন তোমাদের একজনকে এই মুদ্রা সহ শহরে প্রেরণ কর, সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য উত্তম এবং তা থেকে কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্যে। সে যেন সাবধানে যায় এবং কোন লোককে তোমাদের সম্বন্ধে কিছু জানতে না দেয়।

(২০) যদি তারা তোমাদের সম্পর্কে জানতে পারে তবে প্রস্তর বর্ষণ করে তোমাদেরকে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিতে চাইবে, এমন অবস্থায় তোমরা কখনও সাফল্য লাভ করতে পারবে না।

তফসীরুল কোরআন

আসহাবে কাহফ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ তারা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকলেও তাদের

চক্ষুগুলো খোলা থাকে, দর্শক মাত্রই মনে করতো যে তারা জাগ্রত আছে।

وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ

আমি তাদের ডান ও বামে পাশ ফিরিয়ে দেই অর্থাৎ কখনও ডান দিকে, আর কখনও বাম দিকে তারা পাশ ফিরতে থাকে। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মাটি যেন তাদের দেহের গোশ্‌ত না খেয়ে ফেলে এজন্যে ডান বামে তারা পার্শ্ব ফিরিয়ে নিত।

কোন কোন তত্বজ্ঞানীর মতে, তারা শুধু আশুরার দিন পাশ্ব পরিবর্তন করতো আর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেছেন, তারা বছরে একবার পার্শ্ব পরিবর্তন করতো।[১]

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ

"আর তাদের কুকুরটি চৌকাঠে বাহু বিস্তার করে পড়েছিল"।

আসহাবে কাহফের কুকুর

আল্লাহ্ পাক আসহাবে কাহফের হেফাজতের প্রকাশ্য ব্যবস্থা হিসেবে ঐ গর্তের বাইরে একটি কুকুরও মোতায়েন করে রেখেছিলেন। এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, কুকুরটিকে চৌকাঠে রাখার কারণ হলো, যে গৃহে কুকুর বা ছবি বা অপবিত্র ব্যক্তি বা কাফের থাকে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করেনা।

সংসর্গের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি

বস্তুতঃ সংসর্গ এক বিস্ময়কর বিষয়, যদি ভাল লোকের সংসর্গ কেউ অর্জন করে তবে সে আরো ভালো হয় আর মন্দ লোকের সংসর্গে ভাল মানুষও মন্দ হয়। লক্ষ্যণীয়, আসহাবে কাহফের ন্যায় নেককার লোকদের সংসর্গে থাকার কারণে তাদের কুকুরটি এত গুরুত্ব পেয়েছে যে আল্লাহ্ পাকের কালাম পবিত্র কোরআনে তার উল্লেখ হয়েছে। এ কুকুরটির নাম ছিল কেতমীর।

বর্ণিত আছে যে আসহাবে কাহফের একজনেরই ছিল এ কুকরটি। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, এটি ছিল দাকয়ানুস রাজার বাবুর্চির কুকুর। সে আসহাবে কাহফের সাথী হয়ে হিজরত করেছিল। কেতমীর নামক এ কুকুরটি বেহেশতে যাবে বলে বর্ণিত আছে। এজন্যে শায়খ সাদী (রঃ) বলেছেনঃ

پسر نوح بابدان نشت = خاندان نبوتش گم شد

سگ اصحاب کهف روزے چند= پئے نیکان گرفت مردم شد

"নূহ (আঃ)-এর পুত্র সঙ্গ দোষে নবুওয়্যত হারালো, আর আসহাবে কাহফের কুকুর

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৯২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৮৮

কয়েকদিন নেককার লোকদের সঙ্গে থাকার কারণে মানুষ হয়ে গেল"।

মুজাহেদ (রঃ) ও যাহ্যাক (রঃ) আলোচ্য আয়াতের الوصيد শব্দটির অনুবাদ করেছেন, গর্তের আঙ্গিনা।

আর তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেন, শব্দটির অর্থ হলো চৌকাঠ।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এ শব্দটির অর্থ হলো দ্বার।

একরামার সূত্রে বর্ণিত আছে যে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ মতই পোষণ করতেন।

অধিকাংশ তফসীরকারগণ বলেছেন, আসহাবে কাহফের কুকুর কুকুরই ছিল, কিন্তু কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন যে এটি কুকুর ছিল না; বরং এটি ছিল বাঘ কেননা সকল চতুঃষ্পদ জন্তুর ব্যাপারেই আরবী ভাষায় "কালব" শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দূরাত্মা কাফের আবু লাহাবের পুত্র উৎবার জন্যে বদদোয়া করে এরশাদ করেছেনঃ হে আল্লাহ! নিজের কোন কালবকে (কুকুরকে) তার উপর চড়াও করে দাও (এ বদদোয়া কবুল হয়েছে) এবং উতবাকে বাঘ এসে খেয়ে ফেলেছিলো। এ মত পোষণ করেছেন এবনে যুরায়েজ (রঃ) তবে প্রথমোক্ত অভিমত তথা আসহাবে কাহফের কুকুর কুকুরই ছিল-এ মত সর্বজনবিদিত।[১]

মুকাতেল (রঃ) বলেছেন, কুকুরটির বর্ণ ছিল হলুদ, আর কুরতবী (রঃ) বলেছেন, তার বর্ণ ছিল লাল মিশ্রিত হলুদ। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ তার বর্ণ ছিল পাথরের।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, কুকুরটির নাম ছিল 'কেতমীর'। আর হযরত আলী (রাঃ) এর মতে, তার নাম ছিল 'রিয়ান'। আর আওযায়ী (রঃ) বলেছেন, তার নাম ছিল 'তাকুর'। কা'ব (রঃ) বলেছেন, তার নাম ছিল 'সাহবা'।

খালেদ এবনে মিদান বলেছেনঃ আসহাবে কাহফের কুকুর এবং বালম এবনে বাউরের গাধা ব্যতীত কোন চতুঃষ্পদ জন্তু জান্নাতে যাবে না।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেনঃ আসহাবে কাহফ যখন পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন, তখন কুকুরটিও পার্শ্ব পরিবর্তন করতো।

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

"যদি তুমি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখ তবে পেছনে ফিরে পলায়ন করতে এবং ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে উঠতে"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদের অবস্থান-স্থল এবং তাদের চারিপার্শ্বে এমন ভয়-ভীতি সঞ্চার করে রেখেছিলেন যে কেউ তাদের কাছেও যেতে পারতো না এবং তাদেরকে স্পর্শও

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৯৩
তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-২২৭

করতে পারতো না। এ ভয়-ভীতি এজন্যে সৃষ্টি করেছিলেন যেন পরবর্তীকালে লোকেরা ঐ স্থানটিকে খেল-তামাশার স্থান হিসেবে গ্রহণ না করে এবং আসহাবে কাহফের বিরক্তির কারণ না হয়। তাদের হেফাজতের জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে মানুষের মনে এই ভয় সৃষ্টি করা হয়। যেন কোন দুশমন সে যত ক্ষমতাশালী রাজা-বাদশাহই হোক না কেন, আসহাবে কাহফের কাছে যেতে না পারে। কেউ যেন ঐ গর্তের ভেতর প্রবেশের দুঃসাহস না দেখায় এবং প্রহরী হিসেবে একটি কুকুরও তাদের গুহার দ্বারপ্রান্তে মোতায়েন করে রাখা হয়েছিল। কুকুরটি তাদের চৌকাঠের পার্শ্বে বাহু বিস্তার করতঃ প্রহরীর দায়িত্ব পালন করেছে। আসহাবে কাহফের সংশ্রব-গুণে কুকুরটিও তাদের ন্যায় শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত বেঁচে ছিল। এখানেই আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নমুনা লক্ষ্য করা যায়। আসহাবে কাহফের সঙ্গ লাভের বরকতে ঐ কুকুরটিও আজ অমরত্ব লাভ করেছে।

আসহাবে কাহফ ও হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)

সায়ীদ এবনে জুবায়ের (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আমরা হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর সঙ্গী হয়ে জেহাদের উদ্দেশে রোম গমন করেছিলাম। পথে আসহাবে কাহফের গুহা অতিক্রম করার সুযোগ পাই। তখন হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) বলেছিলেন, যদি গর্তের বন্ধ দুয়ার খুলে দেয়া হয় অথবা মধ্যকার দেয়ালটি তুলে দেয়া হয় তাহলে আমরা আসহাবে কাহফকে দেখতে পারতাম। তখন আমি বলেছিলাম, যিনি আপনার চেয়ে উত্তম ছিলেন তাঁকেও এ কাজ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। কেননা আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

"যদি তুমি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখ তবে পেছনে ফিরে পলায়ন করতে এবং ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে উঠতে"।

কিন্তু হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) আমার কথায় কর্ণপাত করেননি এবং কিছু লোককে আসহাবে কাহফকে দেখার জন্যে প্রেরণ করেন। যখন তারা গুহায় প্রবেশ করে, তখন আল্লাহ পাক এক প্রকার বিষাক্ত বাতাস প্রেরণ করেন, পরিণামে তারা জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। এ বর্ণনা পেশ করেছেন এবনে আবি শায়বা, এবনুল মুনজের এবং এবনে আবি হাতেম।[১]

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ

আর এভাবেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করি, যেন তারা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে।

যেভাবে আল্লাহ পাক আসহাবে কাহফকে সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত নিদ্রায় বিভোর রেখেছিলেন, ঠিক তেমনি তাদেরকে জাগ্রত করে দিয়েছেন অর্থাৎ যেভাবে শতাব্দীর পর

১। তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-২২৫
তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৯২

শতাব্দী আসহাবে কাহফকে আল্লাহ পাক নিদ্রিত অবস্থায় রেখেছিলেন এবং তাদের দেহকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করেছিলেন এবং কোন প্রকার ক্ষতি তাদের হয়নি, ঠিক এমনিভাবে মৃত্যুর ন্যায় এ সুদীর্ঘ নিদ্রাকে তিনি দূরীভূত করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে জাগ্রত করেছেন। তাদের নিদ্রা যেমন ছিল বিস্ময়কর, ঠিক তেমনি তাদের জাগরণও ছিল আশ্চর্যজনক। উভয় অবস্থাতে আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শনের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। জাগ্রত হওয়ার পর তারা নিদ্রাকাল সম্বন্ধে আলোচনা করতে থাকে যাতে করে তাদের নিজেদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তারা অবগত হয় এবং আল্লাহ পাকের কত রহমত এবং নেয়ামতের মহাসমুদ্রে তারা নিমজ্জিত রয়েছে সে সম্পর্কে যেন অবগত হয় এবং আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের প্রতি তাদের বিশ্বাস যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কেয়ামতের ব্যাপারে তাদের আকীদা বিশ্বাস আরো সুদৃঢ় হয় এবং তারা আল্লাহ পাকের এ নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পায়।

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ

তাদের মধ্যে একজন বললো, তোমরা কতক্ষণ পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলে? অন্যরা জবাব দেয়, পূর্ণ একদিন বা তার কিছু কম।

আসহাবে কাহফ জাগ্রত হওয়ার পর উপলব্ধি করলো যে, তারা অনেক সময় নিদ্রিত ছিল। সে সময় কতক্ষণ? এ সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ ছিল। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে অনেকক্ষণ নিদ্রিত থাকার কারণে তাদের কিছু নামাজ কাযা হয়ে গেছে, তাই তারা আক্ষেপ করে অথবা বিস্ময় প্রকাশ করে একথা বলেছে।

আসহাবে কাহফ পর্বতের গুহায় সকালের দিকে প্রবেশ করেছে। আর জাগ্রত হয়েছে সন্ধ্যাকালে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে। তাই তারা ধারণা করেছে যে একদিনের চেয়ে কিছু কম সময় তারা নিদ্রিত ছিল। তাদের এ জবাব ছিল নিতান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে ধারণার উপর ভিত্তি করে কোন কথা বলা অবৈধ নয়।

কিন্তু আসহাবে কাহফ যখন দেখলো, তাদের চুল এবং নখ অনেক বড় হয়ে গেছে, এজন্যে তারা বললো, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ

"তারা বললো, তোমরা কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলে এ সম্পর্কে আল্লাহ পাকই ভাল জানেন"।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, তাদের দলনেতা মেকসেলমীন নিদ্রার সময়ের ব্যাপারে মতভেদ দেখে মন্তব্য করেছিল, এসব কথা ছাড়, আল্লাহ পাকই জানেন যে তোমরা কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলে।

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ إِلَى الْمَدِينَةِ

"এখন নিজেদের একজনকে এই মুদ্রা দিয়ে শহরে পাঠাও"।

অর্থাৎ তামলীখাকে মুদ্রা দিয়ে তরতুস নামক শহরে পাঠাও। এ মুদ্রা আসহাবে কাহফের নিকট ছিল, যা তারা হিজরতের সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। এতে একথা প্রমাণিত হয়, নগদ অর্থ-সম্পদ এবং পাথেয় সঙ্গে রাখা তাওয়াক্কুল বিরোধী কাজ নয়, বরং এটিই আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসাকারীদের বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে মানুষ ভুল ধারণা করে, তারা মনে করে আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা করলে আর অর্থ-সম্পদের কি প্রয়োজন? কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হলো, এ সকল প্রয়োজনের জন্যে প্রকাশ্য ব্যবস্থা রেখেই আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা রাখতে হবে, কেননা এটি শরীয়তের বিধান।

فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ

"সে দেখবে কোন্ খাবারটি ভাল এবং তা তোমাদের জন্য নিয়ে আসবে"।

আলোচ্য আয়াতের ازكى শব্দের অর্থ হাকীমুল উম্মত (রঃ) লিখেছেন, হালাল। অর্থাৎ কোন্ খাবারটি হালাল পাওয়া যাচ্ছে তা নিয়ে আস, আর আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো যে শহরে যাবে তার কর্তব্য হবে লক্ষ্য করা কে হালাল বস্তু বিক্রয় করে, কে উত্তম খাবার বিক্রয় করে যা অন্যায়ভাবে অর্জিত হবেনা, অথবা এর অর্থ হলো এমন খাবার যা আল্লাহ্ পাকের নামে জবেহ্ করা হয়েছে।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হল পবিত্রতম। মোকাতেল, এবনে হাব্বান বলেছেন, এর অর্থ হলো 'অত্যন্ত ভাল'। একরামা বলেছেন, এর অর্থ হলো যা পরিমাণে অধিক। আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এ শব্দটির অর্থ হলো যা অত্যন্ত সস্তা।

وَلْيَتَلَطَّفْ

আর সে যেন সাবধানে যায়, অত্যন্ত সন্তর্পণে যায়।

وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا

ঘূর্ণাক্ষরেও যেন কোন লোক আমাদের সম্পর্কে না জানে।

অর্থাৎ তোমার কোন আচরণে যেন কেউ আমাদের সম্পর্কে কোন বিষয়ে জানতে না পারে।

اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ

যদি দাকয়ানুসের লোকেরা তোমাদের খবর পায় বা তোমাদেরকে কাবু করতে পারে,

يَرْجُمُوْكُمْ

তবে তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে, যদি তোমরা মুরতাদ হতে রাজি না হও।

اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِىْ مِلَّتِهِمْ

অথবা তারা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করবে অথবা বল প্রয়োগ করে তোমাদেরকে মূর্তি পূজক বানাতে চেষ্টা করবে।

وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا

যদি তোমরা তাদের ধর্ম গ্রহণ কর এমন অবস্থায় কখনও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না।

অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের ন্যায় কুফরী ও শেরক কর তবে কখনও আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকে নাজাত পাবেনা; বরং চিরস্থায়ী আযাব হবে তোমাদের জন্যে অবধারিত।

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ
لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ
بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۗ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ۗ قَالَ
الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾ سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ
رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ
وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۗ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ
اِلَّا قَلِيْلٌ ۬ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۪ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ
مِّنْهُمْ اَحَدًا ﴿٢٢﴾

তরজমা

(২১) আর এভাবেই আমি তাদের সংবাদ প্রকাশ করে দেই, যাতে করে মানুষ জানতে পারে যে আল্লাহ্ পাকের ওয়াদা সত্য। আর কেয়ামতের আগমনে নিশ্চয় কোন প্রকার সন্দেহ নেই। তারা যখন নিজেদের বিষয়ে তর্ক করে তখন অনেকে বললো, এদের উপর একটি সৌধ নির্মাণ কর। তাদের প্রতিপালকই তাদের অবস্থা সম্পর্কে ভাল করে জানেন। তাদের কর্তব্য সম্পর্কে যাদের মত প্রবল হলো তারা বললো, আমরা তো নিশ্চয় তাদের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করবো।

(২২) কেউ কেউ বলবে, তারা তিনজন, আর তাদের কুকুরটি হলো চতুর্থ এবং একথাও বলবে, তারা ছিল পাঁচজন, তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর, অজানা বিষয় অনুমানের উপর নির্ভর করে। আবার কেউ কেউ বলে, তারা ছিল সাতজন, তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা ভাল জানেন, অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তাদের সংবাদ কেউ জানেনা। অতএব, সাধারণ

আলোচনা ব্যতীত (হে রসূল!) আপনি তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না, আর তাদের মধ্যে কারো নিকট আসহাবে কাহফের সঠিক অবস্থা জানতে চাইবেন না।

তফসীরুল কোরআন

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ যদিও আসহাবে কাহফ তাদেরকে গোপন রাখার জন্যে অনেক সতকর্তা অবলম্বন করেছে, কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের কথা প্রচার করে দিয়েছেন। আসহাবে কাহফের অন্যতম সদস্য তামলীখা যখন তাদের নিকট সংরক্ষিত মুদ্রা নিয়ে শহরে যান তখন দেখেন শহরের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। পূর্বের সেই পরিবেশ, ঐ লোকজনও নেই, সে অবস্থাও নেই, সব কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। তিনি এ পরিবর্তন লক্ষ্য করে বিস্ময়াভিভূত হন। অন্যদিকে তিনি খাবার ক্রয় করার জন্যে যে মুদ্রা নিয়ে এসেছেন তা দেখেও শহরবাসী আশ্চর্যন্বিত হয়, কোন্ যুগের এ মুদ্রা এ বিষয়টিও গবেষণার বিষয়ে পরিণত হয় এবং শহরবাসী এ সম্পর্কে দারুণ কৌতূহল উপলব্ধি করে। হয়তো এ ব্যক্তি কোন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে আর তারই অংশ বিশেষ নিয়ে সে এখন বাজারে এসেছে। কেননা অনুসন্ধানে জানা যায় এই মুদ্রা জালেম দাকয়ানুসের যুগে প্রচলিত ছিল, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ যেভাবে আমি আসহাবে কাহফকে পর্বত গুহায় আশ্রয় দান করেছি, কয়েক শতাব্দী যাবত তাদেরকে নিদ্রিত রেখেছি এবং তাদের দেহকে হেফাজত করেছি, জালেমের জুলুম থেকে তাদেরকে রক্ষা করেছি, ঠিক এমনিভাবে জনসাধারণের নিকট তাদের কথা প্রকাশ করে দিয়েছি।

لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ

"যেন লোকেরা জানতে পারে যে আল্লাহ পাকের ওয়াদা সত্য"।

অর্থাৎ মৃত্যুর পর আল্লাহ পাক মানুষকে পুনর্জীবন দান করবেন এবং কেয়ামতের দিন সকল মানুষের পুনরুত্থান হবে, তাঁর ওয়াদার সত্যতা যেন মানুষ উপলব্ধি করে এজন্যেই আসহাবে কাহফের এ ঘটনা। কেননা যে আল্লাহ পাক তিনশতাধিক বছর ধরে আসহাবে কাহফের রুহকে নিজের কাছে রেখেছেন আর তাদেরকে নিদ্রিত অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন এবং ৩০৯ বছর পর পুনরায় তাদেরকে জীবিত করেছেন, তাঁর পক্ষে মৃত ব্যক্তিদের জীবিত করা আদৌ কঠিন কাজ নয়।[১]

এজন্যেই আল্লাহ পাক কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

(সূরা তোয়াহা)

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৯৫

"এই মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আর এই মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবো, আর এই মাটি থেকেই দ্বিতীয়বার তোমাদেরকে বের করবো"।

এমনিভাবে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ

"তিনি বললেনঃ তোমরা তাতেই জীবন যাপন করবে এবং সেখানেই মৃত্যু বরণ করবে এবং এরপর সেখান থেকে তোমাদেরকে উঠানো হবে"।

আল্লাহ পাকের এ ওয়াদার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে আসহাবে কাহফের ঘটনার মাধ্যমে।

وَّأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا

আর এতে একথাও প্রমাণিত হচ্ছে যে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও অবকাশ নেই।

إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক অভিমত রয়েছে। হাকীমুল উম্মত মওলানা থানবী (রঃ) এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা এই, সে সময় স্মরণযোগ্য যখন লোকেরা আসহাবে কাহফের সম্পর্কে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়। তাদের একদল বললো, আসহাবে কাহফের স্মরণে স্মৃতি সৌধ নির্মাণ কর। এটি হবে আসহাবে কাহফের জন্যে স্মারণিক অথবা এর উদ্দেশ্য হলো, আসহাবে কাহফের গর্তের দ্বার বন্ধ করে দেয়া। এতদ্ব্যতীত লোকেরা আসহাবে কাহফের অবস্থা সম্পর্কেও কথা বলে কিন্তু যেহেতু কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনা, তখন ক্লান্ত হয়ে তারা বলেঃ

رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ

(তাদের প্রতিপালকই তাদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।)

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ

যারা এ ব্যাপারে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় অর্থাৎ রাজা বেদরুস এবং তার সঙ্গীরা বললো, আমরা এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করবো, যাতে করে অনাগত ভবিষ্যতের মানুষ এ সম্পর্কে অবগত হয় যে আসহাবে কাহফ ছিলেন তৌহীদে বিশ্বাসী, আল্লাহ পাকের এবাদত গুজার বন্দা, তাঁরা মুশরেক ছিলেন না, তাঁরা সর্বক্ষণ এক আল্লাহ পাকের এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন, আর তাঁদের এবাদতের প্রতি লক্ষ্য করেই এখানে মসজিদ নির্মাণ করা সমীচিন হবে, যাতে করে যারা এখানে আসবে তারাও যেন আল্লাহর এবাদতে মশগুল হতে পারে এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্য লাভের জন্যে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। সে যুগের লোকদের মধ্যে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে যারা বিশ্বাসী ছিল, হাশরের ময়দানে প্রতিটি মানুষকে হাযির হওয়ার ব্যাপারে যারা ঈমান এনেছিল, তারাই আসহাবে কাহফের ঘটনায় বিজয়ী হলো। কেননা আসহাবে

কাহফের ঘটনায় নতুন করে এ সত্য প্রমাণিত হয় যে, যুগ যুগ ধরে মানুষ কবরে থাকার পরও আল্লাহ্ পাক অতি সহজেই তাদেরকে কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে হাযির করবেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে ঝগড়া বা বিতর্কের কথা উল্লেখ হয়েছে তা কেয়ামতের সত্যতা সম্পর্কে নয়; বরং স্বয়ং আসহাবে কাহফ সম্পর্কে। জনসাধারণের মধ্যে এ বিষয়ে বিতর্ক হয়েছিল যে আসহাবে কাহফের এই লোকগুলো এই সুদীর্ঘকাল কোথায় কিভাবে আত্মগোপন করে রইলো, তারা কি এখনও বেঁচে আছে? না মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী (রঃ) লিখেছেন, আসহাবে কাহফের জাগ্রত হওয়ার পর তাদের অবস্থা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। কেউ বলে, তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। আর কোন কোন লোকের মতে, তাদের মৃত্যু হয়নি; বরং তারা পুনরায় ঘুমিয়েছে এবং এখনও তারা নিদ্রিত আছে। তাদের দেহগুলো সংরক্ষিত আছে। কেয়ামতের পূর্বে যখন হযরত ঈসা (আঃ) আসমান থেকে অবতরণ করবেন তখন তারা জাগ্রত হবেন এবং পর্বতের গুহা থেকে বের হয়ে আসবেন। শুধু তাই নয়; বরং হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে হজ্জও করবেন এবং ইমাম মাহদী (আঃ) যখন ইসলামের দুশনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন তখন আসহাবে কাহফ তাঁর সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবেন। এরপর কেয়ামতের পূর্বে তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হবে। একখানি যয়ীফ হাদীস দ্বারা একথা জানা যায়। হাফেজ এবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেছেন, এই যয়ীফ হাদীস খানি তফসীরে এবনে মরদবিয়ায় সংকলিত রযেছে, যা হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।[১]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, কোন হাদীস দ্বারা একথা জানা যায় না যে আসহাবে কাহফ ঐ ঘটনার পর কতদিন জীবিত ছিলেন অথবা এন্তেকাল করেছেন। আর যদি জীবিত থাকেন তবে কতকাল থাকবেন। এসব বিষয় আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। আর এ বিষয়েও আল্লাহ পাকই সম্পূর্ণ অবগত যে আসহাবে কাহফ কোন্ নবীর অনুসারী? কারো কারো মতে তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারী ছিলেন। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেন, তারা হযরত ইসা (আঃ)-এর পূর্বকালের লোক ছিলেন।

তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে আসহাবে কাহফ সম্পর্কে এ সত্য জানা যায় যে, তারা ছিলেন নিরংকুশ তওহীদে বিশ্বাসী এবং তারা ছিলেন নেককার, এবাদত গুজার। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, যারা গর্তের পাশে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে চেয়েছিল তারা ছিল নাসারা। বিখ্যাত মনীষী আবু হাইয়ান তাঁর রচিত "আল বাহরুল মুহীত" গ্রন্থে আসহাবে কাহফ সম্পর্কে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন।

আসহাবে কাহফের স্থান

আসহাবে কাহফের স্থান নির্ণয়ের ব্যাপারে তত্ত্বজ্ঞানীগণ একাধিক মত পোষণ

১। তফসীরে কুরতুবী, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৮৮
ফাতহুল বারী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৬৫
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪০৫

করেছেন। অধিকাংশ তফসীরকার বলেছেন, এ গুহাটি রোমের একটি পাহাড়ের ভেতর অবস্থিত। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এটি ইরাকের মোসেল প্রদেশের নাইনুয়া এলাকায় অবস্থিত। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এটি আঈলার নিকট।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ পর্বত গুহার ঠিকানা বাতলে দেননি। কোন্ দেশে? কোন্ শহরে এবং কোন্ এলাকায় এ গুহাটি রয়েছে তা সঠিকভাবে আমরা জানিনা। কারণ এর সাথে আমাদের দ্বীন-দুনিয়ার কোন বিষয় সম্পর্কিত নয়। হয়তো আসহাবে কাহফের ঠিকানা গোপন রাখার মধ্যে কোন হেকমত ও মোসলেহাত রয়েছে, যা আমরা জানিনা। যদি এ বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের মধ্যে আমাদের কোন কল্যাণ থাকত তবে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে আমাদেরকে খবর দিতেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ঐ গর্তের অবস্থা এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত করেছেন, কিন্তু এর সঠিক অবস্থান সম্পর্কে জানাননি, অতএব এর অনুসন্ধান করা আমাদের কর্তব্য নয়।

ইমাম রাজী (রঃ)-ও একথাই লিখেছেন যে, সঠিক মত হলো আসহাবে কাহফের অবস্থান অজানা রয়েছে। আর এ কাজটি বুদ্ধি-বিবেচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করা যায়না। এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ঐ পর্বত গুহায় এমন ভয়-ভীতি সৃষ্টি করা হয়েছে যে, কেউ সেদিকে দৃষ্টিপাত করতে পারেনা।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) إِذْ يَتَنَازَعُونَ এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আমি আসহাবে কাহফ সম্পর্কে তখন মানুষকে অবগত করেছি যখন তারা নিজের দ্বীন সম্পর্কে তর্কে লিপ্ত হয়।

একরামা (রঃ) বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে বিতর্ক চলছিল যে স্বশরীরে হাশর হবে না শুধু রুহের হাশর হবে। অমুসলিমরা বলতো, হাশর হবে শুধু রুহের, দেহের নয়; আর মুসলমানদের অভিমত ছিল হাশর হবে দেহ এবং আত্মা উভয়ের। আল্লাহ পাক ঐ মুহূর্তে নিদ্রিত আসহাবে কাহফকে ৩০৯ বছর পর জাগ্রত করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, যেভাবে নিদ্রিত আসহাবে কাহফ জাগ্রত হলো, ঠিক এমনিভাবে মৃত মানব জাতিকে জীবিত করা হবে।

অথবা এ বাক্যটির অর্থ হলো, আসহাবে কাহফ সম্পর্কেই মানুষের মতভেদ হয়েছে। অর্থাৎ আসহাবে কাহফ জাগ্রত হওয়ার পর পুনরায় নিদ্রিত হয়েছে, তখন কিছু লোক বলেছে যে তাদের মৃত্যু হয়নি; বরং তারা পুনরায় নিদ্রিত হয়েছে। আর কিছু লোক বলেছে, এবার তাদের মৃত্যু হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আসহাবে কাহফের ঘটনার পর মুসলমানদের মধ্যে ও তাদের বিরোধীদের মধ্যে মতবিরোধ হয়। মুসলমানগণ বলেন, আমরা এখানে মসজিদ নির্মাণ করবো, কেননা আসহাবে কাহফ ছিলেন মুসলমান, তারা

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪০৭-৪০৮

এক আল্লাহ পাকের এবাদতের জন্যেই সব কিছু ছেড়েছেন। আর অমুসলিমরা বলে, আমরা এখানে এমারত নির্মাণ করবো, যেখানে মানুষ বসবাস করবে এবং এখানে মানব বসতি স্থাপন করবো আর তাদের গুহার দ্বারে এমন একটি ইমারত নির্মাণ করবো যার দ্বারা সেখানে লোকদের প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়, আর যেহেতু তারা আমাদের আত্মীয়-স্বজন ছিল, তাই ইমারত নির্মাণের অধিকার আমাদের রয়েছে। আসহাবে কাহফ সম্পর্কে যারা তর্কে লিপ্ত হয়, তাদের কথার ফাকে আল্লাহ পাক একটি বাক্য উচ্চারণ করেছেন। তা হলো—

رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ

(আসহাবে কাহফ সম্পর্কে তাদের প্রতিপালকই সর্বাধিক অবগত)

যেহেতু কলহে লিপ্ত উভয় দলই আসহাবে কাহফকে নিজেদের বলে দাবী করছিল, তারই প্রতিবাদে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আসহাবে কাহফ মুশরেকদের থেকে ছিল দূরে, তারা ছিল প্রকৃত তওহীদবাদী, আর তারা সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত ছিলনা; বরং তাদের মর্তবা ছিল আরও উচ্চে, তারা ছিল সুফী দরবেশ। আর সুফী দরবেশগণ সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থেকেও সকলের থেকে থাকেন দূরে। এজন্যে মওলানা রুমি (রঃ) বলেছেন-

ہرکے درظن خود شد یارمن = وزدرون من نجت اسرارمن

(প্রত্যেকেই তার ধারণায় আমাকে তার বন্ধু মনে করেছে, কিন্তু আমার প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে কেউ অবগত হয়নি।)

আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ বৈধ, যেন তাঁদের মাজার থেকে বরকত লাভ করা যায়। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তাঁরা বর্ণনা করেন, যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রোগ বৃদ্ধি পায় (যখন তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন) তখন তাঁর চেহারা মোবারক চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। কিন্তু এতে তাঁর কষ্ট হয়, তখন চাদর চেহারা মোবারক থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। ঐ অবস্থায় তিনি এরশাদ করেনঃ আল্লাহর লা'নত হোক ইহুদী ও নাসারাদের উপর যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ হাদীস দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ উম্মতকে আহলে কিতাবদের ন্যায় কাজ করতে নিষেধ করেছেন।

এমনিভাবে মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কবরকে পাকা করা, তার উপর উপবিষ্ট হওয়া এবং তার উপর ইমারত নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।

মুসলিম শরীফে আবুল হেয়াজের কথার উদ্ধৃতি রয়েছে। আবুল হেয়াজ বলেছেনঃ

আমাকে হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ আমি কি তোমাকে এমন কাজে প্রেরণ করবো না? যে কাজে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রেরণ করেছেন, যদি কোন মূর্তি পাও তবে তা ধ্বংস কর, আর যদি কোন উঁচু কবর পাও তবে তা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দাও।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এই হাদীস সমূহের উদ্ধৃতি দেয়ার পর লিখেছেন, এই হাদীস সমূহ দ্বারা কবরকে পাকা করা, উঁচু করা এবং কবরের উপর ইমারত নির্মাণ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু কবরের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়না। দ্বিতীয়তঃ এ হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আহলে কিতাবের একটি সমালোচনা করেছেন, কেননা তারা নবী রসূলগণের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছিল। এর অর্থ হলো, তারা কবরকে সেজদা করা শুরু করেছিল।

হযরত আবু মারসাদ গনবী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা কবরের উপর উপবিষ্ট হয়োনা এবং কবরের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করোনা।[১](মুসলিম শরীফ)

سَيَقُولُونَ ثَلٰثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ

এখন তারা একথাই বলবে যে তারা তিনজন, কুকুরটি চতুর্থ এবং একথাও বলবে যে তারা পাঁচ, কুকুরটি ষষ্ঠ, এ যেন লক্ষ্যস্থল না দেখেই অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার ন্যায় এবং একথাও বলবে, তারা সাত এবং কুকুরটি অষ্টম।

আসহাবে কাহফের সংখ্যা

আসহাবে কাহফের সংখ্যা সম্বন্ধে মানুষ জল্পনা-কল্পনা করবে এবং অনুমানের তীর নিক্ষেপ করবে, কেউ বলবে তিন, কেউ বলবে পাঁচ, কুকুরটি অতিরিক্ত।

মূলতঃ এসবই তাদের অনুমান মাত্র। অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার ন্যায়, সম্ভবতঃ নিজেদের অজ্ঞতার কারণেই এসব উক্তি করে। অথবা ইহুদীদের নিকট থেকে সঠিক সংখ্যা জেনেও হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা করার জন্যে এসব কথা বলে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, নাজরানের খৃষ্টানদের একটি প্রতিনিধি দল হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিল। তাদের মধ্যে সাইয়েদ এবং আকেব অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা আসহাবে কাহফের সংখ্যা সম্পর্কে মতবিরোধ করে। সাইয়েদ বলে, তারা ছিল তিনজন, চতুর্থ ছিল কুকুরটি। আকেব বলে, তারা ছিল পাঁচজন আর কুকুর ছিল ষষ্ঠ। মূলতঃ তারা আসহাবে কাহফের সংখ্যা সম্পর্কে অবগত ছিলনা, এ কারণেই অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার ন্যায় তারা অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলেছিল। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জীব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে এর সংখ্যা জানানোর পর মুসলমানগণ বলবেন তারা ছিল সাতজন, অষ্টম ছিল কুকুর।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৯৭

قُلْ رَبِّيْ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيْلٌ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার প্রতিপালকই তাদের সংখ্যা খুব ভাল করে জানেন, অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তাদের খবর কেউ জানেনা"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো খৃষ্টানদের মধ্যে খুব সামান্য সংখ্যক লোকই সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল। অথবা সকল লোকের মধ্যে সামান্য কয়েকজন মুসলমানই আসহাবে কাহফের সংখ্যা সম্পর্কে অবগত।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আমি সেই স্বল্প সংখ্যক লোকের অন্তর্গত যে আসহাবে কাহফের সংখ্যা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল, তারা ছিল সাতজন।

আল্লাম বয়জাবী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক এ পর্যায়ে তিনটি মতের উল্লেখ করেছেন। প্রথম দু'টি মত সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

رَجْمًا بِالْغَيْبِ

"অন্ধকারে ঢিল নিক্ষেপ করার ন্যায়"।

আর তৃতীয় কথার পর এর প্রতিবাদ করা হয়নি। এর অর্থ হলো, সাতের সংখ্যাই সঠিক। (হে রসূল!) আপনি তাদের কথায় কোন গুরুত্ব দেবেন না, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক আপনাকে যা জানিয়েছেন তাই যথেষ্ট।

فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا

অতএব, সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তাদের সাথে এ সম্পর্কে আর কথা বলবেন না।

وَلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا

আর আসহাবে কাহফের অবস্থা সম্পর্কে তাদের নিকট থেকে কিছু জানারও চেষ্টা করবেন না। কেননা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তাদের জ্ঞানের দৈন্যই প্রকাশ পাবে, তাতে তারা অপমানিত হবে, যা আপনার চরিত্র-মাধুর্যের শানের বরখেলাফ, এজন্যে তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১৯৮-৯৯

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّا
أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي
لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ
وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ
أَحَدًا ﴿٢٦﴾

তরজমা

(২৩) আর (হে রসূল!) কখনও কোন বিষয়ে একথা বলবেন না, "আমি তা আগামীকাল করবো"।

(২৪) "আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে" কথা না বলে, যখন স্মরণ করবেন এবং বলবেন, আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে তা অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ-নির্দেশ করবেন।

(২৫) আর তারা (আসহাবে কাহফ) তাদের গুহায় ছিল ৩০০ বছর তদুপরি আরও ৯ বছর।

(২৬) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তারা কত কাল ছিল তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। আসমান ও জমীনের অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান শুধু তাঁরই। তিনি কত সুন্দরই না দেখেন এবং শুনেন, তিনি ভিন্ন মানুষের কোন অভিভাবকই নেই, আর তিনি তাঁর কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না।

তফসীরুল কোরআন

শানে নজুল

ইহুদীরা যখন মক্কার মুশরেকদেরকে প্ররোচনা দেয় যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আসহাবে কাহফ, জুলকারনাঈন এবং রুহের হাকীকত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। তারা তখন এ বিষয়ে প্রশ্ন করলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'কাল বলবো', তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এরই মধ্যে জীব্রাঈল (আঃ) আসলে তাঁর কাছ থেকে এ বিষয় জেনে নেবেন এবং তাদেরকে জবাব দেবেন। ঘটনাক্রমে তিনি

তখন "ইনশাআল্লাহ" বলেননি। ফলে পনেরো দিন পর্যন্ত ওহীর আগমন বন্ধ ছিল। মুশরেকরা এ সময়ে আপত্তিকর মন্তব্য করতে শুরু করে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এতে বিব্রত বোধ করলেন। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।[১]

(এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে) এ আয়াত দ্বারা এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যেন "ইনশাআল্লাহ" না বলে কিছু করবো এমন কথা বলা না হয়। যদিও আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে, কিন্তু শিক্ষা দেয়া হয়েছে সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে যেন কেউ "ইনশাআল্লাহ" (যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন) না বলে "আগামীকাল অমুক কাজ করবো" না বলে। কেননা আগামীকাল কি হবে তা আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা। যে ব্যক্তি একথা বলছে সে জীবিত থাকবে কি-না তাও জানেনা। আর যে কাজ করবে বলছে সে কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে কি-না তাও সে জানেনা। অতএব, এ পর্যায়ে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা হলো, আগামী দিনের জন্যে কোন কথা বলতে হলে অবশ্যই আল্লাহ পাকের মর্জির কথা মনে করে "ইনশাআল্লাহ" বলতে হবে।

মূলতঃ পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন, তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, তাঁর ইচ্ছা বা মর্জি না হলে কোন কিছুই হয়না। তাই তাঁর ইচ্ছা ও মর্জির কথা লক্ষ্য না রেখে তথা "ইনশাআল্লাহ" না বলে কোন কিছুর ওয়াদা করা উচিত নয়।

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ

(হে রসূল!) যখন আপনি ভুলে যান তখন আপনার প্রতিপালককে স্মরণ করুন।

অর্থাৎ যখন আপনি ইনশাআল্লাহ বলা ভুলে যান তখন আল্লাহ পাকের নামের তসবীহ পাঠ করুন এবং এস্তেগফার করুন।

এ বাক্যটি দ্বারা ইনশাআল্লাহ বলার উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

অথবা এর অর্থ হলো, (হে রসূল!) কোন আদেশ পালনের কথা যদি আপনি ভুলে যান তবে আল্লাহ পাককে স্মরণ করুন এবং তাঁর আযাবের কথাও মনে করুন, যাতে করে ভুলে যাওয়ার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

অথবা এর অর্থ হলো, যদি কোন কথা ভুলে যান তবে যেন আল্লাহ পাক আপনাকে ভুলে যাওয়া কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

তফসীরকার একরামা (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো, যখন আপনার ক্রোধ আসে তখন আল্লাহ পাককে স্মরণ করুন।

ওহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বলেছেন, ইঞ্জিলে রয়েছে, হে আদম সন্তান! যখন তুমি

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২০০
তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-১০৮
আদদররুল মানসুর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৩৯
তফসীরে রুহুল মা'আনী, খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-২৪৭

রাগান্বিত হও তখন তুমি আমাকে স্মরণ কর (তাহলে রাগ কমে যাবে) তোমাকে আমি স্মরণ করবো (অর্থাৎ তোমার দুর্বলতার কারণে আমি তোমাকে দয়া করবো)।

তফসীরকার যাহ্যাক এবং সুদ্দী (রঃ)-এর মতে, এ আয়াত নামাজ সম্পর্কিত অর্থাৎ নামাজে কোন প্রকার ভুল হলে আল্লাহকে স্মরণ কর।

অথবা এর অর্থ হলো, নামাজ আদায় করা ভুলে গেলে যখন স্মরণ হয় সঙ্গে সঙ্গে নামাজ আদায় কর।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি কোন ব্যক্তি নামাজ আদায় করা ভুলে যায় তবে যখন স্মরণ হয় তখনই যেন নামাজ আদায় করে নেয়। (বগভী)

ইমাম বোখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম আহমদ (রঃ), তিরমিযী (রঃ), নেসায়ী (রঃ) এ পর্যায়ে যে হাদীস সংকলন করেছেন তাতে রয়েছে, যে ব্যক্তি নামাজের কথা ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে পড়ে, আর নামাজের সময় শেষ হয়ে যায় তখন তার কর্তব্য হলো যখনই তার স্মরণ হয় অথবা জাগ্রত হয় তখনই সঙ্গে সঙ্গে নামাজ আদায় করবে।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ভুলবশতঃ বেতরের নামাজ না পড়ে অথবা ঘুমিয়ে পড়ে, তার কর্তব্য হলো যখনই স্মরণ হয় তখনই আদায় করা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) মুজাহেদ (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, যদি "ইনশাআল্লাহ" বলা ভুলে যায় তবে যখন একথা স্মরণ হয় তখন "ইনশাআল্লাহ" বলা কর্তব্য হয়ে পড়ে। এ ব্যাখ্যার কারণে তাঁদের মতে, এক বছর পরও "ইনশাআল্লাহ" বলা বৈধ। তবে শর্ত হলো যে কথার ব্যাপারে "ইনশাআল্লাহ" বলা হবে, সে কথার বিরোধী কোন কাজ যদি না করে থাকে (তাহলে পরে "ইনশাআল্লাহ" বলা সঠিক হবে)। একথার সমর্থন পাওয়া যায় এবনে মরদবিয়ার একটি বর্ণনা থেকে। এ বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (১০দিন বা ৪০ দিন পর) "ইনশাআল্লাহ" বলেছিলেন। তবে ফেকাহবিদগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে "ইনশাআল্লাহ" কথার সঙ্গেই বলতে হবে, পরে নয়।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও মনসুর

আব্বাসীয় খলীফা আল-মনসুরকে জনৈক ব্যক্তি খবর দেয় যে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) আপনার পিতামহ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতের বরখেলাফ ফতোয়া দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, "ইনশাআল্লাহ" কথার সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে, আর বিলম্বে ইনশাআল্লাহ বললে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। মনসুর ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে। ইমাম সাহেব খলীফা মনসুরের প্রশ্নের জবাবে বলেন, হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ফতোয়া আপনার বিরুদ্ধে চলে যায়। কেননা আপনি জনসাধারণ থেকে

আপনার আনুগত্যের বয়আত গ্রহণ করেন, আর লোকেরা বয়আত করে কিন্তু আপনার দরবার থেকে বের হওয়ার পর তারা যদি "ইনশাআল্লাহ" বলে তবে আপনার প্রতি আনুগত্যের বয়আত বিশ্বাসযোগ্য থাকবে না। তখন মনসুর ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর কথা মেনে নেয় এবং যে তাঁর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছিল তাকে দরবার থেকে বের করে দেয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এ বিবরণ যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর ইনশাআল্লাহ বলেছিলেন, এর অর্থ এই নয় যে তিনি পূর্বের ভুলের কারণে ইনশাআল্লাহ বলেছেন; বরং ইনশাআল্লাহ বলার যে আদেশ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এসেছে, ভবিষ্যতে তার উপর আমল করার ব্যাপারে তিনি ইনশাআল্লাহ বলেছেন অর্থাৎ "এই আদেশ অবশ্যই পালন করবো"।

সুফি-সাধকদের ব্যাখ্যা

وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ

(যখন আল্লাহ পাক ব্যতীত আর সব কিছুকে ভুলে যাও তখন আন্তরিকভাবে আল্লাহকে স্মরণ কর।)

সুফি-সাধকগণ বলেন, সর্বক্ষণ আল্লাহ পাককে স্মরণ করা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব হয়না, যতক্ষণ অন্তর থেকে আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুকে বের করে না দেয়া হয়। সাধারণত মনের অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে, মনের একাগ্রতা সর্বক্ষণ থাকেনা। আর একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ও প্রতিভাত যে মানুষের মন একটিই, দুটি নয়। আর একই সময় অন্তরে আল্লাহ পাকের স্মরণ থাকবে আর সৃষ্টির কথাও মনে পড়বে– এ অবস্থা সম্ভব নয়। যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর কথা মনে আসবে তখন অতি স্বাভাবিক ভাবেই আল্লাহ পাকের স্মরণে ত্রুটি দেখা দেবে। আর যদি মন থেকে আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু বের করে দেয়া হয়, তখন মন শুধু আল্লাহ পাকের স্মরণে মুগ্ধ মত্ত মাতোয়ারা হয়ে থাকবে এবং সর্বক্ষণ মন আল্লাহ পাকের জিকরে বিভোর থাকবে। সুফি-সাধকদের ভাষায় এ অবস্থাকে 'ফানায়ে কলব' বলা হয়। যে পর্যন্ত কেউ ফানায়ে কলব এর মর্তবা অর্জন করেনা, অর্থাৎ সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের স্মরণে মশগুল থাকেনা, ততক্ষণ তাকে মোয়াহ্হেদ বলা হয়না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ মূলতঃ এ অর্থেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুর কথা যখন ভুলে যাবে তখন একাগ্রচিত্তে আল্লাহ পাকের স্মরণে মশগুল হবে।[১]

وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২০১-২০২

(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমাদের হাস্য-রস অথবা ভিত্তিহীন কথা-বার্তায় কিছুই যায় আসেনা। কেননা আমি আশা করি আমার প্রতিপালকের তরফ থেকে আমার মর্যাদা আরও উন্নীত করা হবে। আমার প্রতিপালক আমার নবুওয়্যতের সত্যতাকে আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করবেন। অতএব, কাফেরদের সমালাচনা সম্পূর্ণ অকেজো প্রমাণিত হবে। (হে রসূল!) আল্লাহ্ পাক আপনাকে আসহাবে কাহফের চেয়ে উত্তমভাবে হেফাজত করবেন এবং আপনার জীবনে এর চেয়ে অনেক বেশী বিস্ময়কর ঘটনা ঘটবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো, (হে রসূল!) যদি আপনি "ইনশাআল্লাহ্" বলা বা আল্লাহ্ পাকের কোন হুকুম পালন করা ভুলে যান তবে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করুন (অর্থাৎ তসবীহ্ পাঠ করুন, এস্তেগফার করুন)।

কোন কোন তত্বজ্ঞানী লিখেছেন, যখন মক্কার কাফেররা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আসহাবে কাহফের কথা জিজ্ঞাসা করে, তখন আল্লাহ্ পাক আসহাবে কাহফের কথা বর্ণনা করেছেন। অবশেষে স্বীয় পয়গম্বরকে আদেশ দিয়েছেন যে, এ ঘটনার চেয়েও সুস্পষ্ট দলিল আল্লাহ্ পাক আপনাকে দান করবেন, আল্লাহ্ পাক এ ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। সমস্ত নবী রসূলগণকে যত এলম দান করা হয়েছে তা এবং তার চেয়েও অধিকতর এলম তাঁকে দান করা হয়েছে এবং এটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও তাঁর নবুওয়্যতের সুস্পষ্ট দলিল।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে (এবং রসূলের মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমানকে) এই আদেশ দিয়েছেন, যখন ইনশাআল্লাহ্ বলতে ভুলে যাও, এরপর স্মরণ হয় তখন "ইনশাআল্লাহ্" বলার পর একথাটিও বল-

عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّىْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا

আর এটিই হলো পূর্বে কৃত ত্রুটির তওবা।

সুফী-সাধকদের ব্যাখ্যার আলোকে আয়াতের অর্থ হবে এই, যখন আল্লাহ্ পাক ব্যতীত সব কিছুকে ভুলে যাবে তখন আল্লাহ্ পাককে স্মরণ করবে, আর একথাও বলবে, আল্লাহ্ পাক আমাকে এমন পথের নির্দেশ দান করবেন বা এমন জিনিস শিক্ষা দেবেন যা ঐ জিকর থেকেও অধিকতর নৈকট্যের কারণ হবে অর্থাৎ এমন কিছু আমাকে শিক্ষা দেবেন যার কারণে আমি আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য-ধন্য হব। কেননা আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ (সূরা ক্বাফ)

(আর আমি মানুষের গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও নিকটতম।)

وَلَبِثُوْا فِىْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا

"আর তারা তাদের গুহায় ৩০০ বছর অবস্থান করে তদুপরি আরও ৯ বছর"।

পূর্ববর্তী আয়াতে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিল। এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে আসহাবে কাহফ গুহায় ৩০৯ বছর অতিবাহিত করেছেন। অথবা কোন

কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, ৩০০ বছর ঘুমের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে, আর অতিরিক্ত ৯ বছর ঘুমের ঘোরে কেটেছে। আর কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, তাদের ঘুম ভাঙ্গার থেকে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব পর্যন্ত ৩০৯ বছর অতিবাহিত হয়েছে। আর ঘুম ভাঙ্গার পর উল্লেখিত সময় তারা পুনরায় ঘুমিয়ে পড়ে। ইহুদী নাসারারা এ মত পোষণ করে। তাই আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে তাদের এ মতের বাতুলতা প্রকাশ করে এরশাদ করেছেনঃ

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا

"(হে রসূল!) আপনি বলে দিন, তারা কত বছর ঘুমিয়ে ছিল, একথা সঠিকভাবে এক আল্লাহ পাকই জানেন আর কেউ নয়"।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে এবং এবনে জরীর যাহ্যাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রথমে وَلَبِثُوْا فِىْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ নাজিল হয়। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! ৩০০ বছর না ৩০০ মাস? তখন سنين শব্দটি নাজিল হয়। অর্থাৎ ৩০০ বছর।

وَازْدَادُوْا تِسْعًا

(তদুপরি আরও ৯ বছর।)

এর ব্যাখ্যায় কালবী (রঃ) বলেছেন, নাজরানের খৃষ্টানরা বলেছিল, আসহাবে কাহফের পর্বত গুহায় ৩০০ বছর অতিবাহিত করার কথা আমরা জানি কিন্তু বাড়তি ৯ বছরের কথা আমরা জানিনা অর্থাৎ আমাদের কিতাবে নেই। তারই জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন, তারা কতকাল পর্বত গুহায় অবস্থান করেছে সে সম্পর্কে আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, আসহাবে কাহফ সূর্য মাস হিসেবে ৩০০ বছর নিদ্রিত ছিল। আর আল্লাহ পাক চান্দ্র মাস হিসেবে ৩০৯ বছরের কথা ঘোষণা করেছেন। সূর্য মাস হিসেবে প্রতি ১০০ বছরে চান্দ্র মাসে ১০৩ বছর হয়। আর এভাবে ৩০০ বছরে ৩০৯ বছর হয়ে থাকে।

لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ

অর্থাৎ তারা কতকাল ঘুমিয়ে ছিল এ সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন, কেননা আসমান জমীনের তথা নিখিল বিশ্বের যাবতীয় গোপন রহস্য এক আল্লাহ পাকেরই জানা রয়েছে। তাঁর কুদরত হেকমত বিস্ময়কর, তাঁর জ্ঞান অনন্ত অসীম, সৃষ্টি জগতের সব কিছুই তাঁর কতৃত্বাধীন। তদুপরি তাঁর দেখা-শোনার পন্থাও বিস্ময়কর। কোন কিছুই তাঁকে দেখতে বা শুনতে বাধা দিতে পারেনা, আর কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকতে পারেনা।

مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا يُشْرِكُ فِىْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا

তিনি ভিন্ন মানুষের কোন অভিভাবক নেই, আর তিনি তাঁর কর্তৃত্বে কোন কিছুকে শরীক করেন না। আর তাই আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কেউ আসহাবে কাহফ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে পারেনা।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসহাবে কাহফের ঘটনা সম্পর্কে ইতিপূর্বে অবগত ছিলেন না, তাই এ ঘটনা তাঁর জন্যে এলমে গায়বের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আল্লাহ্ পাক ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করেছেন, আর কোরআনে করীমে এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। অতএব যা অদৃশ্য বা গায়ব এবং অজানা এমন ঘটনার বর্ণনা তাঁর মোজেযা হয়।

আর এ মোজেযা পবিত্র কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।[১]

وَاتْلُ مَآ أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ
وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم
بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيدُ زِينَةَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ
أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن
شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن
يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۖ وَ
سَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ
أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ
الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا
مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ ۖ
وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২০৪-২০৫
তফসীরে রুহুল মা'আনী, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-২৫২

তরজমা

(২৭) (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের কিতাব থেকে আপনার নিকট যে ওহী প্রেরণ করা হয়েছে তা পাঠ করুন। তাঁর কথা কেউ পরিবর্তন করতে পারেনা, আর আপনি তাঁর নিকট ব্যতীত কোথাও আশ্রয় পাবেন না।

(২৮) আর (হে রসূল!) আপনি নিজেকে তাদের সঙ্গে ধৈর্য সহকারে রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় স্বীয় প্রতিপালককে ডাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে। আর আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য সন্ধানে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। আর আমি যাদের চিত্তকে আমার স্মরণ থেকে অমনযোগী করে রাখছি তাদের কথা আপনি শুনবেন না, যারা তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে এবং যাদের কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।

(২৯) আর (হে রসূল!) আপনি বলুন, আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে যা এসেছে তাই সত্য, অতএব যার ইচ্ছা ঈমান আনবে এবং যার ইচ্ছা অমান্য করবে। পাপীদের জন্যে আমি এমন আগুন প্রস্তুত রেখেছি যার বেষ্টনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে, যদি তারা পানি চায় তবে তাদেরকে এমন পানীয় দেয়া হবে যা পূজের ন্যায়, যা তাদের মুখমন্ডলকে দগ্ধ করবে, তা নিকৃষ্ট পানীয়। আর অগ্নি কত নিকৃষ্ট আশ্রয়!

(৩০) নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি, যে সৎ কাজ করে আমি তার শ্রমফল বিনষ্ট করি না।

(৩১) তাদের জন্যেই রয়েছে স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নির্ঝরমালা প্রবাহিত হয়, তাদেরকে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বর্ণের পোশাক। আর তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে। কত সুন্দরই না এই পুরস্কার! আর কত উত্তমই না এ আশ্রয়-স্থল!

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

এ সূরার প্রারম্ভে পবিত্র কোরআনের অবতরণকে আল্লাহ পাকের নেয়ামত বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এরপর এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর আসহাবে কাহফের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যারা এ ক্ষণভঙ্গুর জগত ও জীবনের যাবতীয় আনন্দ-উল্লাসকে তুচ্ছ মনে করে সুদৃঢ়ভাবে ঈমানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তারা অবশেষে সফলকাম হয়, আর অহংকারী জালেম দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে।

আসহাবে কাহফের ঘটনার পর আলোচ্য আয়াতে পুনরায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের আদেশ দেয়া হয়েছে। এতে কাফেরদের অনেক প্রশ্নের জবাবও রয়েছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের দলিল-প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। এরপর আসহাবে কাহফের ন্যায় যে সাহাবায়ে কেরাম দুনিয়ার আনন্দ-উল্লাস বর্জন করে এক আল্লাহর বন্দেগীতে মশগুল রয়েছেন, তাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করার তাগিদ রয়েছে,

যেমন হযরত আম্মার (রাঃ), হযরত বেলাল (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা ধৈর্য ও সংকল্পের দৃঢ়তার প্রতীক হয়ে দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের প্রতি সুনজর রাখার তাগিদ করা হয়েছে। আর যারা নিজেদের অর্থ-সম্পদের জন্যে গর্ব করে তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার নির্দেশ রয়েছে।

হযরত শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী (রঃ) তাঁর 'এজালাতুল খেফা' গ্রন্থে লিখেছেন, এ আয়াত সমূহে সর্বপ্রথম পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের আদেশ দেয়া হয়েছে। এরপর সে সব লোকের সঙ্গ লাভের আদেশ দেয়া হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ পাকের এবাদতে মশগুল থাকে, এমন লোকদের থেকে বিমুখ না হওয়ার নির্দেশ রয়েছে। পক্ষান্তরে, যারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত, পথভ্রষ্ট, তাদের থেকে দূরে থাকার আদেশ হয়েছে। এ আয়াতে যে দলের সঙ্গে ওঠা-বসা করার আদেশ দেয়া হয়েছে তারা হলেন প্রথম যুগের মুহাজেরগণ, তাঁরা আল্লাহ পাকের এবাদত-বন্দেগীতে সর্বক্ষণ মশগুল থাকতেন, তাঁদের যাবতীয় ধন-সম্পদ তাঁরা আল্লাহর রাহে বিলীন করে দিয়েছিলেন, তাই তাঁরা হয়েছিলেন রিক্ত হস্ত, এটি ছিল তাঁদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।

কাফেররা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একথা বলতো, যদি আপনি ইচ্ছা করেন যে আমরা আপনার কথা শ্রবণ করি এবং আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করি তবে যখন আমরা আপনার নিকট আসি তখন আপনি এ দারিদ্র্য-প্রপীড়িত লোকদেরকে আপনার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন, তাদের সঙ্গে একত্রে বসা আমাদের জন্যে মর্যাদা হানিকর, তাছাড়া তাদের পোশাক থেকে দুর্গন্ধ আসে, এরা আমাদের সঙ্গে বসবার লোক নয়। তখন আলোচ্য আয়াত সমূহ নাজিল হয়। এতে কাফেরদের দরখাস্ত মঞ্জুর না করার নির্দেশ রয়েছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে আপনি এ অহংকারী লোকদের দিকে মনোনিবেশ করবেন না, বরং ইসলামের সত্য-সাধনায় যারা শত কষ্ট সহ্য করেও অগ্রসর হয়েছে তাদেরকে সঙ্গে রেখে চলুন। তারা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর এবাদতে মশগুল রয়েছে, তারাই আল্লাহর প্রিয় বন্দা এবং আসহাবে কাহফের নমুনা। অহংকারী কাফেররা এ নিঃস্ব মুসলমানদের সঙ্গে বসা পছন্দ করেনি, আল্লাহ পাক তাদের এ আবদার রক্ষা না করার আদেশ দিয়েছেন।[১]

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ

"আর আপনার প্রতিপালকের কিতাব থেকে যে ওহী আপনার নিকট প্রেরিত হয়েছে তা পাঠ করুন, তাঁর কথা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না"।

কোন কোন তাফসীরকার লিখেছেন, এ আয়াতের সম্পর্ক হলো পূর্ববর্তী আয়াতের

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১১৪
তফসীরে মাআরেফল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪১১-১২

সঙ্গে যেখানে বলা হয়েছে যে কাফেরদের সঙ্গে সাধারণ আলোচনা ব্যতীত বিতর্কে যাবেন না এবং তাদের কথায় গুরুত্ব দেবেন না। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, (হে রসূল!) কাফের-মুশরেক ইহুদী নাসারাদের কথায় মন না দিয়ে আল্লাহ পাকের প্রেরিত জ্ঞান-গর্ভ মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআন পাঠ করতে থাকুন। কেননা পবিত্র কোরআনের প্রতিটি বিষয় ধ্রুব সত্য এবং চিরসত্য, আর তাতে কোন রকম পরিবর্তনের বা রদবদল করার সাধ্য কারোই নেই। এটি মহান আল্লাহ পাকের কালাম, এটি অকাট্য সত্য। এতে যেমন কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, তেমনি নেই কোন ভুল-ভ্রান্তি। অতএব স্বয়ং আল্লাহ পাক ব্যতীত এতে কোন প্রকার রদবদল করার অধিকারও কারো নেই।

কোন কোন তফসীরকার لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ বাক্যের এ ব্যাখ্যা করেছেন, অবাধ্য নাফরমানদের যে শাস্তির কথা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন হবার নয়; বরং তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে।

وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهٖ مُلْتَحَدًا

(আর তিনি ভিন্ন কোথাও আপনি আশ্রয়ও পাবেন না।)

পবিত্র কোরআন চির সংরক্ষিত, কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি কেউ এ মহান গ্রন্থের যথোচিত মর্যাদা না দেয় তবে সারা পৃথিবীতে তার কোথাও আশ্রয়ের স্থান নেই, একথা যেন সে ভালভাবে জেনে রাখে।

অথবা এর অর্থ হলো কাফেররা বলেছিল, এই কোরআন পরিবর্তন করুন, অন্য কোরআন নিয়ে আসুন, যেখানে মূর্তিপূজা ও শেরকের প্রতিবাদ না থাকে, অথবা এতে কিছু পরিবর্তন করুন, তারই জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাকের মহান বাণীতে কোন প্রকার পরিবর্তন করার কারো সাধ্যই নেই। যদি এতে কেউ পরিবর্তনে প্রয়াসী হয়, তবে ত্রিভূবনে তার কোন আশ্রয় নেই। পক্ষান্তরে, যারা পবিত্র কোরআনের বিধান মেনে চলে তাদের জন্যে আল্লাহর রহমতের বারিধারা বর্ষিত হতে থাকবে। যেমন আসহাবে কাহফ আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং ঈমানের উপর সুদৃঢ় ছিল, তাই আল্লাহ পাকের দরবার থেকে তারা লাভ করেছে নিরাপদ আশ্রয়।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهٗ

"(হে রসূল!) আপনি নিজেকে তাদের সঙ্গেই রাখুন যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে ছেড়ে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য সন্ধানে যেন আপনার দৃষ্টি ছুটে না যায়"।

শানে নজুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে উয়াইনা এবনে হোসাইন ফাজারী সম্পর্কে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উয়াইনা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়। তখন তাঁর দরবারে কয়েকজন নিঃস্ব

মুসলমান উপস্থিত ছিলেন যাদের মধ্যে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) অন্যতম। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর গায়ে একটি ছোট্ট চাদর ছিল। তিনি ছিলেন ঘর্মাক্ত, তখন উয়াইনা বললো, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! এ লোকদের দুর্গন্ধ আপনার কষ্টের কারণ হয় না? আমরা গোত্রের নেতা, সমাজের উঁচু স্তরের লোক, আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি তবে সব লোক মুসলমান হয়ে যাবে, কিন্তু এসব লোকদের উপস্থিতি আমাকে আপনার অনুসরণে বাধা দিচ্ছে, আপনি যদি এদেরকে আপনার এখান থেকে দূরে সরিয়ে দেন তবে আমরা আপনার অনুসরণ করবো, অথবা আমাদের জন্যে বসবার কোন ভিন্ন স্থান নিদৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখুন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়।[১]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কোরায়েশের তথাকথিত নেতারা এসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেছে, যদি আপনি ইচ্ছা করেন যে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনি তবে এ দারিদ্র্য-প্রপীড়িত লোকদেরকে আপনার মজলিস থেকে সরিয়ে দিন অথবা এ ব্যবস্থা করুন, যখন আমরা হাযির হই, তারা যেন তখন না থাকে, আর তাদের জন্যে সময় নিদৃষ্ট করে দিন। তারই জবাবে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।[২]

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ বাক্য দ্বারা আসহাবে সুফ্ফাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাঁদের সংখ্যা ছিল ৭০০। তাঁরা ছিলেন নিঃস্ব, হৃত-সর্বস্ব। ইসলামের জন্যে, সত্যের জন্যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে তারা তাঁদের সকল ধন-সম্পদ যথা সর্বস্ব মক্কা শরীফে রেখে হিজরত করে এসেছেন মদীনা মুনাওয়্যারায়। এখানে তাঁদের বাড়ী-ঘর ছিলনা, বাগ-বাগিচা ছিল না, ব্যবসা-বাণিজ্যও ছিল না, তাঁরা সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হতেন। তাঁরা এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে দ্বিতীয় নামাজের জন্যে মসজিদে অপেক্ষা করতেন। যখন এ আয়াত নাজিল হয়, তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্যে যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করেছেন, যাদের সঙ্গে থাকার জন্যে আল্লাহ পাক আমাকে আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ পাকের দরবারে সর্বাধিক প্রিয় গুণ

মূলতঃ দরবারে এলাহীতে সর্বাধিক প্রিয় গুণ হলো আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ এবং তাঁর সন্তুষ্টির অন্বেষণ। যারা শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে জীবনের যাবতীয় কাজ করে এবং সকল কর্মকাণ্ডে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকে তথা কোন অবস্থাতেই তাঁর নাফরমানী করেনা, তারাই আল্লাহ পাকের দরবারে সর্বাধিক প্রিয়ভাজন। যারা দুনিয়ার জন্যে নয়, এমনকি আখেরাতের নেয়ামতের আশায়ও নয়; বরং শুধু এবং শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে তাঁর সান্নিধ্য লাভের সাধনায়

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২০৬
তফসীরে কবীর, খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১১৪

রত থাকেন, তারাই হলেন আল্লাহর ওলী, তাঁরা আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় বন্দা যেমন হযরত গওসুল আযম (রঃ) বলেছেনঃ

نہ خواهم خوبئے دنیا نہ خواهم راحت عقبی

اگر خواهم تراخواهم نہ خواهم باغ رضوان را

"আমি দুনিয়ার কোন সৌন্দর্য চাই না, আখেরাতের কোন আরামও আমি চাইনা, যদি কিছু চাই হে আল্লাহ! শুধু তোমাকেই চাই"।

আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এমন লোকেরাই অতি প্রিয়, পছন্দনীয়, যারা স্বীয় জীবনকে আল্লাহ পাকের রাহে বিলীন করে দিয়েছেন, দুনিয়ার সম্পদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেননি, হয়তো সমাজ জীবনে তাদের কোন উল্লেখযোগ্য স্থানও থাকেনা, সমাজপতিদের দলভুক্ত তাঁরা হন না, কিন্তু আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাঁদের উচ্চ মর্যাদা সংরক্ষিত থাকে।

অতএব, (হে রসূল!) যারা আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে বদ্ধপরিকর এমন লোকদের মন রক্ষার্থে আপনি তাদেরকে আপনার পবিত্র সঙ্গ লাভ থেকে বঞ্চিত করবেন না; বরং যারা আল্লাহর প্রিয় পছন্দনীয়, যারা থাকে আল্লাহর জিকরে সর্বক্ষণ মশগুল, নিজেকে আপনি তাদেরই সঙ্গে রাখুন, তাদেরকে অধিক পরিমাণে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিন, সমাজের প্রভাবশালী কাফেররা ঈমান আনবে এই আশায় তাদেরকে আপনি দূরে সরিয়ে দেবেন না। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সম্পদ ঐশ্বর্যে নয়; বরং প্রকৃত ঈমান, তাকওয়া-পরহেযগারীর মাধ্যমেই ইসলামের শান মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, মহিমা এবং সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। আল্লাহ পাকের ভয় এবং মহব্বতের মাধ্যমেই আল্লাহ পাকের সাথে বন্দার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, আর এ সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে আল্লাহ পাকের জিকর শোকর তথা এবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে। এ পর্যায়ে যে যত বেশী সাধনায় রত হয়, সে ততবেশী আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হয়, যে এ পথের সন্ধান পেয়েছে, সে আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হতে পেরেছে, এ পৃথিবীতে তার কোন অভাব নেই। আসহাবে কাহফের ঘটনা এ বক্তব্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا

"আর যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে রেখেছি, (হে রসূল!) আপনি তার কথা মানবেন না"।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যার কথা না মানার নির্দেশ রয়েছে, সে হলো উয়াইনা এবনে হোসাইন ফাজারী।

এবনে মরদবিয়া যাহ্যাক (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে এ আয়াত উমাইয়া এবনে খালফ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। উমাইয়া বলেছিল আপনি এ দরিদ্র লোকদেরকে বের করে দিন এবং সমাজপতিদেরকে

আপনার কাছে বসতে দিন। আল্লাহ্ পাক এ প্রস্তাব পছন্দ করেননি। তাই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

وَاتَّبَعَ هَوٰهُ

(আর সে তার প্রবৃত্তির তাড়নায় ছুটে চলে।)

অর্থাৎ যারা ভোগবাদের মরফিয়া পান করে এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার লাভ-লোভে মুগ্ধ মত্ত রয়েছে, যারা আল্লাহ্ পাকের জিকরের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত, যারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত, যারা আল্লাহর রসূলের কথা মেনে চলতে রাজি নয়, যারা প্রবৃত্তির তাড়নায় ছুটে চলে, তারা যত ক্ষমতাশালী বা সম্পদশালী হোক না কেন (হে রসূল!) আপনি তাদের কথা কখনও শুনবেন না। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে কাফেরদের এ আবেদনের দু'টি কারণ রয়েছে (১) ঐ দূরাত্মা কাফেরদের অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন, তারা সত্যকে গ্রহণ করতে প্রস্তুতই নয়। (২) দুনিয়ার আনন্দ-উল্লাসে তারা এত মত্ত যে মা'রেফাত, ভদ্রতা, নম্রতা, উদারতা, মহানুভবতার তাৎপর্য বোঝার ক্ষমতাও তাদের নেই। মানব মন যে পর্যন্ত যাবতীয় অন্যায়-অনাচার ও পাপাচার থেকে পবিত্র না হবে, সে পর্যন্ত মা'রফাতে এলাহীর নূর থেকে থাকবে বঞ্চিত।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলোচ্য আয়াতের আলোকে এ তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন যে اَغْفَلْنَا অর্থাৎ 'আমি গাফেল করেছি'। এ গাফলত করার সম্পর্ক আল্লাহ্ পাক নিজের সাথে করেছেন। আর اتبع هوه (অর্থাৎ সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে) এই বাক্যের সম্পর্ক সে ব্যক্তির সঙ্গে করা হয়েছে। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে বন্দা সম্পূর্ণ মজবুরও নয় এবং সম্পূর্ণ ক্ষমতাবানও নয়। বর্ণিত আছে যে হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেছিলেন তুমি তোমার পা উপরের দিকে তোল। সে এক পা উঠিয়ে দিল, তিনি বললেন, দ্বিতীয়টি ওঠাও। সে প্রথমটি মাটিতে রেখে দ্বিতীয়টি ওঠায়। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, না এক সঙ্গে দু'টি ওঠাও। সে বললো দু'টি এক সঙ্গে ওঠানো সম্ভব নয়। তখন হযরত আলী (রাঃ) বললেন, মানুষের ক্ষমতা এতখানি, আর মানুষ অসহায় অক্ষম ঐ অবস্থায়। অতএব, মানুষ সম্পূর্ণ মজবুরও নয় এবং সম্পূর্ণ সক্ষমও নয়।

وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا

(এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করেছে।)

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কাতাদা এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের فرطا শব্দটির অর্থ হলো– 'তা বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং তার জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে'।

আর মোকাতেল, এবনে হাব্বান এবং আখফাস বলেছেন, 'সে সীমালংঘন করেছে'।

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে যে মহান

বাণী এসেছে তাই সত্য-তথা কোরআন বা ইসলাম চির সত্য। অতএব যার ইচ্ছা ঈমান আনবে, আর কেউ ইচ্ছা করলে কাফের থেকে যাবে। প্রত্যেকে যেন তার ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা করে নেয়, দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী ক্ষণস্থায়ী, অথচ আখেরাতের সুখ-সম্পদ চিরস্থায়ী, যে দুনিয়ার জীবনে আখেরাতের সাফল্যের জন্যে ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ করে তার জীবন-সাধনা সার্থক, সুন্দর ও সফলকাম হয়। পক্ষান্তরে, যারা এ জীবনের আনন্দ-উল্লাস নিয়ে ব্যস্ত থাকে, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর ব্যাপারে উদাসীন থাকে তাদের জীবন-সাধনা হয় ব্যর্থ। দুনিয়ার এ সুখ ও সম্পদ অবশেষে কোন কাজেই আসেনা। যারা দরিদ্র হয়েও আখেরাতের জীবনের জন্যে ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সম্বল সংগ্রহ করে, তারাই আখেরাতের চিরস্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে।

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا

"আমি পাপীষ্ঠদের জন্যে এমন আগুন তৈরী করেছি যার বেষ্টনি তাদের পরিবেষ্টন করে থাকবে"।

অর্থাৎ কাফেরদের জন্যে দোযখের শাস্তি অবধারিত, তারা দোযখের আগুনে পুড়বে, আগুনের পর্দা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে।

وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ

"আর যদি তারা অত্যন্ত তৃষ্ণার কারণে পানীয় চায় তবে তারা এমন পানি পাবে যা হবে পূজের ন্যায়, যা তাদের মুখমন্ডলকে দগ্ধ করবে"।

ইমাম আহমদ, তিরমিযী, নেসায়ী, হাকেম প্রমুখ হযরত আবু উমামা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন ঐ পানীয় তাদের নিকট আনা হবে তখন দোযখীরা তা অত্যন্ত অপছন্দ করবে। এরপর যখন তাদের মুখের নিকট আনা হবে তখন চেহারা এবং মাথার চুল জ্বলে পুড়ে যাবে, যখন তারা ঐ পানি পান করবে তখন তাদের অন্ত্র কেটে বের হয়ে আসবে।

يَشْوِي الْوُجُوهَ

যখন এই তপ্ত পানীয় তাদের মুখের কাছে আনা হবে তখন তাদেরকে দগ্ধ করে ফেলবে।

بِئْسَ الشَّرَابُ

(কত নিকৃষ্ট সেই পানীয়!)

وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

(আর কত মন্দ এবং নিকৃষ্ট সেই আশ্রয়!)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) مُرْتَفَقًا শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটি হলো আশ্রয়স্থল। আর মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এটি হলো একত্রিত হওয়ার স্থান। আর

কোতায়বী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো মজলিস।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا
أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ

যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, তাই আলোচ্য আয়াত মোমেনদের উদ্দেশে বেহেশতের অনন্ত অসীম নেয়ামতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছে এবং ঈমান মোতাবেক নেক আমল করেছে তাদের জন্যে সংরক্ষিত পুরস্কার থেকে তারা বঞ্চিত হবেনা, তাদেরকে অবশ্যই তাদের নেক আমলের শুভ-পরিণতি বা পুরস্কার প্রদান করা হবে। তাদের জন্যে রয়েছে বেহেশতের এমন বাগান যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়। বস্তুতঃ দুনিয়াতে অবস্থান কালে বেহেশতের নেয়ামতের কোন চিত্র কল্পনা করা যায় না, কেননা বেহেশতের নেয়ামত যেমন অনন্ত অসীম, তেমনি অকল্পনীয়, যা কেউ কোনদিন দেখেনি, যার বিবরণ কোন দিন শ্রবণও করেনি, আর কেউ তা উপলব্ধিও করেনি।

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ
وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ

"তাদেরকে সেখানে স্বর্ণের কংকন পরানো হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বর্ণের পোশাক। আর তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে"।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, একজন সাধারণ জান্নাতবাসীকে যে সাধারণ অলংকার পরানো হবে, যদি তা দুনিয়ার অলংকারের সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে তা দুনিয়ার সমস্ত অলংকারের চেয়ে উন্নততর এবং উচ্চতর হবে।

আবুস শেখ কা'বে আহ্বারের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে আল্লাহ পাকের একজন ফেরেশতা তার জন্মলগ্ন থেকে জান্নাতবাসীর জন্যে অলংকার তৈরী করে যাচ্ছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তৈরী করতে থাকবে। যদি জান্নাতবাসীর একটি অলংকার সামনে আনা হয় তবে তার মোকাবেলায় সূর্যের জ্যোতি নিস্প্রভ হয়ে যাবে। জান্নাতবাসীগণ সবুজ বর্ণের মিহি এবং মোটা রেশমের কাপড় পরিধান করবে, তন্মধ্যে পালংকে হেলান দিয়ে তারা বসবে। অর্থাৎ কখনও তাদের পোশাকের আস্তর মোটা হবে আর কখনও মিহি হবে। উভয় প্রকার পোশাকই তারা ব্যবহার করবেন। তফসীরকারগণ লিখেছেন, স্বর্ণ এবং রেশম জান্নাতী পুরুষদের জান্নাতী পোষাক। যারা পৃথিবীতে এ দু'টি জিনিস ব্যবহার করবে সে জান্নাতে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, জান্নাতীদের পোশাক মোটা আস্তরের হওয়ার অর্থ

হলো তা তৈরী করা হবে অত্যন্ত মজবুত ভাবে।

নেসায়ী, আবু দাউদ এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি আরজ করলোঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! জান্নাতবাসীদের পোশাক কি রকম হবে, তা কি তৈরী পোশাক হবে, না কি তৈরী করা হবে? একথা শ্রবণ করে মজলিসের এক ব্যক্তির হাসি পেল। তখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি জানেনা সে ব্যক্তি যখন কোন জ্ঞানী লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করে তখন তোমরা হাস কেন?

তেবরানী হযরত জাবের (রাঃ)-এর সূত্রে হযরত আবুল খায়ের মারসাদ এবনে আবদুল্লাহর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে জান্নাতে একটি বৃক্ষ রয়েছে তাতে মিহি রেশম তৈরী হয়, তার দ্বারাই জান্নাতবাসীর পোশাক তৈরী হবে।

نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا

কত উত্তম পুরস্কার এবং কত উত্তম সুখ-সামগ্রী!

সওয়াব হলো প্রতিদান তথা জান্নাত এবং তার অনন্ত অসীম নেয়ামত। আর مُرْتَفَقًا শব্দটির অর্থ হলো উপবেশনের স্থান বা বিশ্রামাগার অর্থাৎ জান্নাত সমূহ অথবা পালংক সমূহ কত উত্তম বিশ্রামের স্থান হবে!

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا
جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ كِلْتَا
الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿٣٣﴾
وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ
نَفَرًا ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ
اَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا
مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ
مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَآ
اُشْرِكُ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ﴿٣٨﴾

তরজমা

(৩২) (হে রসূল!) দু'জন লোকের একটি দৃষ্টান্ত তাদেরকে বলে দিন, তাদের

একজনকে আমি আঙ্গুরের বাগান দান করি, আর বাগান দু'টিকে আমি খেজুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছি। আর উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শষ্যক্ষেত্র।

(৩৩) উভয় বাগানই ফল উৎপাদন করতো এবং তাতে কোন প্রকার ত্রুটি করতো না এবং উভয়ের ফাকে প্রবাহিত করেছি নহর।

(৩৪) সে লোকটি অনেক ফলমূল লাভ করে, এরপর কথা প্রসঙ্গে তার সঙ্গীকে বলে, তোমার চেয়ে আমার নিকট অধিক পরিমাণে ধন-সম্পদ এবং মানী-সম্মানী লোকজন রয়েছে।

(৩৫) এভাবে নিজের প্রতি জুলুম করেই সে তার বাগানে প্রবেশ করলো। সে বললো, আমি মনে করিনা যে এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে।

(৩৬) আর আমি মনে করিনা যে কেয়ামত হবে, আর যদি কখনও আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনও করি তবে সেখানে পৌছে এর চেয়ে উত্তম স্থান আমি লাভ করবো।

(৩৭) এর উত্তরে তার সাথী তাকে বললো, তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছো, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে, এরপর শুক্র বিন্দু থেকে এবং পরে পূর্ণাঙ্গ করেছেন মানবাকৃতিতে।

(৩৮) কিন্তু আমি একথাই বলবো যে, আল্লাহ পাকই আমার প্রতিপালক, আর আমি আমার প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করিনা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফেরদের একটি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যারা অর্থ-সম্পদের নেশায় মগ্ন ছিল এবং দারিদ্র্য-প্রপীড়িত মুসলমানদেরকে হীন মনে করতো এবং তাদের সাথে বসা অপমানজনক মনে করতো, নিজেদের অর্থ-সম্পদের জন্যে গর্ব করতো, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ আরজী পেশ করতো যে আপনি এই নিঃস্ব মুসলমানদেরকে সরিয়ে দিন।

আলোচ্য আয়াতে ঐ অহংকারী লোকদের শ্রবণ করাতে এবং পৃথিবীর অস্তিত্বহীনতা প্রকাশে বণী ইসরাঈলের দু' ভাইয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন সম্পদশালী কাফের ছিল, সে আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী ছিল। আর নিজের অর্থ-সম্পদের কারণে অত্যন্ত অহংকারী ছিল। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি মোমেন এবং দরবেশ ছিল। সম্পদশালী কাফের অর্থ-সম্পদের নেশায় মত্ত ছিল এবং আখেরাতকে অস্বীকার করতো। আর তার মুসলিম ভাই আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মে বিশ্বাসী ছিল। সে এ সত্য উপলব্ধি করতো যে এই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে, যিনি তোমাকে মৃত্তিকা দ্বারা সষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে এবং তাঁর বন্দেগীতেই রয়েছে সতিকার সম্মান এবং মর্যাদা। আর এ মর্যাদা প্রকৃত মোমেনই অর্জন করে।

মোমেন ব্যক্তি তার সম্পদশালী ভাইকে আল্লাহ পাককে ভয় করার শিক্ষা দিত, তাঁর নাফরমানী না করার তাগিদ করতো এবং বলতো যে আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞ হয়োনা, যে কোন সময় যে কোন বিপদ তোমার প্রতি আপতিত হতে পারে এবং তোমাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। অবশেষে তাই হয়েছে। হঠাৎ এক আসমানী বালা অবতরণ করে, পরিণামে তার বাগানটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং সে আক্ষেপ করতে থাকে। তখন সে উপলব্ধি করে, আল্লাহ পাক যা চান তাই হয়।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত সমূহের মর্মকথা হলো- ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে কাফেররা তাদের ধনবল এবং জনবলের ব্যাপারে গর্ব করতো এবং দারিদ্র্য-প্রপীড়িত মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকত। আলোচ্য ঘটনা দ্বারা আল্লাহ পাক বিশ্ব মানবকে জানিয়ে দিতে চান যে ধনী হওয়া কোন গৌরবের বিষয় নয়, ঈমান এবং নেক আমলের মাধ্যমেই মানুষ গৌরবান্বিত হয়, আল্লাহ পাকের দরবারে বন্দা হিসেবে তার গুরুত্ব হয়, ধন-সম্পদ নিতান্ত অস্থায়ী জিনিস, আজ যে ধনী কাল সে হয় ফকীর, আর আজ যে ফকীর কাল সে ধনী হয়। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে ধনী-দরিদ্র হয়ে যায়, তাঁর মর্জি হলে দরিদ্রও ধনী হয়ে যায়।[২]

তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ

(হে রসূল!) আপনি তাদের নিকট দু' ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করুন।)

এ দু' ব্যক্তি কে? তাদের পরিচয় কি? এ সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আল্লামা বগভী (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, মক্কায় বনু মখজুম গোত্রের দু' ভাই বাস করতো। একজন ছিল মোমেন, অপরজন ছিল কাফের। যিনি মোমেন ছিলেন তার নাম হলো আবু সালমা আবদুল্লাহ (ইনি উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-এর সাবেক স্বামী) এবনে আবদুল আসওয়াদ এবনে আবদ ইয়ালাইল। আর যে কাফের ছিল তার নাম আসওয়াদ এবনে আবদুল আসওয়াদ এবনে আবদ ইয়ালাইল। এ দু'জনের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, উয়াইনা এবনে হোসাইন এবং হযরত সালমান (রাঃ)-এর অবস্থার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বণী ইসরাঈলের দু' ভাইয়ের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, তাদের একজনের নাম ছিল ইয়াহুদা। আর মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, তাদের একজনের নাম ছিল তামলীখা, আর দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম ছিল কাতরোস। আর ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বলেছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম ছিল কাতফারুু। প্রথম ব্যক্তি মুসলমান ছিলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফের ছিল। সূরা ওয়াসসাফ্ফা-তেও ঐ দু' ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মোবারক

১। তফসীরে মাআরেফল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৪১৫
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৯৭
তফসীরে কবীর, খণ্ড- ২১, পৃষ্ঠা-১২৩-১২৪

(রঃ) মা'মারের সূত্রে এ দু' ব্যক্তি সম্পর্কে খোরাসানীর প্রদত্ত বিবরণ এভাবে পেশ করেছেন। এক ব্যক্তির দু' সন্তান ছিল। পিতার ওয়ারিশ সূত্রে উভয়ে আট হাজার স্বর্ণমুদ্রা পায় এবং প্রত্যেকে তা ভাগ করে নেয়। এক ভাই এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার জমি ক্রয় করে। আর দ্বিতীয় জন এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা আল্লাহর রাহে দান করে এবং বলে, হে আল্লাহ! আমার ভাই এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রার জমিন ক্রয় করেছে, আমি তোমার নিকট থেকে এই এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রার বিনিময়ে জান্নাতের জমিন ক্রয় করি। প্রথম ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে একটি গৃহ নির্মাণ করে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা দারিদ্র্য-প্রপীড়িত মানুষকে দান করে এবং এই দোয়া করে, হে আল্লাহ! সে এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা ব্যয় করে গৃহ নির্মাণ করেছে, আর আমি তোমার নিকট থেকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে জান্নাতের একটি গৃহ ক্রয় করি। এরপর প্রথম ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা ব্যয় করে বিয়ে করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা আল্লাহর রাহে দান করে এই দোয়া করে, হে আল্লাহ! আমি আরজী পেশ করি, জান্নাতে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিও। এরপর প্রথম ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা ব্যয় করে গোলাম-বাঁদী এবং ঘরের আসবাব পত্র ক্রয় করে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা দান করে এবং জান্নাতে খাদেম-খেদমতগার এবং আসবাব পত্রের জন্যে আরজী পেশ করে।

যখন দ্বিতীয় ব্যক্তি সমস্ত সম্পদ এভাবে দান করে ফেলে এবং অভাবগ্রস্ত হয়, তখন সে চিন্তা করলো যে ভাইয়ের নিকট আমি সাহায্যপ্রার্থী হতে পারি। আর একথা চিন্তা করে সে তার ভাই যে রাস্তা অতিক্রম করবে তার পার্শ্বে বসে গেল। কিছুক্ষণ পরেই তার সম্পদশালী ভাই চাকর-বাকর নিয়ে ঐ পথ অতিক্রম করলো। ভাইকে দেখে সে চিনতে পারলো এবং জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কি অবস্থা? সে বললো, বর্তমানে আমি অত্যন্ত দরিদ্র এবং আপনার সাহায্যপ্রার্থী। সম্পদশালী ভাই বললো, তোমার অর্থ-সম্পদ কি হয়েছে? তুমি তো তোমার অংশ নিয়েছিলে। দরিদ্র ভাই তার নিজের ঘটনা বর্ণনা করলো। তখন সে বললো, আচ্ছা তুমি দান খয়রাতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ, তুমি যেতে পার, আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারবো না। এভাবে সে তার দরিদ্র ভাইকে বিদায় করে। যাহোক, অবশেষে উভয়েরই মৃত্যু হয়।[১]

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ

(আপনি তাদের জন্যে ঐ দু' ব্যক্তির দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন।)

جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَّحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا

(তাদের একজনকে আমি আঙ্গুরের দু'টি বাগান দান করি। আর খেজুরের বৃক্ষ দ্বারা ঐ বাগান পরিবেষ্টন করি। আর দু' বাগানের মধ্যে ফসল উৎপন্ন করি।)

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২১২-২১৩

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا

উভয় বাগানই নিজ নিজ ফল উৎপাদন করে এবং তাতে কোন কমতিই করেনা। যা সাধারণতঃ বাগানগুলোতে হয়ে থাকে। এক বছর বেশ ফল আসে, পরের বছর একটু কম আসে।

وَفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا

আর উভয় বাগানের মধ্যে আমি ঝরনাও প্রবাহিত করে দেই।

وَكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ

এছাড়াও তার নিকট অনেক ধন-সম্পদ ছিল, একদিকে উভয় বাগানে প্রচুর ফল-ফসল উৎপাদিত হয়। অন্যদিকে তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সন্তান-সন্ততি সবই পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। ধনবল জনবল সবই তার ছিল ফলে সে অহংকারী হলো।

فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا

(সে তার সঙ্গীকে কথা প্রসঙ্গে বলে, আমার নিকট তোমার চেয়ে অধিক পরিমাণে ধন-সম্পদ রয়েছে এবং মানী-সম্মানী লোক রয়েছে।)

একটি বর্ণনায় রয়েছে, ধন-সম্পদশালী ভাই তার দরিদ্র ভাইয়ের হাত ধরে তার বাগানে নিয়ে যায় এবং তার সম্পদের প্রাচুর্য তাকে দেখায়, তখন সে একথা বলে।

وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا

(এভাবে নিজের প্রতি জুলুম করেই সে তার বাগানে প্রবেশ করলো। সে বললো, আমি মনে করিনা যে বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে।)

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাকে অবকাশ দিয়েছেন, সে গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়েছে এবং ভোগবাদের মরফিয়া পান করে ধারণা করছে, যা কিছু আমার কাছে রয়েছে তা কোন দিন বিনষ্ট হবেনা। এসব কিছু আমি আজীবন ভোগ করতে থাকব। এতদ্ব্যতীত সে অর্থ-সম্পদের কারণে অহংকারী হয়ে উঠেছিল। ধরাকে সরা জ্ঞান করছিল, ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই চিরস্থায়ী মনে করছিল। লোকটি শেরক, কুফর, অহংকার এবং গাফলতের মধ্যে ডুবে ছিল। তার ধারণা ছিল এ জগত, এ জীবন এবং যাবতীয় সুখ-সামগ্রী সবই চিরদিন থাকবে।

وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا

"আর আমি মনে করিনা যে কেয়ামত হবে, যদি কখনও আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনও করি তবে সেখানে পৌঁছে আমি এর চেয়ে উত্তম স্থান লাভ করবো"।

অর্থাৎ সে আখেরাতেও বিশ্বাস করতো না, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান হবে এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব-নিকাশ

হবে একথায়ও সে বিশ্বাস করতো না।

وَلَئِنْ رُّدِدْتُّ

আর যদি তোমাদের কথা মত আমার প্রতিপালকের দরবারে প্রত্যাবর্তনও করতে হয় তবে তাতেও কোন চিন্তার কারণ নেই। কেননা আল্লাহ যা কিছু আমাকে দান করেছেন তা একথারই প্রমাণ যে তিনি আমাকে সম্মানিত করেছেন, কেয়ামতের দিন তিনি আমার এ বাগ-বাগিচার চেয়ে উত্তম সম্পদ তিনি দান করবেন।

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ.....

এর উত্তরে তার সাথী তাকে বললো, তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছো, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে? এরপর শুক্র বিন্দু থেকে তোমাকে পূর্ণ পরিণত ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন।

সম্পদশালী অহংকারী কাফের লোকটিকে দরিদ্র মোমেন ভাইটি বললো, তুমি নাফরমানী করছো সেই করুণাময় আল্লাহ পাকের, যিনি প্রথমে মাটি থেকে এরপর শুক্র বিন্দু থেকে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। শৈশবে তুমি ছিলে মায়ের কোলে। এরপর আজ তোমাকে আল্লাহ পাক পূর্ণ পরিণত ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। তুমি ছিলে অজ্ঞ, তিনিই তোমাকে বিজ্ঞে পরিণত করেছেন, তুমি ছিলে নিঃস্ব, তিনিই তোমাকে সম্পদশালীতে পরিণত করেছেন, আজ তুমি তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছো, তুমি কেয়ামতের দিনকে অস্বীকার করছো, আর কেয়ামতের দিনকে অস্বীকার করার অর্থ হলো আল্লাহ পাকের কুদরতকে অস্বীকার করা, যে আল্লাহ পাকের কুদরতে বিশ্বাস করে সে একথাও বিশ্বাস করে যে আল্লাহ পাক মানুষকে প্রথমবার যেমন সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তেমনি দ্বিতীয় বারও সৃষ্টি করবেন, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّىْٓ اَحَدًا

"কিন্তু আমি একথাই বলবো যে আল্লাহ পাকই আমার প্রতিপালক, আর আমি আমার প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করিনা"।

অর্থাৎ তুমি জেনে রাখ যে আমি সর্বাবস্থায় এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করি, কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করিনা, আমি বিশ্বাস করি তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ তাঁর বন্দেগীতেই রয়েছে নিহিত।

وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ
إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسَىٰ رَبِّىٓ أَن
يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ
صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُۥ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَأُحِيطَ
بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا
وَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّىٓ أَحَدًا ﴿٤٢﴾ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُۥ
مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ ٱلْوَلَٰيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤﴾

তরজমা

(৩৯) (আর তুমি যদি ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিতে আমাকে তোমার চেয়ে কম দেখে থাক) তবে যখন তোমার বাগানে তুমি প্রবেশ করেছিলে, তখন কেন বললে না আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা করেন তাই হয়, আর আল্লাহ পাকের সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই।

(৪০) তবে হয়তো আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার চেয়ে উৎকৃষ্টতর কিছু দান করবেন এবং তোমার বাগানে আসমান থেকে লু হাওয়ার প্রবাহ প্রেরণ করবেন, যার পরিণামে তা উদ্ভিদ-শূণ্য মৃত্তিকায় পরিণত হবে।

(৪১) অথবা ভোর না হতেই তার পানি শুকিয়ে যাবে, এরপর তুমি তা খুঁজে আনতেও পারবে না।

(৪২) তার ফল সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্যে আক্ষেপ করতে লাগলো এবং ঐ বাগান তার মাচার উপরই পতিত হয়ে যায়। সে আরও বলতে থাকে- "হায়! আমি যদি কাউকে আমার প্রতিপালকের শরীক না করতাম"।

(৪৩) আর আল্লাহ পাক ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোকজনই ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হলোনা।

(৪৪) এখানে সাহায্য করার অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, পুরস্কার

প্রদানে এবং পরিণতি নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

তফসীরুল কোরআন

وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ.....

অর্থাৎ মোমেন ভাই তার সম্পদশালী অহংকারী কাফের ভাইকে বললো, তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন অহংকার করে একথা কেন বললে, আমার এ বাগান স্থায়ী সম্পদ, কেন একথা বললে না আল্লাহ পাকের যা ইচ্ছা তাই হয়, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে তিনি এই বাগান আবাদ রাখবেন, ইচ্ছা হলে বরবাদ করে দেবেন।

অহংকার পতনের কারণ হয়

বস্তুতঃ ধন-সম্পদ হলো আল্লাহ পাকের বিশেষ নেয়ামত, কিন্তু যদি ধন-সম্পদের কারণে মানব অন্তরে অহংকার সৃষ্টি হয়, মহান দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা হয়, তবে সে ধন-সম্পদ তার জন্যে বিপদজনক হয়ে দাঁড়ায়, কেননা অহংকার মানুষের পতনের কারণ হয়। তাই তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তোমার ধন শক্তি ও জন শক্তির জন্যে গৌরব বোধ করলে, অথচ তোমার কর্তব্য ছিল একথা বলা-

مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থাৎ যা আল্লাহ পাকের মর্জি তাই হয়ে থাকে, আল্লাহ পাকের শক্তি ব্যতীত কোন শক্তি নেই। এভাবে প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো প্রাপ্ত সম্পদের জন্যে দরবারে এলাহীতে শোকর গুজার থাকা। কেননা মানুষের জীবন ও জীবনের যথা সর্বস্ব এক আল্লাহ পাকেরই দান। যদি তিনি দান করেন তবে মানুষ পায়, আর যদি তিনি কাউকে বঞ্চিত করেন তবে কেউ তাকে দিতে পারেনা। এজন্যে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোন মানুষ যখন সুখ-শান্তিতে থাকে বা কোন সুখ-সামগ্রী লাভ করে তখন তার কর্তব্য হলো-

مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

বলা। যদি সে এটি বলে তবে তার ধন-সম্পদ সর্ব প্রকার বালা-মসিবত থেকে নিরাপদ থাকে।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, যদি কেউ নিজের ধন-সম্পদ বা বাড়ী-ঘর দেখে এই দোয়া পাঠ করে তবে তা মানুষের বদ-নজর থেকে নিরাপদ থাকে।

এ আয়াতের উপর বজুর্গানে দ্বীনের আমল

আল্লামা বগভী হেশাম এবনে ওরওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ওরওয়া যখন তাঁর কোন পছন্দনীয় ধন-সম্পদ দেখতেন, অথবা তাঁর কোন বাগান প্রবেশ করতেন তখন বলতেন,

مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

হযরত ইমাম মালেক (রাঃ)-এর বাড়ীর ফটকে লিপিবদ্ধ ছিলঃ ماشاء الله লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতো এই দোয়া কেন লিখেছেন? তখন তিনি বলতেন, কেননা আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন তুমি কেন বললে না

مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

এবনুল মুনজের এবং এবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেছেন, এবনে শেহাব যখন নিজের ধন-সম্পদ দেখতেন তখন বলতেনঃ

مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

এমনিভাবে ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ)-এর বাড়ীর ফটকেও লেখা ছিলঃ

مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

আর তার কারণ হলো আলোচ্য আয়াত।

বর্ণিত আছে, হযরত মুসা (আঃ) তাঁর কোন প্রয়োজনের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের দরবারে আরজী পেশ করেছেন কিন্তু সে প্রয়োজন পূরণে বিলম্ব হয়। তখন হযরত মুসা (আঃ) বললেনঃ

مَاشَاءَ اللّٰهُ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের যা মর্জি তাই হয়। সঙ্গে সঙ্গে হযরত মুসা (আঃ)-এর সেই আকাংক্ষা পূর্ণ হলো। তখন মুসা (আঃ) আরজ করলেন, আমি অনেক সময় আগে এ প্রয়োজনের জন্যে আরজী পেশ করেছিলাম, আর ঠিক এ মুহূর্তে আমার আকাংক্ষা পূর্ণ হলো। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, হে মুসা! তুমি যে مَا شَاءَ اللّٰهُ বলেছো তা তোমার কাম্য বস্তু পাওয়ার ব্যাপারে সর্বাধিক উপকারী হয়েছে।

হযরত মাআজ এবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আরাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করছেন, আমি কি জান্নাতের একটি দ্বারের কথা বলবো না? তখন তিনি বললেন, কোন্ দ্বার? হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেনঃ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

হযরত আবু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবুজর (রাঃ)-কে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভান্ডার থেকে একটি বাক্য শেখাবো না? তখন তিনি বললেন, জ্বী-হ্যাঁ। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) বলেছেন, আমাকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছেন, যেন আমি অধিক পরিমাণে পাঠ করিঃ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

মসনদে আহমদে আছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আমি কি জান্নাতের একটি ভাণ্ডারের কথা তোমাদেরকে বলে দেব? সে ভাণ্ডার হলো لا قوة الا بالله।

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ আমার এই বন্দা মেনে নিয়েছে এবং আত্মসমর্পণ করেছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে (জান্নাতের ভান্ডার সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দেনঃ শুধু مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ নয়, বরং তা-ও যা সূরা কাহফে আছে অর্থাৎ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতের মর্মকথা হলো, প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, এ সত্য উপলব্ধি করা যে আমার জীবন ও জীবনের যথা সর্বস্ব আল্লাহ পাকের দান। তাঁর অগণিত নেয়ামত আমি অহরহ লাভ করছি। অর্থ-সম্পদ, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য, মান-মর্যাদা, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি-সামর্থ, জনপ্রিয়তা এক কথায় সব কিছুই আল্লাহ পাকের দান, এ সব কিছুতে আমার নিজের কোন বাহাদুরী নেই। তাই কর্তব্য হলো, মহান দাতা আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, দানের সদ্ব্যবহার করা, দান পেয়ে দাতাকে ভুলে না যাওয়া এবং দানকে দাতার নাফরমানীতে ব্যয় না করা এবং মহান দাতার সমীপে নিজের অন্তরের মিনতি পেশ করা।

اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا

"তুমি যদি (আজ) আমাকে ধন-সম্পদে এবং সন্তান-সন্ততিতে কম দেখে থাক"।

فَعَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا

"তবে আমি আশা করি, আমার প্রতিপালক তোমার বাগানের চেয়ে উত্তম বাগান আমাকে দান করবেন, আর তোমার বাগানের উপর আসমান থেকে লু হাওয়া প্রেরণ করবেন"।

অর্থাৎ ঐ দরিদ্র মোমেন ভাইটি তাকে বললো, আজ আমি দরিদ্র নিঃস্ব হতে পারি, তোমার ন্যায় ধন-সম্পদ আমার না থাকতে পারে, কিন্তু আমি আমার প্রতিপালকের রহমত থেকে আদৌ নিরাশ নই। আমি এই নিশ্চিত আশা পোষণ করি যে অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ পাক তোমার বাগানের চেয়েও উত্তম বাগান আমাকে দান করবেন। আর আমি তোমার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কেও আশংকা মুক্ত নই। আমার আশংকা হলো, যে কোন সময়

তোমার উপর আযাব আপতিত হতে পারে এবং তোমার সকল সম্পদ মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, সব কিছু মাটির সাথে মিশে যেতে পারে এবং তোমার যথা সর্বস্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে حُسْبَانًا শব্দটির ব্যাখ্যায় ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আযাব। আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর অর্থ করেছেন, অগ্নি। কোতায়বী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো এমন তুফান যাতে প্রস্তর বর্ষিত হয়। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো হিসাব অর্থাৎ প্রত্যেকের গুণাহর হিসাবে আযাব বা আপদ বালা অবতরণ করা হয়।

مِّنَ السَّمَاءِ অর্থাৎ আসমান থেকে। فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا

পরিণামে তোমার এই বাগান মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে, যেখানে একটি বৃক্ষও থাকবে না।

মুজাহেদ (রঃ) صَعِيدًا زَلَقًا এর তরজমা করেছেন, ভয়াবহ মরুভূমি।

أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا

অথবা ভোর হতে না হতেই তার পানি শুষ্ক হয়ে যাবে, এরপর তুমি তা খুঁজেও আনতে পারবে না। অর্থাৎ তার পানি এত গভীরে চলে যাবে যে তুমি অনুসন্ধান করেও তা আনতে সক্ষম হবে না। পানি পাওয়ার ব্যাপারে তোমার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا

তার ফল সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্যে আক্ষেপ করতে লাগলো এবং ঐ বাগান তার মাচার উপরই পতিত হয়ে যায়। সে আরও বলতে থাকে- "হায়! আমি যদি কাউকে আমার প্রতিপালকের শরীক না করতাম"।

অবশেষে তাই হলো। দরিদ্র মুসলিম ভাই যে আশংকা করেছিলেন তাই বাস্তবে পরিণত হলো। আসমানী বালা-মুছিবত নাজিল হলো। তার গর্বের বাগানটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল, সে লাভের আশায় যে অর্থ-সম্পদ বিনিয়োগ করেছিল তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেল, এভাবে সে সর্বস্বান্ত হলো, অহংকারীর অহংকার চূর্ণ হলো, রয়ে গেল তার আক্ষেপ এবং বিলাপ-কান্না। কিন্তু তার এ আক্ষেপ ছিল সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতির কারণে, তার বাগানের ক্ষয়-ক্ষতির কারণে; পরকালের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর শাস্তির ভয়ে নয়, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকের ভয়েও নয়।

এবং সে কেয়ামতের দিন অথবা কবরের আযাব দেখে বলবে, হায় আক্ষেপ! যদি আমি আমার প্রতিপালকের সঙ্গে কাউকে শরীক না করতাম তবে এ বিপদের সম্মুখীন হতাম না।

আর হযরত থানবী (রঃ) এ আয়াতের তরজমা করেছেন এভাবেঃ হায়! কত ভাল

হতো, যদি আমি আমার প্রতিপালকের সঙ্গে কাউকে শরীক না করতাম।

وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا

"আর আল্লাহ্ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন ছিল না, আর সে নিজেও কোন প্রতিকারে সমর্থ হলোনা"।

অর্থাৎ এ দুঃসময়ে কোন আপনজন বা আত্মীয়-স্বজন তার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি এবং সে নিজেও এর কোন প্রতিরোধ বা প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়নি।

অথবা এর অর্থ হলো কেয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকে রক্ষা করার জন্যে বা কোন প্রকার সাহায্য করার জন্যে কেউ আসবে না, আর নিজেও আত্ম-রক্ষা করতে সক্ষম হবে না।

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ

এক্ষেত্রে সাহায্য করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই, যিনি চির সত্য অর্থাৎ এখানেই আল্লাহ্ পাকের প্রভূত্ব, তাঁর অন্তহীন ক্ষমতা, তাঁর অদ্বিতীয় প্রতাপ প্রকাশ পায়। তিনি পরাক্রমশালী, তিনি যাকে সাহায্য করেন সে-ই সাহায্য লাভ করে। তাঁর আধিপত্য সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানেই তাঁর কুদরত ও হেকমতের বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে। কেয়ামতের কঠিন দিনে সাহায্য করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই, আর কারো নয়।

هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا

আল্লাহ্ পাক পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে সর্বোত্তম।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাঁর অনুগত বন্দাদের উত্তম বদলা দিয়ে থাকেন। দুনিয়াতে নেককার বন্দাদেরকে তাঁর হেকমত মোতাবেক বদলা দিয়ে থাকেন, আর আখেরাতে তিনি দান করবেন অনন্ত অসীম নেয়ামত।[১]

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াত দ্বারা কয়েকটি সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলোঃ

১. সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ্ পাক, আর কেউ নয়,

২. বিপদ-মুহূর্তে সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ্ পাক, আর কেউ নয়,

৩. অতএব এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করাই বুদ্ধিমান মানুষের একান্ত কর্তব্য।

৪. যারা ঈমানদার ও নেককার তাদের শুভ-পরিণতি বা সওয়াব কখনও বাতিল হয় না, বরং আল্লাহ্ পাক সর্বোত্তম বদলা দিয়ে থাকেন।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২১২-২১৩

৫. এ ক্ষণস্থায়ী জগতের কোন সম্পদ বা ক্ষমতার কারণে গর্ব করা উচিত নয়, কেননা এখানকার সব কিছুই নিতান্ত সাময়িক এবং ক্ষণ-ভঙ্গুর, যে কোন সময় সম্পদ ও শক্তি বিদায় নিতে পারে। যদি সম্পদ ও শক্তি থাকেও কিন্তু যে ব্যক্তিকে এই সম্পদ ও শক্তি প্রদান করা হয় তাকে সব কিছু ফেলে নির্ধারিত সময়ে এ পৃথিবী থেকে অবশ্যই বিদায় নিতে হয়।

৬. অতএব মনো-ভূবনে স্থান থাকবে এক আল্লাহ পাকের, আর কারো নয়, আর কোন কিছুরও নয়। যদি দুনিয়ার সম্পদ থাকে তবে আলহামদুলিল্লাহ, যদি না থাকে তবুও আলহামদুলিল্লাহ। কেননা আল্লাহ পাক নেককারদের জন্যে পরকালীন চিরস্থায়ী যিন্দেগীতে অনন্ত অসীম নেয়ামত রেখে দিয়েছেন।

৭. কোন লোককে দুনিয়ার সম্পদ বা ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করা হলেই একথা প্রমাণিত হয় না যে সে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করেছে। কেননা হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ দুনিয়ার সম্পদ আল্লাপাক তাকেও দান করেন যাকে তিনি পছন্দ করেন এবং যাকে তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত শুধু তাকেই দান করেন যাকে তিনি পছন্দ করেন।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ
مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿۴۵﴾ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ﴿۴۶﴾ وَ
يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ
مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿۴۷﴾ وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ
اَوَّلَ مَرَّةٍ ۭ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿۴۸﴾ وَوُضِعَ الْكِتٰبُ
فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا
الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ
وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿۴۹﴾

তরজমা

(৪৫) আর (হে রসূল!) তাদের নিকট দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন, তা সেই পানির ন্যায় যা আমি আসমান থেকে বর্ষণ করি। এরপর তার সঙ্গে মিলে মিশে ধরণীর তরু-লতা উৎপন্ন হয়। এরপর তা শুষ্ক হয়ে এমনিভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ্ পাক সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

(৪৬) ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা মাত্র। (হে রসূল!) যে নেক আমল চিরস্থায়ী তা আপনার প্রতিপালকের নিকট পূণ্য হিসাবেও (সহস্র গুণে) উত্তম এবং আশা আকাংক্ষার দিক দিয়েও (সহস্র গুণে) শ্রেয়।

(৪৭) আর সেদিনটি স্মরণীয় যেদিন আমি পাহাড়গুলোকে স্থানচ্যুত করবো, এবং (হে রসূল!) আপনি পৃথিবীকে দেখবেন উন্মুক্ত প্রান্তর হয়ে পড়ে আছে, সেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করবো এবং তাদের কাউকে ছাড়বো না।

(৪৮) আর (হে রসূল!) সকলকেই সারিবদ্ধভাবে আপনার প্রতিপালকের সম্মুখে হাযির করা হবে এবং বলা হবে, তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে আমি সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ। তোমরা তো বলতে যে আমি তোমাদের জন্যে কোন প্রতিশ্রুত ক্ষণ উপস্থিত করবো না।

(৪৯) আর (প্রত্যেকের সম্মুখে) আমলনামা রেখে দেয়া হবে, (হে রসূল!) আপনি দেখবেন অপরাধীদেরকে, তারা ভয়ে থরতর কাঁপছে। তারা বলবে, হায়! কি সর্বনাশ আমাদের। এ কেমন গ্রন্থ এতে ছোট বড় কিছু বাদ পড়েনি, বরং তার সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত দেখতে পাবে। আর (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক কারো উপর জুলুম করেন না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে দু' ব্যক্তির দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। ঐ দৃষ্টান্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য ছিল একথা জানিয়ে দেয়া যে এ পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী। আর আলোচ্য আয়াতেও এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার আরও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, দুনিয়ার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের কোন স্থায়িত্ব নেই, এ জগত ক্ষণস্থায়ী, এ জীবন ক্ষণভঙ্গুর, এ জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ই অস্থায়ী। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ

অর্থাৎ যে সব লোকেরা দুনিয়ার সম্পদের ব্যাপারে গর্ব করে অহংকারী হয় তাদের উদ্দেশে একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন। দুনিয়ার জীবন সেই পানির ন্যায় যা আমি আসমান থেকে অবতরণ করি, শুষ্ক জমিনে যখন বৃষ্টিপাত হয় তখন অতি স্বাভাবিকভাবেই তাতে সজীবতা আসে, তরুলতা জন্মায়, কয়েক দিনের মধ্যেই মাঠের রং পরিবর্তন হয়ে যায়,

সবুজের মেলা বসে, সবুজ তরুলতায় মাঠ ভরে ওঠে আর ঐ মনোরম দৃশ্য মনকে মুগ্ধ করে রাখে। কিন্তু তা কয়দিন, কতক্ষণ? সামান্য কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পরই ফসল কেটে আনা হয় এবং যা মাটিতে অবশিষ্ট থাকে তা ধূলার ন্যায় বাতাসে উড়তে থাকে। সবুজের মেলা কোথাও খুঁজেও পাওয়া যায় না। এজন্য কবি বলেছেন,

چند روز ان زندگی مثل حباب آب ہے
ای نظام دور عالم بس تجھے آداب ہے

"এ পৃথিবীতে মানুষের কয়েক দিনের জীবন যেন পানির বুদবুদ, হে বিশ্ব! তোমাকে সালাম জানিয়ে বিদায় হই"।

দুনিয়ার অবস্থা ঠিক এরূপই, এমন একদিন আসবে যখন এ পাহাড়-পর্বত, এ বৃক্ষ-তরুলতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আকাশচুম্বি এমারতগুলোর কোন চিহ্ন থাকবে না, এখানের সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য সবই বিদায় নেবে, সারা পৃথিবী সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। অতএব, দুনিয়ার মোহে মুগ্ধ হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ অস্থায়ী জীবনের সুখ-সামগ্রীর অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সুখ শান্তি ভুলে থাকা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ পৃথিবীকে যিনি আবাদ করেছেন, যিনি তাকে শস্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, তিনিই তার সব কিছু শেষ করে দেবেন।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا

(আল্লাহ পাক সব কিছু করতে পারেন, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।)

অতএব, দুনিয়ার নেয়ামত ভোগ করার সময় নেয়ামত দাতাকে স্মরণ করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্তব্য। বর্তমান ক্ষণস্থায়ী জীবনকে ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

(ধন-সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা মাত্র। (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের নিকট স্থায়ী নেক আমলের উত্তম প্রতিদান এবং উত্তম আশা রয়েছে।)

বস্তুতঃ ধন-সম্পদ হোক অথবা সন্তান-সন্ততি, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের শোভা মাত্র। এ সবই দুদিনের সাথী, যখন মানুষের জীবনের অবসান ঘটে মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধানের মাধ্যমে তখন সবই বিদায় নেয়। মানুষ পৃথিবীতে একা আসে এবং একাই চলে যায়, অর্থ-সম্পদ সঙ্গে যায় না, যায় না সন্তান-সন্ততি বা কোন আপনজন।

نہ قسمت ساتھ جائیگی نہ دولت ساتھ جائیگی
نہ عظمت ساتھ جائیگی نہ صولت ساتھ جائیگی

جوکچھ پوچھے جائنگے محشر مین وہ نیک اعمال ہین تیرے

جوکچھ کام ائنگے وہ نیک افعال ہین تیرے

"তোমার সৌভাগ্য বা সম্পদ তোমার সঙ্গে যাবে না। উচ্চ মর্যাদা, সম্মান, কোন কিছু নয়। পরকালীন জিন্দেগীতে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে নেক আমল কি নিয়ে এসেছো। এখানে বস্তুতঃ শুধু নেক আমলই সেদিন কাজে আসবে"।

তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ

(শুধু নেক আমল বা পূণ্য সাধনাই হলো জীবন-সাধনার সার্থকতার উপকরণ।)

আল্লামা বগভী লিখেছেন, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি হলো দুনিয়ার ফসল, আর নেক আমল হলো আখেরাতের ফসল। কোন কোন লোকের জন্যে আল্লাহ্ পাক উভয়টি একত্রিত করে দেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ), একরামা (রঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ হলো সোবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলালাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ অধিক পরিমাণে পাঠ কর। আরজ করা হলো ইয়া রসূলাল্লাহ! وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ কি? তিনি এরশাদ করেনঃ

سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله

(সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে এরশাদ হয়েছেঃ

لا حول ولا قوة الا بالله

অধিক পরিমাণে পাঠ করতে থাক। এতে ক্ষতির ৯৯টি দ্বার বন্ধ হয়ে যায় তন্মধ্যে সবচেয়ে ছোট দ্বার হলো দুশ্চিন্তা।

ওকায়লী হযরত নো'মান এবনে বশীর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে,

سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله

(সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)

তেবরানী এ মর্মের হাদীস হযরত সা'দ এবনে ওবাদা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এবনে জরীর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সর্বোত্তম কথা হলো সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার বলা আমার নিকট সে সমস্ত জিনিস থেকে অধিকতর প্রিয় যার উপর সূর্য উদিত হয় অর্থাৎ আমার নিকট পৃথিবীর সবকিছু থেকে প্রিয় হলো এ তছবীহ পাঠ করা (মুসলিম, তিরমিযী)

সায়ীদ এবনে জুবায়ের (রঃ), মসরুক (রঃ) এবং ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ)-এর মতে, بَقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ দ্বারা পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তরফ থেকেও এই মত পোষণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) بَقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ এর অর্থ ব্যাখ্যা করতেন নেক আমল। আর ইমাম কাতাদা (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন।

এ পর্যায়ে তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ بَقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ বলা হয়েছে সে সব নেক আমলকে যার শুভ-পরিণতি চিরস্থায়ী হয় তথা যার ফলাফল সর্বদা চালু থাকে। যেমন কোন লোককে দ্বীনী এলম শিক্ষা দান করা, কোন নেক আমলের প্রচলন করা, মসজিদ নির্মাণ করা, যেখানে পানির অভাব সেখানে কূপ তৈরী করা, পথিক-মুসাফিরের জন্যে মুসাফির খানা কায়েম করা, জায়গা-জমীন-বাগান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে ওয়াকফ করা, সন্তান-সন্ততিকে সঠিক ভাবে প্রতিপালন করা প্রভৃতি।

এসব কাজের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের দরবার থেকে উত্তম প্রতিদান বা পুরস্কারের আশা করা যেতে পারে। অতএব, দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে আখেরাতকে ভুলে যাওয়া শুভ-বুদ্ধির পরিচালক নয়।[১]

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি তোমরা রাত্রে জাগ্রত থেকে এবাদত করতে সক্ষম না হও, যদি দুশমনের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে অক্ষম হও, তবে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবর বলতে অক্ষম হয়োনা। কেননা এগুলোই হলো بَقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ

এবনে মরদবিয়া হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা দোযখ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২২০

ঢাল হাতে লও, তোমরা বল সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন এবনুল মুনজের, এবনুল মরদবিয়া। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে একদিন বললেন, তোমরা দু'বার কি তিনবার ঢাল হাতে নাও। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, কোন শত্রু উপস্থিত হয়েছে কি? তখন তিনি এরশাদ করলেন, বরং তোমরা দোযখ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ঢাল হাতে নাও এবং বল সোবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এগুলো হলো "বাকিয়াতুস সালেহাত"।[১]

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا

"আর সেদিনটি স্মরণীয়, যেদিন আমি পাহাড়কে স্থানচ্যুত করবো এবং (হে রসূল!) আপনি পৃথিবীকে দেখবেন উন্মুক্ত প্রান্তর হয়ে পড়ে আছে, সেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করবো এবং তাদের কাউকে ছাড়বো না। আর (হে রসূল!) সকলেকেই সারিবদ্ধভাবে আপনার প্রতিপালকের সম্মুখে হাযির করা হবে"।

এ আয়াতে কেয়ামতের পূর্বের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। কেয়ামত যখন কায়েম হবে তার পূর্বে পাহাড়-পর্বত কোন কিছুই থাকবে না। সব কিছু নিজ নিজ স্থান ছেড়ে চলে যাবে, বড় বড় পাহাড়গুলো তুলার ন্যায় শূণ্যে উড়তে থাকবে, বিশাল-বিস্তৃত পৃথিবী এক সমতল ভূমিতে পরিণত হবে। সমগ্র মানব জাতিকে সেদিন আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির করা হবে, কাউকে ছেড়ে দেয়া হবেনা।

ارے عاقل نہو غافل تجھے دنیا سے جانا ہے

تجھے اخر خدا کو منہ اپنا ایک دن دنیکھانا ہے

(হে বুদ্ধিমান! গাফেল হয়োনা, তোমাকে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। অবশেষে তোমাকে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে।)

বস্তুতঃ এ জগত ও জীবন যেমন সত্য, তেমনি পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীও সত্য। ইতিপূর্বে আমরা এ পৃথিবীতে ছিলাম না, এখন আছি একথা সত্য, এমন একদিন আসবে যখন আমরা থাকবো না- একথাও সত্য। প্রশ্ন হলো, কোথায় যাব? আখেরাতে দু'টি স্থান রয়েছে। যারা ঈমানদার এবং নেককার হবে তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত। পক্ষান্তরে যারা বেঈমান ও বদকার হবে, তাদের জন্যে রয়েছে দোযখ।

وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً

১। তফসীরে আদ্দুররুল মানসুর, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৪৭-৪৮

আর (হে রসূল!) আপনি দেখতে পাবেন পৃথিবীকে একটি উন্মুক্ত ময়দান, তাতে থাকবেনা কোন ইমারত এবং থাকবেনা কোন পাহাড়-পর্বত।

ইমাম কাতাদা (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন কিন্তু তফসীরকার আতা (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, জমীনের অভ্যন্তরীণ অংশ উপরে উঠে আসবে এবং মৃত ব্যক্তিরা বের হয়ে আসবে।[১]

কেয়ামতের পূর্বের অবস্থা

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ পাক এ আয়াতে কেয়ামতের দিনের পূর্বের কিছু ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। সেদিন আসমান ফেটে যাবে, পাহাড়-পর্বত তুলোর ন্যায় উড়তে থাকবে, সারা পৃথিবী একটি উন্মুক্ত ময়দানে রূপান্তরিত হবে, উঁচু-নীচু স্থান একাকার হয়ে যাবে, কোন বাড়ী-ঘর থাকবে না, কোন বৃক্ষ-তরুলতার অস্তিত্ব থাকবে না। সেদিন সমগ্র মানব জাতিকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের দরবার হাযির করা হবে। ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে দণ্ডায়মান থাকবে, আল্লাহ পাক যাদেরকে অনুমতি দেবেন তারা ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না। যারা পৃথিবীতে কেয়ামতের এই দিনকে অস্বীকার করতো, তাদেরকে ধমক দিয়ে বলা হবে-

لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

তোমরা যে মহা সত্যকে অস্বীকার করতে অর্থাৎ কেয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস করতে না, অবশেষে সেই কঠিন মুহূর্তের সম্মুখীন তোমরা হয়েছ। যেভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা হাযির হয়েছ। অর্থাৎ নগ্ন দেহে তোমরা দরবারে হাযির হয়েছ।[২]

বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ এবং তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভাষণ দেয়ার উদ্দেশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, তোমাদেরকে কবর থেকে বের করে নগ্ন দেহে নগ্ন পায়ে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির করা হবে। তখন সর্ব প্রথম হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে পোশাক পরিধান করানো হবে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে নগ্ন পায়ে নগ্ন দেহে বিবস্ত্র অবস্থায় হাযির করা হবে।

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, তখন পুরুষ ও নারী সকলেই এক সাথে থাকবে এবং একে অন্যকে তারা দেখবে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২২১
তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৩৩
২। তফসীরে এবনে কাসীর উর্দু, পারা-১৫, পৃষ্ঠা-১২

এরশাদ করেনঃ আয়েশা! তখন অত্যন্ত কঠিন সময় হবে অর্থাৎ কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করার অবস্থা থাকবে না।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকেও এমনি হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের নাকি অন্যকে নগ্ন অবস্থায় দেখতে হবে। তখন তিনি এরশাদ করলেন, লোকেরা নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত থাকবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি কাজে ব্যস্ত থাকবে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, প্রত্যেকের সম্মুখে তার জীবনের আমলনামা রাখা হবে, যাতে তার ছোট-বড় সকল কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকবে।[১]

যারা পাপীষ্ঠ তারা তাদের অন্যায় কার্যের বিবরণ দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। আর বলবে, হায় আক্ষেপ! আমরা আমাদের জীবনকে গাফলতের মধ্যে অতিবাহিত করেছি। হায় আক্ষেপ! আমরা মন্দ কাজে লিপ্ত ছিলাম, আর কি বিস্ময়কর এ গ্রন্থ, এতে কোন কিছুই বাদ পড়েনি।

তেবরানীতে একটি বর্ণনা রয়েছে, বর্ণনাকারী হযরত সা'দ এবনে ওবাদা (রাঃ) বলেন যে আমরা হুনায়েনের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক জায়গায় অবস্থান করলেন। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিলেনঃ তোমরা যাও, জ্বালানী বা কাষ্ঠ খণ্ড বা ঘাস যা কিছু পাও নিয়ে আস। আমরা এদিক সেদিক চলে গেলাম। এ সম্পর্কীয় যা পাওয়া গেল আমরা সব কিছু সংগ্রহ করে স্তূপাকারে একত্রিত করলাম। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমরা দেখছো, এভাবে গুনাহগুলো একত্রিত হয়ে স্তূপাকার ধারণ করে। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক, ছোট-বড় গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা কর। কেননা সব কিছু লিপিবদ্ধ হয়েছে, ভাল-মন্দ যে যা করে সে সবই দেখতে পাবে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ

"সেদিনকে ভয় কর, যেদিন প্রত্যেকে তার ভাল এবং মন্দ সর্বপ্রকার আমল দেখতে পাবে"।

আরও এরশাদ হয়েছে

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ

"সেদিনকে ভয় কর, যেদিন সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে, যেদিন সকল গোপন কথা প্রকাশ পাবে, সেদিন মানুষের কোন শক্তি থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারীও সে পাবেনা"।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্যে কেয়ামতের দিন একটি পতাকা থাকবে। ঐ পতাকার মাধ্যমে তার

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২২২

পরিচয় পাওয়া যাবে। এ পতাকা তার রানের কাছে হবে, আর ঘোষণা করা হবে, এটি অমুকের পুত্র অমুকের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার চিহ্ন।

(হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক এমন নন যে তিনি কোন সৃষ্টির প্রতি জুলুম করবেন, হ্যাঁ ক্ষমা করা তাঁর গুণ, তবে ন্যায় বিচার কায়েম করার লক্ষ্যে তিনি পাপীষ্ঠদেরকে শাস্তিও দিয়ে থাকেন, দোযখ পাপীষ্ঠ এবং অবাধ্য লোকদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে। পরে গুনাহগার মোমেনদেরকে রেহাই দেয়া হবে, আল্লাহ পাক সামান্যতম অবিচারও করেন না, তিনি নেক আমলকে বৃদ্ধি করেন, আর গুনাহকে সমানই রাখেন, সেদিন ন্যায় বিচারের পাল্লা সম্মুখে থাকবে, কারও প্রতি অবিচার হবেনা।

মসনদে আহমদে রয়েছেঃ হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি এ খবর পেলাম যে এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস শ্রবণ করেছিলেন যা তিনি বর্ণনা করেন। আমি ঐ হাদীস বিশেষভাবে শ্রবণ করার জন্যে একটি উষ্ট্র ক্রয় করলাম এবং সফরের অন্যান্য আসবাব পত্র তৈরী করলাম। একমাস সফরের পর সিরিয়ায় পৌঁছে জানতে পারলাম তিনি হলেন আবদুল্লাহ এবনে উনাইস (রাঃ)। আমি দ্বার রক্ষীকে বললাম, যাও খবর দাও যাবের দরজায় অপেক্ষমান। একথা শ্রবণ করা মাত্র তিনি সঙ্গে সঙ্গে গৃহ থেকে বের হয়ে আসলেন এবং আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, আমি তাঁকে বললাম, আমি জানতে পেরেছি যে আপনি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে কেসাস সম্পর্কে কোন হাদীস শুনেছেন। আমার ইচ্ছা হলো আমি আপনার নিকট থেকে সেই হাদীস শ্রবণ করি, এজন্যে এখানে এসেছি। আর এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি সফর শুরু করেছি এই ভয়ে যে এই হাদীস শ্রবণের পূর্বে যেন আমার মৃত্যু না হয়ে যায় বা আপনার মৃত্যু না হয়। এখন আপনি ঐ হাদীস বর্ণনা করুন। তখন তিনি বললেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শ্রবণ করেছি, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তাঁর সমস্ত বন্দাদেরকে একত্রিত করবেন নগ্ন দেহ, খতনা ব্যতীত, অসহায় অবস্থায়। এরপর একটি ঘোষণা করা হবে যা নিকট দূরের সকলেই শ্রবণ করবে, আমি মালিক, আমি প্রতিদান প্রদানকারী, কোন দোযখী সে পর্যন্ত দোযখে যাবেনা যে পর্যন্ত কোন জান্নাতীর উপর তার যে হক্ব রয়েছে তা তাকে না দিয়ে দেই। আর কোন জান্নাতীও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তার কোন হক্ব তাকে না দিয়ে দেই যা কোন দোযখীর উপর রয়েছে, যদিও একটি চপেটাঘাত হোক না কেন। আমরা আরজ করলাম, এই হক্ব কিভাবে দেয়া হবে, অথচ আমরা সেখানে সকলেই নগ্ন দেহ এবং নগ্ন পা অবস্থায় থাকব, কোন অর্থ-সম্পদ বা কোন আসবাব-পত্র আমাদের থাকবে না। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ সেদিন হক্ব নেক আমল এবং বদ আমল দ্বারা আদায় হবে। যে দেনাদার তার নেকী পাওনাদারকে দেয়া হবে, যদি তবু দেনা শোধ না হয়, তবে পাওনাদারের গুনাহর বোঝা দেনাদারের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর উর্দু, পারা-১৫, পৃষ্ঠা-১০২-৩

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ.....

"আর প্রত্যেকের সম্মুখে আমলনামা রাখা হবে। (হে রসূল!) আপনি পাপীষ্ঠ লোকদের দেখবেন যে আমলনামায় লিখিত বিষয়ের কারণে ভীত হয়ে তারা থর থর কাঁপছে এবং বলছে, কি সর্বনাশ! এ কেমন গ্রন্থ ছোট বড় কোন কিছুই যে তা থেকে বাদ পড়েনি। সব কিছুই রয়েছে এতে, তাদের যাবতীয় কার্যক্রমের বিবরণ তারা সম্মুখেই দেখতে পাবে। (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক কারো প্রতিই অবিচার করেন না"।

বস্তুতঃ কেয়ামতের দিন প্রত্যেকের হাতে আমলনামা দেয়া হবে এবং পাপীষ্ঠ লোকেরা তাদের পাপের কথা মনে করে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। কেননা ছোট-বড় সব কর্মের বিবরণ স্থান পাবে আমলনামায়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ

(হে রসূল!) আপনি দেখতে পাবেন পাপীষ্ঠরা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় রয়েছে।

وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا

আর তারা বলবে, হায় আক্ষেপ! এই কিতাবের কী হলো? ছোট বড় কোন কিছুই তো বাদ দেয়নি, সবই তো এতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতেالمجرمين। তাদেরকে বলা হয়েছে যাদের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে।

অর্থাৎ সে গুনাহর কারণে যা ঐ আমলনামায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ

এ আয়াতের তফসীরে কবীরা গুনাহ সমূহের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

কিন্তু আমলনামায় তারও এক একটি হিসাব লিপিবদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ ছোট হোক বড় হোক কোন গুনাহই না লিখে ছাড়েনি। হযরত সাহাল বিন সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ সে সব গুনাহ থেকেও আত্মরক্ষা কর যেগুলোকে তুচ্ছ মনে করা হয়। তুচ্ছ গুনাহ সমূহের উদাহরণ হলো এই, যেমন কিছু সংখ্যক লোক একটি উপত্যকায় সমবেত হয়ে কেউ একটি লাকড়ি খুঁজে আনলো, অন্যজন আরেকটি লাকড়ি খুঁজে আনলো, এভাবে এক একটি তুচ্ছ লাকড়ি জমা হয়ে এত হলো যে রান্না করার জন্যে যথেষ্ট হলো। অর্থাৎ ছোট ছোট তুচ্ছ গুনাহগুলো জমা হয়ে বড় হয়ে যায়। (এমনিভাবে) ঐ ছোট গুনাহগুলোও বড় গুনাহর মত ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় (বগভী)।[১]

নেসায়ী, এবনে মাজা এবং এবনে হাব্বান হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা

১। তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-৫, পৃষ্ঠাঃ ২১-২২

করেছেন, যে সব গুনাহকে ছোট মনে করা হয় সেগুলো থেকেও তোমরা বাঁচতে চেষ্টা কর। কেননা কেয়ামতের দিন সেগুলো সম্পর্কেও আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

বোখারী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি রয়েছে, তিনি বলেছেন, তোমরা এমন আমল কর যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম এবং ক্ষুদ্র। আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম।

وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا

(মানুষ যা করেছে, তা আমলনামায় লিপিবদ্ধ দেখতে পাবে।)

অর্থাৎ মানুষের যাবতীয় কার্যক্রম আমলনামায় লিপিবদ্ধ থাকবে যা প্রত্যেকে দেখতে পাবে।

অথবা এর অর্থ হলো, প্রত্যেকটি মানুষ তার আমলের বদলা পাবে।

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا

(আর (হে রসূল) আপনার প্রতিপালক কারো প্রতি জুলুম করেন না।)

জুলুম বা অবিচার আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারের শানের খেলাফ, তা সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়, কল্পনাতীত। এর অর্থ হলো, কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক শাস্তি দেন না, কারো সামান্যতম নেক আমলকেও তিনি বিনষ্ট হতে দেননা। কোন বন্দাকে তার সওয়াব থেকে বঞ্চিত করেন না; বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে প্রত্যেককে তার কর্মের যথোচিত সওয়াব তিনি দান করবেন। দুনিয়াতে যে যা করবে তার পরিণতি অবশ্যই তাকে ভোগ করতে হবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সকল আমলনামা আরশের নীচে একত্রিত হয়। কেয়ামতের দিন যখন সমস্ত লোক দণ্ডায়মান থাকবে, তখন আল্লাহ্ পাক একটি বাতাস প্রেরণ করবেন, যা প্রত্যেককে তার আমলনামা পৌঁছে দেবে। কারো ডান হাতে কারো বাঁ হাতে। নেককারদের ডান হাতে আর বদকারদের বাম হাতে। আমলনামায় সর্ব প্রথম একথাটি লিপিবদ্ধ থাকবেঃ

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا

(সূরা বণী ইসরাঈল)

এবনে জরীর লিখেছেন, পৃথিবীতে যে লেখাপড়া করতে জানেনা, কেয়ামতের দিন সে-ও আমলনামা পাঠ করতে পারবে।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২২৬

কেয়ামতের দিন যেভাবে হিসাব হবে

ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর অর্থ হলো বন্দা যে কাজ করেনি তা আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয়না, আর কোন ব্যক্তির অন্যায়ের যে শাস্তি হওয়া উচিত তার চেয়ে অধিক পরিমাণে শাস্তি দেয়া হয়না, এমনিভাবে একজনের অন্যায়ের জন্য অন্যকে শাস্তি দেয়া হয়না। ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তিকে সম্মুখে রেখে মানুষের হিসাব করা হবে। ইউসুফ (আঃ), আইয়ুব (আঃ) এবং সোলায়মান (আঃ)। যারা গোলাম বা চাকুরীরত তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তুমি এবাদত কেন করোনি? সে বলবে, আমি তো অন্য একজনের গোলাম ছিলাম, এজন্যে এবাদত করতে পারিনি। তখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে ডাকা হবে এবং আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, ইউসুফ তোমার ন্যায়ই গোলাম ছিল কিন্তু আমার এবাদত থেকে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারিনি। এরপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করার আদেশ হবে। এরপর এমন একজনকে হাযির করা হবে, যে অসুস্থ, বিপদগ্রস্ত। সে বলবে আমি তো বালা-মসিবতে গ্রেফতার ছিলাম, আমি কি করে এবাদত করবো? তখন হযরত আইয়ুব (আঃ)-কে ডাকা হবে। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, এ ব্যক্তিকে তোমার চেয়ে বেশী বিপদগ্রস্ত করেছি কিন্তু তার বিপদ তাকে আমার এবাদত থেকে মাহরুম করেনি। এরপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়া হবে। এরপর একজন বাদশাহকে বা ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে আনা হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি কি আমল নিয়ে এসেছো, সে বলবে, রাষ্ট্রীয় কাজে আমি ব্যস্ত থাকার কারণে এবাদত করতে পারিনি। তখন হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে পেশ করা হবে। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, এ হলো আমার বন্দা সোলায়মান, আমি তাকে তোমার চেয়ে বেশী ক্ষমতা এবং তোমার চেয়ে বেশী সম্পদ দান করেছিলাম, কিন্তু সেই ক্ষমতা ও ধন-সম্পদ তাকে আমার বন্দেগী থেকে বাধা দেয়নি। এরপর ঐ ব্যক্তিকে দোযখে নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়া হবে।[১]

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৩৪-৩৫

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ
إِبْلِيسَ ۖ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ
أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۖ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾ مَّآ
أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ ۖ وَمَا كُنتُ
مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥١﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا۟ شُرَكَآءِىَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ
فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾ وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ
النَّارَ فَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا۟ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾

তরজমা

(৫০) আর স্মরণ কর সে সময়কে, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, তোমর আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলে সেজদা করে, সে ছিল জ্বীন সম্প্রদায়ের, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো, তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছো? অথচ তারা তোমাদের শত্রু, সীমা লংঘনকারীদের প্রতিফল অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

(৫১) আসমান জমীন সৃষ্টির সময় আমি তাদেরকে ডাকি নাই এবং তাদের সৃষ্টির সময়ও নয়, আমি পথভ্রষ্টকারীদেরকে কখনও আমার সহায় করিনা।

(৫২) আর সেদিনের কথা স্মরণ কর যেদিন তিনি বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাক, তারা তখন তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের আহ্বান সাড়া দেবেনা। আর আমি তাদের উভয়ের মাঝে এক অন্তরায় সৃষ্টি করবো।

(৫৩) আর পাপীষ্ঠরা আগুন দেখে বুঝতে পারবে যে তারা তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তারা আগুন থেকে পরিত্রাণ-স্থল পাবেনা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে কতিপয় সম্পদশালী কাফেরের অহংকারের কথা বর্ণিত হয়েছে। মুশরেকরা দাবী করেছিল, তারা উচ্চ বংশীয় লোক এবং তারা সম্পদশালী, অতএব, দারিদ্র-প্রপীড়িত মুসলমানদের সাথে তারা বসবেনা। ঠিক এভাবে ইবলিসও অহংকার করে

আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয়েছিল, হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি সম্মান সূচক সেজদা দেয়ার আদেশ অমান্য করে বলেছিল, আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাঁদা মাটি দিয়ে, তাই আমি আদমকে সেজদা করতে পারিনা।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ পর্যায়ে ইবলিসের ঘটনা বর্ণনা করার কারণ হলো, এ বিষয়ে সতর্ক করা যে তোমরা যে পন্থা অবলম্বন করেছ তা হলো ইবলিস শয়তানের পন্থা, আর ইবলিস শয়তানের পন্থা হলো ধ্বংসের পন্থা।

সকল অন্যায়ের উৎস হলো অহংকার

আর অহংকার শুধু একটি মাত্র অন্যায় নয়; বরং সকল অন্যায়ের উৎসই হলো অহংকার, যা শুরু হয়েছিল অভিশপ্ত ইবলিস শয়তানের দ্বারা। পক্ষান্তরে বিনয়, আনুগত্য এবং সত্যকে গ্রহণ করা এ সবই হলো যাবতীয় কল্যাণকর কাজের উৎস, যা শুরু করেছিলেন হযরত আদম (আঃ)। অতএব, মানব জাতির একান্ত কর্তব্য হলো আদি পিতা আদম (আঃ)-এর অনুসরণ করা। কাফেররা অহংকার করেছে আর দারিদ্র্য-প্রপীড়িত মুসলমানদেরকে হেয় মনে করেছে, ঠিক এমনিভাবে ইবলিস শয়তান অহংকার করেছে এবং আদম (আঃ)-কে হেয় মনে করেছে। অতএব, ইবলিসের শোচনীয় পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করে অহংকারী মাত্রকে তার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত।[১]

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, মানুষের গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতার দু'টি পন্থা রয়েছে ১. অর্থ-সম্পদের লোভ, ২. ইবলিস শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হওয়া। ইতিপূর্বে অর্থ-সম্পদের লোভ এবং পরিণতিতে অর্থ-সম্পদ লাভের কারণে অহংকারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে ইবলিস শয়তানের ধোকাবাজীর ব্যাপারে সতকর্তা অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ

"আর সে সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়েছিলাম যে তোমরা আদমের প্রতি সম্মান সূচক সেজদা দাও। ইবলিস ব্যতীত সকলেই সেজদা দিল"।

كَانَ مِنَ الْجِنِّ

"ইবলিস ছিল জ্বীন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত"।

فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ

"ইবলিস তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো"।

ইবলিসের ইতিকথা

আয়াতের বর্ণনা-শৈলী দ্বারা একথা বোঝা যায় যে ইবলিসের অবাধ্য হওয়ার কারণ

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রাঃ), খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা-৪২৫
তফসীরে কবীর খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা১৩৬

হলো জ্বীনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। কেননা ফেরেশতাগণ কখনও আল্লাহ পাকের নাফরমানী করেন না।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ইবলিস ফেরেশতাদের একটি বিশেষ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাদেরকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাদের জ্বীন বলা হতো।

আর হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, ইবলিস ফেরেশতা ছিল না; বরং সে ছিল জ্বীন।

যেভাবে আদম (আঃ) সমগ্র মানব জাতির আদি পিতা, ঠিক এমনিভাবে জ্বীনদের আদি হলো ইবলিস।

কিন্তু আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর এ মতকে অযৌক্তিক বলেছেন, কেননা আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি জ্বীন ও মানুষকে শুধু আমার বন্দেগীর জন্যই সৃষ্টি করেছি। এই আয়াত, সূরা আর রাহমান ও সূরা জ্বীনের আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, মানুষের ন্যায় জ্বীনদের মধ্যেও কিছু নেককার, কিছু জালেম কাফের রয়েছে। জালেম ও কাফেররা নিঃসন্দেহে দোযখী হবে। আর ইবলিস এবং তার বংশধররা সকলেই আল্লাহ পাকের শত্রু, অলী আল্লাহগণের শত্রু। অতএব, ইবলিস কোন অবস্থাতেই জ্বীনদের আদি ব্যক্তি হতে পারেনা।

كَانَ مِنَ الْجِنِّ

অর্থাৎ ইবলিস ছিল জ্বীন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ তফসীরকারগণ এ অভিমতই প্রকাশ করেছেন। জ্বীন হওয়া সত্বেও তার অত্যধিক এবাদতের কারণে সে ফেরেশতাদের দলভুক্ত হয়। আর এ কারণেই যখন ফেরেশতাদেরকে সেজদা দেয়ার হুকুম হয়, সে হুকুম ইবলিসের ব্যাপারেও হয়, কিন্তু এ হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে ইবলিসের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায়, সে অহংকারী হয়, আর অহংকারের কারণেই সে আল্লাহ পাকের আদেশ অমান্য করার ধৃষ্টতা দেখায়- অর্থাৎ আদম (আঃ)-কে সেজদা করতে অস্বীকৃতি জানায়।

বিস্ময়কর বিষয় হলো, আদম সন্তানেরা তাদের পৈত্রিক শত্রু ইবলিস শয়তানকে বন্ধু হিসেবে বরণ করে। নিজেদের সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করে।

হযরত আদম (আঃ) ও শয়তানের ঘটনা ইতিপূর্বেও বর্ণিত হয়েছে।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ পাক এ আয়াতে মানব জাতিকে ইবলিস শয়তান সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এ মর্মে, ইবলিস তোমাদের আদি পিতা আদম (আঃ)-এর শত্রু। অতএব, তোমরা স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের বিধানকে অমান্য করোনা এবং ইবলিসের অনুগমন করোনা।

১। তফসীরে নুরুল কোরআন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ২৬১-৬২

মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, ফেরেশতাগণকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ইবলিসকে অগ্নি দ্বারা। যদিও ইবলিস দিবারাত্রি ফেরেশতাদের ন্যায় এবাদত করেছিল, কিন্তু আদম (আঃ)-কে সেজদা করার আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায়। তার ভেতর যে অহংকার নিহিত ছিল, তার কারণে সে আদম (আঃ)-কে সেজদা দিতে অস্বীকৃতি জানায়।[১]

أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ

"তোমরা কি তবে আমাকে বাদ দিয়ে তাকে এবং তার সন্তান-সন্ততিকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু"।

অর্থাৎ ইবলিসকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে আদৌ উচিত নয়, ইবলিস শয়তানই দুনিয়ার সৌন্দর্যের সম্মোহনী ফাঁদে মানব জাতিকে ফেলে এবং মানুষকে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে ধ্বংস করে।

بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

(পাপীষ্ঠদের প্রতিফল খুবই মন্দ।)

পাপীষ্ঠদের পরিণাম অত্যন্ত মন্দ

অর্থাৎ কাফেররা যে আল্লাহ পাকের স্থলে ইবলিস ও তার বংশধরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের এ কাজটি অত্যন্ত মন্দ।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, মুজাহেদ (রঃ) ইমাম শা'বী (রঃ)-এর বর্ণনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি বসেছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আসলো এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, ইবলিসের স্ত্রী আছে কি? আমি জবাব দিলাম, আমি জানি না। এরপর আমার স্মরণ হলো যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ

অর্থাৎ তোমরা কি ইবলিস এবং তার বংশধরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছ? আর বংশধর স্ত্রী ব্যতীত হতে পারেনা। একথা স্মরণ হওয়ার পর আমি বললাম, হ্যাঁ ইবলিসের স্ত্রী আছে।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেন, শয়তানদেরও মানুষের ন্যায় সন্তান-সন্ততি হয়।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, ইবলিসের সন্তানদের মধ্যে রয়েছে, লাকীন, ওয়ালহান, হাফাফ, মোররা, জালনাবুর, আওয়ার, মাতুস, ইয়াসুর, ওয়াসেম।

ওয়ালহান অজু, গোসল ও নামাজের সময় মানুষকে ওয়াসওয়াসা দেয়। আর ইবলিসকে বলা হয় আবু মোররা অর্থাৎ ইবলিস এ উপনামেই বিখ্যাত। জালনাবুর বাজারে মিথ্যা শপথ করায় এবং বিক্রেতাকে মিথ্যা কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করে। আওয়ার নামক

১। তফসীরে এবনে কাসীর উর্দু, পারা-১৫, পৃষ্ঠা-১০৩-০৪

শয়তান মানুষকে ব্যাভিচারে লিপ্ত করে। মাতুস মানুষের মধ্যে গুজব রটায়। আর ইয়াসুর নামক শয়তান মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে শরীয়ত বিরোধী পন্থায় বিলাপ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ওয়াসেম নামক শয়তানের কাজ হলো মানুষ যখন বাড়ীতে যায়, সে কাউকে সালাম দেয়না, আল্লাহর জিকরও করেনা তখন ওয়াসেম শয়তান সে ব্যক্তির বাড়ীর প্রত্যেকটি জিনিসকে এদিক সেদিক করে বিনষ্ট করে রাখে, যা দেখে মানুষ রাগান্বিত হয়। আর সে বাড়ীর লোকদেরকে যা ইচ্ছা তাই বলে। আর বিসমিল্লাহ পাঠ না করে আহার করা আরম্ভ করে, তখন ওয়াসেম শয়তান তার সাথে খাবারে অংশীদার হয়।

আ'মাশ (রঃ) বলেছেন, কোন কোন সময় বিসমিল্লাহ না বলে কেউ গৃহে প্রবেশ করে এবং কাউকে সালামও করেনা, এরপর বাড়ীর লোকদের সঙ্গে ঝগড়া করতে থাকে।

হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ অজুতে প্রতারণাকারী শয়তানকে বলা হয় ওয়ালহান, তোমরা তার ওয়াসওয়াসা থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হও।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে হযরত ওসমান এবনে আবি লাজ (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! শয়তান আমার নামাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং আমার নামাজের ব্যাপারে সন্দিহান করেছে। আমার মনে থাকে না কত রাকাআত পড়েছি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, এ হলো শয়তান, তাকে খোনজব বলা হয়, যখন এ অবস্থা উপলব্ধি কর, তখন আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা কর, অর্থাৎ আউবুবিল্লাহ পাঠ কর এবং বাম দিকে তিনবার থুথু ফেল। হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, আমি তাই করেছি এবং আল্লাহ পাক শয়তানকে দূর করে দিয়েছেন। (মুসলিম শরীফ)[১]

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ইবলিস তার আসন পানির উপর স্থাপন করে। এরপর তার দলবলকে সারা পৃথিবীতে প্রেরণ করে। ইবলিসের কাছে সবচেয়ে নৈকট্য-ধন্য সে-ই হয় যে সবচেয়ে বেশী অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। কেউ এসে বলে, আমি এই কাজ করেছি। ইবলিস বলে, তুমি কিছুই করোনি। আরেক শয়তান বলে, আমি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি। ইবলিস বলে তুমি ভাল কাজ করেছ। এরপর ঐ শয়তানকে নিজের কাছে টেনে আনে। আ'মাশের বর্ণনা এই যে বর্ণনাকারী বলেছেন, এরপর ইবলিস তাকে জড়িয়ে ধরে। (মুসলিম শরীফ)।

مَا اَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ

"আমি তো তাদেরকে আসমান জমীন সৃষ্টির সময় ডাকিনি এবং তাদের নিজেদের সৃষ্টির সময়ও নয়"।

অর্থাৎ মানুষ কেন এই শয়তানদের অনুসরণ করে অথবা তাদের সাহায্য কামনা করে

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ২২৮-২

এবং আল্লাহ পাকের শরীক করে? বিরাট এবং বিশাল আসমান জমীন সৃষ্টির সময় আমি তাদেরকে ডাকিনি বা তাদের পরামর্শ গ্রহণ করিনি। নিখিল বিশ্ব যখন সৃষ্টি করি তখন তাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আর তাদের নিজেদের সৃষ্টির সময়ও তাদের কোন পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি যে তাদেরকে কিরূপে তৈরী করতে হবে। অর্থাৎ কোন সৃষ্টির ব্যাপারেই তাদের কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করা হয়নি। যাতে করে তারা এবাদতের যোগ্য হতে পারে। কেননা যে স্রষ্টা শুধু সে-ই এবাদতের যোগ্য হয়। কারো এবাদতে শরীক হওয়ার তাৎপর্য হলো সৃষ্টির কাজে তার শরীক হওয়া। যেহেতু সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টির ব্যাপারে কোন কিছুই আল্লাহ পাকের সাথে শরীক হয়নি; তাই তাঁর এবাদতের ব্যাপারেও কেউ শরীক হতে পারে না।

وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا

(আর আমি বিভ্রান্তকারীদের সাহায্য গ্রহণ করবার নই।)

المضلين। অর্থাৎ বিভ্রান্তকারী। এর দ্বারা শয়তানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

عضدا (বাহু) অর্থাৎ সাহায্যকারী।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ নিখিল বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে আমি কারো সাহায্য গ্রহণ করিনি, কারো কাছ থেকে কোন পরামর্শ গ্রহণ করিনি। যদি সাহায্য নেয়াও হতো তবে এই বিভ্রান্তকারীদেরকে তো কোন অবস্থাতেই সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করতাম না। কেননা তারা মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেনঃ তোমরা যাদেরকে আল্লাহ পাকের শরীক মনে কর তারা তোমাদেরই ন্যায় আমার সৃষ্টি, আমার গোলাম। কোন কিছুর মালিকানা তাদের নেই। আসমান জমীনের সৃষ্টির ব্যাপারে আমি তাদেরকে ডাকিনি। তারা তখন বর্তমানও ছিল না। সবকিছু আমি একাই সৃষ্টি করেছি আমার কোন শরীক নেই, কোন সাহায্যকারী নেই, কোন পরামর্শদাতা বা উজিরও নেই, আমার কোন দৃষ্টান্তও নেই।[১]

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, مَا اشْهَدتهم এর সর্বনামটি দ্বারা শয়তানদেরকে নয়, মুশরেকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এমন অবস্থায় অর্থ হবে, বিশ্ব সৃষ্টির সময় আমি মুশরেকদেরকে সাক্ষী বানাইনি, আর তাদেরকে কোন বিশেষ জ্ঞান আমি দান করিনি, যদি তাদেরকে বিশেষ কোন জ্ঞান প্রদান করা হতো তবে এমন অবস্থায় এই কাফেররা বলতে পারতো যে আমরা যদি মুসলমান হই তবে সকলে মুসলমান হয়ে যাবে। অতএব (হে রসূল!) আপনি মুশরেকদের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। আর তাদের কোন প্রকার সাহায্যের আশাও করবেন না। কেননা এমন বিভ্রান্তকারীদেরকে আমি আমার দ্বীনের সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করিনা।

১। তফসীরে এবনে কাসীর উর্দু, পারা

কালবী (রঃ) বলেছেনঃ مَآ اَشهدتهم এর সর্বনামটি দ্বারা ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে আমি ফেরেশতাদেরকে শরীক করিনি যে তোমরা তাদের পূজা করবে এবং তাদেরকে আল্লাহর কন্যা মনে করবে (নাউযুবিল্লাহ)। অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে ফেরেশতাদের থেকেও সাহায্য গ্রহণ করা হয়নি এবং শয়তানদের থেকেও নয়।[১]

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا

"আর সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন তিনি বলবেন, আমার সে সব শরীকদেরকে ডাক যাদেরকে তোমরা মানতে, তখন তারা ডাকবে কিন্তু তাদের ঐ শরীকরা কোন উত্তরই দেবে না। আর আমি তাদের মাঝে একটি আড়াল রেখে দেব"।

আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন কাফের মুশরেকদেরকে লজ্জিত করার জন্যে সকলের সম্মুখে ঘোষণা করবেনঃ দুনিয়াতে তোমরা যাদেরকে ডাকতে, তাদেরকে এখন ডাক যেন আজকের বিপদ থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করে। কিন্তু কোন জবাব আসবে না, দুঃসময়ে তারা সাহায্য করতে কেউ হাযির হবে না, কেননা তাদের মধ্যে এবং তাদের উপাস্যদের মধ্যে আল্লাহ পাক একটি অগ্নির প্রাচীর রেখে দেবেন। আলোচ্য আয়াতের زَعَمْتُمْ শব্দটির অর্থ হলোঃ তোমরা মনে করতে যে তোমাদের উপাস্যরা আমার শরীক। অথবা তোমরা এই ধারণা করতে যে তোমাদের উপাস্যরা আমার আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবে।

فَدَعَوْهُمْ

তখন মুশরেকরা তাদের উপাস্যদেরকে ডাকবে।

فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ

কিন্তু তারা তাদের পূজারীদেরকে কোন উত্তর দেবে না।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا

অর্থাৎ কাফেরদের এবং তাদের উপাস্যদের মধ্যে একটি আড়াল রেখে দেব।

مَوْبِق অর্থাৎ ধ্বংসের স্থান। তফসীরকার আতা এবং যাহ্যাক (রঃ) শব্দটির এ তরজমাই করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন مَوْبِق হলো দোযখের একটি ময়দানের নাম। মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, গরম পানির একটি হ্রদ। আর একরামা (রঃ) বলেছেন مَوْبِق হলো অগ্নির একটি সাগর। যার তীরে কৃষ্ণ বর্ণের খচ্চরের সমান সর্প রয়েছে। আর এবনুল আরাবী বলেছেন, দু'টি জিনিসের মধ্যে যা আড়াল করে রাখে তাকে

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭ পৃষ্ঠা ২৩০

موبق বলা হয়।[১]

وَرَاَالْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا

"আর পাপীষ্ঠরা দোযখকে দেখতে পেয়ে বুঝতে পারবে যে তাদেরকে তন্মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, আর তারা দোযখ থেকে ফেরার কোন পথ পাবে না"।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, প্রথম প্রথম পাপীষ্ঠদের মনে ক্ষীণ আশা থাকবে যে হয়তো নাজাত হতেও পারে। কিন্তু যখন দোযখ দেখতে পাবে তখন আর এ সত্য বুঝতে বাকী থাকবে না যে দোযখই তাদের অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ আছে, নাজাতের আর কোন সম্ভাবনা নাই। কেননা দোযখের অগ্নি তাদেরকে চর্তুদিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। আর সব দিক থেকেই ফেরেশতারা প্রহরায় রত থাকবে। আর যাদেরকে তারা দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাকের শরীক মনে করতো তারা এত অসহায় হবে যে পূজারীদেরকে সাহায্য করা তো দূরের কথা, তাদের কাছেও আসতে পারবে না।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস মসনদে আহমদে সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কাফেররা দোযখকে ৪০ মাইল দূরত্ব থেকে দেখবে। এরপর তাদের মনে নাজাতের আর কোন আশা থাকবে না, ঐ দোযখেই তারা নিক্ষিপ্ত হবে- এ সত্য তারা উপলব্ধি করবে।[২]

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا
فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ
جَدَلًا ﴿٥٤﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ
اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾ وَمَا
نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ﴿٥٦﴾ وَ
مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ
يَدٰهُ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَ
اِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٥٧﴾

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭ পৃষ্ঠা ২৩০
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রাঃ), খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা-৪২৬
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫১

তরজমা

(৫৪) আমি মানব জাতির জন্যে এই কোরআনে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার বাণী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছি; কিন্তু মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বড় কলহ-প্রিয়।

(৫৫) যখন তাদের নিকট হেদায়েত আসে তখন তারা মানুষকে ঈমান আনয়ন করা এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা থেকে বিরত রাখে, শুধু এ অপেক্ষায় যে তাদের সম্মুখে পূর্ববর্তী লোকদের দশা উপস্থিত হোক, অথবা তাদের নিকট আসুক সরাসরি আযাব।

(৫৬) রসূলগণকে আমি শুধু সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করে থাকি, কিন্তু কাফেররা সত্য কথাকে বিতাড়িত করার লক্ষ্যেই মিছেমিছি কলহ করতে চায়। তারা আমার কালাম এবং ভয় প্রদর্শনকে বিদ্রুপের বিষয় রূপে গ্রহণ করে থাকে।

(৫৭) আর সে ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর জালেম কে হবে, যাকে আল্লাহ পাকের কালাম দ্বারা হেদায়েত করা সত্বেও সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে লয় এবং তার কৃতকর্ম সমূহ ভুলে যায়? আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যেন তারা কোরআন বুঝতে না পারে। আর তাদের কানে বধিরতা এনে দিয়েছি। (হে রসূল!) যদি আপনি তাদেরকে হেদায়েতের দিকে ডাকেনও, তবু তারা কিছুতেই হেদায়েত গ্রহণ করবে না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, কাফেররা তাদের ধন-সম্পদের কারণে অহংকার করেছে এবং দারিদ্র্য-প্রপীড়িত মুসলমানকে হেয় মনে করেছে, তাদের এ আচরণ শুধু নিন্দনীয়ই নয়; বরং তাদের জন্যে বিপদজনকও। এ পর্যায়ে ইতিপূর্বে দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আমি মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, বারে বারে সত্যকে বোঝাবার জন্যে অনেক দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছি, কিন্তু যারা কলহ প্রিয়, যারা তর্কপ্রিয়, তাদের তর্কের শেষ হয়না। ঈমান না আনার জন্য, পবিত্র কোরআনে বিশ্বাস না করার জন্যে তাদের কাছে কোন দলিল-প্রমাণ বা যুক্তি থাকেনা। কিন্তু এতদসত্বেও তাদের জেদ এবং হঠকারীতা ও অযথা তর্ক শেষ হয়না।

তাদের এ ঘৃণ্য আচরণে একথাই প্রমাণিত হয় যে তারা নিজেদের জন্যে চরম ধ্বংসের অপেক্ষায় রয়েছে। অথচ আমি তাদের জন্যে প্রত্যেকটি কথা সুস্পষ্টভাবে বারে বারে বর্ণনা করেছি। কিন্তু এতদসত্বেও তারা সঠিক পথ থেকে দূরে থাকে।

এ আয়াতের তফসীরে বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীস প্রায় সকলেই উল্লেখ করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক রাত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার এবং তাঁর কন্যার নিকট

আগমন করলেন এবং এরশাদ করলেন, তোমরা উভয়ে রাত্রে নামাজ আদায় কর না? অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাজ বা নফল নামাজ! আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের প্রাণ আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণে, তিনি যখন ইচ্ছা করেন তখন উঠিয়ে দেন। আমার এ আরজীর পর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তশরীফ নিয়ে গেলেন, আমাকে কোন জবাব দিলেন না। আমি শুনলাম তিনি তার রানের উপর হাতে মেরে এ আয়াত তেলাওয়াত করেনঃ

وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلاً

"মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বড় কলহ প্রিয়"।

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, হযরত আলী (রাঃ) মুস্তাহাব বা নফল এবাদতের ব্যাপারে এ জবাব প্রদান করেছেন। আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের ব্যাপারে মানুষের কোন হাত নেই, তিনি তৌফিক দিলেই এবাদত করতে পারে, আর তিনি তৌফিক না দিলে, আল্লাহ পাকের এবাদত করা সম্ভব হয়না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-এর এ জবাব শ্রবণ করে কোন কথা বলেননি; বরং তিনি সেখান থেকে তশরীফ নিয়ে গেলেন।

তফসীরকারগণ বলেছেন, হয়তো হযরত আলী (রাঃ)-এর এ জবাব তিনি পছন্দ করেননি, তাই আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছেন।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, আলোচ্য আয়াতের الانسان শব্দ দ্বারা নজর এবনে হারেছকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কালবী (রঃ) এর মতে, উবাই এবনে খালফকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতের الانسان শব্দ দ্বারা সকল কাফেরকেই বোঝানো হয়েছে। কারণ কাফেররা সকলেই কলহ-প্রিয়। সত্য গ্রহণে তাদের রয়েছে চরম অনীহা। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে انسان শব্দ দ্বারা সকল মানুষকে বোঝানো হয়েছে। মোমেন হোক কি কাফের।[২]

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ

"যখন তাদের নিকট হেদায়েত আসে তখন তারা মানুষকে ঈমান আনয়ন করা এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা থেকে বিরত রাখে। শুধু এ অপেক্ষায় যে তাদের সম্মুখে পূর্ববর্তী লোকদের দশা উপস্থিত হোক অথবা তাদের নিকট আসুক সরাসরি আযাব"।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ২৩১
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রাঃ), খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা-৪২৭
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু,), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-১০৫
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৩০০
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ২৩১

কাফেরদের উদ্দেশে কঠোর সতর্কবাণী

যখন মানুষের কাছে পবিত্র কোরআনের হেদায়েত এসে পৌছে তখন ঐ হেদায়েত গ্রহণ করায় এবং আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করায় কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ছিলনা। কিন্তু শুধু এতটুকুই বাধা ছিল যে তারা এ অপেক্ষায় রয়েছে, অতীত কালে যে সব উম্মত আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কারণে আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হয়েছে তাদের দশা এদেরও হোক, অথবা সরাসরি আল্লাহ পাকের দরবার থেকে তাদের প্রতি আযাব আসুক। কেননা ইতিপূর্বে যারা আল্লাহ পাকের হেদায়েতকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং জেদ ও হঠকারীতার কারণে সত্যের বিরোধিতা করেছে, তাদের শাস্তি হয়েছে যুগে যুগে। হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের প্রিয় রসূল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল। তাঁর নিকট নাজিল হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন। কিন্তু এতদসত্বেও তারা তাঁর বিরোধিতা করে। অতএব তাদের এ আচরণ এ তথ্যেরই প্রমাণ যে তারা আল্লাহ পাকের আযাবের অপেক্ষায় রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের هدى শব্দটি দ্বারা পবিত্র কোরআন এবং ইসলামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

سنة الاولين

আল্লাহ পাকের আযাবের সে পন্থা যা পূর্বকালের কাফেরদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে এবং যে পন্থায় তাদের মূলোৎপাটন করা হয়েছে।

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين

"আর আমি রসূলগণকে শুধু সুসংবাদ দাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী রূপেই প্রেরণ করি"।

প্রিয়নবী (সাঃ) কে সান্ত্বনা

রসূলগণকে প্রেরণের দুটি উদ্দেশ্য একঃ মোমেনদের জন্যে সওয়াব এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা। দুইঃ কাফেরদেরকে দোযখের আযাবের ভয় প্রদর্শন করা। একথার তাৎপর্য হলো, আমি কোন পয়গম্বরকে এ বিষয়ের অধিকার দেই না যে, কাফেররা কোন প্রকার মোজেযা তলব করলেই তা পেশ করবেন। অথবা এর অর্থ হলো, আমি কোন পয়গম্বরকে এ দায়িত্ব দেই না যে সারা পৃথিবীর মানুষকে হেদায়েত করবেন, বরং তাদের কাজ হলো দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। তাঁদের আহ্বানে যে সাড়া দেবে সে ভাগ্যবান হবে, আর যে তাঁদের আহ্বানে সাড়া দেবে না সে ভাগ্যাহত হবে। কোন লোককে হেদায়েত গ্রহণের জন্যে বাধ্য করা পয়গম্বরের কাজ নয়। এতে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি সান্ত্বনা। এ মর্মে যে (হে রসূল!) যদি মক্কাবাসী আপনার প্রতি ঈমান না আনে তবে আপনি তার জন্যে দায়ী নন। কেননা মক্কার কাফেররা বলেছিল, হে আল্লাহ! যদি এই নবী সত্য হয় তবে আমাদের প্রতি আসমান থেকে পাথর বর্ষণ কর

অথবা কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রেরণ কর, এমনকি তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেছিল, হে নবী! আমরা তো আপনাকে পাগল মনে করি; তাই ফেরেশতা কেন আনেন না? তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দান করেছেন এ মর্মে যে (হে রসূল!) আপনার কাজ হলো মুসলমানদেরকে সুসংবাদ প্রদান করা এবং কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা। আর এ দায়িত্ব আপনি সঠিক ভাবে পালন করেছেন।[১]

وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ

"কিন্তু কাফেররা সত্য কথাকে বিতাড়িত করার লক্ষ্যেই মিছেমিছি কলহ করতে চায়, তারা আমার কালাম এবং ভয় প্রদর্শনকে বিদ্রুপের বিষয় রূপে গণ্য করে"।

কাফেররা না-হক্ব কথা বলে ঝগড়া সৃষ্টি করে, তাদের লক্ষ্য হলো সত্যকে বিতাড়িত করা, যেমন তারা বলতো-

أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا

(আল্লাহ কি মানুষকে রসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন?)

এমনিভাবে তারা বলতো-

مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

(তুমি তো আমাদের ন্যায় একজন মানুষই, এর বেশী তো কিছু নও।)

তারা আরো বলতো-

لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً

(যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করতেন তবে হেদায়েতের জন্য ফেরেশতা অবতরণ করতেন।)

এ ধরণের ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক বাজে কথা বলে তারা সত্য গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করতো এবং সত্যকে প্রতিরোধ করার অপচেষ্টা করতো, অথচ কোন দিনও বাতিল দ্বারা সত্যকে প্রতিরোধ করা যায় না।

وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا

(আর তারা আমার আয়াত সমূহকে এবং ভয় প্রদর্শনকে বিদ্রুপের বিষয় বলে গ্রহণ করে থাকে।)

কাফেররা পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহকে বিদ্রুপ করতো এমনকি, তাদেরকে যখন আখেরাতের আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা হতো তখনও তারা ঐ সতর্কবাণীর প্রতি বিদ্রুপ করতো, যেমন তারা বলতো-

---

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু,), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-১০৬
তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ২৩২
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রাঃ), খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা-৪২৭

لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا

(ইচ্ছা করলে আমরাও এমন বাণী রচনা করতে পারি।)

তারা আরও বলতো, يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ

(কোন লোক এসে তাঁকে শিখিয়ে যায়।)

এমনিভাবে তারা বলতো, اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ

(এ-তো শুধু পূর্বকালের কাহিনী ব্যতীত আর কিছু নয়।)

আর আযাব সম্পর্কে তারা বলতো- لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ

(আমাদের কথার উপর আল্লাহ্ পাক আযাব কেন প্রেরণ করেন না?)

এভাবে তারা পবিত্র কোরআনের মহান বাণীকে পরিহাস করতো।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ

"আর সে ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর জালেম কে হবে? যাকে আল্লাহ্ পাকের কালাম দ্বারা হেদায়েত করা সত্ত্বেও সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে লয় এবং তার কৃতকর্ম সমূহ ভুলে যায়"।

অর্থাৎ সে সবচেয়ে বড় জালেম, সবচেয়ে বড় অত্যাচারী, যার সম্মুখে তার স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী পাঠ করা হয়, আর সে সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করেনা; বরং সে পাক কালাম থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে আর ইতিপূর্বে সে যে অন্যায়-অত্যাচার করেছে, সেগুলোও ভুলে যায়, এর পরিণাম সম্পর্কে ভেবে দেখেনা। কত ভয়াবহ পরিণাম তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে এ বিষয়ে তারা চিন্তাও করেনা। তাদের এ অন্যায় আচরণের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَّبَدًا

"তাদের এ অন্যায় আচরণের শাস্তি হলো এই, আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি, যেন তারা পবিত্র কোরআন বুঝতে না পারে, আর তাদের কানে বধিরতা এনে দিয়েছি। আর (হে রসূল!) যদি আপনি তাদেরকে হেদায়েতের দিকে ডাকেনও তবু তারা কখনও হেদায়েত গ্রহণ করবে না"।

যেহেতু কাফেররা আল্লাহ্ পাকের আয়াত সমূহকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো। এমনকি, যখন তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের আযাবের ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করা হতো তখনও তারা পরিহাস করতো, তাই শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ্ পাক তাদের অন্তরে আবরণ রেখে দিয়েছেন। পরিণামে তারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সত্যকে গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে

ফেলেছে। তাদের কর্ণে এসেছে বধিরতা, এমন অবস্থায় তারা কোনদিন সত্যকে গ্রহণ করবে না। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ (হে রসূল!) আপনি তাদের হেদায়েতের যত চেষ্টাই করুন না কেন, কখনও তারা হেদায়েত কবুল করবে না। কেননা হেদায়েত গ্রহণের যোগ্যতাই তাদের নেই, এ আয়াতের ঘোষণা সে কাফেরদের উদ্দেশে, যারা ঈমান আনবে না বলে আল্লাহ পাক জানতেন।[১]

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو
الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ
لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا
وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ
أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا
حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا
غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾

তরজমা

(৫৮) আর (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান। মানুষকে যদি তাদের কার্যকলাপের জন্যে তিনি পাকড়াও করতেন, তবে তাদের শাস্তি তরান্বিত করতেন। কিন্তু তাদের জন্যে রয়েছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত, তা থেকে সরে যাওয়ার কোন স্থান তারা পাবেনা।

(৫৯) আর এসব জনপদ যাদের অধিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস করেছিলাম, যখন তারা সীমা লংঘন করেছিল, আর তাদের ধ্বংসের জন্যে আমি একটি নিদৃষ্ট সময় স্থির করেছিলাম।

(৬০) আর স্মরণ কর সে সময়কে, যখন মুসা তাঁর যুবক সঙ্গীকে বলেছিলেন, দু সমুদ্রের সঙ্গম-স্থলে পৌছেই আমি থামবো, নতুবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবো।

(৬১) যখন তারা উভয়ে দু' সমুদ্রের সঙ্গম-স্থলে পৌছলেন তখন নিজেদের মাছের কথা তারা ভুলে গেলেন। ফলে সাগরে সুড়ঙ্গ করে মাছ তার পথ করে নিল।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্টা ২৩২

(৬২) যখন তারা আরও অগ্রসর হলেন, তখন মুসা তাঁর সঙ্গীকে বললেন, আমাদের খাবার আন, আমরা তো এই সফরে ক্লান্ত হয়ে গেছি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অন্যায় আচরণের বিবরণ দেয়ার পর তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, দুবৃত্ত কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এত বিরোধিতা সত্বেও বহাল তবিয়তে কেন রয়েছে, তাদের শাস্তি কেন হয় না? তারই জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ

কাফেরদের অবকাশ প্রদানের কারণ

(হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অনন্ত অসীম তাঁর রহমত। আর এ রহমতের কারণেই তিনি দুর্বৃত্ত কাফেরদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেননা; বরং তাদেরকে একটা নিদৃষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন, ঐ নিদৃষ্ট সময় শেষ হওয়ার পর তাদের কোন আশ্রয়-স্থল থাকেনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক যে অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং অতীব দয়াবান তার একটি প্রমাণ হলো, মক্কার দুবৃত্ত কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে চরম কষ্ট দেয়া সত্বেও আল্লাহ পাক তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। তাদের উপর আযাব আপতিত হয়না, তবে তাদের এ অবকাশ চিরদিনের জন্যে নয়; বরং কয়েক দিনের জন্যে। বস্তুতঃ মানুষের কৃতকর্ম এত মন্দ যে, তাদের শাস্তি হওয়া উচিত অনতিবিলম্বে, কিন্তু করুণাময় আল্লাহ পাকের অন্তহীন করুণা ও রহমতই তাদের শাস্তি বিধানের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আল্লাহ পাক তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, যেন এই সুযোগে তারা আত্মসংশোধনে মনোনিবেশ করতে পারে। এটি আল্লাহ পাকের দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا

"বরং তাদের জন্যে রয়েছে একটি নিদৃষ্ট প্রতিশ্রুত সময়, তা থেকে সরে যাওয়ার কোন স্থান তারা পাবে না"।

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন। আর (দুনিয়াতে) বদরের যুদ্ধের দিন। কেননা বদরের যুদ্ধের দিন মক্কার কাফেরদের তথাকথিত নেতা উপনেতাদের অনেকেই নিহত হয়।

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا

"আর ঐসব জনপদ-যখন তাদের অধিবাসীরা সীমা লংঘন করে, তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করি। আর তাদের ধ্বংস করার একটি ওয়াদাও আমি ঠিক করে রেখেছিলাম"।

আদ জাতি, সামুদ জাতি, ফেরাউনের দলবল তথা যাদেরকে ইতিপূর্বে আল্লাহ্ পাক ধরা-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, তারা তাদের কীর্তিকলাপের শাস্তি পেয়েছে। অতএব, আল্লাহর নাফরমানদের এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। অবাধ্য কাফেরদের জানা উচিত, যখন আল্লাহর আযাব আপতিত হয় তখন তাদের জন্যে কোথাও আশ্রয়-স্থল থাকেনা, তাদের ধ্বংস হয় অনিবার্য, অপরিহার্য।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে কাফেরদের উদ্দেশে অর্থাৎ যেভাবে ইতিপূর্বে অবাধ্য কাফেরদের একটি নিদৃষ্ট সময়ে ধ্বংস করা হয়েছে ঠিক এমনিভাবে যখন এদের জন্যে নিদৃষ্ট সময় আসবে তখন তাদেরও আত্মরক্ষার কোন স্থান থাকবে না।

وَاِذْ قَالَ مُوسٰى لِفَتٰهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰٓى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ

"আর সে সময়কে স্মরণ কর যখন মুসা তার যুবক সঙ্গীকে বলেছিলেন, দু' সমুদ্রের সঙ্গম-স্থলে পৌঁছেই আমি থামব, নতুবা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

যেহেতু মক্কার কাফেরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা করার জন্য তিনটি প্রশ্ন করেছিলঃ ১. রুহ ২. আসহাবে কাহফ ৩. জুলকারনাঈন সম্পর্কে। আর ইহুদীরা তাদের বলে দিয়েছিল, যদি তিনি এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দেন, তবে তোমরা জানবে যে তিনি সত্য নবী। পক্ষান্তরে, যদি তিনি এর সঠিক জবাব না দেন তবে তিনি নরী নন। তাই আলোচ্য আয়াত থেকে হযরত মুসা (আঃ) ও খিজির (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে যেন ইহুদীরা জানতে পারে যে নবীর জন্যে সব কিছু জানা জরুরী নয়; বরং নবীর জন্যে আল্লাহ পাকের ওহী এবং হেদায়েতের এলম থাকা একান্ত জরুরী। আর এ কারণেই হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে কথা বলার সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া সত্বেও সেই এলম তাঁর নিকট ছিলনা, যা হযরত খিজির (আঃ)-কে প্রদান করা হয়েছিল। আর এজন্যেই হযরত মুসা (আঃ) হযরত খিজির (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করার উদ্দেশে সফর করেছিলেন, যেন তিনি সে এলম অর্জন করেন যা বিশেষভাবে হযরত খিজির (আঃ)-কে দান করা হয়েছিল। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে নবী হওয়ার জন্যে সব বিষয়ে অবগত হওয়া জরুরী বিষয় নয়; বরং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের, তাঁর নৈকট্য-ধন্য হওয়ার এবং হেদায়েতের পথ ও পন্থা তথা শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরী। হযরত খিজির (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাক যে বিশেষ এলম দান করেছিলেন তা এই প্রকার ছিলনা, আর এ বিষয়ে হযরত মুসা (আঃ) থেকে হযরত খিজির (আঃ)-এর এলম অধিকতর ছিল, কিন্তু হেদায়েতের এলম এবং শরীয়তের বিধান সম্পর্কে হযরত মুসা (আঃ)-এর এলম তখন সর্বাধিক ছিল। হযরত মুসা (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল এমরান। আর আলোচ্য আয়াতের فَتٰى শব্দটি দ্বারা ইউশা এবনে নুন এবনে আফরাসীম এবনে ইউসুফ (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ দু' সমুদ্রের সংযোগ-স্থল।

اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا

(অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবো।)

حقبا অর্থ হলো সুদীর্ঘ কাল। আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ কামুসে حقبا অর্থ আশি বছর বা তার চেয়ে অধিক লিপিবদ্ধ হয়েছে, সুদীর্ঘ সময়, অনেক বছর।

এবনে জরীর ও এবনে আবি হাতেমের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি রয়েছে حقبا অর্থ হলো সুদীর্ঘ সময়। আর আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, حقبا অর্থ আশি বছর। আর কোন কোন তত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ সত্তর বছর। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ লিখেছেন, আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্দাগণ যত উচ্চ মর্যাদার অধিকারীই হন না কেন এবং যত বড় জ্ঞানীই হন না কেন, নিজেকে কখনও বড় বলেন না এবং মনেও করেন না। ঘটনাক্রমে যদি এমন কোন কিছু ঘটে যায়, তখন আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করেন। হযরত মুসা (আঃ) একজন শীর্ষস্থানীয় পয়গম্বর। আল্লাহ পাক তাঁর সাথে কথা বলতেন, এজন্যে তাঁকে "কালিমুল্লাহ" বলা হয়। একবার তিনি এক বিরাট জনসমাবেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। এ মজলিসে একজন শ্রোতা জিজ্ঞাসা করে যে এ যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম কে? হযরত মুসা (আঃ) বলেনঃ "আমি"। কিন্তু আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ)-এর জবাব পছন্দ করেননি। আর তাই আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন এ মর্মে, "হে মুসা! আমার আর এক বন্দা তোমার চেয়ে বড় আলেম রয়েছে"। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, একথাটির অর্থ হলো সব বিষয়ে তিনি সকলের চেয়ে বড় জ্ঞানী। তাঁর চেয়ে বড় জ্ঞানী আর কেউ নেই। একথাটি একজন নবীর মুখে শোভা পায়না। যদি হযরত মুসা (আঃ) "আল্লাহ পাকই বেশী জানেন" বলতেন তবে তাই হতো শোভনীয়। মূলতঃ যাঁরা আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য তাঁদেরকে আল্লাহ পাক সামান্য ত্রুটির জন্যেও সতর্ক করেন। আর এ কারণেই হযরত মুসা (আঃ)-এর উদ্দেশে আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, হে মুসা! আমার আরেকজন বন্দা রয়েছে, যার কাছে তোমার চেয়ে বেশী এলম রয়েছে। হযরত মুসা (আঃ) আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! তাঁর সাথে আমার মোলাকাত কিভাবে হবে? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, দু'টি সাগরের সংযোগ-স্থলে আমার একজন বন্দা রয়েছে, তুমি সঙ্গে একটি ভাজা মাছ নিয়ে যাও, ঐ মাছটি যেখানে হারিয়ে যাবে, আমার ঐ বন্দার সাথে সেখানেই দেখা হবে। হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক তাঁর খাদেম ইউশা এবনে নুনকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলেন। ইউশাকে তিনি ঐ মাছটির প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দিলেন এবং একথাও বললেন, আমাদের নিদৃষ্ট স্থানে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা চলতে থাকব, যত দিন বা যত যুগ অতিবাহিত হোক আমাদের ভ্রমণে কোন বিরতি হবেনা। ইউশা এবনে নুন এবং হযরত মুসা (আঃ) যেতে যেতে একটি পাথরের নিকট পৌঁছলেন এবং ঐ পাথরে মাথা রেখে তিনি বিশ্রাম করছিলেন। ঐ মুহূর্তে মাছটি পাত্র থেকে বের হয়ে সাগরে ঝাঁপ দিল এবং পানির

ভেতর সুড়ঙ্গের ন্যায় তার পথ করে নিল। আল্লাহ পাক পানির গতিকে থামিয়ে দিলেন। এই সময় ইউশা জাগ্রত হলেন। আর তাঁর সম্মুখেই মাছটি সাগরে চলে গেল। হযরত মুসা (আঃ) জাগ্রত হয়ে দিনের অবশিষ্টাংশ সময় চলতে থাকলেন (অর্থাৎ জাগ্রত হয়েই রওয়ানা হলেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকলেন) মাছের চলে যাওয়ার এ ঘটনাটি মুসা (আঃ)-এর নিকট উল্লেখ করতে ইউশা ভুলে গেলেন। মুসা (আঃ) সারারাত চলতে থাকলেন। পরদিন সকাল হলো। তখন তিনি ইউশাকে বললেন, আমরা এই সফরে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এবার খাবার আন। এ পর্যায়ে একথা উল্লেখ্য, যে স্থানে মাছটি সমুদ্রে লাফ দিল তার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ক্লান্ত হননি, কিন্তু ঐ স্থান থেকে অগ্রসর হওয়ার পরই ক্লান্তি অনুভূত হলো। ইউশা বললেন, আমরা যখন পাথরের নিকট অবস্থান করেছি তখনই মাছটি ব্যাকুল হয়ে সমুদ্রে চলে যায়, আর এ ঘটনাটি আপনার নিকট বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল, মাছটি সমুদ্রে বিস্ময়কর ভাবে তার পথ তৈরী করেছিল। হযরত মুসা (আঃ) তখন বললেন, আমরা তো ঐ স্থানটির অনুসন্ধানেই ছিলাম। এরপর তাঁরা উভয়ে নিজেদের পদচিহ্নের অনুসরণ করে নিদৃষ্ট স্থানে ঐ পাথরের নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখানে তিনি একজন মানুষকে পেলেন, যিনি তাঁর মুখমন্ডলকে বস্ত্রাবৃত করে রেখেছিলেন। মুসা (আঃ) তাঁকে সালাম দিলেন। খিজির (আঃ) বললেন, তোমাদের এই জমিনে সালামের পন্থা কোথায়? মুসা (আঃ) বললেন, আমি মুসা। খিজির (আঃ) বললেন, বণী ইসরাঈলের নবী মুসা (আঃ)? মুসা (আঃ) জবাব দিলেন, জ্বী-হ্যাঁ।

এরপর মুসা (আঃ) বললেন, আমি আপনার নিকট এজন্যে এসেছি যে আপনাকে যে বিশেষ এলম দান করা হয়েছে তার কিছু আপনি আমাকে প্রদান করবেন। খিজির (আঃ) বললেন, হে মুসা! আপনি আমার সঙ্গে থাকতে পারবেন না, আমাকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে এলম প্রদান করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনি অবগত নন। মুসা (আঃ) বললেন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি আপনার নির্দেশের বরখেলাফ কিছু করবো না। খিজির (আঃ) বললেন, যদি আপনি আমার সঙ্গে থাকতেই চান তবে যে পর্যন্ত আমি কিছু বর্ণনা না করি, সে পর্যন্ত কোন ঘটনা সম্পর্কে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। এ অঙ্গীকার গ্রহণের পর তাঁরা উভয়ে রওয়ানা হলেন। কিছু দূর চলার পর তাঁরা সমুদ্রের তীরে পৌঁছলেন। ওদিক থেকে একটি নৌকা অতিক্রম করছিল। তাঁরা নৌকায় আরোহণের কথা বললে পরিচালক কোন ভাড়া ব্যতীত তাদেরকে আরোহণ করিয়ে নেয়। কেননা তারা হযরত খিজির (আঃ)-এর সাথে পরিচিত ছিল। যখন তাঁরা নৌকায় আরোহণ করলেন তখন মুসা (আঃ) দেখলেন, খিজির (আঃ) নৌকার একটি কাষ্ঠ খন্ড ভেঙ্গে দিচ্ছেন। তখন মুসা (আঃ) বললেন, তারা আমাদেরকে কোন প্রকার বিনিময় ব্যতীত নৌকায় আরোহণ করিয়েছে, অথচ আপনি নৌকাটি বিনষ্ট করছেন, এতে নৌকার সকল আরোহী নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। খিজির (আঃ) বললেন, আমি পূর্বেই বলেছিলাম যে আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। হযরত মুসা (আঃ) বললেন, আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি একথাটি ভুলে গিয়েছিলাম।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ঐ মুহূর্তে দেখা গেল একটি পাখি নৌকার এক পার্শ্বে বসে গেছে এবং সাগরের পানি পান করছে। হযরত

খিজির (আঃ) মুসা (আঃ)-কে বললেন, আল্লাহ পাকের জ্ঞানের তুলনায় আপনার জ্ঞানের পরিমাণ তেমনি অকিঞ্চিতকর, যেমন সমুদ্রের পানির তুলনায় পাখিটির ঠোঁটের পানি। পাখিটি সমুদ্রের পানি তার ঠোঁটে নেয়ার কারণে সমুদ্রের পানির কমতি হয়নি, ঠিক তেমনি আমার এবং আপনার এলম আল্লাহ পাকের জ্ঞানের মহা ভাণ্ডার থেকে এতটুকু কম করতে পারেনা। এরপর তাঁরা নৌকা ছেড়ে পথ চলতে লাগলেন। হযরত খিজির (আঃ) দেখলেন, একটি ছেলে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খেলায় রত ছিল। হযরত খিজির (আঃ) তাকে ধরে হত্যা করলেন। মুসা (আঃ) তখনই বললেন, আপনি একটি অন্যায় কাজ করেছেন, একটি বেগুনাহ, নির্দোষ ছেলেকে আপনি হত্যা করেছেন। খিজির (আঃ) বললেন, আমি আপনাকে বলিনি যে আপনি আমার সাথে থাকতে পারবেন না? তখন মুসা (আঃ) বললেন, যদি এরপর আমি আপনাকে প্রশ্ন করি তবে আমাকে আপনি সঙ্গে রাখবেন না এবং আপনার নিকট আমার কোন ওজর-আপত্তিও চলবে না। এরপর তাঁরা উভয়ে অগ্রসর হলেন। একটি গ্রামে পৌঁছলেন। গ্রামবাসীকে খাবার দিতে বললেন। কিন্তু তারা তা দিলনা। সেখানে একটি দেয়াল দেখলেন, যা যে কোন সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে। খিজির (আঃ) তাকে তাঁর হাতের ইঙ্গিতে ঠিক করে দিলেন। তখন মুসা (আঃ) বললেন, আমরা এখানে এসেছি গ্রামবাসীরা আমাদের মেহমানদারী করেনি, আপনি তাদের দেয়াল ঠিক করে দিলেন, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন। তখন খিজির (আঃ) বললেন, এখন আমার এবং আপনার একত্রিত থাকার আর সম্ভাবনা নেই, এরপর তিনি তাঁর তিনটি কাজের ব্যাখ্যা দিলেন এবং বললেন, এ হলো সেই বিষয়, যা জিজ্ঞাসা না করে আপনি থাকতে পারেননি।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি মুসা (আঃ) সবর করতেন (তবে এমনি আরো ঘটনা ঘটতো) আর আল্লাহ পাক আমাদেরকে সে সম্পর্কে অবগত করতেন।

আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর প্রিয় বন্দা কে?

এবনে জরীর, এবনুল মুনজের ও এবনে আবি হাতেম তাঁদের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে হযরত মুসা (আঃ) তাঁর প্রতিপালককে জিজ্ঞাসা করেছেন, হে আল্লাহ! তোমার বন্দাদের মধ্যে কে তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়? আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, সে ব্যক্তি আমার সর্বাধিক প্রিয় বন্দা যে আমাকে স্মরণ রাখে এবং কখনও ভোলেনা।

মুসা (আঃ) পুনরায় আরজ করলেন, তোমার বন্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম শাসনকর্তা কে? আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, যে প্রবৃত্তির তাড়নায় পরিচালিত হয়না এবং যে হক্ব বা সত্য সিদ্ধান্ত নেয়। হযরত মুসা (আঃ) আরজ করলেন, তোমার বন্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম কে? তিনি বললেন, যে নিজের এলমের সঙ্গে অন্যের এলম একত্রিত করে বা অন্যের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের এলম বৃদ্ধি করে (এ উদ্দেশে যে হয়তো তার নিকট থেকে হেদায়েতের কোন পথ জানা যায় এবং ধ্বংসের পথ থেকে ফিরে আসা যায়)।

মুসা (আঃ) আরজ করলেন, হে আল্লাহ! তোমার বন্দাদের মধ্যে কেউ আমার চেয়ে

বড় আলেম যদি থাকে তবে আমাকে তার ঠিকানা ও পথ বাতলে দাও। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, তোমার চেয়ে বেশী এলম রয়েছে খিজিরের। মুসা (আঃ) বললেন, আমি খিজিরকে কোথায় পাব? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, সমুদ্রের তীরে পাথরের নিকট। মুসা (আঃ) আরজ করলেন, আমি তার চিহ্ন কি করে জানবো। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, একটি ভাজা মাছ সঙ্গে নিয়ে যাও, যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানেই খিজিরকে পাবে। হযরত মুসা (আঃ) তাঁর খাদেমকে বললেন, যে স্থানে মাছটি হারিয়ে যায় সেখানে আমাকে বলবে। এরপর হযরত মুসা (আঃ) এবং তাঁর খাদেম ইউশা উভয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন।[১]

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

এ ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে জানা যায়। হযরত ইউশা (আঃ) হযরত মুসা (আঃ)-এর বিশেষ খাদেম ছিলেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, সফরে সাথী বা খাদেম রাখা নবীগণের সুন্নত।

হযরত মুসা (আঃ) একথা বলেছেন, যে পর্যন্ত আমি দু' সমুদ্রের সংযোগ-স্থলে না পৌঁছব, সে পর্যন্ত চলতে থাকব। এর তাৎপর্য হলো, জ্ঞানের অন্বেষণে কঠোর পরিশ্রমের ফজিলত এবং গুরুত্ব রয়েছে। হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা থানবী (রঃ) লিখেছেন, এর দ্বারা একথাও জানা যায় যে, শায়খে কামেলের অন্বেষণে চরম সাধনা করা উচিত, যতক্ষণ এর দ্বারা কোন ওয়াজিব বিনষ্ট না হয়।

فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا

যখন তারা উভয়ে দুটি সমুদ্রের সংযোগ-স্থলে পৌঁছেন। এ সংযোগ-স্থলটি কোথায়, এ সম্পর্কে তফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ বলেছেন, পারস্য সাগর রোমান সাগরের সঙ্গে যেখানে মিলিত হয়েছে ঠিক সে স্থানটি। এ মতের প্রেক্ষিতে সুয়েজ যোজককে সে স্থান ধরে নেয়া যেতে পারে। সিরীয় উপকূল যে সর্বাপেক্ষা পশ্চিমে, এরূপ ধারণাও এ সূত্র থেকে পাওয়া যায়।

মোহাম্মদ এবনে কা'ব বলেছেন, এ স্থানটি হলো- তনজা।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এ স্থানটি হলো পারস্য সাগর ও রোমান সাগরের সংযোগ-স্থল।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, কারো কারো ধারণা এ ঘটনায় যে পাথরের উল্লেখ রয়েছে, সে পাথরটির নীচে আবে হায়াতের ঝরণা ছিল, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই, যদি কোন মৃত প্রাণীর উপর ঐ পানি পড়তো তবে তা জীবিত হয়ে যেত।

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ২৩৫-৩৭
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রাঃ), খণ্ড-৪ পৃষ্ঠা-৪৩৩-৩৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু,), পারা-১৫, পৃষ্ঠা-১১১
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৩০০
তফসীরে আদদুররুল মানসুর, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা ২৫২-৫৫

কালবী (রঃ) বলেছেন, ইউশা এবনে নুন আবে হায়াত দ্বারা অজু করে ভাজা মাছটির উপর পানির ছিটা দিয়েছিলেন, ফলে মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যায়। মাছটি তার লেজ দিয়ে আঘাত করলে পানির ভেতর পথ তৈরী হয়।

نَسِيَا حُوتَهُمَا

তারা উভয়ে মাছটির কথা ভুলে গেলেন অর্থাৎ হযরত মুসা (আঃ) মাছের কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলেন। আর ইউশা এবনে নুন ভুলে গেলেন মাছ যে সমুদ্রে চলে গেছে এই খবর দিতে।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, মাছটি ছিল ইউশা (আঃ)-এর নিকট। মাছের কথা তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু মাছটি উভয়েরই পাথেয় হিসেবে আনা হয়েছিল, সেজন্যে উভয়ে ভুলে গেছেন বলা হয়েছে।

فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا

মাছটি সাগরে তার পথ ধরে এবং চলে যায়।

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ

অতঃপর তারা অগ্রসর হয়ে চলতে লাগলেন, মুসা (আঃ) তাঁর খাদেমকে বললেন, খাবার আন, এই সফরে আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

غداء বলা হয় সকালের খাবারকে। আর عشاء সান্ধ্যকালীন খাবারকে বলা হয়। আর نَصَبًا অর্থ ক্লান্ত।

হযরত মুসা (আঃ) যখন তাঁর নিদৃষ্ট গন্তব্যস্থল পার হয়ে চলে গেলেন, তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এই ব্যবস্থা করা হয় যে তাঁর ক্ষুধা অনুভূত হলো, যেন খাবারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় এবং মাছের কথা স্মরণ হয়। আর সফরের উদ্দেশের দিকে ফিরে আসেন। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, যতক্ষণ হযরত মুসা (আঃ) তাঁর জন্যে নিদৃষ্ট স্থান ত্যাগ করেননি, ততক্ষণ তিনি ক্লান্তি ভোগ করেননি।

قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى
الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَٰنُ أَنْ أَذْكُرَهُۥ ۚ وَ
اتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلَىٰٓ
ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ ءَاتَيْنَٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا
وَعَلَّمْنَٰهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن
تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَ
كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِۦ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا
وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْـَٔلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰٓ
أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

তরজমা

(৬৩) যুবকটি তখন বলে, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন বিশ্রাম করছিলাম, আমি তখন মাছটির কথা ভুলে যাই; বস্তুতঃ শয়তানই আমাকে তার কথা বলতে ভুলিয়ে দেয়, আর মাছটি অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে সমুদ্রে পথ করে নেয়।

(৬৪) মুসা বললেন, আমরা তো সে স্থানটির অনুসন্ধান করছিলাম। এরপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন।

(৬৫) অতঃপর তাঁরা আমার বন্দা থেকে এমন এক বন্দাকে পান, যাকে আমি আমার রহমত দান করেছিলাম, আর আমার তরফ থেকে তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।

(৬৬) মুসা তাকে বললেন, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে প্রদান করা হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শেখাবেন, এ উদ্দেশে আমি কি আপনার অনুসরণ করবো?

(৬৭) তিনি বললেন, আপনি যে আমার সঙ্গে সবর অবলম্বন করে থাকতে পারবেন না।

(৬৮) যে বিষয় আপনার এলমের আওতায় নয়, সে সম্পর্কে আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন কিভাবে?

(৬৯) মুসা বললেন, আল্লাহ্ পাকের মর্জি হলে আপনি আমাকে ধৈর্য ধারণকারী পাবেন, আর আমি আপনার কোন কথা অমান্য করবো না।

(৭০) তিনি বললেন, আমার সঙ্গে যদি থাকতে চান, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি আপনাকে সে সম্বন্ধে কিছু বলি।

তফসীরুল কোরআন

হযরত মুসা (আঃ)-এর খাদেম ইউশা এবনে নুন বললেন, আমরা যে পাথরটির নিকট বিশ্রাম করছিলাম, সেখানেই মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল এবং বিস্ময়কর ভাবে সে সমুদ্রে তার পথ করে নিয়েছিল, কিন্তু কি আশ্চর্য আমি একথাটি আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আর এ কাজটি শুধু শয়তানের, যথাসময়ে কাজের কথা ভুলে যাওয়া নিঃসন্দেহে শয়তানেরই কাজ।

فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ

(মাছের কথাটি আপনাকে আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।)

এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে।

(১) আমি আপনার নিকট মাছের কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

(২) আমি মাছটি হারিয়ে ফেলেছি, অথবা মাছটি ছেড়ে এসেছি।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, ইউশা এবনে নুন যখন দেখলেন যে মাছ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে তখন হযরত মুসা (আঃ)-কে এ সম্পর্কে অবগত করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু হযরত মুসা (আঃ)-এর জাগ্রত হওয়ার পর তাঁকে এ বিষয়ে অবগত করতে ভুলে গেলেন এমনকি, সারাদিনেও একথা মনে হয়নি, পরের দিন জোহরের নামাজ আদায়ের পর যখন হযরত মুসা (আঃ) খাবার হাযির করতে বললেন, তখন ইউশা (আঃ)-এর মাছের কথা স্মরণ হলো। তিনি বললেন, শয়তানের কারণেই আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছি।

আল্লামা বয়জাবী (রঃ) লিখেছেন, হযরত ইউশা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমত দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। আর এ কারণেই মাছের ঘটনা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত বিনয়ের কারণে তিনি মাছের কথা ভুলে যাওয়াকে নিজের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا

মুসা বললেন, আমরা তো সে স্থানটির অনুসন্ধান করছিলাম। এরপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন এবং অবশেষে পুনরায় সেই পাথরটির নিকট পৌঁছলেন। আর ঐ স্থানটি খিজির (আঃ)-এর সাথে মোলাকাতের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল।

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

এরপর আমার বন্দাদের মধ্য থেকে এমন এক বন্দাকে পায় যাকে আমি আমার তরফ

থেকে রহমত দান করেছি। ইনিই ছিলেন হযরত খিজির (আঃ)। এই রহমত হলো হালাল রিয্ক, অথবা মানুষ থেকে দূরে থাকার সুযোগ এবং কারো মোহতাজ না হওয়া বা সুদীর্ঘ জীবন, আর কোন কোন তফসীরকারের মতে নবুওয়্যত।

হযরত খিজির (আঃ) প্রসঙ্গে

হযরত খিজির (আঃ) সর্বকালের সর্বজনবিদিত ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ পাক তাঁকে সৃষ্টি-রহস্যের অনেক অসাধারণ জ্ঞান দান করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম হলো, বিলিয়া বিন মালকান। অথবা আলইয়াসা অথবা ইলিয়াস। খিজির হলো তাঁর উপাধি। তাঁর উপনাম ছিল আবুল আব্বাস। আল্লামা বগভী হোমাম এবনে মোনাব্বার সূত্রে লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, খিজিরকে খিজির এজন্যে বলা হয়, তিনি যখন কোন স্থানে বসতেন, তখন সে স্থানটি সবুজ হয়ে যেত। চারিপার্শ্বে সবুজের মেলা লাগতো। মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, যে স্থানে হযরত খিজির (আঃ) নামাজ আদায় করতেন তার চারিপার্শ্বে সব কিছু সবুজ হয়ে যেত। আল্লামা বগভী বলেছেন, খিজির (আঃ) ইসরাঈলী বংশধর ছিলেন। কেউ বলেছেন তিনি ছিলেন রাজপুত্র, যিনি দুনিয়াত্যাগী হয়েছিলেন। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে আমার মতে হযরত খিজির (আঃ) ইসরাঈলী ছিলেন না। কেননা তাহলে মুসা (আঃ)-এর অনুসরণ করা তাঁর কর্তব্য হতো।[১]

হযরত খিজির (আঃ) নবী ছিলেন বা শুধু শীর্ষস্থানীয় ওলী ছিলেন, এ বিষয়ে তফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে তত্ত্বজ্ঞানীদের মতে, স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী না হলেও আল্লাহ পাক তাঁকে বিশেষ জ্ঞান প্রদানে ধন্য করেছেন।[২]

সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, হযরত খিজির (আঃ) কোন স্থানে দাঁড়ালে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পায়ের তলদেশে উদ্ভিদ উৎপন্ন হতো যা তাঁর দু' পা-কে ঢেকে দিত।

এবনে আসাকের যাহ্যাক (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। খিজির (আঃ) ছিলেন আদম (আঃ)-এর সন্তান, তাঁর মায়ের নাম ছিল রূমিয়া।

সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, তিনি ছিলেন শাহজাদা, পূর্বকালের কোন বাদশাহর পুত্র, সর্বক্ষণ তিনি আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকতেন।

ওহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বলেছেন, তিনি হলেন মালকান এবনে ফালেগ এবনে আবের এবনে সালেখ এবনে আরফাখসাজ এবনে সাম এবনে নূহ (আঃ)।

আল্লামা আলুসী (রঃ) ইমাম নববী (রঃ)-এর অভিমতের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে খিজির (আঃ)-এর নাম ছিল বিলিয়া বিন মালকান। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ মতই পোষণ করতেন। আল্লামা আলুসী আরও বলেছেন, যেভাবে তাঁর নবুওয়্যতের ব্যাপারে

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা ২৪০
২। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৩৯০

মতভেদ রয়েছে, তেমনি বর্তমানে তিনি জীবিত আছেন কি-না এ সম্পর্কেও তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তাদের এক দলের মত হলো তিনি এখন জীবিত নেই। ইমাম বোখারী (রঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে হযরত খিজির (আঃ) ও হযরত ইলিয়াস (আঃ) এখন কি জীবিত আছেন? তখন তিনি বলেন, কিভাবে? কেননা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যারা বর্তমানে পৃথিবীতে আছে, একশত বছর পর তাদের কেউ থাকবে না। এমনিভাবে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর এন্তেকালের পূর্বে এরশাদ করেছেনঃ বর্তমানে পৃথিবীতে যারা আছে, একশত বছরের মাথায় তারা কেউ থাকবেনা।

ইমাম এবনে তাইমিয়া (রঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, যদি খিজির জীবিত থাকতেন তবে তাঁর কর্তব্য হতো হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হওয়া, তাঁর দীক্ষা গ্রহণ করা এবং তাঁর সম্মুখে আল্লাহর রাহে জেহাদ করা, অথচ বদরের যুদ্ধের দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছিলেনঃ

اللهم ان تهلك العصابة لا تعبد فى الارض

(হে আল্লাহ! যদি এই ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস হয়ে যায় তবে তোমার বন্দেগী আর হবেনা।) আর বদরের রণাঙ্গণে সাহাবীর সংখ্যা ছিল ৩১৩ এবং তাঁরা ছিলেন সুপরিচিত, সুবিখ্যাত, তাঁদের মধ্যে খিজির (আঃ) তো ছিলেন না।[১]

কোরআনে পাকে যে ব্যক্তিকে عبد (বন্দা) বলা হয়েছে বোখারী শরীফ এবং অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থে তাঁকে خضر (খিজির) বলা হয়েছে। তিনি হলেন আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য একজন মকবুল বন্দা।

رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

"আমার তরফ থেকে তাঁকে এক বিশেষ রহমত দান করেছি"।

আল্লাহ পাকের এই এরশাদ থেকে হযরত খিজির (আঃ)-এর মকবুল বন্দা হওয়া সম্পর্কে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। অবশ্য এই 'বিশেষ রহমত'টি নবুওয়্যত রূপে হওয়া জরুরী নয়। সুতরাং হযরত খিজির (আঃ)-এর নবী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ হয়েছে। আল্লামা আলুসী (রঃ) রূহুল মাআনীতে লিখেছেনঃ অধিকাংশ আলেমের মতে তিনি একজন নবী, তবে রসূল নন। আবার কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনি একজন রসূল। অনেকে বলেছেন তিনি একজন ওলী। কুশাইরী এবং অপর একটি সম্প্রদায় এ মত পোষণ করেন। তফসীরে মোয়ালেমুত তানজীল গ্রন্থে বলা হয়েছে যে অনেক আলেমের মতে তিনি নবী নন।

وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড- ১৪ পৃষ্ঠা- ৩১৯-২৯

অর্থাৎ আমি তাকে নিজের তরফ থেকে বিশেষ এলম দান করেছিলাম।

এই এলম তাঁকে চেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়নি বা অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষা করতে হয়নি, বরং কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তাঁকে এই এলম সরাসরি দেয়া হয়েছিল। এই এলম ছিল বিশ্বসৃষ্টির গোপন রহস্য। মোহাক্কেক আলেমগণ বলেন যে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের জন্যে বিশ্ব জগতের গোপন রহস্য জানা জরুরী নয়, বরং এলমে শরয়ী বা এলমে এলাহী (শরীয়ত ও মারেফত) আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের জন্যে জরুরী। এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করা হয় যে হযরত মুসা (আঃ) এক বিশাল মর্যাদার অধিকারী নবী হওয়ার কারণে একথা নিশ্চিত যে তিনি তাঁর যুগের সকল মানুষের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। সুতরাং তাঁকে কিভাবে তখন অন্য এক ব্যক্তির নিকট জ্ঞান লাভের জন্যে পাঠানো সম্ভব হলো। কিন্তু ইমাম রাজী (রঃ) বলেন যে এটা অতি সহজেই সম্ভব হয়। কোন ব্যক্তি যদি অনেক ধরনের এলমে সমৃদ্ধ হয়েও থাকেন, তবুও তাঁর কাছে কোন কোন বিষয় অজানা থাকতে পারে এবং তা শিক্ষা করতে তাঁকে কারো কাছে পাঠানো যেতে পারে।

عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا

"আমার বন্দাগণের মধ্যে একজন বন্দা"।

অর্থাৎ তিনি কামেল বুযুর্গ এবং জ্ঞান-সমৃদ্ধ হওয়া সত্বেও আমার একজন বন্দা-ই ছিলেন। তিনি আল্লাহর একজন বন্দার চেয়ে কণা পরিমাণ অতিরিক্ত কিছু ছিলেন না।

عَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا

আর আমি আমার পক্ষ থেকে তাকে বিশেষ এলম দান করেছি, যা আল্লাহ্ পাকের তৌফিক ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়।

আলোচ্য আয়াতে علما শব্দটির তাৎপর্য হলো আল্লাহ্ পাকের পবিত্র সত্বা ও গুণাবলীর এলম।

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

"তাঁকে মুসা (আঃ) বললেন, আপনাকে যে মহৎ জ্ঞান দান করা হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু এলম দান করবেন এ উদ্দেশে আমি আপনার অনুসরণ করবো কি"?

অর্থাৎ আপনার নিকট থেকে কিছু জ্ঞান অর্জনের জন্যে আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চাই।

তিরমিযী এবং এবনে মাজা হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, জ্ঞানের কথা মোমেনের হারানো সম্পদ।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, কোন কোন হাদীসে রয়েছে, মুসা (আঃ) যখন খিজির

(আঃ)-কে তাঁর সঙ্গে থাকার কথা বললেন, তখন খিজির (আঃ) বললেন, এলমের জন্যে তৌরাত যথেষ্ট, আর আমলের জন্যে বণী ইসরাঈলের হেদায়েতের প্রচেষ্টা যথেষ্ট। আর বাড়তি এলম ও আমলের কোন প্রয়োজন নেই। তখন মুসা (আঃ) বললেন, আল্লাহ্ পাক আমাকে এ আদেশ দিয়েছেন যেন আপনার সঙ্গে থেকে আমার এলম বৃদ্ধি করি। হযরত মুসা (আঃ) তাঁর এ বক্তব্যে অত্যন্ত আদব ও বিনয় প্রকাশ করেছেন এবং হযরত খিজির (আঃ)-এর নিকট দরখাস্ত করেছেন যে আমাকে আপনার সঙ্গে রাখুন এবং আল্লাহ্ পাক আপনাকে যে এলম দান করেছেন তার কিছু অংশ আমাকে দান করুন।

এলম হাসিল করার আদব

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত সমূহ থেকে বোঝা যায় যে মুসা (আঃ) যখন খিজির (আঃ)-এর নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা করেন তখন তিনি অত্যন্ত আদব এবং ভদ্রতার পরিচয় দেন।

(১) তিনি খিজির (আঃ)-এর নিকট বিনয় প্রকাশ করে এভাবে অনুমতি প্রার্থনা করেন, هَلْ اَتَّبِعُكَ আমি আপনার অনুসরণ করবো কি?

(২) তিনি তাঁকে অনুসরণ করার জন্যে এমন এক ভঙ্গিতে অনুমতি প্রার্থনা করেন যার ভাষাটি হলোঃ আমার নিজেকে আপনার অনুগত করে দিতে আমাকে অনুমতি দিন, এটি ছিল চরম বিনয়ের দৃষ্টান্ত।

(৩) তিনি আরজ করেছিলেন- 'আমাকে আপনি শিক্ষা দান করবেন'। একথা দ্বারা তিনি নিজেকে অজ্ঞ এবং খিজির (আঃ)-কে বিজ্ঞ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

(৪) তিনি তাঁর নিকট এভাবে আরজ করেছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক আপনাকে যত জ্ঞান দান করেছেন তা থেকে কিছু আমাকে দান করুন। مِنْ শব্দটি ব্যবহার করে 'কিছু' জ্ঞান প্রার্থনা করা হয়েছে। অর্থাৎ খিজির (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাক যত জ্ঞান দান করেছেন তার মধ্য থেকে কিছু বা কিঞ্চিৎ জ্ঞান প্রার্থনা করেছেন। কথা বলার এ ভঙ্গিটিও বিনয়ের এক অনন্য উদাহরণ, যেন তিনি বলছেনঃ আমি আপনার কাছে সে পরিমাণ চাই না যে জ্ঞানের ব্যাপারে আমাকে আপনার সমান বানিয়ে দেবেন, বরং আপনার অগাধ এলমের কিছু অংশ দান করবেন, যেরূপ একজন বিত্তবানের কাছে তার বিশাল সম্পদ থেকে একজন ভিক্ষুক সামান্য কিছু প্রার্থনা করে থাকে।

(৫) মুসা (আঃ) বলেছেন مِمَّا عُلِّمْتَ অর্থাৎ আপনাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। একথার দ্বারা তিনি স্বীকার করেছেন যে খিজির (আঃ) যত এলমের অধিকারী হয়েছেন, তা আল্লাহ পাকই শিক্ষা দিয়েছেন।

(৬) মুসা (আঃ) বলেছেন رُشْدًا অর্থাৎ হেদায়েত। তিনি হেদায়েত লাভের উদ্দেশে খিজির (আঃ)-এর কাছ থেকে এলম হাসিল করতে চেয়েছেন। আর হেদায়েত এমন এক বস্তু যদি তা হাছিল না হয় তবে তার স্থলে হাসিল হয় গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা।

(৭) মুসা (আঃ) বলেছেন, تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ পাক

আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবে আপনি আমাকে শিক্ষা দেবেন। হযরত মুসা (আঃ)-এর বিনয় প্রকাশ পেয়েছে এ মর্মে যে আপনি আমাকে যা কিছু শিক্ষা দেবেন তা হবে আপনার তরফ থেকে আমার প্রতি সেরূপ একটি দান, যেরূপ আল্লাহ্ পাক আপনাকে নেয়ামত স্বরূপ দান করেছেন। এখানে যেন একথাই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যে আমি তাঁর অনুগত, যাঁর কাছ থেকে আমি একটি মাত্র হরফ শিখেছি।[১]

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا

"খিজির (আঃ) বললেনঃ একথা নিশ্চিত যে আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেন না"।

হযরত খিজির (আঃ) হলেন নিগূঢ় তত্ত্বের রহস্য-জ্ঞানী। আর হযরত মুসা (আঃ) হলেন, শরীয়তের আইন-কানুনের ধারক বাহক এবং প্রচারক। একজনের কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হলো অভ্যন্তরীণ রহস্য। অন্যদিকে আরেকজনের যাবতীয় পদক্ষেপ হলো শরীয়তের বিধান মোতাবেক। তাই হযরত মুসা (আঃ) প্রকাশ্য শরীয়ত বিরোধী কোন কাজকে সহ্য করবেন না এটাই স্বাভাবিক। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا

(আর যে বিষয়ে আপনার পূর্ণ এলম নেই সে বিষয়ে আপনি কিভাবে সবর করবেন?)

আলোচ্য আয়াতের خبرا শব্দটির অর্থ এলম, খবর। হযরত খিজির (আঃ) জানতেন, এমন এমন ঘটনা ঘটবে যা প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ হবে। আর নবীগণ নিষিদ্ধ বিষয়ের ব্যাপারে নীরব থাকতে পারেন না, যে পর্যন্ত না সে নিষিদ্ধ বিষয়ের কোন বৈধতা তাঁদের নিকট প্রকাশিত হয়। হযরত মুসা (আঃ) মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বানের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন। আর হযরত খিজির (আঃ)-এর কাজ হযরত মুসা (আঃ)-এর শরীয়ত মোতাবেক ছিলনা, কিন্তু আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ মোতাবেক ছিল। তাই উভয়ের সহযাত্রা বা সহাবস্থান সম্ভব নয় বলে হযরত খিজির (আঃ) মন্তব্য করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এজন্যে সুফী-সাধকগণ বলেন, যদি মুরীদ একথা পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করে যে পীর কামেল এবং তিনি আরেফে কামেল, তবে তাঁর কোন কাজে প্রশ্ন করা উচিত নয়। যদি পীরে কামেলের সাথে মুরীদের মত-বিরোধ হয়ে যায় এবং মুরীদ পীরের কর্মের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন না করে থাকতে না পারে, তবে পীরের সংসর্গ ত্যাগ করা উচিত, কাছে থেকে প্রশ্ন করার চেয়ে দূরে থাকা অনেক ভালো।[২]

قَالَ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا

হযরত খিজির (আঃ)-এর কথার জবাবে হযরত মুসা (আঃ) বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত

১। তফসীরে কবীর, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-১০১
২। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-, পৃষ্ঠা ২৪২-৪৩

থাকুন, ইনশাআল্লাহ আমাকে আপনি সবর অবলম্বনকারী পাবেন। আর আমি আপনার কোন কথা অমান্য করবো না। হযরত মুসা (আঃ) সবর অবলম্বনের অঙ্গীকার করলেন। কেননা সবরের মাধ্যমেই হযরত খিজির (আঃ)-এর সান্নিধ্য তাঁর জন্যে উপকারী হতে পারে। এরপর আরো সুস্পষ্ট ভাবে বললেন, আমি আপনার কোন কথা অমান্য করবো না। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো, কারো কথা অমান্য করলে তার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়না। যেহেতু হযরত খিজির (আঃ) ও হযরত মুসা (আঃ)-এর চিন্তাধারা ও জীবন ধারা ভিন্ন ভিন্ন ছিল, আর এ কারণে হযরত মুসা (আঃ)-এর পক্ষ থেকে হযরত খিজির (আঃ)-এর কোন কর্মের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপনের সম্ভাবনা ছিল, তাই হযরত খিজির (আঃ) তাঁকে সঙ্গে রাখার ব্যাপারে একটি শর্ত আরোপ করলেনঃ

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

খিজির (আঃ) বললেন, যদি আপনি আমার সাথে থাকতে চান, তবে কোন ব্যাপারেই আমাকে পূর্বে জিজ্ঞাসা করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি আপনাকে বলি। অর্থাৎ যদি আমি এমন কোন কাজ করি যা আপনার অপছন্দনীয় হয়, তবে যে পর্যন্ত আমি কিছু না বলি, সে পর্যন্ত উক্ত বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন না, কোন প্রশ্ন উত্থাপন করবেন না। কেননা এমন অবস্থায় উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়না।

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ
خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ أَلَمْ
أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَ
لَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ
قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٧٤﴾

তরজমা

(৭১) অতঃপর উভয়ে চলতে থাকেন, অবশেষে যখন একটি নৌকায় আরোহন করেন, তিনি (খিজির) তাতে ফাটল ধরিয়ে দেন, মুসা বললেন, আপনি কি আরোহীদের ডুবিয়ে দেয়ার জন্যেই তাতে ফাটল ধরিয়ে দিলেন, নিশ্চয় আপনি এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।

(৭২) খিজির বললেন, আমি কি আপনাকে একথা বলিনি যে আপনি আমার সঙ্গে

সবর অবলম্বন করে থাকতে পারবেন না।

(৭৩) মুসা বললেন, আমার ভুলের জন্যে আমাকে অপরাধী করবেন না, আর আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।

(৭৪) এরপর উভয়ে পুনরায় চলতে লাগলেন। অবশেষে যখন একটি বালককে দেখতে পান, তিনি (খিজির) তাকে হত্যা করেন। তখন মুসা বললেন, আপনি কি একটি নিরপরাধ জীবন নাশ করলেন হত্যার অপরাধ ব্যতীত, নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।

তফসীরুল কোরআন

হযরত মুসা (আঃ)-এর তরফ থেকে কোন প্রকার প্রশ্ন না করার অঙ্গীকারের পর তাঁদের উভয়ের যাত্রা শুরু হলো। তাঁদের নৌকায় আরোহণের প্রয়োজন হলো এবং একটি নৌকা পেয়েও গেলেন।

হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ)-এর সূত্রে বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ একটি নৌকা তাঁদের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিল। তাঁরা উভয়ে নৌকায় আরোহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নৌকার মালিক হযরত খিজির (আঃ)-কে চিনতে পেরেছিল, তাই সে তাঁদেরকে বিনা ভাড়ায় আরোহণ করালো।

حَتّٰى اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا

নৌকাটি তীরের কাছাকাছি হওয়ার পূর্বেই খিজির (আঃ) নৌকার একখানি তক্তা খুলে তাতে ফাটল ধরিয়ে দিলেন। কিন্তু মুসা (আঃ) এ কাজ পছন্দ করলেন না।

قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا

মুসা (আঃ) বললেন, আরোহীদের ডুবিয়ে দেয়ার জন্যেই কি আপনি তাতে ফাটল ধরিয়ে দিলেন। তারা তো আমাদেরকে বিনা ভাড়ায় আরোহণ করিয়েছে, এখন পানি প্রবেশ করবে এবং সকলেই নিমজ্জিত হবে।

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا

"নিশ্চয় আপনি একটি গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন"।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত মুসা (আঃ) হয়তো লক্ষ্য করেননি, কিন্তু নৌকার আরোহীরা যেন নিমজ্জিত না হয় এবং আপাততঃ নৌকাটি ত্রুটিপূর্ণ হলেও তক্তাটি পরে যেন জুড়ে দেয়া যায়, সেদিকে হযরত খিজির (আঃ) লক্ষ্য রেখেছেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত খিজির (আঃ) যে তক্তায় ছিদ্র করেছেন ঐ ছিদ্রের উপর একটি পাত্র তিনি স্থাপন করেছেন ফলে নৌকায় পানি প্রবেশ করতে পারেনি।

বিখ্যাত তফসীরকার জালালুদ্দীন মহল্লী লিখেছেন, নৌকাটিতে পানি প্রবেশ না করা ছিল হযরত খিজির (আঃ)-এর মোজেযা।[১]

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا

মুসা (আঃ)-এর মন্তব্যের জবাবে খিজির (আঃ) বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি, আপনি ধৈর্য ধারণ করে আমার সাথে থাকতে পারবেন না। এভাবে হযরত খিজির (আঃ) হযরত মুসা (আঃ)-কে তাঁর শর্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। এদিকে মুসা (আঃ) দেখলেন, নৌকায় ফাটল সৃষ্টি করা হলেও আরোহীদের কোন ক্ষতি হয়নি, পানি ভেতরে প্রবেশ করেনি।

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ

মুসা (আঃ) বললেন, আমি ভুলে গিয়েছিলাম, ভুলক্রমে কথাটি বলে ফেলেছি, অতএব, দয়া করে আমার ভুল ধরবেন না।

হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মুসা (আঃ)-এর প্রথম জিজ্ঞাসা ছিল ভুলক্রমে, দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা ছিল দোষ স্বীকারে, আর তৃতীয় জিজ্ঞাসা ছিল ইচ্ছা করে বিদায় গ্রহণে।

وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا

আর আমার কাজকে কঠিন করবেন না। অর্থাৎ আমার সাথে কঠোর ব্যবহার করবেন না। ভুলবশতঃ আমি প্রশ্ন করেছি, এর জন্যে এমন কঠোর ব্যবহার করবেন না যে আপনার সঙ্গে অবস্থান করা কঠিন হয়ে যায়।

فَانْطَلَقَا

নৌকা থেকে অবতরণ করে তারা পুনরায় চলতে থাকেন।

حَتّٰى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ

অবশেষে তারা একটি বালককে দেখতে পান, খিজির (আঃ) তাকে হত্যা করেন। তফসীরকারগণ লিখেছেন, একটি বালক অন্য বালকদের সঙ্গে খেলা করছিল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন বালকটিকে হযরত খিজির (আঃ) হত্যা করলেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, বালকটি নাবালক ছিল। পবিত্র কোরআনের غُلٰما শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে। কেননা সাবালক হওয়ার পর غُلٰما শব্দটি ব্যবহৃত হয়না। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একথাও বলেছেন যে হযরত মুসা (আঃ) বলেছেন,

اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً

(আপনি কি একটি নিঃস্পাপ প্রাণকে হত্যা করলেন?)

১। তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৪৬

নিহত ছেলেটি নাবালক ছিল বলেই হযরত মুসা (আঃ) তাকে নিঃস্পাপ বলেছেন।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, ছেলেটি সাবালক ছিল। আর কালবী (রঃ) বলেছেন, সে নওজোয়ান ছিল। সে পথিক মুসাফিরের সম্পদ লুণ্ঠন করতো এবং তার পিতার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করতো। যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, নাবালক ছিল কিন্তু খারাপ কাজ করতো, এজন্যে তার পিতা-মাতা ব্যথিত হতো।

ইমাম মুসলিম হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে বালকটিকে খিজির (আঃ) হত্যা করেছেন সে জন্মগত কাফের ছিল। যদি সে জীবিত থাকত, তবে তার পিতাকে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত করতো। তাই হযরত খিজির (আঃ) তাকে দেখেই হত্যা করেছেন।

قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا

মূসা (আঃ) বললেন, আপনি কি একটি নিঃস্পাপ শিশুকে কোন অপরাধ ব্যতীত হত্যা করলেন। নিশ্চয় আপনি খুবই অন্যায় কাজ করেছেন। আপনি অকারণে তথা কোন অপরাধ ব্যতীত তাকে যে হত্যা করলেন, তা অত্যন্ত গুরুতর অন্যায়। বিশেষতঃ তখন সে এমন কোন অন্যায় করেনি যার শাস্তি হতে পারে মৃত্যু। সে হত্যাকারীও নয় এবং মুরতাদও নয়। অতএব, এমন একটি বালককে হত্যা করার চেয়ে আর অন্যায় কি হতে পারে!

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ২৮ অক্টোবর মোতাবেক ২৯ রবিউসসানী রোজ বুধবার তফসীরে নূরুল কোরআনের পঞ্চদশ খণ্ডের রচনা শেষ হল। হে আল্লাহ! কবুল কর এই সাধনাকে এবং এ মহান গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর, আমীন।

